এম. এ. পার্ট - ওয়ান

রাষ্ট্র বিজ্ঞান

চতুর্থ পত্র প্রথম অর্ধ ১ ও ২

চতুর্থ পত্র দ্বিতীয় অর্ধ ১ ও ২

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইরেকটরেট অব্ ডিস্ট্যান্স্ এডুকেশন

গোলাপবাগ ঃ বর্ধমান-৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক

অধ্যাপক অনিলবরণ রায়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১০

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান - ৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পুনর্মুদ্রণ : ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৩

প্রকাশনা

ডাইরেক্টর, ডিসট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহায়তা

ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল
নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

সম্পাদকের নিবেদন

চতুর্থ পত্র প্রথম অর্ধ পর্যায়-১

২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে নতুন স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু হয়। নতুন পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো যাতে ছাত্রছাত্রীরা যথার্থভাবে অনুধাবন ও আয়ত্ত করতে পারে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশন মূলত দু'টি পন্থা গ্রহণ করেন। এক, দক্ষ অধ্যাপকদের সাহায্যে বিষয়গুলো এমনভাবে পরিবেশন করা যাতে তা ছাত্রছাত্রীদের সহজবোধ্য হয়। দুই, দূর- শিক্ষার ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাঝে মাঝে কিছু সময়ের জন্য দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকবৃন্দ কর্তৃক প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা ইংরাজীতে যাকে Personal Contact Programme বলা হয়। এই দুই ব্যবস্থার সফল রূপায়নে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের Directorate of Distance Education উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা যা যথেষ্ট সুফলদায়ক হয়েছে সে কথা Distance Education Council , New Delhi স্বীকার করেছেন।

বর্তমান পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠক্রমের চতুর্থ পত্রের প্রথম অর্ধের (ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও জাতীয় আন্দোলন) অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয় ছ'টি ইউনিটে বা এককে ভাগ করে পরিবেশন করা হয়েছে। প্রথম ইউনিটে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-কর্তৃক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পূর্ববর্তী অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের বিভিন্ন দিক, যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ইত্যাদির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ইউনিটে জাতীয় আন্দোলনের নরমপন্থী ও চরমপন্থী রাজনীতির উদ্ভব, বিকাশ ও তারতম্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় ইউনিটে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন কীভাবে ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় উদ্ভূত হয়ে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ও অঞ্চল বিশেষে প্রভাব বজায় রেখেছিল সে কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ইউনিটে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কীভাবে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল সে কথা বলা হয়েছে।

আমার সহকর্মী এবং বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিমাই প্রামাণিক বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে ভাগ করে প্রাঞ্জলভাষায় তা পরিবেশন করে এবং নমুনা প্রশ্নাবলী, অনুশীলনী ও গ্রন্থপঞ্জীর সাহায্যে পাঠ উপকরণকে পূর্ণাঙ্গ এবং সুবোধ্য করে আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। অধ্যাপক প্রামাণিকের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছে লিখিত পাঠ উপকরণ।

আমাদের বর্তমান কার্যক্রম সফল করার পিছনে রয়েছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্ট অব্ ডিস্‌ট্যান্স এডুকেশন-এর অধিকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. ষোড়শীমোহন দাঁ, সহ-অধিকর্তা শ্রী নবকুমার ঘোষ এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অমিত কুমার মল্লিক মহাশয়। এঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণা ছাড়া আমাদের এই কাজ সাফল্যের সাথে করা সম্ভব হতো না।

যাদের জন্য এই কাজ সেই ছাত্রছাত্রীদের যথার্থ উপকারে লাগবে এই পাঠ-উপকরণগুলি —এই আমাদের আশা।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
১৮ই জুন, ২০০৭

ড. অনিলবরণ রায়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকের নিবেদন

চতুর্থ পত্র প্রথম অর্ধ পর্যায়-২

২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু হওয়ার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা-অধিকরণ প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন পাঠক্রমের বিভিন্ন পত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোকে ইংরাজী, বিশেষকরে বাংলায় সহজভাবে পরিবেশন করার। বেশীরভাগ ছাত্র বাংলায় লিখতে ইচ্ছুক হওয়ায় বাংলায় পুস্তিকাকারে বিভিন্ন পত্রভুক্ত বিষয়গুলোকে প্রকাশ করার বিশেষ যুক্তি আছে। সেই প্রচেষ্টার সফল রূপায়ণ বর্তমান পুস্তিকাটি। পুস্তিকাটিতে স্নাতকোত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠক্রমের চতুর্থপত্রের প্রথম অর্ধের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির ঠিক আগের দশক অর্থাৎ চল্লিশের দশকটি নানা কারণে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংঘাত-বহুল এই দশকটিতে নানা ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন আমরা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের বিভিন্ন আন্দোলনে সামিল হতে দেখি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হতে দেখি, অন্যদিকে তেমনি স্বাধীনতা-আন্দোলনকে হীনবল করার জন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সক্রিয় হতে দেখি। একদিকে যেমন ভারতবর্ষের বাইরে থেকে নেতাজীর-নেতৃত্বে পরিচালিত **আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে** মরণ-পণ সংগ্রামে নিযুক্ত হতে দেখি অন্যদিকে তেমনি বম্বেতে ভারতীয় **নৌ-বাহিনীর** একটি শাখাকে ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দেখি। একদিকে যেমন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ্ নেতৃত্বকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কিভাবে আসবে ও কি প্রকৃতির হবে — অখণ্ড হবে না পাকিস্তানের উদ্ভবে দ্বি-খণ্ডিত হবে — এই নিয়ে দরকষাকষি করতে দেখি অন্যদিকে তেমনি ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি ক্রিপস্, ওয়াভেল, ক্যাবিনেট মিশন ও মাউন্টব্যাটেনকে বিভিন্ন পরিকল্পনা মারফৎ কিভাবে ব্রিটিশ স্বার্থ যতটা সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া যায় — সে সম্পর্কে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ্ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় — নিযুক্ত হতে দেখি। এ'সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে ভারতবর্ষের দ্বি-খণ্ড করণে এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট-কর্তৃক ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা- আইন অনুমোদনে।

বহু ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতে একইসঙ্গে সমৃদ্ধ ও কণ্টকিত এই দশকটির আলোচনা উল্লেখযোগ্যভাবে করেছেন আমার সহযোগী ও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক নিমাই প্রামানিক। প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশন করার ফলে পাঠ উপকরণসমূহ সুবোধ্য হয়েছে। আবার, নমুনা প্রশ্নাবলী, অনুশীলনী ও প্রশ্নপঞ্জী সমন্বিত হওয়ায় তা পূর্ণাঙ্গও হয়েছে। অধ্যাপক প্রামানিককে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তার এই সু-প্রচেষ্টাটির জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দূর-শিক্ষা অধিকরণের অধিকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ ষোড়শী মোহন দাঁ এবং সহ অধিকর্তা শ্রী নবকুমার ঘোষ সদা-জাগ্রত থেকেছেন যাতে লিখিত বিষয়গুলো যথা সত্বর এবং নিখুঁতভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা যায়, তাঁদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও আনুকূল্য দানের জন্য।

সর্বোপরি, যাঁর নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্ব দান ছাড়া আমাদের এই কাজকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সম্পূর্ণ করা সম্ভব হতো না তিনি হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অমিত কুমার মল্লিক। তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানাই।

ছাত্রছাত্রীদের যথার্থ কাজে লাগবে পরিবেশিত পাঠ উপকরণ — এই আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি এই প্রতিবেদন।

বর্ধমান, বিশ্ববিদ্যালয়
১৪ই আগষ্ট, ২০০৭

ডঃ অনিলবরণ রায়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকের নিবেদন

চতুর্থ পত্র দ্বিতীয় অর্ধ পর্যায়-১

২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে পুস্তিকাকারে প্রকাশ ও পরিবেশনা করার যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা-অধিকরণ (Directorate of Distance Education) নিয়েছেন তার উল্লেখযোগ্য ফসল হল বর্তমান পুস্তিকাটি। পুস্তিকাটিতে স্নাতকোত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চতুর্থ পত্র/ দ্বিতীয় অর্ধেক অন্তর্ভূক্ত কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় রাজনীতিতে যে সমস্যাগুলোকে জ্বলন্ত বিষয় বা burning issues বলে উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে নিঃসন্দেহে পড় এ'গুলিঃ আঞ্চলিকতাবাদ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা, জাত ও শ্রেণীর সমস্যা ও জাতীয় সংহতির সমস্যা। এই সব সমস্যার অতি প্রাঞ্জল আলোচনা ও বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক সুশীল রঞ্জন রায়। আলোচনার শেষে প্রশ্নাবলি, অনুশীলনী ও গ্রন্থপঞ্জি দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন আলোচিত বিষয়গুলো। এ সবের ফলে আমরা সম্পাদনার কার্যটি নিঃসন্দেহে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয়েছে। অধ্যাপক রায়কে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদ জানাই দূরশিক্ষা অধিকরণের মাননীয় অধিকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব ড: ষোড়শীমোহন দাঁ ও সহ-অধিকর্তা শ্রী নবকুমার ঘোষকে। বস্তুত এদের সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া আমাদের এই কাজটিকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কখনই সম্ভব হতো না। আর যাঁর অতন্দ্র অনুপ্রেরণা ও পথ নির্দেশ আমাদের এই কাজটি করার পথে সব সময় পাথেয় হয়েছে সেই মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক অমিত কুমার মল্লিক মহাশয়ের বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই আমাদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
৩১ শে আগস্ট, ২০০৭

ডঃ অনিলবরণ রায়
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

সম্পাদকের নিবেদন

চতুর্থ পত্র দ্বিতীয় অর্ধ পর্যায়-২

অ্যারিস্টটল মানুষকে রাজনৈতিক প্রাণী হিসাবে বিশেষিত করেছিলেন, কারণ রাষ্ট্র ছাড়া মানুষ নিজেকে বিকশিত করতে পারে না। রাষ্ট্র এমন রকরগুলি অধিকার মানুষের জন্য সংরক্ষণ করে এবং এমন কতকগুলি অধিকার মানুষকে সংবিধান বা আইন মারফৎ দেয় যেগুলি ব্যতীত মানুষ তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটাতে পারে না।

অধিকার ছাড়া মানুষ যথার্থ হয় না। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে মানবিক অধিকারের বাতাবরণ অক্ষুণ্ণ রাখা। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র তাই মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত — একে অপরের পরিপূরক। আবার, আন্তর্জাতিক মানবসমাজ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দায়িত্বও এব্যাপারে কম নয়। মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বঘোষণাপত্রে একথা নিঃসংকোচে স্বীকার করা হয়েছে।

মানবাধিকারের এই যে প্রাতিস্বিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট — এই প্রেক্ষাপটে মানবাধিকারের গুরুত্ব যে অসীম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান পুস্তিকাটিতে অধ্যাপক সুশীল রঞ্জন রায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের চতুর্থ পত্রের দ্বিতীয় অর্ধ অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মানবাধিকার কী, মানবাধিকারের তত্ত্বসমূহ যেমন আলোচনা করেছেন তেমনি ভারতে মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও মানবাধিকার সম্পর্কিত কয়েকটি আন্দোলনের আলোচনা করেছেন। আবার, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বগোষণাপত্রও তাঁর আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আর একটি বিষয় যা সাম্প্রতিক কালে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং যা অধ্যাপক রায়ের আলোচনায় স্থান পেয়েছে তা হচ্ছে ভারতে পরিবেশ বিষয়ক রাজনীতি ও বিকল্প উন্নয়নের ধারনা। এই বিষয়টিতে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের চতুর্থপত্রের দ্বিতীয় অর্ধের অন্তর্গত। ভারতে পরিবেশের সংকট কি কারণে, গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ আন্দোলন যেমন চিপকো, নর্মদা বাঁচাও ইত্যাদির প্রধান বিচার্য বিষয় কি কি, ভারতে পরিবেশ সমস্যার সমাধানে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, বিকল্প উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়, এ সম্পর্কে গান্ধীবাদী, মার্কসবাদী, 'প্রযুক্তি'-বাদী, সংরক্ষণবাদী, নৈরাজ্যবাদী ও নারীবাদী দৃষ্টিকোণ ও তত্ত্বের বক্তব্য ইত্যাদির যথাযথ আলোচনা প্রাঞ্জল ভাষায় করা হয়েছে। অনুশীলনী, নমুনা প্রশ্নবলী ও গ্রন্থপঞ্জীর সাহায্যে পাঠচর্চায় উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

সম্পাদক হিসাবে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক রায়কে প্রদত্ত কাজটি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য। প্রকাশনার কাজটি দক্ষতার সঙ্গে সম্পূর্ণ করেছেন দূরশিক্ষা-বিভাগ যার নেতৃত্বে রয়েছেন বিভাগের অধিকর্তা ডঃ মোহন পাল। এঁদের সকলকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ডঃ ষোড়শী মোহন দাঁ কে এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ সুব্রত পাল মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ উপকারে লাগবে এই পাঠ উপকরণগুলি।

ডঃ অনিলবরণ রায়
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
১৮ মে, ২০০৮

চতুর্থ পত্র প্রথম অর্ধ পর্যায় - ১-২

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ড. নিমাই প্রামাণিক
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্থ পত্র দ্বিতীয় অর্ধ পর্যায় - ১-২

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

অধ্যাপক , সুশীল রঞ্জন রায়
প্রাক্তন রীডার,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান রাজ কলেজ, বর্ধমান

সূচীপত্র

চতুর্থ পত্র প্রথম অর্ধ পর্যায় - ১-২

পাঠ একক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ঔপনিবেশিক শোষণের প্রকৃতি — অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক	৩
২.	স্বদেশী আন্দোলন এবং নরমপন্থী ও চরমপন্থী রাজনীতি	৪৮
৩.	সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবান্দোলন	৭০
৪.	অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২)	৯৪
৫.	আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩৪)	১১২
৬.	আগষ্ট আন্দোলন (১৯৪২)	১৩০
৭.	শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম	১৫৩
৮.	কৃষক আন্দোলন	১৭২
৯.	চল্লিশের দশকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি	১৯১
১০.	ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভূমিকা	২১১
১১.	নৌ-বিদ্রোহ, ১৯৪৬	২২৯
১২.	চল্লিশের দশকে ছাত্র আন্দোলন	২৪৩
১৩.	ক্রিপস মিশন ও ওয়াভেল পরিকল্পনা	২৫৭
১৪.	ক্যাবিনেট মিশন, মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭	২৭১

সূচীপত্র

দ্বিতীয় পত্র প্রথম অর্ধ পর্যায় - ১

পাঠ একক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিকতাবাদ	২৯২
২.	ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা	৩১২
৩.	সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ভারতের রাজনীতি	৩৩৭
৪.	ভারতীয় রাজনীতিতে জাত ও শ্রেণী	৩৫৬
৫.	ভারতে জাতীয় সংহতি	৩৮০
৬	যুক্ত(রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও রাজ্যের অধিকার	৩৯৯
৭	ভারতের জোট রাজনীতি	৪২০
৮	ভারতে পরিবেশ বিষয়ক রাজনীতি বিকল্প উন্নয়নের ধারণা	৪৪১
৯	মানবাধিকার ভারতে মানবাধিকার সংর(ণ ও আন্দোলন	৪৬৬

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও জাতীয় আন্দোলন

চতুর্থ পত্র ঃ প্রথমার্ধ

পর্যায় - ১

একক - ১

(Unit - 1)

ঔপনিবেশিক শোষণের প্রকৃতি --- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক

(Nature of Colonial Exploitation — Economic, Social, Cultural, Political and Administrative)

এককের গঠন-বিন্যাস

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রাক্ - ব্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষ

১.২ ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের ধ্বংসমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি

১.২.১ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

১.২.১.১ বণিকপুঁজির যুগ

১.২.১.২ শিল্পপুঁজির যুগ

১.২.১.৩ মহাজনী পুঁজির যুগ

১.২.২ সামাজিক ক্ষেত্রে

১.২.৩ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

১.২.৪ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

১.৩ ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের উজ্জীবনমূলক প্রকৃতি

১.৩.১ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

১.৩.২ সামাজিক ক্ষেত্রে

১.৩.৩ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

১.৩.৪ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

১.৪ সারসংক্ষেপ

১.৫ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

১.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) পর থেকে একশ' নব্বই বছর ধরে প্রথমদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এবং পরবর্তী সময়ে (১৮৫৮ সালের পরে) ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের নেতিবাচক দিকগুলিকে যেমন বর্তমান এককে তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি আলোকপাত করা হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ইতিবাচক দিকগুলিকে। নিজেদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে শাসন ও শোষণ করলেও ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর অজান্তেই উপ্ত হয়েছিল তাদেরই ধ্বংসের বীজ, যা একদিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। এই আন্দোলন ও সংগ্রাম এক-রৈখিক পথ ধরে অগ্রসর হয়নি। তা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ক্ষমতার হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার রাজনীতি এবং শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণের পূর্বে প্রাক্ - ব্রিটিশ ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। তা না হলে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, সেগুলির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে না।

১.১ প্রাক্ - ব্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষ

প্রাক্ - ব্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস হল স্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষের ইতিহাস। পরাধীনতার কালো ছায়া নেমে আসার পূর্বে ভারতবর্ষের তেরশ বছরের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে অনেক রাজবংশের উত্থান-পতন কিংবা হিন্দু - শাসকের পরিবর্তে মুসলমান শাসকের আবির্ভাব সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজের সামন্ততান্ত্রিক প্রকৃতির কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে রাজন্যবর্গ এবং সামন্তপ্রভুরা সুখসমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের মধ্যে দিন কাটাতেন। কিন্তু সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক, কারিগর আর নিম্নশ্রেণীর মানুষদের জীবনে দুঃখদারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ছিল নিত্যসঙ্গী। সামাজের সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল অংশ কৃষক ও কারিগররা জীবন্মৃত অবস্থায় কোনরকমে দিনাতিপাত করত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষ ছিল স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। সামন্ত-শোষণ জর্জরিত হলেও তদানীন্তন ভারতের স্বাধীন বিকাশের ধারাটি কোন বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ ও তার প্রকৃতি : ''আদিমকালের বলদটানা হালের চাষ এবং সহজ - সরল যন্ত্রপাতি -নির্ভর হস্তশিল্পের ওপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামই ছিল প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য।'' সামান্য কিছু পরিবর্তনের কথা বাদ দিলে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় একশ' বছর ধরে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামই ছিল ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান। সর্বপ্রকার বৈদেশিক আক্রমণ, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, ধর্মীয় আন্দোলন প্রভৃতির মুখে পড়েও এই ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। মধ্যযুগে ভারতের গ্রামগুলি 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র' হিসেবে বিরাজ করত। প্রতিটি গ্রামে

কৃষক ও কারিগররাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। গ্রামবাসীরা নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন করত। সেই সঙ্গে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করার করার জন্য নানা প্রকার গৃহশিল্পের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখত। এইভাবে কৃষি ও গৃহশিল্পের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবন।

প্রতিটি গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিচারকার্য সম্পাদন করা এবং খাজনা আদায় করার দায়িত্ব ছিল 'প্রধান ব্যক্তি' বা 'মোড়ল'-এর হাতে। তাছাড়া, গ্রামের অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য থাকতেন হিসাবরক্ষক, পুরোহিত, পাঠশালার গুরুমশাই, জ্যোতিষী, নাপিত, কামার, কুমোর, ছুতোর প্রভৃতি। এঁরা ছিলেন গ্রামের সেবক। তাই তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হত গ্রামের লোকেদের। গ্রামের জনসমষ্টির কাছ থেকে তাঁরা কিছুটা নিষ্কর জমি পেতেন।

কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত খাদ্য ও কৃষিজাত দ্রব্য সামগ্রীই ছিল মধ্যযুগীয় ভারতের গ্রামীণ সমাজের প্রধান সম্পদ। জমির সঙ্গে কৃষকের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। আধুনিক অর্থে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বলতে যা বোঝায়, সেরূপ কোন মালিকানাস্বত্বের উদ্ভব তখনও ঘটেনি। উত্তর ভারতের গ্রামগুলিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চায়েত গ্রামের কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দিত। আর তারা পুরুষানুক্রমে সেই জমি ভোগ-দখল করত। ঐসব জমির ওপর ব্যক্তি-মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিগত মালিকানা বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রামবাসীরা যৌথভাবে রাজাকে খাজনা প্রদান করত। কিন্তু ভারত, দক্ষিণ ভারত, বাংলাদেশ ও আসামের প্রতিটি গ্রামে মোড়লদের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হোত। ''এই স্বনির্ভর গ্রামগুলো বহির্জগত থেকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল এবং এই কারণে গ্রামীণ জীবনধারায় সামাজিক বিনিময়ের বিশেষ কোন স্থান ছিল না। গ্রামগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী একই প্রকারের স্থিতিশীল একঘেয়ে সামাজিক জীবনের অভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছিল।''

কার্ল মার্কসের দৃষ্টিতে প্রাক্ - ব্রিটিশ ভারত : প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতিটি মার্কসের ক্ষুরধার দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তিনি লিখেছেন, এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুপ্রাচীন ভারতীয় সম্প্রদায় যার ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছিল, তা হল জমির ওপর সর্বসাধারণের স্বত্ব, কৃষি ও অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাগ। প্রতিটি গ্রামীণ সম্প্রদায় ছিল ঘনবিন্যস্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপাদানে সক্ষম। উৎপন্ন দ্রব্যের বেশীর ভাগ অংশ গ্রামীণ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে লেগে যেত বলে তা পণ্যে রূপান্তরিত হতে পারত না। কেবল উদ্বৃত্ত অংশ পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারত। কিন্তু উদ্বৃত্তের একটি অংশ মাত্র পণ্যও হতে পারত। কারণ, অপর অংশ সুপ্রাচীন কাল থেকে রাজস্ব হিসেবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য বলে বিবেচিত হোত। এই গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সংগঠন ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার ছিল। যেখানে সহজ-সরল ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকত, সেখানে যৌথভাবে কৃষিকাজ পরিচালিত হোত এবং উৎপন্ন দ্রব্য সকলের মধ্যে বণ্টিত হত। একই সঙ্গে প্রতিটি পরিবারে সম্পূরক কারিগরি শিল্প হিসেবে সুতা কাটা ও কাপড় বোনা হত। এর পাশাপাশি থাকতেন গ্রামের 'প্রধান ব্যক্তি', যিনি একই সঙ্গে বিচারক, শান্তিরক্ষক ও রাজস্ব সংগ্রকারী হিসেবে কাজ করতেন। কৃষি-সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব অর্পিত থাকত পাটোয়ারীর ওপর। সীমান্তরক্ষীর কর্তব্য ছিল পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ সম্প্রদায়ের হাত থেকে সীমান্ত রক্ষা করা।

সেচের তত্ত্বাবধায়ক সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পুষ্করিণী থেকে সেচের জল বণ্টন করতেন। ব্রাহ্মণের দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় কাজকর্ম সম্পাদন করা। আবার, পাঠশালার পণ্ডিত ও আচার্য ব্রাহ্মণ বা জ্যোতিষীদের কাজ ছিল যথাক্রমে শিশুদের লেখাপড়া শেখানো এবং শস্য বোনা ও তোলার শুভ-অশুভ দিন দেখে দেওয়া। কামার ও ছুতোর চাষের সব রকম যন্ত্রপাতি তৈরী ও মেরামত করত এবং কুম্ভকার গ্রামের লোকেদের প্রয়োজন অনুযায়ী মাটির বাসনকোসন তৈরী করত। তাছাড়া, গ্রামের মধ্যে নাপিত, ধোপা, রূপোর কামার, এমনকি, অনেক সময় কবিও থাকতেন। সমগ্র গ্রামীণ সম্প্রদায় পূর্বোক্ত ধরনের দশ-বারো জন লোকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করত। গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পতিত জমিতে পুরানো গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ধাঁচে নতুন একটি গ্রামীণ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করা হত। যে-আইন অনুসারে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের শ্রমবিভাগ পরিচালিত হত, তা ছিল প্রকৃতির নিয়মের মতোই অমোঘ এবং তা অপরিবর্তিতরূপে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল। ঘটনাচক্রে যদি কোন গ্রামীণ সম্প্রদায় লোপ পেত, তাহলে সেই স্থানে একই নামে তার পুনরাবির্ভাব ঘটত।

মার্কসের মতে : এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়সমূহের উৎপাদন-সংক্রান্ত সংগঠন লক্ষ্য করলেই এশীয় সমাজের অপরিবর্তনীয় চরিত্রের গুহ্য সূত্রটি বোঝা যায়। এশিয়া মহাদেশে রাষ্ট্রের অবিরত পতন ও অভ্যুত্থান এবং সদাসর্বদা রাজবংশের আবির্ভাব ও বিলোপের যে-প্রবণতা দেখা যায়, তার পাশাপাশি গ্রামীণ সম্প্রদায়ের চারিত্রিক বৈপরীত্য লক্ষ্য করবার মতো। রাজনৈতিক জগতের আলোড়ন সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামোর ওপর স্বল্পতম প্রভাবও বিস্তার করতে পারে না।

ভারতের গ্রামীণ সমাজের জাতপ্রথার কঠোর বিধি অনুসৃত হোত। এই বিধি অনুসারে মানুষের বৃত্তি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকত। প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই তা ছিল অপ্রতিরোধ্য এবং বংশানুক্রমিকভাবে চলত বলে শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠেছিল বংশগত। সামন্ত-সমাজের গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল বলে কেবল বিবাহ কিংবা তীর্থযাত্রা ছাড়া অন্য কোন কারণে গ্রামীণ মানুষকে বাইরে যেতে হত না।

গ্রামীণ ভারতের পরিচালন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ভারতের সামাজিক সংগঠনগুলি ব্যক্তিভিত্তিক ছিল না, ছিল সমষ্টিভিত্তিক। তখন পারিবারিক বন্ধনের দ্বারা ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারিত হত। গ্রামীণ সম্প্রদায় ও জাতগুলির দ্বারা বিভিন্ন পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিচালিত হত। গোষ্ঠীগত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কতকগুলি পরিবার নিয়ে গ্রাম্য-সম্প্রদায় গঠিত হত। বিবাহ, পানাহার, বৃত্তি এবং সমাজের অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গঠিত কতকগুলি পরিবারের সমষ্টিকে 'জাত' নামে অভিহিত করা হত। তবে গ্রাম-সম্প্রদায়ের মতো জাত এক স্থানে আবদ্ধ ছিল না। পরিবার, জাত ও গ্রাম-সম্প্রদায় — এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মতাদর্শে ব্যক্তিকে আবদ্ধ থাকতে হত। ব্যক্তি এইসব প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি মেনে চলতে বাধ্য ছিল। তখন গোষ্ঠীর বাইরে ব্যক্তির কোন পৃথক অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। গ্রাম-সম্প্রদায় ছিল প্রধানত আর্থিক ও প্রশাসনিক সংগঠন। একে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রাষ্ট্রের থাকলেও রাষ্ট্র সেই অধিকার প্রয়োগ করত না বললেই চলে। জাত ও পরিবার-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা কিছুই ছিল না। জাতি ও পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হত হিন্দু আইন ও প্রথাগত বিধি-নিষেধের দ্বারা। ''এমনকি, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেও ভারতীয় সমাজব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাভিত্তিক পরিবার, জাত ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে শহরাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যভিত্তিক সমবায় সঙ্ঘ (Guilds) ও কর্পোরেশনের নিকট দায়বদ্ধ থাকত।''

প্রাক্ - ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় শহরের অবস্থা : প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের তুলনায় শহরের সংখ্যা ছিল নগণ্য। **গ্যাডগিল** (Gadgil) -এর মতে, সমকালীন ভারতের শহরগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা — (১) প্রশাসনিক শহর, (২) ধর্মীয় শহর এবং (৩) বাণিজ্যিক শহর।

(১) প্রশাসনিক শহরগুলি ছিল বিভিন্ন রাজ্য ও সাম্রাজ্যের রাজধানী। এগুলি ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র। এখানে রাজা বা সম্রাট শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। স্বাভাবিকভাবে অভিজাত সম্প্রদায়, সামন্তবর্গ, সামরিক কর্তা-ব্যক্তিরা এবং সরকারী কর্মচারীরা ঐ শহরেই থাকতেন। শহরটি রাজ্যের রাজধানী হওয়ায় সেখানে সামরিক ঘাঁটিও গড়ে উঠত। গায়ক, ভাস্কর, চিত্রকর, কবি, নর্তক-নর্তকী, বারাঙ্গানা প্রভৃতি সহায়ক সামাজিক গোষ্ঠীর লোকেরা বিত্তবান শহরবাসীর আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য শহরেই বাস করত।

(২) বারাণসী, মথুরা, পুরী, নাসিক ও বৃন্দাবনের মতো শহরগুলি ছিল ধর্মীয় শহর। কারণ, এগুলি ছিল প্রধানত ধর্মাচরণের কেন্দ্র ও তীর্থস্থান। ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীদের আনাগোনায় এরূপ শহরগুলি মুখরিত হয়ে উঠত। তীর্থযাত্রীদের সেবাকর্মে নিযুক্ত একটি জনসমষ্টি ঐসব শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে।

(৩) সমুদ্রোপকূল, নদীর তীর কিংবা বাণিজ্যপথের ধারে যেসব শহর গড়ে উঠেছিল, সেগুলিকে বলা হোত বাণিজ্যিক শহর। কেবল বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী বন্দর-নগরগুলি ছাড়া অন্যান্য সব ধরনের শহরের অস্তিত্ব জমির ওপর ধার্য করের আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

''জটিল ও নানা ধরনের কারুশিল্প এইসব শহরে গড়ে উঠেছিল।'' এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **ক্যালভারটন** (Calverton) বলেছেন, ভারতের কারিগরি শিল্প পশ্চিমী দেশগুলির শিল্প অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ছিল। তীক্ষ্ণধী সুনিপুণ কলাকৌশল এবং সৃজনশীল প্রতিভাসম্পন্ন লোকেরা এইসব শিল্প গড়ে তুলেছিল। পশ্চিমী দেশসমূহ নৌ-পরিবহন শিল্পে যখন পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেনি, তখন প্রায় সহস্রাধিক লোক বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ এখানে তৈরী হোত। বয়নশিল্পের ক্ষেত্রেও হিন্দুস্থান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। এখনকার তৈরী নানা প্রকার সুতি ও রেশমবস্ত্রের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিভিন্ন দেশের লোক ভারতীয় বস্ত্র পরম আগ্রহের সঙ্গে ক্রয় করত। তাছাড়া, ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চাদশ শতাব্দীতে হিন্দুস্থানে ধাতু ও পাথরের তৈরী জিনিসপত্র, চিনি, নীল ও কাগজশিল্প গড়ে উঠেছিল। ভারতের বিভিন্ন অংশে কাঠশিল্প, মৃৎশিল্প, চর্মশিল্প প্রভৃতির যেমন বিকাশ ঘটেছিল, তেমনি অতি উন্নত মানের জরি ও চিকনের কাজও বিদেশীদের আকৃষ্ট করত। সমকালীন ভারতে দস্তা, পারদ ও লৌহ শিল্পের উন্নতি ঘটেছিল। তাছাড়া, ছিল রাসায়নিক শিল্প ও চীনা মাটির শিল্প। এখানকার হাতির দাঁতের কাজ বিশ্বের সব দেশের মানুষের কাছে বিশেষ প্রিয় ছিল। দামী পাথরের নানা রকম শিল্পদ্রব্য তৈরী করার ব্যাপারে ভারতীয় শিল্পীরা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল। কারিগরি শিল্পগুলি ছোট ছোট গ্রামীণ-সম্প্রদায়ের সীমিত প্রয়োজন পূরণ করত। কিন্তু শহরের শিল্পগুলি সমাজের অভিজাত ও ধনিক-বণিক শ্রেণীর বিলাসদ্রব্য যেমন উৎপাদন করত, তেমনি সৈন্যবাহিনীর সাজসরঞ্জাম, যুদ্ধাস্ত্র, দুর্গ প্রভৃতি তৈরী করত। রাজপ্রাসাদ, সুউচ্চ মন্দির কিংবা মসজিদ প্রভৃতি শহরের শিল্পীদেরই সৃষ্টি। এদের তৈরী লালকেল্লা, কুতুব মিনার, তাজমহল, আগ্রা দুর্গ প্রভৃতি আজও বিশ্বের বিস্ময়।

তখন শহরের কারিগরদের মোটামুটিভাবে দু'টি ভাগে ভাগ করা হোত, যথা — (১) স্বাধীন কারিগর এবং (২) মজুরীর ভিত্তিতে নিযুক্ত কারিগর। স্বাধীন কারিগররা কারও দ্বারা নিযুক্ত না হয়েই স্বাধীনভাবে শিল্পদ্রব্য তৈরীতে আত্মনিয়োগ করত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বা কোন কর্পোরেশন কিংবা কোন ধনশালী ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত মজুরীর বিনিময়ে যারা কেবল অর্থ প্রদানকারীর প্রয়োজন মেটাবার কাজে ব্যাপৃত থাকত, তাদের মজুরীর ভিত্তিতে নিযুক্ত কারিগর বলা হোত। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **এ. আর. দেশাই** বলেছেন :

> প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ভারতীয় অর্থনীতির ও সামাজিক পুঁজিবাদী রূপান্তরের কিছুটা সম্ভাবনা ছিল বটে, কিন্তু এইসব সম্ভাবনা থেকে রূপান্তর ঘটাবার অবস্থা আসেনি। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের আর্থিক ও সমাজিক কাঠামোর কতকগুলি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের জন্যই আভ্যন্তরীণ সামাজিক শক্তিসমূহ, যথা — বাণিজ্যিক মূলধন ও শহরের শিল্পের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে বুর্জোয়া সমাজের উদ্ভব হয়নি। সম্ভবত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম এই প্রক্রিয়ার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল।

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ না ঘটার পিছনে তিনটি কারণ ছিল বলে মনে করা হয়। এই তিনটি কারণ হোল — (১) গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির আর্থ-সামাজিক জীবনের আভ্যন্তরীণ সংগঠনটি এমন সংহত, অনড় ও শক্তিশালী ছিল যে, শহরাগত শিল্পদ্রব্যাদির পক্ষে ঐ দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব ছিল। (২) ভারতীয় কৃষির পক্ষে জলসেচ ও নানা প্রকার সরকারী উদ্যোগ গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এগুলি পরিচালনার জন্য ভূমি থেকে প্রাপ্ত কর আদায়ের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে হোত। কেন্দ্রগুলি প্রশাসনিক শহর হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে; কিন্তু গ্রাম গ্রামেই থেকে যায়। (৩) গ্রামের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত শোষণের ওপর ভিত্তি ক'রে রাজা-রাজড়া, নবাব-বাদশা ও শহুরে অভিজাত ব্যক্তিদের বিলাস, আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছিল। গ্রামীণ এলাকার ওপর কর আরোপের অধিকার তাঁরা কখনও হারাতে রাজী ছিলেন না। শহর-কেন্দ্র থেকে এই অধিকার প্রযুক্ত হয়ে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অর্থনীতির সম্ভাব্য প্রগতির কণ্ঠরোধ করত। **শেল্‌ভাঙ্করের** মতে :

> গ্রামের দুর্ভেদ্য আবরণ ও বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক অক্ষমতা — এই দু'টি কারণে ভারতীয় অর্থনীতির বিবর্তন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

ভি. আই. পাভলভ্ প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশের পথে অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে ভারতীয় শহরগুলির জনসাধারণের বিশেষ বিভাগসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ঐ বিভাগসমূহের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও জমির ওপর ধার্য খাজনা সংগ্রহকারীদের সম্পর্কের কথা বলেছেন।

প্রাক্ - ব্রিটিশ ভারতের গ্রামীণ সংস্কৃতি : প্রাক্‌ব্রিটিশ ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিটি গ্রামের গ্রামবাসীদের উৎপাদন-পদ্ধতি ছিল যেমন সাদাসিধে, তেমনি তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও ছিল অত্যন্ত কম। বহির্বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিনিময় না থাকায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার একান্ত অভাবের জন্য ''ভারতীয় শহুরে সংস্কৃতি বা বিশ্ব-সংস্কৃতির আলোকরশ্মি ভারতীয় গ্রামগুলির দুর্ভেদ্য কূপমণ্ডুকতার আস্তরণ ভেদ করতে পারেনি।'' **এ. আর. দেশাই** বলেছেন :

> অনিশ্চিত জীবনযাত্রা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে অসহায়তা ও নিরাপত্তাহীন অবস্থায় গ্রামীণ জনসাধারণের মন কুসংস্কার, ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তা এবং প্রাকৃতিক শক্তির অসংস্কৃত পূজা-অর্চনার প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য। দৈবাধীনতা ও ব্যর্থতার মনোভাব সব সময়েই তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখত।

গ্রামবাসীরা জাত-ব্যবস্থাকে দৈবাদিষ্ট বলে মনে করত। জাতপ্রথার সর্বপ্রকার আচার-আচরণকে তারা অবনত মস্তকে মেনে চলত। কারণ, সামন্ততান্ত্রিক ভারতীয় সমাজে জাতপ্রথাকে 'ঈশ্বর-সৃষ্ট' বলে মনে করা হোত। তিনি আরও বলেছেন:

> ধর্মীয়-অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যায় গ্রামবাসীদের মন আচ্ছন্ন ছিল বলে জাত-ব্যবস্থার মতাদর্শ ও কাঠামো সম্পর্কে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের প্রশ্ন তাদের মনে উঠতই না। গ্রামের বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা, বন্যা বা খরার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা পর্যুদস্ত মানুষের মনে যে-অসহায়তা সৃষ্টি হয়, সেটা গভীরতর হয়ে উঠেছিল তিনটি কারণে : **প্রথমত,** জাত-ব্যবস্থা, **দ্বিতীয়ত,** প্রভুত্বপরায়ণ যৌথ পরিবার এবং **তৃতীয়ত,** শিশুকাল থেকে লব্ধ ধর্মীয় অতীন্দ্রিতার প্রভাব। ... এই অবস্থায় লোকে যেখানে বাস করত অর্থাৎ সেই স্বয়ংশাসিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মবিনষ্ট গ্রামগুলি ছিল অনড় আর্থিক ব্যবস্থা, সামাজিক প্রতিক্রিয়া এবং সাংস্কৃতিক বদ্ধতার লীলাভূমি।

সমুদ্রগুপ্ত কিংবা আকবরের মতো সম্রাটদের সময় যখন ভারতের একটি বৃহৎ অংশ অভিন্ন রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে ছিল, তখনও স্বয়ংশাসিত গ্রামীণ ভারতবর্ষের মৌলিক জীবনধারার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। **দেশাই**-এর মতে, ''ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়, সামরিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আলোড়ন প্রায়ই ঘটা সত্ত্বেও গ্রামের গোঁড়া অপরিবর্তনীয় রূপ অক্ষুণ্ণ থেকে গিয়েছিল।'' এর ফলে জনগণের মধ্যে কোনরকম জাতীয় চেতনা গড়ে উঠতে পারেনি। তিনি আরও বলেছেন :

> জাতীয় চেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে এমন ভাবনা অর্থাৎ নিজেকে ভারতীয় বলে মনে করা, মানুষের মনে আসত না। ঐক্যের ধারণাও একমাত্র ধর্মীয় অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল অর্থাৎ কিনা, ভারতবর্ষ হিন্দুভূমি — হিন্দুধর্মের বন্ধনে একতাবদ্ধ জনসমষ্টির বাসভূমি। ভারত আর্থিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে একত্রিত ভারতীয়দের বাসভূমি — এই চিন্তা মানুষের আসত না। চেতনাটা ছিল ধর্মীয় মতাদর্শজনিত ঐক্যের চেতনা, রাজনৈতিক-আর্থিক একতার (জাতীয়তাবাদ) নয়।

প্রাক্ - ব্রিটিশ ভারতের নগর-সংস্কৃতি : প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতের প্রধান প্রধান শহর ছিল প্রশাসনিক কর্মকেন্দ্র, রাজা-বাদশা-নবাব ও সুলতানদের বাসভূমি, সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কর্মকেন্দ্র এবং প্রধান সামরিক ঘাঁটি। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ শহরের কোষাগারে সঞ্চিত হোত। রাজস্বের সিংহভাগ ব্যয়িত হোত শাসকগোষ্ঠী, অভিজাত শ্রেণী এবং সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের বিলাস-ব্যসনের জন্য। স্বাভাবিকভাবে রুচিবিলাসী অভিজাত শ্রেণী ও ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উন্নত ধরনের সূতী ও রেশম বস্ত্র, কারুকার্যখচিত ধাতু ও পাথরের পাত্র, নানা রকম বিলাসদ্রব্য ও যুদ্ধের সাজ-সারঞ্জাম প্রভৃতি

শহরেই উৎপন্ন হোত। ফলে শহরের আর্থিক অবস্থা গ্রামের থেকে অনেক বেশী স্বচ্ছল ছিল। অনেক সময় রাজা-বাদশারা, অভিজাতবর্গ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে যে-উদ্বৃত্ত ধনসম্পদ থাকত, তা দিয়ে তারা কবি, দার্শনিক, শিল্পী, চিত্রকর, সঙ্গীতশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক প্রমুখের ভরণপোষণ করত। এইভাবে অশোক, বিক্রমাদিত্য, ভোজ প্রভৃতি হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজাদের রাজসভায় কিংবা আকবর, শাহজাহান ও অন্যান্য মোগল সম্রাটের সভাতেও শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, কবি প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল। কালিদাস, বাণভট্ট, ধন্বন্তরী, হরিষেণ, বরাহ-মিহির, তানসেন, আবুল ফজল, ফৈজী প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ-দরবারে সাংস্কৃতিক গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। তাছাড়া, গায়কদের সুরের মুর্চ্ছনায় কিংবা নর্তকীদের নূপুর-নিক্কণে রাজ-দরবার অমরাবতীতে পরিণত হোত। '' এক কথায়, রাজ-দরবারে অনুগ্রহপুষ্ট, শহরবাসী শিল্পী-বিজ্ঞানী-সাহিত্যিকেরা এবং শহর-সভ্যতার পিলসুজ মেহনতী মানুষেরা ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের রূপকার হয়ে উঠতেন। কেবলমাত্র বিক্রমাদিত্য বা আকবরের মতো বরেণ্য সম্রাটেরাই জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে রাজ-দরবারের কেন্দ্রভূমিতে 'রত্নসভা' গড়ে তুলতেন এমন নয়, উদ্বৃত্ত সম্পদের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন রাজবংশের প্রতিনিধিরা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনা করতেন।'' লক্ষণীয় বিষয় হোল — হিন্দু ও মুসলমান উভয় সংস্কৃতিই ছিল মূলত ধর্মভিত্তিক। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **ও'ম্যালি** (O'Malley) বলেছেন :

> হিন্দু সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হোল ধর্মীয় উপাদান। এর প্রভাবই ছিল সব থেকে প্রবল। হিন্দুদের আচার-আচরণের সঙ্গে ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। ... ধর্ম ও সাহিত্যের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ ছিল যে, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের অধিকাংশই হোত ভক্তিরসাশ্রিত। যে-শিল্প জনসাধারণের সৌন্দর্য্য-ভাবনার প্রকাশ, সেই শিল্পও ধর্মের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল। মন্দির নির্মাণে যে-স্থাপত্যকলার এবং মন্দিরের অলঙ্করণে যে-ভাস্কর্যকলার প্রকাশ হয়েছে, তার সবই ধর্মীয় প্রতীকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

মুসলমান সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এমনকি, সুদীর্ঘকাল ধরে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে যখন এই দুই সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তখনও সেই সমন্বয় উভয় সংস্কৃতির মৌলিক চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু ঐসব সংস্কৃতি জাতীয় চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি। এমনকি, যেসব শিল্পকলা, স্থাপত্য ইত্যাদি ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে গড়ে উঠেছিল, সেগুলিও জাতীয় চরিত্রবিশিষ্ট ছিল না। এগুলি রাজা-বাদশাদের মাহাত্ম্য কিংবা মনীষীদের জন্য সম্রাটের গভীর প্রেমের নিদর্শন হিসেবে তৈরী হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে আমরা কুতুব মিনার কিংবা তাজমহলের কথা উল্লেখ করতে পারি। **ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার** বলেছেন :

> সমকালীন ভারতে কেউ ভারতীয় ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন বাঙালী, শিখ, রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষ। তাঁদের দৃষ্টি আপন আপন প্রদেশের সীমানার বাইরে বিস্তৃত ছিল না; ভারতবর্ষ বলে কোন দেশের ধারণাও তাঁদের মধ্যে ছিল না।

এ. আর. দেশাই-এর অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, জাতীয় চেতনার উদ্ভবের জন্য যে-ধরনের বৈষয়িক ও চেতনাগত ভিত্তির প্রয়োজন, প্রাক্‌ব্রিটিশ ভারতে তা বিদ্যমান ছিল না।

মার্কসের অভিমত : পরিশেষে, **ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদের** ভাষায় মন্তব্য করা যায় :

ভারতের সামাজিক জীবন 'শত শত বৎসরের পুরাতন' বলে সাধারণ জাতীয়তাবাদী মানুষরা গর্ব সহকারে দাবী করলেও ঐ সামাজিক জীবনের প্রতি মার্কসের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। বরং, তিনি এরূপ জীবনকে ঘৃণার চোখেই দেখতেন। ব্রিটিশদের হাতে ওর ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটতে দেখে। তিনি এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করতেও রাজী ছিলেন না।

'ভারতে ব্রিটিশ শাসন' নামক প্রবন্ধে সমকালীন সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কসের মন্তব্য থেকে এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। **মার্কস** লিখেছেন :

> ঐসব লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামাজিক সংগঠনগুলি অসংগঠিত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, নিমজ্জিত হচ্ছে দুর্দশার এক সমুদ্রে, সেই সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে একই সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবিকার্জনের বংশানুক্রমিক উপায়। দেখতে এটা মানবিক অনুভূতির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক্ না কেন, একথা যেন আমরা না ভুলি যে, ঐসব শান্ত সরল গ্রাম গোষ্ঠীগুলিকে যতই নিরীহ বলে মনে হোক্, আসলে সেগুলিই হোল প্রাচ্য স্বৈরাচারের চিরকালের দৃঢ় ভিত্তিভূমি, সংকীর্ণতম গণ্ডির মধ্যে মানুষের মনকে তারাই বেঁধে রেখেছে, কুসংস্কারের অপ্রতিরোধী যন্ত্রে পর্যবসিত করেছে, চিরাচরিত বিধি-নিষেধের ক্রীতদাস ক'রে রেখেছে এবং অপহরণ ক'রে নিয়েছে তার সব কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মশক্তি। যে-বর্বর স্বার্থপরতা একটি অতি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের মধ্যে নিবদ্ধ থেকেও অবিচলভাবে প্রত্যক্ষ ক'রে গেছে সাম্রাজ্যের পতন, অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান, বড় বড় শহরের অধিবাসীদের হত্যাকাণ্ড। তারা এগুলিকে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ছাড়া আর বেশী কিছু বলে ভাবত না। আর আক্রমণকারীর নজরে একবার পড়ে গেলে যে-নিজেও তার অসহায় শিকার হয়ে উঠেছে, সেই আত্মনিমগ্নতাকে, স্বার্থপরতাকে আমরা কিছুতেই ভুলে যেতে পারি না। এই হীন, নিশ্চল ও উদ্ভিদ-সুলভ জীবনধারাকে আমরা কিছুতেই ভুলে যেতে পারি না। এই নিষ্ক্রিয় অস্তিত্বই অন্যদিকে বন্যা, লক্ষ্যহীন ও সীমাহীন ধ্বংসশক্তিগুলিকে উৎসাহিত ক'রে তুলেছে এবং নিজেই হত্যাকাণ্ডকে হিন্দুস্থানের ধর্মীয় আচারে পরিণত করেছে। আমরা কিছুতেই ভুলতে পারব না যে, এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদ প্রথা ও ক্রীতদাসত্বের দ্বারা কলুষিত; অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না ক'রে তাকে করেছিল বাইরের অবস্থার পদানত, স্বয়ং-বিকশিত একটি সমাজব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছিল অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে এবং এইভাবে তৈরী করেছিল প্রকৃতির এমন পূজা যা মানুষকে পশু ক'রে তোলে। প্রকৃতির প্রভু যে-মানুষ, তাকে হনুমানদেবরূপী বানর ও শবলাদেবীরূপী গরুর অর্চনায় নতজানু ক'রে অধঃপতনের পরিচয় দিয়েছে।

সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ : এইভাবে ''সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনের মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো বাস করত কৃষক, কারিগর ও অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণী।'' কিন্তু অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠলে মাঝে-মাঝে কৃষকশ্রেণী তাদের সামন্ত-প্রভুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করত। উদাহরণ হিসেবে কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা যায়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাল বংশের রাজা দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারী শাসনে অতিষ্ট হয়ে বাংলার

জনসাধারণ জনৈক কৈবর্ত নেতার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মহীপালকে হত্যা করে। অনুরূপ বিদ্রোহ দেখা দেয় সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ও মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে স্থানীয় কোতায়ালদের অত্যাচার চরমে উঠলে রণথম্বরের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ হাজি মৌলা নামে জনৈক কোষাগার রক্ষীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের কাছ থেকে জোর ক'রে বর্ধিত খাজনা আদায় করা হতে থাকলে কৃষকরা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু ঐ সময় উৎপাদন-পদ্ধতির কোন মৌলিক পরিবর্তন না ঘটায় এবং কৃষকশ্রেণীর চেতনার স্তর অত্যন্ত নীচু থাকায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কৃষক বিদ্রোহকে নিষ্ঠুর হাতে দমন করা সম্ভব হয়েছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী বণিকদের অনুপ্রবেশ : মোগল যুগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের পণ্য উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের বিশেষ কোন প্রসার ঘটেনি। মোগল আমলে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারতীয় অর্থনীতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন সধিত হয়। ঐ সময় ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকরা ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। তারা বাংলাদেশের সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। তবে 'ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধে'র সময় এই ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ঐ যুদ্ধে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ বারুদের প্রধান উপকরণ গন্ধক সংগৃহীত হয়েছিল বিহারের উত্তরাঞ্চল থেকে। তাছাড়া, বিদেশী বণিকরা ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস ও রেশম দ্রব্য, নীল প্রভৃতি ক্রয় ক'রে ইউরোপের বাজারে চালান দিত। বণিকরা রৌপ্যের বিনিময়ে ঐসব জিনিস ক্রয় করত। ১৬৮০-৮৩ সালের মধ্যে কেবল বাংলাদেশ থেকে জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য ব্রিটিশ বণিকদের ২,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের রৌপ্য নিয়োগ করতে হয়েছিল। ওলন্দাজ বণিকদের বাৎসরিক নিয়োগের পরিমাণ ইংরেজদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম ছিল না। এইভাবে ভারতবর্ষে বিপুল পরিমাণ রৌপ্য আমদানির ফলে দেশের অর্থনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হোল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৃষক ও কারিগরদের হাতে কিছু কিছু রৌপ্য পৌঁছতে লাগল। কালক্রমে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে রৌপ্য গৃহীত হওয়ায় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হতে থাকে। ব্যবসা- বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের মূল্য ও বেতনের হার বৃদ্ধি পায়। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তনের ফলে সমাজের ধনিক সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা লাভবান হয়। তাদের হাতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হতে লাগল। এইভাবে একদিকে যখন সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে, অন্যদিকে তখন রৌপ্যধনের কল্যাণে ভারতের মাটিতে এক প্রভাবশালী ধনিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। মহাজনী কারবার, দাদন কারবার, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি ছিল এদের ধনাগমের প্রধান উৎস। কাশী, লাহোর, মূলতান, আগ্রা, সুরাট, আমেদাবাদ প্রভৃতি শহর ছিল এইসব ধনী ব্যবসায়ীদের প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্র। গুজরাটের ভিরজি ভোরা, মুর্শিদাবাদের শেঠ পরিবার প্রভৃতি ছিল তদানীন্তন ভারতীয় ধনশালী পরিবার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ভারতে পুঁজিবাদ বিকশিত না-হওয়ার কারণ : 'গোলাপের যুদ্ধে'র পর ইংল্যাণ্ডে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণীর পরিবর্তে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। নতুন শ্রেণী শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করতে সমর্থ হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ড বাণিজ্য-পুঁজির যুগ থেকে শিল্প-পুঁজির যুগে উত্তরণ করে। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে সামন্ত-সমাজের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দেওয়ার মতো শক্তি বা সামর্থ্য উদীয়মান বণিকশ্রেণীর ছিল না। শহরাঞ্চলে বাণিজ্য-পুঁজিকে কেন্দ্র ক'রে বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটলেও তার প্রভাব

শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া, ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের মতো ভারতীয় বণিকশ্রেণী নানা কারণে বাণিজ্য-পুঁজিকে শিল্প-পুঁজির স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হয়নি। সর্বোপরি, ভারতীয় বণিকশ্রেণী কখনই রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের ওপর নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর অনেক সময় রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা নির্ভর করলেও এই শ্রেণীকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পণ্যসামগ্রী চালান দিতে হলে আভ্যন্তরীণ শুল্ক প্রদান করতে হোত। এইভাবে ভারতের সামন্ত - রাষ্ট্রসমূহ দেশীয় বণিকদের প্রভাব - প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। ফলে ইউরোপের মতো এদেশে পুঁজিবাদ স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারেনি।

ইংরেজ আগমনের পর অবস্থার পরিবর্তন : কিন্তু ইংরেজদের ভারতে আগমনের পর, বিশেষত ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর, দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অগ্রগতির পথ পুরোপরিভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **রজনী পাম দত্ত** যথার্থই বলেছেন :

> অপেক্ষাকৃত উন্নত শিল্পরীতি, সামরিক সাজসজ্জা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সংযোগের অধিকারী অপেক্ষাকৃত উন্নত ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সংকটের দিনে ভারত অভিযান, বিবর্তনের এই স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত ক'রে দিয়ে তাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করল। ফলে পুরাতন ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে বিকাশোন্মুখ ভারতীয় বুর্জোয়ার শাসন নয়, তা হোল বিদেশী বুর্জোয়ার শাসন। পুরানো সমাজের বুকের ওপর এই বিদেশী বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের কর্তৃত্ব জোর ক'রে চাপিয়ে দিল এবং অভ্যুত্থানশীল ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বীজ পর্যন্ত ধ্বংস ক'রে দিল।

১.২ ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের ধ্বংসমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ : ভারতবর্ষে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে। ১৫০০ সালে পর্তুগীজরা কালিকটে তাদের প্রথম কারখানা স্থাপন করে এবং ১৫১০ সালে গোয়া দখল করে। এর পর ১৬০২ ও ১৬৬৪ সালে যথাক্রমে ওলন্দাজ এবং ফরাসীরা ভারতবর্ষে আগমন করে। ভারতে ব্যবসা-বাণিজ চালাবার উদ্দেশ্যে ইংরেজরা ১৬০০ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে। ১৬১২ সালে সুরাটে, ১৬৩৯ সালে মাদ্রাজে, ১৬৬৮ সালে ঢাকায় এবং ১৬৬৯ সালে বোম্বাই শহরে কোম্পানী কুঠি স্থাপন করে। ১৬৯৬ সালে কলকাতায় কোম্পানীর কাজকর্ম শুরু হয়। তবে নতুন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, যা পরবর্তী সময়ে ভারত বিজয় করে এবং ১৬৯৮ সালে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে থেকে ভারতবর্ষে একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার জন্য সনদ (Charter) লাভ করে। ১৭০৮ সালে পুনরায় সনদের নবীকরণ ঘটলে কোম্পানীর ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

❑ ১.২.১ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের ইতিহাসকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ ক'রে আলোচনা করা যেতে পারে, যথা — **(১)** বণিক-পুঁজির (Merchant Capital) যুগ, **(২)** শিল্প-পুঁজির (Industrial Capital) যুগ এবং **(৩)** মহাজনী পুঁজি বা ফিনান্স পুঁজির (Finance Capital) যুগ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে শুরু ক'রে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বণিক-পুঁজি যুগের পরিব্যাপ্তি। দ্বিতীয় যুগ অর্থাৎ , শিল্প-পুঁজি যুগের সূত্রপাত ১৮১৩ সালে এবং ১৮৫৭ সালে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। তৃতীয় যুগ অর্থাৎ , ফিনান্স পুঁজি যুগের পরিব্যাপ্তি হোল ১৮৫৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

● ১.২.১.১ বণিকপুঁজির যুগ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃতি : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল ব্রিটিশ বণিক-পুঁজিপতিদের সৃষ্ট একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। প্রাচ্য দেশসমূহে, বিশেষত ভারতবর্ষে, একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রিটেনের উৎপাদন ব্যবস্থা তখন উন্নতমানের ছিল না বলে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য বিদেশে বাজার খোঁজার কোন প্রয়োজন অনুভব করেনি কোম্পানী। ঐ সময় ইউরোপের বাজারে, বিশেষত ইংল্যাণ্ডে কতকগুলি ভারতীয় কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বিশেষভাবে ছিল। গন্ধক, নীল, লঙ্কা ও অন্যান্য মসলার যেমন চাহিদা ছিল, তেমনি সুরাটের ক্যালিকো, ঢাকার মসলিন, মুর্শিদাবাদের সিল্ক প্রভৃতি ছিল ইউরোপীয়দের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। তাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঐসব জিনিস স্বল্প মূল্যে এদেশ থেকে ক্রয় ক'রে ইউরোপের বাজারে বেশী মূল্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে অত্যধিক মুনাফা অর্জন করতে থাকে। প্রথম দিকে প্রতি বছরে ঐসব দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার জন্য ৩০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সোনা, রূপো এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু বণিক-পুঁজিবাদ সোনা, রূপো প্রভৃতি ধাতুকে দেশের মহামূল্যবান সম্পদ বলে মনে করত, সেহেতু পরবর্তী সময়ে কোম্পানী ঐসব দ্রব্যসামগ্রী নামমাত্র মূল্যে কিংবা বিনামূল্যে সংগ্রহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যেহেতু ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে লুঠ করার ক্ষমতা তখনও তারা অর্জন করতে পারেনি, সেহেতু আফ্রিকা ও আমেরিকার উপনিবেশসমূহের লুণ্ঠিত সম্পদের সাহায্যে ভারতে ক্রীত পণ্যসামগ্রীর মূল্য প্রদান করত। সেই সঙ্গে ভারতের ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিভূদের নানাপ্রকার বাণিজ্যিক শুল্ক প্রদান করতে হোত। কিন্তু কোম্পানী শাহজাহানের কাছ থেকে এই সুযোগ লাভ করে যে, তাদের দেশীয় বণিকদের মতো কোন আভ্যন্তরীণ শুল্ক দিতে হবে না। এই সুযোগ লাভ করার পর কোম্পানী ক্রমে ক্রমে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়। ভারতবর্ষে ওলন্দাজ, ফরাসী, আর্মেনিয়ান প্রভৃতি জাতির যেসব বণিক ব্যবসা-বাণিজ্য করত, ইংরেজরা তাদের ওপর অত্যাচার করতে শুরু করে। বাদশার ফরমান পেয়ে কেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করত তা-ই নয়, সেই সঙ্গে কোম্পানীর ভারতীয় গোমস্তারাও কোম্পানীর দস্তকের (বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতিপত্র) অপব্যবহার ক'রে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করত।

ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোম্পানীর হস্তক্ষেপ : ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় মুঘল শাসনব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়তে থাকে। কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসকবৃন্দ কম-বেশী স্বাধীন হয়ে ওঠে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করে। স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে কোম্পানী ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার জন্য অধিক পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হয়। তাছাড়া, দেশীয় সামন্ত-প্রভুদের পারস্পরিক যুদ্ধে কোম্পানী এক পক্ষের বিরুদ্ধে অন্য পক্ষকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। এইভাবে ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোম্পানীর হস্তক্ষেপের সূত্রপাত ঘটে।

পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানীর বাণিজ্য - পরিধির সম্প্রসারণ : পূর্বোক্ত দস্তক নিয়ে যে-দুর্নীতি চলছিল, সে সম্পর্কে মুর্শিদকুলি খাঁ এবং আলিবর্দি খাঁ বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। সিরাজদৌল্লার রাজত্বকালে সেই দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলে নবাব তা বন্ধ করার জন্য কোম্পানীকে নির্দেশ দেন। কিন্তু সেই নির্দেশ উপেক্ষা

করলে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে উভয় পক্ষের যে-যুদ্ধ হয়, তাতে নবাবের পরাজয় ঘটে। এর পর কোম্পানীর আশীর্বাদপুষ্ট মীরজাফর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী লাভ করেন। ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তিনি কোম্পানীর 'বাণিজ্যিক সুবিধাগুলি' সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানীর বাণিজ্য-পরিধি অধিকতর সম্প্রসারিত হয়। লবণ, সুপারী ও তামাক — যা এতদিন ইউরোপীয়দের বাণিজ্যের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, তা-ও ইংরেজদের জন্য উন্মুক্ত হোল। কোম্পানীর লুণ্ঠন ও অত্যাচারের মাত্রা অনেক বেশী বৃদ্ধি পেল। মীরজাফরের পর মীরকাশিম নবাব হয়েই কোম্পানীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলেন যে, কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে একদিকে যেমন দেশে দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি প্রতিনিয়ত শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার ফলে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার আয় থেকে নবাবকে বঞ্চিত করছে। তিনি ইংরেজ বণিকদের বিশেষ বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা বন্ধ ক'রে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, ইংরেজ বণিকদের মতো দেশীয় বণিকদের কোনরকম আভ্যন্তরীণ শুল্ক দিতে হবে না। এই ঘোষণা ইংরেজ বণিকদের স্বার্থে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানে। মীরকাশিমের সঙ্গে কোম্পানীর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং সেই যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হলে কোম্পানীর দস্যুবৃত্তির পথের শেষ কাঁটাটিও অপসারিত হয়। মীরকাশিমের পরাজয়ের পর ইংরেজরা পুনরায় মীরজাফরকে সিংহাসনে বসায়। তিনি মীরকাশিম কর্তৃক আরোপিত শুল্ক-রহিত পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নিলেন। কোম্পানী বাণিজ্য করার নামে দস্যুগিরি চালাবার অধিকার পুনরায় ফিরে পেল। সেই সঙ্গে তখন থেকেই ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বাণ্যিজ্যের ওপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্ব সরকারীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ও তার পরিণাম : এর পর ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আয়ের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। এই দেওয়ানীর সুবাদে কোম্পানী ভূমি-রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। দেওয়ানীর সুযোগে ইংরেজরা কার্যত দেশ শাসন করতে থাকে এবং অধিক অর্থ অর্জনের জন্য উৎপাদক-কৃষকদের কাছ থেকে অস্বাভাবিকভাবে ভূমি-রাজস্ব আদায় করতে শুরু করে। ১৭৬৪-৬৫ সালে যেখানে নবাবের অধীন বাংলায় ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬৫ লক্ষ টাকা, সেখানে ইরেজরা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পাবার অব্যবহিত পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১১৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। এদেশে দস্যুবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে কোম্পানীর কত টাকা ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল, তার হিসেব দিতে গিয়ে ১৭৬৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে প্রেরিত এক পত্রে **ক্লাইভ** লিখেছিলেন :

> আমি যতটা অনুমান করতে পারি, তাতে পূর্বে দখলীকৃত বর্ধমান-সহ এই দখলের মাধ্যমে আগামী বৎসরে আপনাদের রাজস্বের পরিমাণ ২৫০ লক্ষ সিক্কা টাকার কম হবে না ইত্যাদি। এর পর এই অঙ্ক ২০ থেকে ৩০ লক্ষেরও বেশী হবে। শান্তির সময়ে আপনাদের সামরিক ও অসামরিক ব্যয় কখনই ৬০ লক্ষ টাকার বেশী হতে পারে না। নবাবদের ভাতা ইতোমধ্যেই কমিয়ে ৪২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে এবং দিল্লীর বাদশাহ্‌কে (গ্রেট মোগল) দেয় অর্থের পরিমাণ করা হয়েছে ২৬ লক্ষ টাকা। সুতরাং, কোম্পানীর স্পষ্টতই ১২২ লক্ষ সিক্কা টাকা বা ১,৬৫০,৯০০ স্টার্লিং পাউণ্ড লাভ হবে।

পুরাতন আমলের জমিদারদের অস্তিত্ব লোপ : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করার বহু পূর্ব থেকেই এদেশে 'জমিদার' নামে এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হয়েছিল। তাদের কাজ ছিল কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা বা রাজস্ব আদায় করে তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নবাবের রাজকোষে জমা দেওয়া। স্ব-স্ব এলাকার জমিদাররা ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী। মোঘল আমলে জমিদাররা উত্তরাধিকারসূত্রে খাজনা আদায়ের অধিকার ভোগ করত। তখন জমিদারদের জমিদারী কেড়ে নেওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতা হাতে পেয়েই পুরানো জমিদারদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। প্রতি বছর জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য নীলাম ডাকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। নীলামের সময় যেসব ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণ খাজনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিত, কোম্পানী তাদের হাতেই খাজনা আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করত। ''ফলে একদল দুর্ধর্ষ নর-পিশাচের আবির্ভাব হোল, যারা কোম্পানীর অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে প্রজাদের কাছ থেকে জুলুম ক'রে তাদের শেষ কানাকড়িটি পর্যন্ত কেড়ে নিতে আরম্ভ করল। পুরানো দিনের জমিদারেরা প্রজা-পীড়নে ও খাজনা আদায়ে নতুন নর-পিশাচের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। ফলে তাদের জমিদারী একে একে হাতছাড়া হয়ে যেতে লাগল।'' এইভাবে বাংলাদেশের নাটোর, নদীয়া, দিনাজপুর প্রভৃতি জায়গার পুরানো যুগের প্রায় প্রতিটি জমিদার বংশ কোম্পানী-শাসনের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ভেঙে পড়ল।

কোম্পানীর শাসনে কৃষকদের অবস্থা : কোম্পানী-সৃষ্ট নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় পুরানো জমিদাররা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হোল, তেমনি কৃষকরাও হোল নিঃস্ব, রিক্ত ও সর্বস্বান্ত। কোম্পানীর প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ লুণ্ঠন করা। কিন্তু স্থানীয় জমিদাররা অনেক সময় কোম্পানীর ইচ্ছা অনুযায়ী খাজনা আদায় করতে পারত না। সেজন্য কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য নতুন করে একদন খাজনা আদায়কারী কর্মচারী নিয়োগ করা হোল। এই আদায়কারীদের প্রতি বছর নিয়োগ করা হত। যেসব ব্যক্তি অধিক পরিমাণে খাজনা আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিত, তাদের ওপরেই আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হত। বর্ধিত খাজনা দিতে গিয়ে কৃষকরা ঋণের দায়ে সর্বস্বান্ত হল। অনেকে খাজনার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে কিংবা ডাকাতের দলে নাম লেখাতে বাধ্য হল। শোষণের জাঁতাকলে বাংলার গ্রামবাসীর পাঁজর ক'খানা যখন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে দেখা দিল অজন্মা। ফলে সারা দেশে হাহাকার শুরু হল। শেষে হাহাকার দুর্ভিক্ষে গিয়ে পৌঁছাল। এই দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১৭৭৬ বঙ্গাব্দ) নামে পরিচিত। ওই সময় মাত্র ৯ মাসের মধ্যে বাংলার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ মানুষের মৃত্যু হল। কিন্তু এত বড় দুর্ভিক্ষও ব্রিটিশ বণিকদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। ১৭৭০-৭১ সালের চরম দুর্ভিক্ষের সময় কোম্পানী কৃষকদের কাছ থেকে আগের বছরের তুলনায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বাড়তি খাজনা হিসেবে আদায় করেছিল।

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', 'হফ্‌তম' ও 'পন্‌জম' আইন ইত্যাদির কুফল : এর পর ১৭৯০ সালে দশসালা বন্দোবস্ত এবং ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই নতুন ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশে জমিদারী প্রথার উৎপত্তি ঘটে। চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পূর্বে জমিদারদের জমিতে কোনরকম স্বত্ব ছিল না। কেবল রাজস্ব আদায়ের বা ইজারাদারদের দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত থাকত এবং আদায়ীকৃত অর্থের ১১ ভাগের ১ ভাগ তারা কমিশন হিসেবে পেত। জমির প্রকৃত মালিক ছিল রাইয়ত কৃষকরা। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় জমিদাররা চিরস্থায়ীভাবে ভূ-সম্পত্তি ভোগ করার এবং রাইয়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার

অধিকার লাভ করে। এর বিনিময়ে সরকারকে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব তাদের প্রদান করতে হত। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির সূর্যাস্তের পূর্বে ঐ রাজস্ব জমা দিতে না পারলে সংশ্লিষ্ট জমিদারের জমিদারী নীলামে উঠত। এর পর ১৭৯৯ সালে প্রণীত কুখ্যাত 'হফ্‌তম' আইনের সাহায্যে রাইয়ত ও কৃষকদের উচ্ছেদ করার ক্ষমতা স্বেচ্ছাচারী জমিদারদের হাতে প্রদান করা হয়। এই আইনে আরও বলা হয় যে, প্রজারা এক জমিদারের এলাকা ছেড়ে অন্য জমিদারের এলাকায় যেতে কিংবা অন্য জমিদারের জমি চাষ করতে পারবে না। কোন প্রজা যদি তা করে, তবে সংশ্লিষ্ট জমিদার তাকে আটক বা কয়েদ করতে পারবে। তার কয়েক বছর পরে 'পন্‌জম' আইন জারি করা হয়। এই আইন অনুসারে জমিদাররা খাজনার হার নির্ধারণ করতে এবং জমি থেকে প্রজাকে উচ্ছেদ করতে পারত। '' এইভাবে রাইয়ত ও কৃষকদের সর্বনাশ করার জন্য জমিদারদের হাতে কোম্পানীর সরকার এই সমস্ত শোষণ ও অত্যাচারের সুযোগ ও অধিকার দিয়েছিল তার নিজের অমানুষিক শোষণের স্বার্থে।'' এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **রজনী পাম দত্ত** বলেছেন, এইভাবে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার স্বভাবসুলভ প্রক্রিয়া ভারতে নিষ্ঠুরভাবে সম্পন্ন করা হোল। এর ফলে জমির মালিক থেকে কৃষকরা প্রজায় পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়া আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনগণের একটি অংশ ভূমিহীন মজুর বা নতুন কৃষি সর্বহারায় পরিণত হয়েছে। এই নতুন ক্ষেতমজুর শ্রেণী বর্তমানে কৃষিজীবী জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধাংশ পর্যন্ত হবে।

দেশীয় শিল্পের ওপর চরম আঘাত : কৃষক ছাড়াও ভারতীয় সমাজে অন্য যেসব শ্রেণী দেশের উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করত, তাদের মধ্যে শিল্পী, কারিগর প্রভৃতি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা বস্ত্র, ধাতু দ্রব্য ইত্যাদি তৈরী করত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কায়েম হওয়ার পূর্বে ঢাকা, শান্তিপুর, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জায়গায় তাঁতশিল্প বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ঐসব অঞ্চলের তাঁতীরা ছিল স্বাধীন। তারা নিজেদের অর্থ নিজেদের শিল্পে নিয়োগ করতে পারত এবং শিল্পজাত দ্রব্য নিজেরাই বিক্রী করত। তখন ঐসব অঞ্চলের তাঁতীদের গৃহিণীরা গর্ব করে বলত :

চরকা আমার সোয়ামী পুত, চরকা আমার নাতি;
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি।

লর্ড ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি যখন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন, তখন তিনি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেন যে, ভারতবর্ষের এই শহরটি লণ্ডনের মতোই 'বৃহৎ, জনাকীর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী।' কিন্তু এইসব শিল্পের ওপর কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই কৃষকদের মতো শিল্পী ও কারিগরদের জীবনেও নেমে এল ঘোর অন্ধকার। প্রথমে তাঁতীদের কাছ থেকে মাল সংগ্রহের জন্য কোম্পানী একদল ঠিকাদার নিয়োগ করল। তারা তাঁতীদের 'দাদন' দিত এবং এর বিনিময়ে উৎপাদিত সামগ্রী তারা ঠিকাদারদের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য থাকত। পরবর্তী সময়ে কোম্পানী অধিক মুনাফা লাভের জন্য ঠিকাদারী ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে। তখন থেকে গোমস্তা নিয়োগ ক'রে তাদের মাধ্যমে কোম্পানী সরাসরি মাল সংগ্রহ করত। গোমস্তারা কোম্পানীর পক্ষ থেকে কারিগরদের 'দাদন' দিত। কিন্তু যারা 'দাদন' নিত, তারা বাজার দর অপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ, এমনকি, কোন কোন ক্ষেত্রে ৪০ ভাগ পর্যন্ত কম দামে কোম্পানীর কাছে মাল বিক্রী করতে বাধ্য থাকত। পাছে তাঁতীরা স্বল্প মূল্যে কোম্পানীর কাছে মাল বিক্রী না ক'রে, এই ভয়ে 'দাদন' দেওয়ার সময় তাদের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হোত। যারা মুচলেকা দিতে সম্মত হোত না, তাদের চরম শাস্তি দেওয়া হোত। অনেক সময়

তাদের আঙুল পর্যন্ত কেটে দেওয়া হোত। ছোট-বড়-মাঝারি কোন কারিগরই কোম্পানীর গোমস্তার হাত থেকে রেহাই পেত না। কোম্পানীর ঐসব এজেন্ট ইচ্ছা করলে কারিগরদের অবরুদ্ধ করতে, বলপূর্বক জরিমানা আদায় করতে, প্রহার করতে, এমনকি জাত-ব্যবসা থেকে উৎখাত করতে পারত। এইভাবে কোম্পানীর শাসন প্রবর্তিত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের সুবিখ্যাত তাঁতশিল্প চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। সমৃদ্ধিশালী শহরগুলি বন্য পশুর বাসভূমিতে পরিণত হয়। কোম্পানীর শাসনে ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক **কার্ল মার্কসকেও** বিচলিত করেছিল। তিনি বলেছিলেন :

> ইংল্যাণ্ডই ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাকে ভেঙে দিয়েছে, ... পুরানো জগতের অপহৃতি অথচ নতুন কোন জগতের এই অপ্রাপ্তির ফলে হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশার ওপর একটি বিশেষ রকমের বিষাদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং ব্রিটিশ-শাসিত হিন্দুস্থান তার সমস্ত অতীত ঐতিহ্য, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।

এইভাবে ''ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এশীয় স্বৈরাচারের ওপর ইউরোপীয় স্বৈরাচারের পত্তন ঘটিয়ে এমন এক দানবীয় বীভৎসতা সৃষ্টি করেছে, যা সালফেট মন্দিরের রোমহর্ষক স্বর্গীয় দানবদেরও হার মানায়।''

● ১.২.১.২ শিল্প - পুঁজির যুগ

ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের পর বণিক-পুঁজিবাদের ওপর শিল্প-পুঁজিবাদের প্রাধান্য বিস্তার : ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে নিজের দেশে অর্থাৎ খোদ ইংল্যাণ্ডে বাণিক-পুঁজিবাদ সংকটের সম্মুখীন হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতবর্ষ লুণ্ঠিত হওয়ার ফলে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর ঐ অর্থ ইংল্যণ্ডে শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution)-কে ত্বরান্বিত করে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ড বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেখানে এক নতুন ধরনের পুঁজিপতি শ্রেণী অর্থাৎ আধুনিক শিল্পভিত্তিক পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই শ্রেণী নিজেদের শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য 'অবাধ বাণিজ্য' নীতির সপক্ষে জোরালোভাবে প্রচার শুরু করে। তারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক অনুসৃত বণিক-পুঁজিবাদের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকে। এই উদীয়মান শ্রেণীর অন্যতম প্রবক্তা বিখ্যাত বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্ অ্যাডাম স্মিথ তাঁর সুবিখ্যাত ***ওয়েলথ অব্ নেশনস্*** (*Wealth of Nations*) নামক গ্রন্থে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনেরও নিন্দা করেন। প্রখ্যাত ইংরেজ বাগ্মী এবং উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি এডমণ্ড বার্ক বণিক-পুঁজিবাদের অন্যতম স্তম্ভ ওয়ারেন হেস্টিংসকে 'ইমপিচ' করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য **জর্জ কর্ণওয়েল লুইস** ১৮৫৮ সালে কমন্সসভায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথা বণিক-পুঁজির স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে বলেন :

> আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি, বিশ্বের কোথাও এমন কোন সরকার এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যা ১৭৬৫-১৭৮৪ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেয়ে বেশী দুর্নীতিপরায়ণ, বিশ্বাসঘাতক ও লোভাতুর ছিল।

ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে রাজনীতিতেও শিল্পপতিদের প্রাধান্য-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। উভয় পক্ষই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৭৭০ সাল থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে বণিক-পুঁজিবাদের সঙ্গে শিল্প-পুঁজিবাদের বিরোধ

তীব্র আকার ধারণ করে। কোম্পানীর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কার-আইন প্রণয়ন করে, যথা — ১৭৭৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আইন (The Regulating Act of 1773), ১৭৮৪ সালের ভারত (শাসন) আইন (India Act of 1784) ইত্যাদি। লর্ড নর্থের নিয়ন্ত্রণ আইনের সাহায্যে বাংলার জন্য স-পরিষদ গভর্নর জেনারেল (Governor General-in Council) নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া, বোম্বাই ও মাদ্রাজের জন্য গভর্নর ও তাঁর পরিষদ এবং সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন করা হয়। পিটের ভারত (শাসন) আইনের সাহায্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য ইংল্যাণ্ডে একটি নিয়ন্ত্রণকারী পর্ষদ (Board of Control) প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে একদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন এবং অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা থাকায় কার্যত দ্বৈত শাসনব্যবস্থা (Dual Administration) প্রবর্তিত হয়। এর পর ১৮১৩ সালে আইন প্রণয়ন ক'রে ব্রিটিশ পার্লমেন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার খর্ব করে। এইভাবে ব্রিটিশ রাজনীতিতে বণিক-পুঁজিবাদের পরিবর্তে শিল্প-পুঁজিবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর পর ইংল্যাণ্ড শিল্প-পুঁজির যুগ শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবে ভারতবর্ষের ওপরেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

শিল্প-পুঁজির শাসনে ভারতবর্ষ পরাধীন উপনিবেশে পরিণত : স্বদেশে বিজয়লাভের পর ব্রিটিশ শিল্প-পুঁজিপতিরা ভারতবর্ষকে শোষণের জন্য নতুন পথে অগ্রসর হয়। তারা একদিকে ব্রিটিশ পণ্যের খোলা বাজার হিসেবে এবং অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত কারখানাগুলির জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের উৎস হিসেবে ভারতকে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে। ব্রিটিশ শিল্পপতিদের এই স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্কার সাধন। সেজন্য ইংরেজরা রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধন, রেলপথ স্থাপন, সেচ ব্যবস্থার সংস্কার সাধন, ডাক ও তার ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। সর্বোপরি, ভারতবর্ষের মাটিতে এক শ্রেণীর অনুগত কেরানী ও ভৃত্য তৈরী করার জন্য সীমাবদ্ধভাবে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বলা বাহুল্য, ''ভারতে 'সভ্যতার আলো' বিকিরণ করার জন্য এই রেলপথ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়নি; এগুলির সৃষ্টি হয়েছিল আরও বিজ্ঞানসম্মত কায়দায় ভারত শোষণের প্রয়োজনে।'' এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৮৫৩ সালে **মার্কস** বলেছিলেন :

> '' ... ইংরেজ মিলতন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথ-বিভূষিত করতে ইচ্ছুক এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কলকারখানার জন্য কম দামে তুলো ও অন্যান্য কাঁচামাল নিষ্কাশিত করা যায়।'' এইভাবে ভারতবর্ষকে একটি পরিপূর্ণ পরাধীন উপনিবেশে পরিণত করার উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রিটিশ শিল্প-পুঁজিপতিরা এদেশের অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করে।

ব্রিটিশ শিল্প-পুঁজিবাদের যুগে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন : শিল্প-পুঁজির যুগে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী ভারতে বিক্রয় ক'রে বিরাট অঙ্কের মুনাফা অর্জনের জন্য ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার এক বৈষম্যমূলক শুল্ক-নীতির প্রবর্তন করে। এই শুল্ক-নীতির ফলে ভারতের বাজারে ব্রিটিশ পণ্য আমদানির জন্য কোনরকম শুল্ক দিতে হোত না; কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বাজারে ভারতীয় পণ্য রপ্তানির জন্য উচ্চ হারে শুল্ক প্রদান করতে হোত। এর ফলে ভারতীয় শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়ে। **কার্ল মার্কস** তাঁর 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন :

১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন থেকে ভারতে সুতা চালানোর অনুপাত ১ থেকে ৫,২০০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৮২৪ সালে ভারতে ব্রিটিশ মসলিনের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১০,০০,০০০ গজেরও কম। কিন্তু ১৮৩৭ সালে তা ৬,৪০,০০,০০০ গজেরও বেশী দাঁড়ায়। অথচ একই সময়ে ঢাকার জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে ২০,০০০-এ নেমে আসে। শিল্পের জন্য বিখ্যাত এইসব ভারতীয় শহরগুলির অবক্ষয়ই ব্রিটিশ আধিপত্যের নিকটতম ফলাফল নয়। সারা ভারতবর্ষব্যাপী কৃষি ও হস্তচালিত শিল্পের যে-ঐক্য ছিল ব্রিটিশ বাষ্প ও বিজ্ঞান, তাকে উন্মূলিত ক'রে দিয়েছে।

১৮৪০ সালে পার্লামেন্টারী তদন্ত কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে **মন্টগোমারী মার্টিন** বলেছিলেন :

> গত পঁচিশ বছর ধরে আমরা ভারতকে ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য গ্রহণ করতে বাধ্য করেছি। আমাদের পশমজাত দ্রব্য বিনা শুল্কে, তুলাজাত দ্রব্য শতকরা আড়াই ভাগ শুল্কে এবং অন্যান্য দ্রব্য এই অনুপাতে ভারতকে নিতে বাধ্য করেছি; অথচ ঠিক এই পঁচিশ বছর ধরে আমরা ব্রিটেনে রপ্তানিকৃত ভারতীয় পণ্যের ওপর অত্যধিক শুল্ক চাপিয়ে দিয়েছি। এই শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ, ৩০ শতাংশ, ৫০শতাংশ, ১০০ শতাংশ, ৫০০ শতাংশ, এমনকি ১০০০ শতাংশ পর্যন্ত উঠেছে। কাজেই ভারতের সঙ্গে খোলা বাজার স্থাপনের চেষ্টা চলেছে বলে যে-রব উঠেছে, সেটা একটা ধুয়া মাত্র। আসলে ইংল্যাণ্ড ভারতে খোলা বাজারের অধিকার পেয়েছে; ভারত এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে খোলা বাজারের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এইভাবে সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ভারতের বাজারে ব্রিটিশ পণ্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতীয় শিল্পগুলি একে একে ধ্বংসের পথে পা বাড়ায়। ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানিকৃত তুলাজাত জিনিসপত্র যেমন ভারতীয় তাঁতীদের ধ্বংস ডেকে আনে, তেমনি মেশিনে তৈরী ধাতু ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্পসামগ্রী এঁটে উঠতে পারে না। ফলে ক্রমে ক্রমে ঐসব শিল্প ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায়।

ভারতীয়দের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা : ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ভারতবর্ষে নিজেদের পণদ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য বাজার চায়। কিন্তু তারা দেখতে পায়, ভারতীয় জমিদার ও শিল্পপতিরা ধ্বংসপ্রাপ্ত, কারিগরেরা বেকার এবং কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ। এমতাবস্থায় ভারতীয়দের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদ সৃষ্টি করার কাজে মনোযোগী হোল। তবে নিজেদের শিল্পস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেই তারা কয়েকটি অপরিহার্য কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য ভারতকে প্রস্তুত করতে লাগল। এ প্রসঙ্গে **মার্কসের** উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতিরা যতই ভারতের বাজারের ওপর নির্ভরশীল হতে থাকল, ততই তারা ভারতের উৎপাদন-শক্তিকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করার প্রয়োজন অনুভব করতে লাগল।

ভারতবর্ষ কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে রূপান্তরিত : ইংল্যাণ্ডে যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের উদ্ভবের ফলে ব্রিটিশ নাবিকদের পোশাকের জন্য নীল রং গৃহীত হওয়ার জন্য ইংল্যাণ্ডে নীলের বাজার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই এদেশে নীল চাষের ওপর ব্রিটিশ সরকার বিশেষ মনোযোগ দেয়। বস্তুত, নীল চাষই হোল ভারতবর্ষে ইংরেজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম কুটির শিল্প। তাছাড়া, ভারতকে শিল্পপ্রধান দেশ থেকে কাঁচামাল সরবরাহকারী

দেশে রূপান্তরিত করার জন্য ১৮৩৩ সাল থেকে এদেশে ইংরেজদের জমি-জায়গা ক্রয় করার এবং খামার গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হয়। এইসব খামারে চা, কফি, রবার প্রভৃতি উৎপন্ন হওয়ার ফলে ১৮৩৩ সালের পর ঐ সব জিনিসের রপ্তানি অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিক ও সামরিক স্বার্থে ১৮৫৩ সালে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের মাটিতে রেলপথ পাতা হয়। এইভাবে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতকে একটি কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে রূপান্তরিত করা হয়।

কৃষির ওপর অত্যধিক চাপ বৃদ্ধি : বস্তুত, ১৮১৩ সালের পর ভারতবর্ষে শিল্প-পুঁজির যুগে ভারতীয় শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ শিল্পী ও কারিগর বেকার হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই তারা এসে কৃষিক্ষেত্রের ওপর ভিড় জমায়। এমনিতেই কৃষির অবস্থা ছিল শোচনীয়, তার ওপর অত্যাধিক চাপের ফলে কৃষকদের জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। ফলে সৃষ্টি হতে থাকে একের পর এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৮২৫ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে মনুষ্য-সৃষ্ট বিপর্যয়ের ফলে ২ কোটিরও বেশী ভারতবাসী প্রাণ হারায়।

- **১.২.১.৩ মহাজনী পুঁজির যুগ**

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান : ১৮৫৮ সালে 'ভারত শাসন আইন' (Government of India Act, 1858) প্রণয়ন ক'রে ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটায় এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই ঘটনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, ইংল্যাণ্ডে এতদিন ধরে বণিক-পুঁজির সঙ্গে শিল্প-পুঁজির যে-বিরোধ চলছিল, সেই বিরোধ শেষ পর্যন্ত শিল্প-পুঁজির পরিপূর্ণ বিজয় ঘটে। এর পর ভারতবর্ষকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শোষণ করার জন্য বিজয়ী শিল্প-পুঁজিপতি শ্রেণী সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়। ১৮৫৮ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করেন যে, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুসারে ভারতীয়দের সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হবে। বলা বাহুল্য, এই ঘোষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনগণের একটি অংশকে ব্রিটিশ সরকারের শোষণমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে শোষণ ব্যবস্থাকে অধিকতর সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্যকে অধিকতর সম্প্রসারিত করার জন্য ১৮৬১, ১৮৯২ এবং ১৯০৯ সালে আইন প্রণয়ন করা হয়।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজির রপ্তানি : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংল্যাণ্ডের মতো বিকশিত বুর্জোয়া দেশে উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীভবনের ফলে একচেটিয়া কর্তৃত্বের উদ্ভব ঘটে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐসব একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পায় এবং উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহকে শোষণের জন্য তারা নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে। **লেনিনের** মতে, এই সময় ঔপনিবেশিক শোষণের চিরাচরিত পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য হয়ে দেখা দেয় 'পুঁজির রপ্তানি'। ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ পুঁজির রপ্তানি এবং তার বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা এই পর্বের বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। চা-বাগিচা, চটশিল্প, রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতিতে ব্যাপকহারে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়। তবে একথা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের সাধারণ নিয়ম অনুসারে পুঁজির বিনিয়োগকে পুঁজি রপ্তানি বলা হলেও ভারতের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা সেভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করেনি। ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা

ভারতবর্ষে যে-পরিমাণ পুঁজি রপ্তানি করেছিল, তার প্রমাণ ছিল অতি অল্প। ১৮৫৭ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে ব্রিটেন যে-পরিমাণ পুঁজি রপ্তানি করেছিল, তার চেয়ে ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে প্রেরিত করের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। এইভাবে ভারতীয় জনসাধারণকে লুণ্ঠন করেই ভারতের বুকে ব্রিটিশ মহাজনী পুঁজি গড়ে তোলা হয়েছিল।

ব্রিটিশ মহাজনী পুঁজি কর্তৃক ভারত-শোষণ : ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শাসনভার অধিগ্রহণের সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ৭০০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণকে 'সরকারী ঋণ' (Public Debt) বলে অভিহিত করা হয়। তাছাড়া, ১৮৫৭ সালের 'বিদ্রোহ দমন', কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর হাতে ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর, যুগপৎ চীন ও আবিসিনিযার যুদ্ধ ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত 'ভারত অফিসে'র যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতির জন্য ব্যয়িত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্রিটেন যেসব ঋণ গ্রহণ করেছিল, সেগুলিকেও 'ভারত সরকারের ঋণ' বলে ঘোষণা করা হয়। সর্বোপরি, ভারতে রেলপথ নির্মাণের ফলে এই ঋণের বোঝা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। রেলপথ নির্মাণের জন্য ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা যে-পরমাণ অর্থই ব্যয় করুক না কেন, সেজন্য তাদের শতকরা পাঁচ টাকা হারে সুদ দেওয়ার গ্যারাণ্টি প্রদান করা হয়। এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের হাতে পড়ে ভারতীয় জনগণের ঋণের পরিমাণ প্রথম আঠারো বছরের মধ্যে ৭০০ লক্ষ পাউণ্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে, ১৪০০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায় অর্থাৎ, দ্বিগুণ হয়। ১৯০০ সালে তার পরিমাণ হোল ২,২৪০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৩৯ সালে তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮,৮৪২ লক্ষ পাউণ্ডে উপনীত হয়। এইসব তথাকথিত ঋণের জন্য ভারতীয় জনগণকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সুদ হিসেবে প্রদান করতে হোত। ১৯১৪ সাল নাগাদ সুদ, মুনাফা ও প্রত্যক্ষ নজরাণা হিসেবে যে-পরিমাণ অর্থ ব্রিটেন নিয়ে যেত, তা ব্যবসা-বাণিজ্য, কারখানায় তৈরী পণ্য, নৌ-পরিবহন প্রভৃতি থেকে অর্জিত মুনাফার তুলনায় অনেক বেশী ছিল। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ব্রিটেনের মহাজনী পুঁজি ভারত-শোষণের প্রধান উপাদানে পরিণত হয়েছিল। বস্তুত, ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক দিক থেকে লুণ্ঠন করার নীতির জন্যই ভারতীয়দের মধ্যে দুঃখ-দারিদ্র্য সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। **দাদাভাই নওরোজি** তাঁর 'নিষ্কাশন তত্ত্বে'র মাধ্যমে ইংরেজদের বলগাহীন অর্থনৈতিক লুণ্ঠন নীতির স্বরূপ তুলে ধরেছিলেন। আবার, **গোপালকৃষ্ণ গোখেল** প্রচার করেন যে, ব্রিটিশ শাসন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের উদ্যোগ বিনষ্ট করেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। **সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়** ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিলেন যে, তারা ভারতীয়দের 'ভূমিদাস', 'কাঠুরে' এবং 'জলবহনকারী'তে রূপান্তরিত করেছে। অনুরূপভাবে, **অ্যানি বেসান্ত** দেশের চারুকলার ও শিল্প-ব্যবস্থার ধ্বংসকারী, সেচ ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উপেক্ষাকারী হিসেবে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনের অভিযোগ আনেন।

বেসরকারী ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ : ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রেলপথ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চা, কফি, রবার প্রভৃতির চাষ এবং অন্যান্য কয়েকটি শিল্পের বিকাশ সাধিত হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐ সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধের বিলোপ সাধিত হওয়ার ফলে ভারতের মাটিতে বেসরকারী ব্রিটিশ ব্যাঙ্কসমূহ গড়ে ওঠে। এই ব্যাঙ্কগুলিকে 'এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক' বলা হত। এদের প্রধান কার্যালয় ছিল ভারতের বাইরে। সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা

ও আনুকূল্য লাভ করার ফলে ভারতীয় অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ওপর এরা অতি সহজেই আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়। ১৯১৩ সালে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়োজিত মোট পুঁজির তিন-চতুর্থাংশের অধিক বিনিয়োগ করেছিল বিদেশী পুঁজিপতিরা এবং এক-চতুর্থাংশেরও কম বিনিয়োগ করেছিল দেশীয় পুঁজিপতিরা। লক্ষণীয় বিষয় হোল — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতে লগ্নীকৃত ব্রিটিশ পুঁজির শতকরা ৯৭ ভাগই বিনিযোগ করা হোত সরকারী যানবাহন, কৃষি ও অর্থ সম্পর্কিত কাজে অর্থাৎ , কাঁচামালের উৎস ও ব্রিটিশ পণ্যের বাজার হিসেবে ভারতকে শোষণ করার জন্য ঐসব পুঁজি বিনিয়োগ করা হোত। ভারতের শিল্প বিকাশের জন্য ঐ পুঁজি নিয়োগ করা হয়নি। ১৯১১ সালে **জর্জ পেইশ্** (Sri George Paish) 'রয়াল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটি' (Royal Statistical Society) -র সামনে যে-হিসেব পেশ করেন, তা থেকে জানা যায় যে, ব্যক্তিগত পুঁজি বাদ দিয়েই ভারত ও সিংহলে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) বিনিয়োজিত ব্রিটিশ মহাজনী পুঁজির মোট পরিমাণ ছিল ৩৬৫ মিলিয়ন পাউণ্ড।

কোন্ শিল্পে কত বিনিয়োগ করা হয়েছিল, তা নিম্নে বর্ণনা করা হোল :

		মিলিয়ন পাউণ্ড
সরকার ও মিউনিসিপ্যালিটি-সংক্রান্ত	----	১৮২.৫
রেলওয়ে	----	১৩৬.৫
চা, কফি ও রবার চাষ	----	২৪.২
ট্রামওয়ে	----	৪.১
খনি	----	৩.৫
তৈল	----	৩.২
শিল্প-বাণিজ্য	----	২.৫
অর্থ, ভূমি ও বিনিয়োগ	----	১.৮
বিবিধ	----	৩.৩

ব্রিটিশ মহাজনী পুঁজির আমলে সর্বাধিক শোষণ : এইভাবে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ মহাজনী পুঁজি যে-পরিমাণ নিয়োজিত ছিল, যুদ্ধোত্তর ভারতে তার পরিমাণ দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে। এই যুদ্ধের অব্যবহিতকাল পূর্বে ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণ ছিল ৫,০০০ লক্ষ পাউণ্ড। এই মহাজনী পুঁজির মুনাফা ও প্রত্যক্ষ কর বাবদ ভারতীয়দের প্রতি বছর প্রদান করতে হোত ৫০০ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতবর্ষে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুনাফা ও প্রত্যক্ষ কর হিসেবে ভারত থেকে অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করা হোত। ১৯২৯ ও ১৯৩৩ সালে ভারতে নিয়োজিত ব্রিটিশ ব্রিটিশ মহাজনী পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৭,০০০ লক্ষ এবং ১০,০০০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। এই হিসেব থেকে একটি কথাই প্রমাণিত হয় যে, মহাজনী পুঁজির আমলে ভারতবর্ষে পূর্বপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে শোষিত হয়েছে। ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী কর্তৃক ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করার পর মহাজনী পুঁজির আমলে প্রথম দুই দশকে যে-পরিমাণ অর্থ ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করা হয়েছিল, তার পরিমাণ হোল প্রায় ১,৫০০ লক্ষ পাউণ্ড, যা ছিল ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর শাসনাধীন ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে প্রেরিত অর্থের পরিমাণের সমান।

ভারতে মহাজনী পুঁজির আমলে কৃষকদের অবস্থা : ব্রিটিশরা তাদের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি কায়েম করে। এই অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল দুটি, যথা — **(ক)** ব্রিটিশ ধাঁচের সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ও সর্বপ্রকার সামন্ত-সম্পর্ক জিইরে রাখা এবং **(খ)** দেশকে শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদ রাখা ও জাতীয় শিল্পের বিকাশ সাধনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। ব্রিটিশ ধাঁচের সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশরা এক শ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি করে, যারা ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল। নতুন ধরনের সামন্ত-সম্পর্কের অধীনে কৃষকরা তিন প্রকার শোষণের শিকার হয়। **প্রথমত,** তাদের ওপর আরোপিত ভূমি-রাজস্ব সরকারকে নগদে দিতে হোত। এর সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণের কোন সম্পর্ক নেই। ব্রিটিশ মহাজনী পুঁজির যুগে কৃষকদের সর্বাধিক পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব দিতে হয়েছিল। ১৮০০ সালে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ছিল মোট ৪২ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু ১৯১১ ও ১৯৩৬-৩৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে প্রায় ২ কোটি এবং ২ কোটি ৩৯ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। **দ্বিতীয়ত,** ভূস্বামীকে উচ্চহারে খাজনা এবং **তৃতীয়ত,** মহাজনকে সুদ দিতে হোত। এই ত্রিবিধ শোষণের শিকার হওয়ার ফলে কৃষকরা আপাদমস্তক ঋণে ডুবে থাকত। ভারতীয় কৃষকদের ঋণ তখন প্রবাদে পরিণত হয়েছিল - ''ভারতীয় কৃষক ঋণ নিয়ে জন্মায়, ঋণের মধ্যে বাস করে এবং ঋণ নিয়েই মারা যায়।'' ১৯৩৭ সালে এই ঋণের বোঝা ছিল ১৮০০ কোটি টাকারও বেশী। ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ কৃষককে জমি হারাতে হয়। এইভাবে গ্রামীণ মানুষের এক-তৃতীয়াংশ কৃষি-শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। শতকরা ৯০ জনেরও অধিক কৃষক ছিল ৫ একরের কম জমির অধিকারী। অপরদিকে, গ্রামীণ জনতার মাত্র ৪ শতাংশ অকৃষক ভূস্বামীরা জমিতে একচেটিয়া মালিকানা ভোগ করতে থাকে।

মহাজনী পুঁজির যুগে শিল্পের অবস্থা : শিল্প-বিকাশের ধারাকে প্রতিহত করার জন্য ইংরেজ পুঁজিপতিরা একটি ধারাবাহিক নীতি অনুসরণ করে। ১৯১৪ সালে কারখানা আইনের আওতাভুক্ত শিল্প-শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯ লক্ষ ৫১ হাজার। ১৯৩১ সালে তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ লক্ষে দাঁড়ায়। খনি-শ্রমিক ও রেলকর্মীদের ধরলে ঐ বছর ভারতের মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৬ লক্ষ। এই পরিসংখ্যান থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রামাণিত হয় যে, ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভারতের শিল্প-বিকাশের জন্য কোনরকম চেষ্টাই করেনি। বরং , নানারকম কূটকৌশল অবলম্বন ক'রে তারা দেশীয় শিল্পের বিকাশ রোধের চেষ্টা করেছে। ব্যাঙ্ক, বীমা, বাণিজ্য, বিনিময়, জাহাজ-পরিবহন, রেলপথ, বাগিচা এবং চটশিল্পকে ব্রিটিশ মহাজনী পুঁজি সম্পূর্ণ গ্রাস ক'রে ফেলেছিল। এমনকি, সুতীবস্ত্র শিল্প — যেখানে ভারতীয় পুঁজির প্রাধান্য ছিল, সেখানেও ঐ শিল্পের পরিচালন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য 'ম্যানেজিং এজেন্সী' প্রথা চালু করা হয়। দেশের মধ্যে কোনরকম বুনিয়াদী শিল্প গড়ে তুলতে দেওয়া হয়নি। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় বাধ্য হয়েই ব্রিটিশরা টাটাদের জামসেদপুরে ইস্পাত কারখানা স্থাপন করতে দেয়। বস্তুত, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে জাতীয় আন্দোলনের চাপের ফলে ১৯১৮ সালে **মন্টেগু - চেমস্‌ফোর্ড** রিপোর্টে শিল্প প্রসারের কথা ঘোষণা করা হলেও কার্যক্ষেত্রে এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি। বরং , ১৯২২ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকার 'পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ নীতি' অনুসরণ করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী পূর্বতন শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে কোনরকম শিল্প প্রসারের চেষ্টা করেনি। যুদ্ধজনিত সংকটের সম্মুখীন

হয়েও সরকার দেশের সম্পদের যেমন সদ্ব্যবহার করেনি, তেমনি দেশের মধ্যে অবস্থিত কলকারখানাসমূহের যন্ত্রপাতির ক্ষয় পূরণের জন্য বিদেশ থেকে কোন মূলধনও আমদানি করতে দেয়নি। তাদের ভয় ছিল — এসব করা হলে যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষ স্বাভাবিকভাবে শিল্পে সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠবে; তার ফলে ব্রিটিশ মহাজনী পুঁজির স্বার্থে আঘাত লাগবে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্রিটিশ মহাজনী পুঁজির ফলাফল : অসভ্য ভারতীয়দের সভ্য করার পবিত্র কর্তব্য পালনের লম্বা-চওড়া বুলির আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতবাসীর ওপর শোচনীয় নিরক্ষরতার এক বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেয়। শিক্ষা প্রসারের কোন চেষ্টাই তারা করেনি। ১৯৪৭ সালে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, তখন শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বমোট ১ লক্ষের কিছু বেশী ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করত। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ হাজার। চিকিৎসাশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি-সংক্রান্ত শিক্ষায় চরম অব্যবস্থা বিরাজমান ছিল। চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতকের সংখ্যা ছিল বছরে মাত্র ৭০০। সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী স্বীকৃত থাকায় আঞ্চলিক ভাষাসমূহকে হয় দমন, নয়তো নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার অপহরণ, রাজনৈতিক দলগুলির দমন, যে-কোন গণ-আন্দোলন, বিশেষ ক'রে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর আন্দোলন দমন করার জন্য নির্মম অত্যাচার, শিক্ষাগত ও সম্পত্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত নীতি। ১৯১৩ সালে ব্রিটিশ মহাজনী পুঁজির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে **লেনিন** এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ব্রিটিশ পুঁজি ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশকে পরাধীন ও লুণ্ঠন করছে 'একান্ত নির্মমভাবে এবং সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে'। তিনি ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনকে 'নির্ভেজাল একনায়কতন্ত্র' বলে চিহ্নিত করেন। কারণ, সেখানকার 'প্রায় ৩০ কোটি অধিবাসী ইংরেজ আমলাতন্ত্রের লুঠ ও জবরদস্তির কবলে সমর্পিত'।

এই শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ বারংবার গর্জে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **রজনী পাম দত্ত** বলেছেন, ব্যাঙ্ক-পুঁজির অধীনে তীব্রতরভাবে শোষণের মধ্যেই ব্রিটিশ ভারতের ঘনায়মান সংকট এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র বিদ্রোহের মূল কারণ নিহিত রয়েছে।

❑ ১.২.২ সামাজিক ক্ষেত্রে

'শ্বেতাঙ্গের বোঝা', 'নরডিক কুলের উৎকর্ষ' প্রভৃতি তত্ত্বের অবতারণা : ইংরেজরা জাতিকুলগত শ্রেষ্ঠত্বের (Racial Superiority) তত্ত্বে বিশেষভাবে বিশ্বাসী ছিল। তাই তারা নিজেদের অত্যাচারী শোষণমূলক ঔপনিবেশিক শাসনের সপক্ষে নানারকম অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করত। এ বিষয়ে কিপলিং-এর 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা', 'নরডিক কুলের উৎকর্ষ' প্রভৃতি তত্ত্ব অবতারণার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষেকে নিজেদের উপনিবেশ হিসেবে রাখার জন্য এই যুক্তি প্রদর্শন করত যে, অসভ্য ও বর্বর ভারতীয়দের সুসভ্য ও শিক্ষিত ক'রে গড়ে তোলার পবিত্র দায়িত্ব তাদেরই। কারণ, তারা হোল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এইভাবে নিজেদের জাতিকুলগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে ইংরেজরা সুপ্রাচীন হিন্দু সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করত। এ বিষয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিক **মিল** ও **উইলসন** (Mill and Wilson) -এর কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে কেবল 'বিদ্রোহ, হত্যা এবং বর্বরোচিত বিজয়'

(rebellions, massacres and barbarous conquest) ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। তাই এ হেন বর্বর সভ্যতাকে ধ্বংস ক'রে তার জায়গায় সুসভ্য ব্রিটিশ সভ্যতার বনিয়াদ নির্মাণের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বিশেষভাবে চেষ্টা করে।

শাসিত জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি : কিন্তু অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রটি প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিটি প্রতিক্রিয়াশীল শাসন, বিশেষ ক'রে বিদেশী শাসনের অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হোল শাসিত জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ক'রে শাসন করা। ইংরেজরাও ভারত শাসনের জন্য সেই পথই বেছে নেয়। **(১)** দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার সাধন ক'রে এবং **(২)** দেশীয় রাজ্যগুলির পরিপোষণ ক'রে তারা নিজেদের অত্যাচারী শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়।

(১) ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপনে ইংরেজদের ইন্ধন : ঐতিহাসিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৮৯০ সালে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে কয়েকজন মুসলমান উক্ত ধর্মাবলাম্বীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু তদানীন্তন সময়ের দায়িত্বশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতা করলে সেই প্রস্তাব সূতিকাগারেই বিনষ্ট হয়। এর পর ১৯০৬ সালে আগা খানের নেতৃত্বে একটি মুসলমান প্রতিনিধি দল স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবি নিয়ে ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে আলোচনা করেন। ভাইসরয় সঙ্গে সঙ্গে সেই দাবি মেনে নেন। বলা বাহুল্য, আগা খানের এইসব দাবী উত্থাপনের পশ্চাতে স্বয়ং ব্রিটিশ সরকারের হাত ছিল। অন্যতম জাতীয় মুসলমান নেতা মহম্মদ আলি-প্রদত্ত ১৯২৩ সালে জাতীয় সংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ থেকে একথা জানা যায়। এছাড়া, ১৯০৬ সালে লর্ড মিন্টোর কাছে লিখিত লর্ড মার্লির এক পত্র থেকেও এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এই পত্রে **মিন্টো** লিখেছিলেন :

> I won't follow you again into our Mahomedan dispute. Only I respectfully remind you once more that it was *your* early *speech* about their extra claims that first started the M. (Moslem) hare.

ঐ বছরই সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। বলা বাহুল্য, মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্ররোচনা ছিল। কারণ, ঐ সময় লর্ড কার্জনের কুখ্যাত বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে - ব্যাপক গণ-জাগরণ দেখা দিয়েছিল, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক দল সৃষ্টি ক'রে ব্রিটিশ সরকার তাকে দুর্বল ক'রে দিতে চেয়েছিল। যাই হোক্, এর পর থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদী সরকার ১৯০৯ সালে 'ভারত শাসন আইনে' মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে। ১৯১৯ সালে 'ভারত শাসন আইনে' এই ব্যবস্থাকে অধিকতর সুদৃঢ় করা হয়।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর সাম্প্রায়িকতার সম্প্রসারণ : কিন্তু ব্রিটিশদের এই অপচেষ্টা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথম পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল এবং গান্ধীর নেতৃত্বে যে-অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হয়, তাতে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ঐকান্তিকভাবে

যোগদান করে। ১৯১৬ সালে সম্পাদিত 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি (Lucknow Pact) অনুসারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়। কিন্তু ১৯২২ সালে চৌরিচৌরায় গণ-অভ্যুত্থানের পর গান্ধী একতরফাভাবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলে খিলাফৎ নেতৃবৃন্দ সমস্বরে এর প্রতিবাদ করেন। পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে ভাঁটা পড়লে পুনরায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। লালা লাজপত রাই-এর সভাপতিত্বে ১৯২৫ সালে সর্বভারতীয়ভাবে হিন্দু মহাসভা সংগঠিত হওয়ার পর এই বিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯২৫ সালে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলমান সম্মেলনে জিন্না তাঁর বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা দাবী' উত্থাপন করেন। এইভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্কে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। ইংরেজরা ভারতীয়দের মধ্যে ধর্মীয় অনৈক্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে।

বিভিন্ন আইনে মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা : ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড (MacDonald) 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' (Communal Award) সম্পর্কিত ঘোষণা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ফাটল ধরায়। এই ঘোষণার ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালে 'ভারত শাসন আইনে' মুসলমান ছাড়াও শিখ, ইঙ্গ-ভারতীয়, ভারতীয় খ্রীস্টান ও অবহেলিত সংখ্যালঘু শ্রেণীসমূহ এবং ইউরোপীয়, ভূস্বামী শিল্পপতি প্রভৃতির জন্যও পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা যে ভারতীয় জনগণের ঐক্য ও সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করেছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির যে-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মুসলিম লীগ এবং জাতীয় কংগ্রেস পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই নির্বাচনে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নিম্নকক্ষে মোট ১,৫৮৫ টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭১১ টি আসন লাভ করে। কিন্তু মুসলিম লীগ ৪৮২ টি মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত আসনের মধ্যে ৫৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে মাত্র ২৬টি আসন অধিকার করতে সমর্থ হয়। এমতাবস্থায় লীগ-নেতৃত্ব সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য কংগ্রেসের কাছে বেসরকারীভাবে প্রস্তাব রাখে। কিন্তু কংগ্রেস-নেতৃত্ব সেই প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করার পর উভয় দলের মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবী : মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে ১৯৩৭ সালের পর মুসলিম লীগের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২৭ সালে যেখানে লীগের সর্বমোট সদস্যসংখ্যা ছিল ১৩৩০, সেখানে ১৯৩৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে কয়েক হাজারে এবং ১৯৪৪ সালে ২০ লক্ষে দাঁড়ায়। মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক দাবীও বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ সালে লীগ তার লাহোর কংগ্রেসে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সার্বভৌম মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের দাবী-সম্বলিত প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩০ সালে মুসলমান কবি ইকবাল এবং ১৯৩৩ সালে কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র যখন এই দাবী তুলেছিলেন, তখন মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেই দাবীকে 'ছাত্রদের স্বপ্ন' (students' dream), 'অসার ও অবাস্তব কল্পনা' (chimercial and impractical) ইত্যাদি বলে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন। এর পর ১৯৪৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর **জিন্না** ঘোষণা করেন যে, ''আমরা মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারি, কেবলমাত্র মিঃ গান্ধী যদি বলেন 'পাকিস্তান থাকা উচিত এটা আমি স্বীকার করি'।'' তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে , যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তান সৃষ্টির দাবী স্বীকার না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না এবং হবেও না।

সাম্প্রদায়িক বিরোধের সুযোগ গ্রহণ : মুসলমানদের এই দাবীর পশ্চাতে ব্রিটিশ সরকারের যে উস্কানি ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, ১৯৩৯ সালের ১৭ই অক্টোবর বড়লাট লিনলিথগো ঘোষণা করেন যে, বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কোন পরিবর্তন সাধন করা হবে না। ১৯৪২ সালে ভারতে ক্রিপস্ মিশন প্রেরণের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের পর ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদানের জন্য ভারতবাসীদের ঐক্যের ভিত্তিতে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। ক্রিপস্-প্রস্তাবেও অনুরূপ কথা বলা হয়। সেই সঙ্গে প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, কোন প্রদেশ সর্বভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে না চাইলে তার পৃথক থাকার এবং নিজ সংবিধান গঠন করার অধিকার থাকবে। কিন্তু নানা কারণে ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হয়। এর পর কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো' (Quit India) আন্দোলন শুরু হলে মুসলিম লীগ সেই আন্দোলনে যোগদান থেকে বিরত থাকে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধী-জিন্নার যে-বৈঠক হয়, তাতে গান্ধী গণভোট কিংবা গণতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু জিন্না পাকিস্তান গঠনের দাবী থেকে এক চুলও নড়তে সম্মত না হওয়ায় এই বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালে লর্ড ওয়াভেল-প্রস্তাবে বলা হয় যে, বড়লাটের শাসন পরিষদে ১০ জন ভারতীয় সদস্য থাকবেন। তার মধ্যে হিন্দু-প্রতিনিধির সংখ্যা মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যার সমান হবে অর্থাৎ , উভয় সম্প্রদায় ৫ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবে। কিন্তু **জিন্না** দাবী করেন, পরিষদের মোট ৫ জন ক'রে মুসলমান প্রতিনিধিকে মুসলিম লীগই মনোনয়ন করবে; কংগ্রস কোন মুসলমান প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে পারবে না। কংগ্রেস প্রস্তাব দেয় যে, হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত ৫টি আসনের ১টিতে কংগ্রেস ১ জন মুসলমান প্রতিনিধি মনোনয়ন করবে। কিন্তু জিন্না এতে আপত্তি করেন। তিনি ঘোষণা করলেন, কোন মুসলমান প্রতিনিধিকে কংগ্রেস মনোনয়ন দিলে লীগ সেই সরকারে অংশগ্রহণ করবে না। উভয় সম্প্রদায়ের এই অনৈক্যের সুযোগ ব্রিটিশ সরকার প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন অসম্ভব বলে ঘোষণা করে।

মুসলিম লীগের শক্তিবৃদ্ধি : ইতোমধ্যে মুসলিম লীগের ভিত্তি অনেক সুদৃঢ় হয়েছে; মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ লীগের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করতে শুরু করেছে। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভাগুলির নির্বাচনী ফলাফল থেকেই তা প্রমাণিত হয়। এই নির্বাচনে মুসলমান-প্রধান দেশগুলির মধ্যে কেবল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস যেখানে ৫৬টি আসন অধিকার করে, সেখানে লীগ পায় মাত্র ৩০টি আসন। এই নির্বাচন থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নির্বাচকমণ্ডলী কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবকে যেমন সমর্থন করেছে, তেমনি মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ লীগের পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবীর প্রতিও সমর্থন জ্ঞাপন করেছে।

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত বিভাগ : ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক স্বাধীনতাস্পৃহা লক্ষ্য ক'রে **ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী** ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করেন যে, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাদির সমাধান করার উদ্দেশে ভারত সচিব প্যাথিক লরেন্স-সহ কয়েকজন ক্যাবিনেট-সদস্যকে ভারতে প্রেরণ করা হবে। এই মিশন 'ক্যাবিনেট মিশন' (Cabinet Mission) নামে খ্যাত। ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার

প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলিকে হিন্দু-প্রধান ও মুসলমান-প্রধান — এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হবে। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গণ-পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করবে। পূর্বোক্ত দু'টি বিভাগের নির্বাচন প্রতিনিধিরা পৃথকভাবে মিলিত হয়ে নিজ নিজ সংবিধান রচনা করতে পারবে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যে-কোন প্রদেশ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে পারবে। এছাড়া, বিভিন্ন দলের সম্মতি অনুযায়ী দলীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব-সহ ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে অংশগ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কথা ঘোষণার জন্য লীগ ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকে। কিন্তু বড়লাট লীগের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে অস্বীকার করলে জিন্না ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে চাইলে বড়লাট লীগের প্রতিনিধি ছাড়াই সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট দিনটিকে লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' (Direct Action) দিবস রূপে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ দিন লীগের নেতৃত্বে বাংলায়, বিশেষত কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-লুঠতরাজ প্রভৃতি ব্যাপক আকার ধারণ করে। এইভাবে ভারতবর্ষের দু'টি প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন বিরোধ তুঙ্গে, ঠিক তখনই (১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে) ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, ভারতীয়দের একটি বিরাট অসহযোগী অংশকে বাদ দিয়ে গণ-পরিষদ যে-সংবিধান গ্রহণ করবে, তা জোর করে এই অংশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এই ঘোষণা মুসলমানদের পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯৪৭ সালের ২৬শে জুলাই বড়লাট মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক পাকিস্তানের জন্য পৃথক গণ-পরিষদ গঠনের কথা ঘোষিত হওয়ার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। ১৯৪৭ সালের 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' (The Indian Independence Act, 1947) অনুসারে ঐ বছরের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষকে দ্বি-খণ্ডিত করা হয়; সৃষ্টি হয় ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য বিভক্ত করে শাসন করার যে-প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করেছিল, তার ফলে ভারতবর্ষের বিভাজন সম্পূর্ণ হয়েছিল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শুধু বিদ্বেষ বীজ বপনই করেনি, সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত-বিভাজনের কাজটিকেও অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছিল। বস্তুত, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে হিন্দু-মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছিল না। যা ছিল, তা হোল — হিন্দু শাসকের সঙ্গে মুসলমান শাসকের যুদ্ধ এবং তাতে সাম্প্রদায়িকতার কোন চিহ্ন ছিল না। সাইমন কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে এই সত্যটি স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছিল। **রাজনী পাম দত্তের** মতে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ হোল 'ব্রিটিশ শাসনের একটি বিশেষ ফল' (a special **product of British rule**) মাত্র। এই উক্তিটির সত্যতা প্রমাণিত হবে যদি আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ সরকারের কয়েকজন পদস্থ কর্মচারীর উক্তি উদ্ধৃত করি। ১৮২১ সালের মে মাসে 'এশিয়াটিক রিভিয়্যু' (Asiatic Review) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে জনৈক ইংরেজ

পদস্থ কর্মচারী লেখেন, 'বিভক্ত ক'রে শাসন করো' (*Divide et impera*) — এই নীতি ভারত-শাসনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মেরাদাবাদে নিযুক্ত সামরিক কর্মচারী **কোক** (Coke) -ও অনুরূপ উক্তি করেন। তিনি বলেছিলেন :

> Our endeavour should be to uphold in full force the (for us fortunate) separation which exists between the different religions and races, not to endeavour to amalgamate them. *Divide et impera* should be the principle of Indian Government.

১৮৮৮ সালে **স্যার জন স্ট্র্যাচী** (Sir John Strachey) লেখেন, একথা সত্য যে, ভারতবর্ষে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় হওয়ার অন্যতম কারণ হোল সেখানে পরস্পর-বিরোধী দু'টি ধর্মমতের অবস্থান। ব্রিটিশরা কীভাবে এই বিভেদ-নীতিকে সযত্নে লালন-পালন করত, সেকথা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিউম জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতা গান্ধীর কাছে বর্ণনা করেছিলেন। এই বিভেদ-নীতি অনুসরণের ফলে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব সৃষ্টি হয়, যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর মধ্যেকার ঐক্য বিনষ্ট ক'রে জাতীয় সংহতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্যের সুযোগে ব্রিটিশরা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ অব্যাহতভাবে চালাবার সুযোগ পায়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **লেনিন** বলেছিলেন, ''ইংরেজরা প্রভুত্ব করছে 'বিভক্ত করো' নীতির মাধ্যমে।''

ভারতবর্ষকে 'ব্রিটিশ-ভারত' এবং 'দেশীয় রাজ্যসমূহে' বিভাজন : ইংরেজদের 'বিভক্ত ক'রে শাসন করো' নীতির অন্য একটি দিক আছে। তারা এই নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে একদিকে যেমন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের সুযোগে শোষণ করত, অন্যদিকে তেমনি সমগ্র ভারতবর্ষকে 'ব্রিটিশ-ভারত' এবং 'দেশীয় রাজ্যসমূহ' (Native States) — এই দু'ভাগে ভাগ ক'রে শাসন করত।

দেশীয় রাজ্যের সৃষ্টি ও সংরক্ষণ : সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর 'বিভক্ত ক'রে শাসন করো' নীতির অন্য একটি দিক হোল দেশীয় রাজ্যসমূহের সংরক্ষণ। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে দু'ভাগে বিভক্ত ক'রে শাসন করত। এই দু'টি ভাগ হোল — ব্রিটিশ-ভারত (British India) এবং দেশীয় রাজ্য (Native States) । দেশীয় রাজ্যগুলির সংখ্যা ছিল ৫৬৩টি, যার মধ্যে হায়দ্রাবাদের মতো বৃহৎ রাজ্য কিংবা সিমলা পার্বত্য রাজ্যসমূহের (The Simla Hill States) মতো ক্ষুদ্র রাজ্যও ছিল। **রজনী পাম দত্তের** মতে, ঐসব রাজ্যকে 'রাজ্য' বলে অভিহিত করলে ভুল হবে। কারণ, ঐসব রাজ্যে রাজনৈতিক কারণে ইংরেজ সরকার পুতুল রাজন্যবর্গকে সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করত। ঐসব নরপতি নিজ নিজ রাজ্যে স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী ও নৈরাজ্যমূলক ব্যবস্থা কায়েম করতে পারলেও তাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। এই ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে ব্রিটিশ সরকারের হতেই ন্যস্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৮৫৩ সালে **মার্কস** বলেছিলেন :

> যখন থেকে দেশীয় রাজ্যগুলি কোম্পানীর অধীন (subsidiary) হয় এবং কোম্পানী কর্তৃক সংরক্ষিত হতে শুরু করে, তখন থেকেই কার্যত স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

দেশীয় রাজ্যসমূহকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্য : লক্ষণীয় বিষয় হোল — ইংল্যাণ্ডে যে-পুঁজিপতি শ্রেণী সেখানকার সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস সাধন করে তার ওপর গড়ে তুলেছিল পুঁজিবাদের ইমারত, সেই ব্রিটিশ পুঁজিপতি শ্রেণী ভারতবর্ষে অত্যাচারী শাসন ও অমানবিক শোষণ চালাবার জন্য দেশীয় নৃপতিদের সংরক্ষণ ও পরিপোষণের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পূর্বে ব্রিটিশরা এ বিষয়ে মনোযোগ স্থাপন করেনি। কিন্তু এই বিদ্রোহের পর ইংরেজরা উপলব্ধি করতে পারল যে, ভারতবর্ষে সামন্ত-শক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান শত্রু নয়; বরং, তা গণ-জাগরণের অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। সেজন্য বিদেশী শাসকগোষ্ঠী দেশীয় সামন্ত-নরপতিদের অর্থাৎ , ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে সযত্নে লালন-পালন ও সংরক্ষণ করার নীতি গ্রহণ করে। ১৮৫৮ সালে রানীর ঘোষণায় (The Queen's Proclamation of 1858) দেশীয় নৃপতিদের 'অধিকার, মর্যাদা ও সম্মান' (the rights, dignity and honour) রক্ষার কথা সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়। ১৮৬০ সালে **লর্ড ক্যানিং** ঘোষণা করেন :

> আমরা যদি রাজার হাতিয়ার (royal instruments) হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন কতকগুলি দেশীয় রাজ্য সংরক্ষণ করতে পারি, তাহলে যতদিন আমাদের নৌ-বাহিনীর প্রাধান্য বজায় থাকবে, ততদিন আমরা ভারতবর্ষে অবস্থান করতে পারব।

ক্যানিং-এর এই ঘোষণা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ব্রিটিশ রাজশক্তির 'হাতিয়ার' হিসেবে দেশীয় নৃপতিদের ব্যবহার ক'রে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে শাসন করতে চেয়েছিল। ১৯৩০ সালে **রাশব্রুক উইলিয়ামস্** (Rushbrook) বলেছিলেন:

> দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকবৃন্দ ব্রিটিশদের প্রতি অত্যন্ত আনুগত্যপরায়ণ। তাঁদের অনেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সংগ্রামের সময় ব্রিটিশ শক্তির সমর্থন যদি তাঁরা না পেতেন, তাহলে আজ তাঁদের অনেকেরই অস্তিত্ব থাকত না। বর্তমান অশান্তির সময় তাঁদের অনুরাগ ও আনুগত্যই হোল ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ ...। এইসব অনুগত দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সাধারণ বিদ্রোহ ভারতকে গ্রাস করতে পারছে না।

অনুরূপভাবে, ঐসব দেশীয় রাজ্যে যাতে কোন রকম বিদ্রোহ ঘটতে না পারে, সেজন্য ব্রিটিশ সরকার সব সময়েই দেশীয় রাজন্যবর্গের পাশে এসে দাঁড়াতো। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত **বুল্টার কমিটির রিপোর্ট** (The Bulter Committee)-এ বলা হয়েছিল, কোন রকম বিপ্লব বা বিদ্রোহের হাত থেকে দেশীয় রাজ্যগুলিকে রক্ষা করার যে-কর্তব্য ব্রিটিশ সরকারের আছে, তা চুক্তি, সনদ, রীতিনীতি, ব্রিটিশরাজের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদির দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।

দেশীয় রাজ্যগুলিতে জনসাধারণের অবস্থা : দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণ কী ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করত, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে **জওহরলাল নেহরু** তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন :

> সম্ভবত বর্তমানে দেশীয় রাজ্যগুলি জগতে স্বৈরশাসনের প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। অবশ্য এইগুলি সর্বদাই ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অধীন, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা অথবা উহার প্রসার সাধন ছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলিতে বড় একটি হস্তক্ষেপ করেন না।... এখানে নৃপতির ঐশ্বর্যের আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদের

ঔজ্জ্বল্যের পার্শ্বেই লোকে দেখে জনসাধারণ কী অপরিসীম দারিদ্র্য ও অধঃপতনের মধ্যে বাস করিতেছে। রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য নৃপতির ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের জন্য সেই প্রাসাদে আসিয়া জমা হইতেছে; তাহার কতটুকু অংশ জনহিতকর কার্যের জন্য লোকে ফিরিয়া পায়। সংবাদপত্র এখানে প্রশ্রয় পায় না, বড়জোর সাহিত্য বিষয়ক অথবা আধা-সরকারী সাপ্তাহিক পত্র চলিতে পারে। বাহিরের সংবাদপত্র প্রায়ই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ছাড়া (এখানে ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষাও শিক্ষিতের হার অধিক) অন্যান্য রাষ্ট্রে শিক্ষিতের সংখ্যা অতিমাত্রায় অল্প। ... রাজাদিগকে সমালোচনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ আইন আছে, রাজ্যের অভ্যন্তরে অবশ্য অতি মৃদু সমালোচনাও কঠোর হস্তে দমন করা হইয়া থাকে। সাধারণ জনসভার কথা সেখানে লোকের অজ্ঞাত, এমনকি সামাজিক সম্মেলনও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, বাহিরের প্রধান জননায়কদিগকে প্রায়ই রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

রজনী পাম দত্তের মতে, তদানীন্তন অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যে 'ক্রীতদাসত্ব, স্বৈরতন্ত্র্য এবং অত্যাচার ছিল বর্ণনাতীত'। দেশীয় রাজ্যের প্রজা-সমিতির (State People's Conference) ১৯৩৯ সালের ঘোষণা থেকেও ঐসব রাজ্যের জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়।

বিভিন্ন সংস্কার আইনে দেশীয় রাজন্যবর্গের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা : সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকরা কিন্তু দেশীয় নৃপতিদের অত্যাচারী শাসন ও শোষণকে নিজেদের স্বার্থেই পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে এসেছে। ১৯২১ সালে 'চেম্বার অব্ প্রিন্সেস্' (The Chamber of Princes) গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলিকে সুসংগঠিত করার জন সচেষ্ট হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে দেশীয় নৃপতিবর্গকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। বলা হয় যে, উক্ত আইন অনুসারে যে-যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে, তাতে সব প্রদেশকে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদান করতে হবে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে এই নীতি বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হবে না। অর্থাৎ , প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যগুলি যোগদান করবে কিনা, তা ঐসব রাজ্যের রাজন্যবর্গই স্থির করবেন। তাছাড়া, প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষে দুই-পঞ্চমাংশের অধিক এবং নিম্ন কক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য দেশীয় রাজ্যগুলির রাজন্যবর্গের মধ্যে থেকে আসবেন। দেশীয় রাজ্যগুলিকে এইভাবে পরিপোষণ ও সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে **লর্ড রিডিং** (Lord Reading) বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না থাকলেও এর পশ্চাতে রয়েছে কংগ্রেস। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভায় রাজন্যবর্গের যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হলে স্থিতিশীলতা রক্ষা করা সম্ভব হবে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে আংশিকভাবে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির যোগদান না করার ফলে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে দেশীয় রাজন্যবর্গের স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৯৪২ সালে ক্রিপস্ মিশনের প্রস্তাবে দেশীয় রাজন্যবর্গের জন্য কয়েকটি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়। **প্রথমত,** যুদ্ধের পর প্রস্তাবিত গণপরিষদে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রত্যেকে নিজ নিজ জনসংখ্যা অনুযায়ী

সদস্য নির্বাচন করবে। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে যে-ক'টি আসন ভারতীয় প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, ঠিক ততগুলি আসন দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। **দ্বিতীয়ত,** সর্বভারতীয় ইউনিয়নে কোন দেশীয় রাজ্য যোগদান করতে চাইলে তা পৃথকভাবে নিজ সংবিধান অনুযায়ী শাসিত হওয়ার অধিকার পাবে। ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন-প্রস্তাবেও দেশীয় রাজন্যবর্গের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার নানাভাবে সচেষ্ট ছিল। প্রস্তাবে বলা হয়, যেসব দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ তাদের প্রদেশকে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইবে, গণ-পরিষদে তাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার জন্য যে-গণপরিষদ গঠিত হয়, তার সর্বমোট ৩৯৫ জন সদস্যের মধ্যে ৯৩ জন সদস্য ছিলেন দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি। ১৯৪৬ সালের ১৬ই এবং ২২শে মে ক্যাবিনেট মিশন ঘোষণা করেছিল যে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর থেকে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে। তখন দেশীয় রাজন্যবর্গ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারবে। তবে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা সঙ্গত হবে বলে মিশন মন্তব্য করে। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' পাশ হয়। এই আইন অনুসারে দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তির সর্বময় কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। এর ফলে তারা ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগদান করার স্বাধীনতা অর্জন করে। উল্লেখযোগ্য যে, দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকাংশই ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগদান করে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী সরকার নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য ভারতবর্ষের মাটিতে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য সামন্ততন্ত্রকে নির্লজ্জভাবে পোষণের মাধ্যমে দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করেছিল।

❑ ১.২.৩ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার কুফল : প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে দু'টি ভুল ধারণা ছিল। প্রথমটির প্রবক্তা উগ্র জাতীয়তাবাদী আর্যসমাজ দাবী করত যে, আর্যরাই বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং বেদের মধ্যেই এগুলির সবই বর্তমান রয়েছে। এমনকি, আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো সব নীতি ও সিদ্ধান্ত বেদে বর্ণিত রয়েছে বলে তাঁদের দাবী। কিন্তু মেকলে সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, ভারতীয় সংস্কৃতিই হোল পুঞ্জিভূত অবিমিশ্র কু-সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই দু'টি ধারণার কোনটিই বস্তুনিষ্ঠ নয়। **এ. আর. দেশাই**-এর মতে, ''ভারতবর্ষের অতীত সংস্কৃতির এটা একটা একপেশে ছবি।'' তাই আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ঐসব কু-সংস্কার দূর করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। খ্রীস্টান মিশনারীরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন প্রধানত ভারতীদের ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশে। কিন্তু ভারতীয়দের কী ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হবে, ইংরেজপন্থী ও প্রাচ্যপন্থীদের মধ্যে তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল। ইংরেজপন্থী মেকলে 'পশ্চিমী সংস্কৃতির দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিবর্তন' চেয়েছিলেন। তাই তিনি এমন এক ধরনের ইংরেজপন্থী শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, যা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করবে। তিনি বলেছিলেন যে, এই শিক্ষার লক্ষ্য হবে এমন এক শ্রেণীর ভারতীয় তৈরী করা, যারা 'রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতবাদ, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ'। কিন্তু প্রাচ্যপন্থীরা ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-

বিজ্ঞান প্রসারের কর্মসূচী গ্রহণ করলেও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃত ও আরবীকে বেছে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এই গোষ্ঠী ওয়ারেন হেস্টিংস্ ও মিন্টোর চিন্তা-ভাবনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তবে এই দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম গোষ্ঠীটি শেষ পর্যন্ত সমকালীন ভারতবর্ষের শিক্ষা নীতিকে কার্যত নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। এর ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিবর্তে ব্রিটিশ সংস্কৃতিকে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **এ. আর. দেশাই** বলেছেন :

> বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়ে দুনিয়াকে সভ্য ও ঐক্যবদ্ধ করার অবতারের ভূমিকায় ব্রিটেনের এমন একটা প্রায় উন্মত্ত বিশ্বাস আর তার সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা মিশে ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ত্বরান্বিত করেছিল।

কিন্তু আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার যেসব নেতিবাচক প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেগুলি হোল —

(১) এই শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ভারতীয়দের একটি সংখ্যালঘু অংশ উত্তেজনা ও আবেগে ফেটে পড়েছিল। এইসব শিক্ষিত ভারতীয় ভারতের পুরানো আদর্শ ও মানদণ্ডকে বিসর্জন দিয়ে মদ্যপান, অস্বাস্থ্যকর যৌন জীবনযাপন প্রভৃতিকে স্বাধীনতা বলে মনে করতে শুরু করেন। ভারতবর্ষের অগ্রগামী বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে ভারতের প্রাচীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে ঘৃণার মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁরা জনসাধারণকে বর্বর বলে চিহ্নিত করতেন এবং জনগণ তাঁদের 'সাহেব' ও 'বিজাতীয়' বলে মনে করত। ফলে জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের এক দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছিল।

(২) কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজব্যবস্থা ও মতাদর্শের দ্বারা আরোপিত বাহ্যিক ও মানসিক বাধানিষেধের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উন্মাদনায় সাময়িকভাবে হলেও শিক্ষিত ভারতীয়দের একটি অংশ পশ্চিমী উদারনীতিবাদকে সর্বপ্রকার শৃঙ্খলাহীনতার পরিপোষক বলে ভুল করেছিলেন।

(৩) নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষার ওপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপের ফলে তা জনসাধারণের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ, ঐ শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রিটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরব ও মাহাত্ম্যই প্রচার করা হয়েছে এবং নিন্দা করা হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতিকে। বস্তুত, ইংরেজরা যে-শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল, তার ফলে ভারতীয় জনজীবন থেকে নিরক্ষরতা, কু-সংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব, কু-প্রথার প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বলা বাহুল্য, আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ছিল ব্রিটিশদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বনিয়াদকে শক্তপোক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা, জনশিক্ষার সম্প্রসারণ নয়।

❑ ১.২.৪ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের প্রকাশ : রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্রিটিশ শাসনে দেশের মধ্যে 'আইনের অনুশাসন' (Rule of Law) বলে কিছুই ছিল না। স্বদেশে ইংরেজরা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে

'আইনের অনুশাসন' প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে নিজেদের শোষণভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য ন্যায়বিচার, আইনের অনুশাসন প্রভৃতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতে শুরু করে। তাছাড়া, ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারীরা ছিল প্রকৃতিগতভাবে অত্যাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ ও উদ্ধত। তারা নিজেদের প্রকৃত শাসনকর্তা বলে মনে করত। ব্রিটিশ আমলাদের কাছে একজন শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়ের মূল্য বহুসংখ্যক কৃষ্ণকায় ভারতীয় অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তারা ভারতীয়দের আনুগত্য লাভ করার চেষ্টা করত। সর্বোপরি, তারা এই ধারণার দ্বারা পরিচালিত হোত যে, ভারতবর্ষকে জয় করার জন্য অনেক শ্বেতাঙ্গকে প্রাণ দিতে হয়েছিল এবং বহু অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল। তাই ভারতীয়দের শাসন ও শোষণ করার সব রকম অধিকার ইংরেজদের রয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের অত্যাচার ও ঔদ্ধত্য প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে কোম্পানী-শাসনের অবসান ঘটার পর থেকে অধিক পরিমাণে ভারতীয়কে দেশের শাসনকার্যের (administration) সঙ্গে যুক্ত করার নীতি ঘোষিত হলেও কার্যক্ষেত্রে পূর্বাবস্থাই বিদ্যমান ছিল। তবে দেশ-শাসনের জন্য ইংরেজরা শ্বেতাঙ্গ সরকারী কর্মচারী ছাড়াও এক শ্রেণীর দেশীয় কর্মচারী সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় তারা সীমাবদ্ধ ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে স্বল্প সংখ্যক ভারতীয়কে সরকারী কার্যের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দের উচ্চ পদে নিয়োগ করা হোত না। ফলে তাদের মনে এক ধরনের হীনমান্যতা দেখা দিয়েছিল। সেই সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, ঊর্ধ্বতন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের নির্দেশ মান্য করাই ছিল তাদের প্রধান কর্তব্য। এইভাবে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীদের যোগ্যতা ও দক্ষতার অবমূল্যায়ন ক'রে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছিল।

পরবর্তী সময়ে, বিশেষত বিশ শতকের প্রথম দশকের পর থেকে ভারতবর্ষে স্বায়ত্বশাসনের দাবী উঠলে ব্রিটিশ সরকার এই যুক্তি প্রদর্শন করত যে, ভারতীয়রা একটি জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তাছাড়া, প্রশাসনিক কার্যের কোন অভিজ্ঞতা কিংবা প্রতিনিধিত্বের নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা অর্থহীন। কিন্তু ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের আদর্শ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ায় দেশের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক গণ-জাগরণ দেখা দেয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে তা দমন করার চেষ্টা করে। বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার, হত্যা, কারাদণ্ড ইত্যাদি তখন সাধারণ ব্যাপারে হয়ে দাঁড়ায়। বিচারের নামে প্রহসন চলতে থাকে। এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়নমূলক নীতির উদাহরণ : দু'-একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়নমূলক নীতির স্বরূপ উদঘাটন করা যেতে পারে। ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসীর সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে যখনই কোনরকম অসন্তোষ বা প্রতিবাদ দেখা যেত, তখনই অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তা দমন করা হোত। লর্ড লিটনের শাসনকালে (১৮৭৬-৮০) দমন-পীড়নের আধিক্য অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৭৭ সালে যখন ব্যাপক দুর্ভিক্ষে দক্ষিণ ভারতের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে, ঠিক তখনই মহাসমারোহে এক দরবার আহ্বান ক'রে ব্রিটেনের মহারানীকে 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' বলে লিটন ঘোষণা করেন। লিটনের এই আচরণকে **সুরেন্দ্রনাথ** রোম নগরী আগুনে পোড়ার সময় নীরোর বেহালা বাজানোর

সঙ্গে তুলনা করেন। তাছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী লিটন ঐ সময় দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ শুরু করেন। ঐ যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহের জন্য ভারতবাসীর ওপর অত্যধিক পরিমাণে কর আরোপ করেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদগুলি তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলে তিনি ১৮৭৮ সালে 'মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র আইন' (The Vernacular Press Act) প্রণয়নের মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেন। তাছাড়া, ভারতীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার বিকাশে আতঙ্কিত হয়ে তিনি ঐ বছরেই 'অস্ত্র আইন' (The Arms Act) প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতীদের ক্ষেত্রে অস্ত্র রাখা এবং বহন করা বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু ইংরেজদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে না বলে ঘোষণা করা হয়। এর ফলে লর্ড লিটনের সময় অমানবিক নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ আমলে যেসব কুখ্যাত আইন প্রণীত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে ১৮১৮ সালের কুখ্যাত ৩ নং রেগুলেশন, ১৯১৯ সালের রাওলাট আইন ইত্যাদি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের তথাকথিত 'সভ্যতা-বিকিরণকারী' ভূমিকার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

অনুশীলনী - ১

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

২। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। বণিক-পুঁজির যুগে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে ভারতীয় কৃষকদের অবস্থা কেমন ছিল?

২। শিল্প-পুঁজির যুগে ভারতীয় শিল্পের অবস্থা কেমন ছিল?

৩। মহাজনী পুঁজির যুগে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি কীরূপ ছিল?

৪। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি কীরূপ ছিল?

৫। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের নেতিবাচক প্রকৃতি কীরূপ ছিল?

৬। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি কীরূপ ছিল?

১.৩ ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসক ও শোষণের উজ্জীবনমূলক প্রকৃতি

উজ্জীবনমূলক প্রকৃতি সম্পর্কে মার্কসের অভিমত : ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ফলাফল ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের পাশাপাশি তার একটি উজ্জীবনমূলক তথা ইতিবাচক দিকও রয়েছে। **মার্কসের** মতে, ভারতে ইংল্যাণ্ডের ''দু'টি কাজ ছিল : একটি ভেঙে ফেলার কাজ এবং অপরটি নতুন ক'রে গড়ে তোলার কাজ; এশিয়ার প্রাচীন সমাজের ধ্বংসসাধন এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বাস্তব ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।'' আমাদের চোখে সাধারণত ধ্বংসের দিকটি প্রকট হয়ে উঠলেও গঠনের কাজও কিছু কিছু শুরু হয়েছিল। **মার্কসের** ভাষায় :

আরবী, তুর্কী, তাতার, মোগল যারা একের পর এক ভারতকে প্লাবিত করেছে, তারা অচিরেই হিন্দুভূত হয়ে গেছে; ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নততর সভ্যতায়। ব্রিটিশরাই প্রথম বিজয়ী, যারা ছিল হিন্দু সভ্যতার চেয়ে উন্নত এবং সেহেতু তার কাছে অনধিগম্য। দেশীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়ে, দেশীয় শিল্পকে উন্মূলিত ক'রে এবং দেশীয় সমাজে যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল, তাকে সমতল ক'রে দিয়ে ব্রিটিশরা সেই সভ্যতাকে ধ্বংস করে। তাদের ভারত-শাসনের ঐতিহাসিক পাতাগুলো থেকে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়। স্তূপাকৃতি ধ্বংসের মধ্য থেকে উজ্জীবনের ক্রিয়া প্রায় দৃষ্টিগোচরই হয় না। তা সত্ত্বেও সেই ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

এই নতুন 'প্রাণ-সঞ্চারে'র সূত্রপাত **মার্কস** দেখতে পেয়েছিলেন কয়েকটি লক্ষণের মধ্য দিয়ে, যথা — **(ক)** ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ ও চিরস্থায়ী হতে বাধ্য এমন এক রাজনৈতিক ঐক্য, যা মোগল আমলের চেয়ে সুদৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ ও বিস্তৃত, **(খ)** দেশীয় সৈন্যবাহিনীর নিয়োগ, **(গ)** স্বাধীন সংবাদপত্রের আবির্ভাব, **(ঘ)** জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা, **(ঙ)** শাসন চালাবার গুণাবলীসম্পন্ন ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত এক শিক্ষিত ভারতীয় শ্রেণীর গঠন এবং **(চ)** বাষ্পযানের সাহায্যে ইউরোপের সঙ্গে নিয়মিত ও দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন। ব্রিটিশ শাসনের উজ্জীবনমূলক প্রকৃতিকে চারটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে, যথা — **(১)** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, **(২)** সামাজিক ক্ষেত্রে, **(৩)** সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং **(৪)** রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে।

❑ ১.৩.১ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের উজ্জীবনমূলক তথা গঠনমূলক ভূমিকা রয়েছে। শিল্প-পুঁজির দ্বারা শোষণের জন্য ভারতের বাজারের বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য ভারতকে পুনরুৎপাদক দেশে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অন্যভাবে বলা যায়, ভারত শুধুমাত্র কাঁচামালের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং তৈরী করা জিনিসপত্র আমদানীর পরিবর্তে কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি করবে। এর জন্য রেলপথ, রাস্তা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন প্রয়োজন হয়ে পড়ল। **মার্কসের** ভাষায় :

> আমি জানি যে, ইংরেজ মিলতন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথে বিভূষিত করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কলকারখানার জন্য কম দামে তুলা ও অন্যান্য কাঁচামাল নিষ্কাশিত করা যায়। কিন্তু যে দেশটায় লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের গতিপথে যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায়, তাহলে সেই যন্ত্র তৈরীর ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্য যা দরকার, সেইসব শিল্প-প্রক্রিয়ার প্রবর্তন না ক'রে বিশাল এক দেশের ওপর রেলপথের জাল বিস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্যে থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতে সত্যকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। এটা যে নিশ্চয় তা আরও স্পষ্ট এই কারণে যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করে, একেবারে নতুন

ধরনের শ্রম-ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং যন্ত্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করার মতো বিশেষ যোগ্যতা হিন্দুদের আছে। কলকাতা টাঁকশালে যে-দেশীয় যন্ত্রশিল্পীরা অনেক বছর ধরে বাষ্পীয় যন্ত্রে কাজ করছেন, তাঁদের সামর্থ্য ও নৈপুণ্য, হরিদ্বার কয়লা অঞ্চলে কতকগুলি বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশীয়গণের শ্রম এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত থেকে এ ঘটনার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুসংস্কারে ভীষণভাবে প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও মিঃ ক্যাম্পবেল স্বয়ং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ভারতের বিপুল জনগণের মধ্যে প্রভূত শিল্প-ক্ষমতা বর্তমান, পুঁজি সঞ্চয়ের মতো যোগ্যতা তাদের বেশ আছে, গাণিতিকভাবে তাদের মাথা পরিষ্কার এবং অঙ্ক ও গাণিতিক বিজ্ঞানাদিতে তাদের প্রতিভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি আরও বলেছেন :

> 'এদের মেধা চমৎকার'। যে-বংশগত শ্রম-বিভাগের ওপর ভারতের জাতবর্ণগুলি আশ্রয় ক'রে আছে, ভারতের অগ্রগতি এবং ভারতের শক্তির পথে যেসব চরম বাধা বর্তমান রয়েছে — রেলপথ থেকে উদ্ভূত আধুনিক শিল্প তাদের সকলেরই বিলোপ সাধন করবে।

তাছাড়া, নিজেদের সঙ্কীর্ণ বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ পুঁজিতন্ত্রের প্রবর্তন করে। এখানে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদিতে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করতে থাকে। পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ভারতীয় পুঁজিপতি যাতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে না পারে, সেজন্য তারা সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কিন্তু ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা পুঁজিবাদের বিকাশের সাধারণ প্রক্রিয়াটিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ হয় না। তাই বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিছু পরিমাণে দেশীয় পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ দিতে হয়। দেশীয় পুঁজিপতিরাই হোল ভারতবর্ষের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর পূর্বসূরি। এই শ্রেণী ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের একচেটিয়া প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিস্তার করতে গিয়ে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকে। তাই বিদেশী পুঁজিপতিদের পরাজিত করার জন্য দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করে। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শোষণের অভিযোগ এনে তারা ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত ঘটায়। এইভাবে ব্রিটিশ বুর্জোয়া-শাসন পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিল এবং ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মে নিজের ধ্বংসের বীজ নিজেই বপন করেছিল।

❑ ১.৩.২ সামাজিক ক্ষেত্রে

ব্রিটিশ শাসনের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে কিছুটা মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনে এদেশে সীমাবদ্ধভাবে হলেও যে-ইরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল, তার ফলে ভারতীয়দের একাংশ লক্, মিল, রুশো, ভল্‌তেয়ার, স্পেন্সার, বার্ক প্রমুখের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ, আমেরিকা ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস সম্বন্ধেও তাদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। তাছাড়া, ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতীয়রা দুর্বোধ্য সংস্কৃতের পরিবর্তে সহজসাধ্য ইংরেজী ভাষায় অনূদিত ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে পারে। সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃতিলাভ করার

ফলে দেশের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয়। বিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আকার ধারণ করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নবজাগরণের মধ্যে এর বীজ উপ্ত হয়েছিল। এই নবজাগরণের উদ্‌গতা ছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। রামামোহন ছাড়াও ডিরোজিও এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, অ্যানি বেসান্ত, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখও এই ভাবধারার পতাকাবাহী ছিলেন। ভারতবর্ষে স্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের জন্য ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ঐসব বুদ্ধিজীবী পাশ্চাত্য ভাবধারা, সমাজবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক-পুস্তিকা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশে ব্রিটিশ সরকারের কাছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার দাবী জানান। তাছাড়া, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, দাসপ্রথা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও অনুশাসনগুলি স্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের পথে অন্তরায় ছিল। তাই তাঁরা সেগুলির বিলোপসাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এককথায় বলা যায়, ঐসব বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম যে-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সৃষ্টি হয়, তার চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এগুলি হোল — **(১)** পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে মোহভঙ্গের সূচনা, **(২)** ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে ভারতবাসীর অধিকতর বিরোধের সূত্রপাত, **(৩)** মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষ থেকে জনসাধারণের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা এবং **(৪)** হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপলব্ধি। পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা অধিকতর বিকশিত হয়ে উঠলে শুরু হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম। প্রধানত উদীয়মান ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এই সংগ্রামের নেতৃত্ব প্রদান করে। তারা দ্বিমুখী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। একই সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং দেশীয় সামন্ততন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম করতে হয়। এইভাবে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল।

❑ ১.৩.৩ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার সুফল : ব্রিটিশ যুগে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির সবকিছুকে খারাপ প্রতিপন্ন ক'রে ব্রিটিশ শাসনের অনুগামী একদল ভৃত্য তৈরী করা। কিন্তু ঐ শিক্ষার যে একটি প্রগতিশীল দিক ছিল, তা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **এ. আর. দেশাই** বলেছেন যে, এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, উদার এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যই ছিল উন্মুক্ত। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের শিক্ষাব্যবস্থা কিন্তু এরকম ছিল না। সর্বোপরি, এই শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয়দের সামনে আধুনিক পশ্চিমী যুক্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছিল। বস্তুত, আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, কৃষিবিদ্যার মতো আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি এই শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া, ইংল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক সাহিত্য পাঠ ক'রে শিক্ষিত ভারতীয়রা গণতান্ত্রিক নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভোটাধিকার, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাঁরা পশ্চাৎপদ সংস্কৃতির পরিবর্তে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান-নির্ভর সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **এ. আর. দেশাই** বলেছেন যে, বিশ্বের সংস্কৃতি আত্মস্থ করার ফলে শিক্ষিত

ভারতীয়দের কেবল জ্ঞানার্জনই ঘটেনি। সেই সঙ্গে তাঁদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও পরিপ্রেক্ষিতটিও গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার প্রগতিশীল ভূমিকাটি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার-আন্দোলনের মধ্যে। ঐসব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা।

❑ ১.৩.৪ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

ব্রিটিশ শাসনের উজ্জীবনমূলক চরিত্রটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, আকবর প্রমুখ সমগ্র ভারতবর্ষে অখণ্ড শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করলেও তাঁদের সেই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি। ব্রিটিশরা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত (centralised) শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে। অভিন্ন আইন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি গড়ে তোলা হয়। এর ফলে সমগ্র দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে-ঐক্য (unity) পরিলক্ষিত হয়, তা মোঘল সম্রাটদের আমলেও বিদ্যমান ছিল না। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **এ. আর. দেশাই** বলেছেন, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফল হোল এমন একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, যা রাজনৈতক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম দেশের মধ্যে একটি প্রকৃত ও মৌলিক (a real and basic) ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেছে। বস্তুত, ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে-নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই অখণ্ড রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। অন্যভাবে বলা যায়, ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে ধ্বংস ক'রে দিয়ে আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতির প্রবর্তন করে। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বার্থে তারা রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ডাক ব্যবস্থা প্রভৃতি গড়ে তোলে। এর ফলে ভারতবর্ষের এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে অন্য প্রান্তের মানুষের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। একই ধরনের অর্থনৈতিক শোষণ ও পীড়নমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিজ্ঞতা ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে একই রকমের বীতশ্রদ্ধ মনোভাব জাগিয়ে তোলে। একটি কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার অধীনে থাকার ফলে দেশের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও ঐক্য বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের পথ সুগম হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পুনরুজ্জীবনমূলক ভূমিকার কথা বললেও তারা যে ভারতীয় জনসাধারণকে মুক্ত করতে এবং তাদের সামাজিক অগ্রগতির পথে পরিচালিত করতে পারবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। তাই ভারতে ব্রিটিশ পুঁজিবাদী শাসনের 'সঞ্জীবনী' ভূমিকার কথা বলবার সময় তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি নতুন অগ্রগতির বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি সম্পর্কে তার ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় জনগণকেই সেই প্রগতি ও উন্নতি অর্জন করতে হবে। হয় নিজেদের সফল বিদ্রোহের সাহায্যে, নয়তো ব্রিটেনের শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় ও মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভ যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ ভারতে সাম্রাজ্যবাদের যাবতীয় কীর্তি ভারতীয় জনসাধারণের কোন উপকারে লাগবে না বা তাদের অবস্থার কোন উন্নতি সাধন করতেও পারবে না। **মার্কসের** ভাষায় :

> খাস গ্রেট ব্রিটেনেই যতদিন না শিল্প-কারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার বর্তমান শাসকশ্রেণী স্থানচ্যুত হচ্ছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট

শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের ছড়িয়ে দেওয়া এইসব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না।

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **রজনী পাম দত্ত** বলেছেন :

> অবাধ বাণিজ্যের পুঁজিবাদের যুগে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যে-প্রগতিশীল বা উন্নতি বিধায়ক ভূমিকা ছিল, আজ সারা দুনিয়ার পুঁজিবাদের ন্যায় তার সে ভূমিকা শেষ হয়েছে। আজ তা ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি; ভারতে প্রতিক্রিয়ার অপরাপর রূপকেই তা পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে রক্ষা করছে। কাজেই আজ এমন এক স্থানে উপনীত হওয়া গেছে, যেখানে মার্কস-কথিত রাজনৈতিক রূপান্তরই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনুশীলনী - ২

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের উজ্জীবনমূলক প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

২। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের উজ্জীবনমূলক প্রকৃতির ওপর একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের উজ্জীবনমূলক ভূমিকাটি কী?

২। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের উজ্জীবনমূলক ভূমিকাটি কী?

৩। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের উজ্জীবনমূলক ভূমিকার প্রকৃতি কেমন ছিল?

৪। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের উজ্জীবনমূলক ভূমিকাটি কী?

১.৪ সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের প্রকৃতিকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা — **(১)** ধ্বংসমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি এবং **(২)** উজ্জীবনমূলক প্রকৃতি। ধ্বংসমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতিকে চারটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। এগুলি হল — **(১)** অর্থনৈতিক, **(২)** সামাজিক, **(৩)** সাংস্কৃতিক এবং **(৪)** রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বণিক-পুঁজির যুগে ব্রিটিশরা অর্থনৈতিক দিক থেকে নানা উপায়ে ভারতকে কেবল শোষণই করেনি, সেই সঙ্গে দেশীয় শিল্পের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল। শিল্প-পুঁজির যুগে তারা ভারতকে একটি পরাধীন উপনিবেশে পরিণত করেছিল। ব্রিটিশ শিল্পের প্রয়োজনে তারা ভারতবর্ষকে রূপান্তরিত করেছিল কাঁচামাল সরবরাহকারী একটি দেশে। এই পর্বে ভারতীয় শিল্প কার্যত ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে কৃষির ওপর অস্বাভাবিক চাপ বৃদ্ধি

পেয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের সর্বশেষ পর্যায়ে অর্থাৎ, মহাজনী পুঁজির যুগে সুচতুর কৌশলে ভারতকে অনেক বেশী পরিমাণে অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণ করেছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজির রপ্তানি বৃদ্ধি, অস্বাভাবিকভাবে বেসরকারী ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ প্রভৃতি ছিল এই পর্বের ব্রিটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্য। 'ম্যানেজিং এজেন্সী' প্রথা চালু, 'পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ নীতি' অনুসরণ প্রভৃতির ফলে ভারতের বিভিন্ন ধরনের শিল্প চরম সংকটের মুখে পড়ে। আবার, সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসনের সমর্থনে ইংরেজরা 'শ্বেতাঙ্গের তত্ত্ব', 'নরডিক কুলের উৎকর্ষ' প্রভৃতি তত্ত্বের অবতারণা করে একথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে, ইংরেজরা কেবল অসভ্য ও বর্বর ভারতীয়দের থেকেই নয়, সমগ্র বিশ্বের সব জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিজেদের শাসনকে নিরঙ্কুশ ক'রে তোলার উদ্দেশে সামাজিক দিক থেকে তারা যেমন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় দু'টির মধ্যে বিভেদের দেয়াল গড়ে তুলেছিল, তেমনি দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। এইভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে তারা 'বিভক্ত ক'রে শাসন করো' নীতি অনুসরণ করেছিল। আবার, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে মেকলের মতো ইংরেজরা পশ্চিমী সংস্কৃতির দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধন চেয়েছিলেন। তাঁরা ভারতে এমন এক শ্রেণীর ভারতীয় তৈরী করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যাঁরা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় হলেও রুচি, মতবাদ, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ। বলা বাহুল্য, ইংরেজ তথা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্তিহেতু এই নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় কার্যত ভারতীয় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কারণ, তাঁরা ভারতের অতীত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করতে থাকেন। একইভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রটি প্রকাশিত হয় তাদের প্রণীত বিভিন্ন কুখ্যাত আইনের মাধ্যমে। যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও সরকারী চাকুরীতে ভারতীয়দের বঞ্চিত করা হোত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোত না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়রা ছিল অধিকারহীন প্রজা। সামান্য প্রতিবাদ করলেই অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ ক'রে দেওয়া হোত।

কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতির পাশাপাশি তাদের একটি উজ্জীবনমূলক ভূমিকাও ছিল। এই ভূমিকাকে প্রধানত **(ক)** অর্থনৈতিক, **(খ)** সামাজিক, **(গ)** সাংস্কৃতিক এবং **(ঘ)** রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক — এই চারটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। নিজেদের প্রয়োজনে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভারতবর্ষকে কাঁচামালের সরবরাহকারী এবং ব্রিটিশ পণ্যের ক্রেতা দেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনে এখানে রেলপথ, রাস্তাঘাট, সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি গড়ে তোলে। তাছাড়া, নিজেদের সংকীর্ণ বাণিজ্যিক স্বার্থে এখানে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদিতে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করে। ভারতীয় পুঁজিপতিরা যাতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে না পারে, সেজন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে দেশীয় পুঁজিপতিদের পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ দিতে বাধ্য হয়। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মেই এই উদীয়মান পুঁজিপতি শ্রেণী একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় এবং পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বদান করে। তাছাড়া, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এক শ্রেণীর অনুগত কেরানী তৈরীর উদ্দেশে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা একদিন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ায়। আবার, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরাই এদেশে আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা প্রভৃতির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক

অধিকার ও স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এঁরাই বিশ্বের সংস্কৃতিকে আত্মস্থ ক'রে বিপুল জ্ঞানার্জন ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে সাহায্য করেছিলেন। সর্বোপরি, নিজেদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে ব্রিটিশরা একটি কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করলেও তার ফলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এমন এক ধরনের ঐক্য গড়ে উঠেছিল, যার ফলে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তার ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের পথ সুগম হয়।

১.৫ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ১.২.১ - ১.২.১.৩ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ১.২.২ দ্রষ্টব্য।

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ১.২.১.১ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ১.২.১.২ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন - ১.২.১.৩ দ্রষ্টব্য।

৪ নং প্রশ্ন - ১.২.২ দ্রষ্টব্য।

৫ নং প্রশ্ন - ১.২.৩ দ্রষ্টব্য।

৬ নং প্রশ্ন - ১.২.৪ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী - ২

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ১.৩.১ - ১.৩.২ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ১.২.৩ - ১.৩.৪ দ্রষ্টব্য।

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ১.৩.১ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ১.৩.২ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন - ১.৩.৩ দ্রষ্টব্য।

৪ নং প্রশ্ন - ১.৩.৪ দ্রষ্টব্য।

ESSAY-TYPE QUESTIONS

1. Analyse the nature of british colonial rule in India.
2. Analyse the destructive and reactionary role of the British colonial rule in India.
3. Examine the regenerative role of the British colonial rule in India.
4. Analyse the destructive and regenerative role of the British colonial rule in India in the economic sphere.
5. Analyse the destructive and regenerative role of the British colonial rule in India in the social sphere.

SHORT ANSWER-TYPE QUESTIONS

1. What was the destructive and reactionary role of british colonial rule in India?
2. What were the conditions of the Indian peasants during the rule of the East-India Company in the period of mercantile capitalism?
3. What were the conditions of the Indian industries during the period of Industrial Capitalism?
4. What was the nature of British rule in India during finance capitalism?
5. What was the regenerative role of British colonial rule in India?
6. What was the regenerative role of British colonial rule in India in the economic sphere?
7. What was the regenerative role of British colonial rule in India in the social sphere?
8. What was the regenerative role of British colonial rule in India in the political and administrative spheres?

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

Basu, B. D., *Consolidation of the Christian Power in India.*

Calverton, V. F., *The Awakening of America.*

Desai, A. R., *Social Background of Indian Nationalism.*

Dutt, R. Palme, *India Today.*

Dutt, R. C., *Economic History of India*, vol. II.

Majumdar, R. C., *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Centrury.*

Marx, Karl, 'The British Rule in India', *The Indian War of Independence 1857-59.*

Mukherjee, D. P., *Modern Indian Culture.*

Namboodiripad, E. M. S., *A History of Indian Freedom Struggle.*

Shelvankar, K. S., *The Problem of India.*

Sunderland, J. T., *India in Bondage.*

কমোরোভ, এ., *লেনিন ও ভারতবর্ষ*।

চন্দ্র, বিপান, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী, কে. এন. পানিক্কর ও সুচেতা মহাজন, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭-১৯৪৭*।

চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*।

চৌধুরী, কেশব, *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ*।

দত্ত, রজনী পাম, *আজিকার ভারত*।

দেশাই, এ. আর., *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি*।

নেহরু, জওহরলাল, *আত্মচরিত*।

মার্কস, কার্ল, 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন', মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন, *ভারত-প্রসঙ্গে*।

—, 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল', মার্কস-এঙ্গেলস্, *ঔপনিবেশিকতা-প্রসঙ্গে*।

সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫ - ১৯৪৭*।

- o -

একক - ২

(Unit - 2)

স্বদেশী আন্দোলন এবং নরমপন্থী ও চরমপন্থী রাজনীতি

(Swadeshi Movement and Moderate & Extremist Politics)

এককের গঠন-বিন্যাস

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ বিশ শতকের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম

২.২ বিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম

২.৩ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-পরিচালিত সংগ্রাম : স্বদেশী আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন

- ২.৩.১ স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি
- ২.৩.২ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের কর্মসূচী
- ২.৩.৩ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের শ্রেণী-চরিত্র
- ২.৩.৪ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা
- ২.৩.৫ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্ব

২.৪ নরমপন্থী ও চরমপন্থী রাজনীতি

- ২.৪.১ নরমপন্থী রাজনীতি
  - ২.৪.১.১ নরমপন্থী রাজনীতির উৎস
  - ২.৪.১.২ নরমপন্থী রাজনীতির লক্ষ্য
  - ২.৪.১.৩ নরমপন্থী রাজনীতির কর্মসূচী
  - ২.৪.১.৪ নরমপন্থী রাজনীতির শ্রেণী-চরিত্র
  - ২.৪.১.৫ নরমপন্থী রাজনীতির প্রগতিশীলতা
- ২.৪.২ চরমপন্থী রাজনীতি
  - ২.৪.২.১ চরমপন্থী রাজনীতির উৎস
  - ২.৪.২.২ চরমপন্থী রাজনীতির লক্ষ্য
  - ২.৪.২.৩ চরমপন্থী রাজনীতির কর্মসূচী
  - ২.৪.২.৪ চরমপন্থী রাজনীতির শ্রেণী-চরিত্র
  - ২.৪.২.৫ চরমপন্থী রাজনীতির প্রতিক্রিয়াশীলতা
  - ২.৪.২.৬ চরমপন্থী রাজনীতির ব্যর্থতার কারণ

২.৫ সারসংক্ষেপ

২.৬ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

২.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে শুরু হলেও তার বহু পূর্বেই ব্রিটিশ-বিরোধী অনেকগুলি সংগ্রাম সংঘটিত হতে দেখা যায়। কিন্তু ঐসব সংগ্রামের নানা প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সেগুলি ব্যর্থ হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম আন্দোলন হোল স্বদেশী আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫-০৮)। এই আন্দোলনের পটভূমি, কর্মসূচী, সীমাবদ্ধতা, গুরুত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে পরিচয় ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে এই পর্বে কংগ্রেসের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রশ্নে দু'টি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এই গোষ্ঠী দু'টি 'নরমপন্থী' (Moderates) ও 'চরমপন্থী' (Extremists) নামে পরিচিত। বর্তমান এককে নরমপন্থীদের ও চরমপন্থীদের চিন্তাগত উৎস, লক্ষ্য, কর্মসূচী শ্রেণী-চরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া, চরমপন্থী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণও সংক্ষেপে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে এই এককে।

২.১ বিশ শতকের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম

ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী বিভিন্ন সংগ্রাম : প্রায় দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধুমাত্র ইংরেজদের শাসন আর শোষণেরই ইতিহাস নয়, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ইতিহাস। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ- বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু হলেও তার বহু পূর্বেই ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ সালের মধ্যে কোম্পানী-শাসনের বিরুদ্ধে যেসব বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোল পশ্চিম ভারতের তন্তুবায় ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম, অত্যাচারী দেবী সিংহের বিরুদ্ধে রংপুরের কৃষকদের সংগ্রাম, বাঁকুড়ার প্রজা বিদ্রোহ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের চোয়াড় বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ইত্যাদি। ১৮১৩ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মানভূমের চোয়াড় বিদ্রোহ, তিতুমীরের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, ফরিদপুরের ফরায়েজী আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে সজোরে নাড়া দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৫৭-৭০), নীল বিদ্রোহ (১৮৬০-৬১), আসামের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৬১-৬৪), মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৫৭), মাদ্রাজের রুম্পা বিদ্রোহ (১৮৭৮-৭৯), উড়িষ্যার খোন্দ বিদ্রোহ (১৮৬২-৯৪), মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ (১৮৭৩-৯৬), ছোটনাগপুরের কোল বিদ্রোহ (১৭৫৯-১৯০০) এবং বিরশা মুন্ডার নেতৃত্বে বিদ্রোহের (১৮৯৫-১৯০০) কথা বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী সংগ্রামের ত্রুটি-বিচ্যুতি : কিন্তু ঐসব কৃষক বা উপজাতি-কৃষকদের সংগ্রাম ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং আঞ্চলিক স্বার্থকেন্দ্রিক। নেতৃত্বহীন এবং বৈপ্লবিক আদর্শ ও লক্ষ্যহীন ছিল বলে ঐ বিদ্রোহগুলি বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। তাছাড়া, বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সচেতনতা প্রাক্-বিংশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বুকে ভীতি সঞ্চার করতে সমর্থ হলেও বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সর্বোপরি, ঐসব বিপ্লবের সময় ভারতবর্ষে শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেনি বলে কৃষক-সমাজকে বিদ্রোহের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা হোল — কৃষি মানব সমাজের প্রথম ও প্রধান উৎপাদন-ব্যবস্থা হলেও তা অতি নিম্ন স্তরের উৎপাদন-ব্যবস্থা। এই অনুন্নত উৎপাদন-ব্যবস্থাই কৃষকশ্রেণীর জীবন ও জীবিকার প্রধান ভিত্তি। এরূপ একটি অনুন্নত উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত কোন সম্প্রদায় স্বাভাবিক কারণেই একটি বিপ্লবী শ্রেণীতে পরিণত হতে কিংবা স্বাধীনভাবে বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারে না। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অক্টোপাসে আবদ্ধ কৃষক-সমাজ কোন একটি বিপ্লবী শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে বিপ্লবের 'একটি সহায়ক বাহিনী' হিসেবে কাজ করতে পারে। বিশ্ব ইতিহাস এই বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষকশ্রেণী তৎকালীন প্রগতিশীল ও বিপ্লবী শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে বিপ্লবের সহায়ক বাহিনী হিসেবে কাজ করেছে। ১৯১৭ সালে মহান্ সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লবের সময় রাশিয়ার কৃষকশ্রেণী বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সহায়ক বাহিনী হিসেবে পরিচালিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে নিজেদের পূর্ণমুক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাবের পূর্বে কোন বিপ্লবী শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক-সমাজ পরিচালিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। তাই অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দায়িত্ব তাদের নিজেদের কাঁধেই তুলে নিতে হয়েছিল। ফলে ইতিহাসের নিয়মেই সেইসব বিদ্রোহ অসংগঠিত ও আদর্শহীন হয়ে পড়ে এবং গণ-ভিত্তি লাভ না করার ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আবার, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ সাধিত হলেও অসহযোগ আন্দোলনের পর্ব পর্যন্ত তারা শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীকে সমাজের বিধ্বংসী শক্তি বলে মনে ক'রে দূরে সরিয়ে রাখত। অনেকে আবার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে এইসব শ্রেণীর কোন ভূমিকা আছে বলে মনে করত না। তাই বিংশ শতাব্দীর পূর্বে পরিচালিত বিদ্রোহগুলি জাতীয় ভিত্তিতে যেমন সুসংগঠিত হয়নি, তেমনি আবার তাদের মধ্যে দেশীয় ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ এবং সমাধানের পথ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়নি। ফলে ঐসব বিদ্রোহ সর্বভারতীয় বিদ্রোহ না হয়ে আঞ্চলিক অভ্যুত্থান বা বিক্ষোভের পর্যায়েই থেকে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর পূর্বে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহ গুরুত্ব : তবে একথা সত্য যে, সব বিদ্রোহের, বিশেষত ১৮৫৭ সালের পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত কৃষক বিদ্রোহগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহচর জমিদার-মহাজন গোষ্ঠীর অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে যে-আপসহীন সংগ্রামের মহান্ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনায় এবং পরাধীন ভারতবর্ষের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করার ক্ষেত্রে ঐসব বিপ্লবের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ঐসব আপসহীন বৈপ্লবিক সংগ্রাম ভারতবর্ষের মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দিয়েছিল এবং তাঁদের জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নীল বিদ্রোহের সময় (১৮৬০-৬১) ভারতীয় বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী **শিশিরকুমার ঘোষ** বিদ্রোহী কৃষকদের সংস্পর্শে এসে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ''এই নীল বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের মানুষকে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেছিল। বস্তুত, বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালে নীল বিদ্রোহই ছিল প্রথম বিপ্লব।'' অনুরূপভাবে, ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৫৭-৭০) যে ভারতীয় বুর্জোয়া ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, তা বিপিনচন্দ্র পাল নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। **যোগেশচন্দ্র বাগল** বলেছেন, ১৮৭১সালে ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের বিচারের সময় বিদ্রোহী পক্ষের ব্যারিস্টার অ্যানেস্টি সাহেব যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা বিপিনচন্দ্র পালের মতো মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল।

২.২ বিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে কংগ্রেস ও অন্যদের ভূমিকা সম্পর্কে মতবিরোধ : বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের যেমন উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে, তেমনি সূচনা হয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের। এই সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও এর মূল নেতৃত্ব ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হাতে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনায় কংগ্রেসের একক নেতৃত্বদানের ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। অথচ মজার ব্যাপার হোল — কংগ্রেসের সরকারী ও আধা-সরকারী ঐতিহাসিকরা ভারতের সাম্রাজ্যবাদী - বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসকে কংগ্রেসের ইতিহাস বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। **পট্টভি সীতারামায়া** তাঁর **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস** (***The History of Indian National Congress***) নামক সুবিশাল গ্রন্থে বলেছেন :

> কংগ্রেসের ইতিহাস হোল প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতীয় জাতি বিদেশী শাসনের অধীনে ছিল এবং এই অধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য অর্ধ শতাব্দী ধরে কংগ্রেস প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

সেই সঙ্গে অনেকে এমন কথাও প্রচার করেন যে, কেবল গান্ধীবাদী পথেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছে। অনেকে আবার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। **মাইকেল এডওয়ার্ডসের** মতে, কংগ্রেস কখনও একটি বিপ্লবী সংগঠন ছিল না। কংগ্রেসকে ভুল পথে চালিত করার এবং দেশ বিভাগের জন্য তিনি গান্ধীকেই দায়ী করেছেন। এমনকি, **লর্ড অ্যাটলি** এই অভিমত পোষণ করেছিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে গান্ধীর ভূমিকা ছিল 'অত্যন্ত কম' (minimal।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের তিনটি প্রধান ধারা : উপরি-উক্ত দু'ধরনের মতই অল্প-বিস্তর অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট। কারণ, ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গান্ধী ও কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রামের পাশাপাশি সহিংস সংগ্রামও পরিচালিত হয়েছে। সেই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর আন্দোলন — বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে যার নেতৃত্ব করেছিল মূলত

কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং, তিনটি ধারায় ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি-সংগ্রাম প্রবাহিত হয়েছিল। এই তিনটি ধারাকে যথাযথভাবে আলোচনা না করলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঠিক মূল্যায়ন করা যাবে না। ১৯৪০ সালে **গান্ধী** নিজেই স্বীকার করেছেন, এখনও পর্যন্ত আমরা যা অর্জন করেছি, তা মিশ্র অহিংসা (mixed non-violence)-র ফল। তিনি বলেছিলেন :

> We in India have never given non-violence the trial it has deserved. The marvel is that we had attained so much even with our mixed non-violence.

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বিভিন্ন রূপ (forms)-কে আমরা প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি, যথা — **(১)** জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত সংগ্রাম, **(২)** সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রাম এবং **(৩)** শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর সংগ্রাম।

২.৩ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-পরিচালিত সংগ্রাম : স্বদেশী আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন

❑ ২.৩.১ স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি

জন্মের পর থেকে শুরু করে প্রায় বিশ বছর ধরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার প্রতিষ্ঠাতাদের পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হয়েছিল। প্রথম যুগে কংগ্রেস 'উচ্চস্তরের বুর্জোয়াদের, বিশেষত তাঁদের মতাদর্শের প্রতিনিধি (ideological representatives) উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রতিষ্ঠান' ছিল। ১৮৮৯ সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানকারী ব্রিটিশ কমন্স সভার সদস্য **ডাব্লিউ. এস. কেইন** লিখেছিলেন :

> The four thousand gentlemen sitting round me are picked men of the legal, medical, engineering and literary professions all over India.

তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি 'অবিচল শ্রদ্ধা ও আনুগত্য' প্রদর্শনের কথা বলতেন। ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করার পরিবর্তে তাকে জনপ্রিয় করে তোলাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিককার ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিশ্ব-রাজনীতির কিছু কিছু পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে স্বদেশী আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য করে।

তদানীন্তন ভারতের আর্থ - সামাজিক অবস্থা : ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ভারতীদের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বার প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে শিক্ষিত বুর্জোয়া যুবকরা আইন ব্যবসা ও সরকারী চাকুরির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই সময় সরকারী চাকুরির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত থাকায় এবং চাকুরি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করার ফলে শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় , ঐ সময় ডাক ও তার বিভাগে ৭৯টি উচ্চপদের মধ্যে মাত্র ৪টিতে, বন বিভাগের ২৪টি উচ্চপদের মধ্যে মাত্র ২টিতে, পুলিশ বিভাগের ১১২টি উচ্চপদের মধ্যে ৯টিতে এবং শুল্ক বিভাগের ৩৩টি উচ্চপদের মধ্যে মাত্র ১টিতে ভারতীয়দের নিয়োগ করা হয়েছিল। জরিপ বিভাগের ১৩টি উচ্চপদের সবগুলিতেই ইংরেজরা নিযুক্ত হয়েছিল। এমতাবস্থায়

শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সাংবাদিকতার কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পেশা হিসেবে আইন ব্যবসা কিংবা সাংবাদিকতা ছিল বড়ই অনিশ্চিতকর। তাছাড়া, ব্রিটিশ শিক্ষানীতির কঠোরতার ফলে ভারতীয়দের পক্ষে উচ্চ-ডিগ্রী লাভ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ফলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য ভারতীয় যুবকদের মনে চরম হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। শহরের শিক্ষিত তরুণদের পাশাপাশি গ্রামের কৃষক ও শহরের শ্রমিকদের মধ্যেও তীব্র অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ব্রিটিশ সরকারের ভূমি-নীতি এবং গ্রামাঞ্চলে জমিদার ও মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচার গ্রামের অসংখ্য গরীব ও মাঝারী কৃষকদের বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছিল। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের পরিচালিত কলকারখানায় কোনরকম শ্রম-আইন কিংবা শ্রমিকদের সঙঘ গঠনের অধিকার বা চাকুরির নিরাপত্তা না থাকায় কৃষক ও শিক্ষিত যুবকদের মতো শ্রমিকরাও ছিল অসন্তুষ্ট; তাদের মনের মধ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল।

সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা : সমকালীন ভারতের আর্থ-সামজিক অবস্থার জন্য যখন সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ-শাসন সম্পর্কে তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, সেই সময় সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণী ভারতীয় বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ভূমিকার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলে তাদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। সরকারী কর্মচারীরা কংগ্রেসের অধিবেশনে দর্শক হিসেবেও যাতে উপস্থিত থাকতে না পারেন, সেজন্য ১৮৯০ সালে একটি সরকারী নির্দেশ জারী করা হয়। ১৯০০ সালে ভারত-সচিবের নিকট লিখিত এক পত্রে **কার্জন** লিখেছিলেন, ''কংগ্রেস এখন পতনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতে এসে আমার অন্যতম উচ্চাশা হোল এর শান্তিপূর্ণ মৃত্যুতে সাহায্য করা।'' এই উদ্দেশ্য নিয়ে লর্ড কার্জন যে-ভারতনীতি অনুসরণ করতে লাগলেন, তার ফলে সর্বশ্রেণীর ভারতীয় জনগণের মনে অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৮৯৯ সালে প্রণীত কলকাতা পৌর আইনের মাধ্যমে কলকাতা পৌরসভার কমিশনারের সংখ্যা হ্রাস ক'রে ৭৫ থেকে ৫০ করা হয়। পূর্বেকার নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়। **সুরেন্দ্রনাথের** মতো নরমপন্থী নেতাও ১৮৯৯ সালের পৌর আইনকে 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পরিহাস' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এর পর ১৯০৩ সালে প্রণীত 'ভারতীয় সরকারী গোপনীয়তা সংশোধনী আইনে'র মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকারী এই অগণতান্ত্রিক আইন দেশের শিক্ষিত মানুষের মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। পরের বছর অর্থাৎ , ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী সরকার শিক্ষা সংকোচনের কাজে আত্মনিয়োগ করে। এই আইনের মাধ্যমে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পুনর্গঠিত করা হয়। তাছাড়া, ঐ আইন বেসরকারী কলেজগুলির ওপর হস্তক্ষেপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস, ছাত্রদের শিক্ষাবেতন বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালকমণ্ডলীতে মনোনীত সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা সংকোচনের অধিকার সরকারের হাতে প্রদান করে।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিশ শতকের প্রথমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যায়। ১৮৬৮ সালে শক্তিশালী একটি আধুনিক জাতি হিসেবে জাপানের অভ্যুত্থান ভারতবাসীর মনে জাতীয় উন্মাদনার জোয়ার আনে। মাত্র পঞ্চাশ বছরেও কম সময়ের মধ্যে একটি শিল্পোন্নত ও শক্তিশালী সামরিক দেশ হিসেবে জাপানের আত্মপ্রতিষ্ঠা একথাই প্রমাণ করল যে, কোন পশ্চিমী রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায়

এশিয়ার একটি দেশ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে। তাই জাপান হয়ে উঠল ভারতবাসীর কাছে অনুকরণীয় আদর্শ স্বরূপ। তাই ১৮৯৬ সালে ইথিওপিয়ার হাতে ইতালির এবং ১৯০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করল যে, এশিয়ার জাতিগুলি ইউরোপীয় জাতিগুলি অপেক্ষা আদৌ হীনবল নয়। সর্বোপরি, আয়ারল্যাণ্ড, রাশিয়া, মিশর, তুরস্ক ও চীনের সাধারণ মানুষ তাদের মুক্তির জন্য যে-সংগ্রাম শুরু করেছিল, সেই সংগ্রামের বাণী ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। ভারতবাসী একথা উপলব্ধি করতে পারল যে, আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হলে প্রচণ্ডতম রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব।

লর্ড কার্জন ও বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা : উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে যখন অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল, ঠিক তখন ১৯০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর তদানীন্তন ভারত সচিব রিসলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাত দিয়ে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ প্রস্তাবে চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। বলা বাহুল্য, আন্দোলনমুখী উদীয়মান বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে না পারে, সেজন্য শাসকগোষ্ঠী, বিশেষত লর্ড কার্জন সুপরিকল্পিতভাবে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার মাধ্যমে পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে **রিসলের** উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন :

> বাংলার শক্তি তার একতায়। তাকে ভাগ করা হলে তার শক্তিকেও বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়া যাবে। আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হোল তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের উৎসকে দুর্বল ক'রে ফেলা।

পরবর্তী সময়ে **লর্ড হার্ডিঞ্জও** স্বীকার করেছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাতে 'বাঙালীকে আঘাত হানার ইচ্ছাই' ছিল সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা চেয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে জাতীয় চেতনাকে ধ্বংস ক'রে দিতে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র বাংলায় এর বিরুদ্ধে কয়েকশ' সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়। এমনকি, ১৯০৩ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে বাংলা থেকে তার ভূখণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করার বিরুদ্ধে তথা বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও প্রশাসনিক ঐক্যকে বিনষ্ট করার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু তদানীন্তন কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির রুদ্ধদ্বারে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে কার্যত নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। তাঁদের এই দুর্বল মনোভাবের সুযোগে ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কার্যকর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

❑ ২.৩.২ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের কর্মসূচী

বয়কট আন্দোলনের কর্মসূচী : স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব চরমপন্থীদের হাতে থাকায় 'স্বরাজ' অর্জনের উদ্দেশ্যে আবেদন-নিবেদন ও শাসন সংস্কারের দাবীর পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হয়। 'বয়কট' ও 'স্বদেশী' হোল এই আন্দোলনের দু'টি দিক। প্রথমটির উদ্দেশ্য হোল বিদেশী দ্রব্যের বর্জন এবং দ্বিতীয়টির মূল কথা হোল স্বদেশী পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার। ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদী শোষক গোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আঘাত হানার জন্য ম্যানচেস্টারে উৎপাদিত সর্বপ্রকার বিদেশী বস্ত্র বয়কটের যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, ক্রমে ক্রমে তা লবণ, চিনি, সিগারেট ও অন্যান্য বিলাতী পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' — গানটি স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। শুরু হয় স্বদেশী বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর ব্যবহার এবং বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। বিদেশী মদ্যদ্রব্যের দোকানের সামনে পিকেটিং চলতে থাকে। বয়কট আন্দোলনের কর্মীরা বিদেশী পণ্য বর্জন, বিদেশী ভাষা বর্জন, বিদেশী খেতাব বর্জন এবং আইনসভা ইত্যাদি থেকে পদত্যাগকে নিজেদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন। আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিধিও সম্প্রসারিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং উকিল-ব্যারিস্টাররা আদালত বয়কট করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের কর্মসূচী : বিদেশী দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠান বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের যেমন চেষ্টা করা হয়, তেমনি বিভিন্ন প্রকার স্বদেশী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশীয় কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠান, সাবান, চামড়া, ঔষধ প্রভৃতির কারখানা ইত্যাদি গড়ে উঠতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সরলা দেবী চৌধুরানী 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী দ্রব্যের একটি আড়ত খোলেন। অনুশীলন সমিতির তরুণ সদস্যরা 'বেঙ্গল স্টোর' এবং যোগেশ চৌধুরী 'ইণ্ডিয়ান স্টোর' নামে স্বদেশী দ্রব্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ও দমননীতির প্রতিবাদে গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি। ১৯০৮ সালের মধ্যে ২৫টি মাধ্যমিক ও ৩০০টি প্রাথমিক 'জাতীয়' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক ও মানবিক বিদ্যালয়গুলিকে জাতীয় ভাবধারায় পরিচালিত করাই ছিল এদের লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মুখার্জীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯০৬ সালের ১৪ই আগস্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষার্থীর মনে অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও দেশসেবার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি; দেশের ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের পরিব্যাপ্তি : ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়েছিল। ১৯০৫ সালের শেষে যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজের বিভিন্ন জেলায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। বোম্বাই-এ স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিলক ও তাঁর কন্যা কেটকার, এ. ভি. যোশী, এস. এম. পরাঞ্জপেই, বিষ্ণুগোপাল বিজাপুরকার এবং মহাদেব রাজারাম বোদাস। জয়পাল, রাম গঙ্গারাম, চন্দ্রিকা দত্ত ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পাঞ্জাবে এই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার, পি. আনন্দ চারলু, টি. এম. নায়ার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মাদ্রাজের আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উড়িষ্যায়ও সীমাবদ্ধভাবে হলেও এই আন্দোলন চলেছিল। এই সময় জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারলাভ করে। বাল গঙ্গাধর তিলক এবং লালা লাজপৎ রাই-এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ সালের মধ্যে যুক্তপ্রদেশ, বেরার, বোম্বাই ও মাদ্রাজে অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে মসলিপত্তনমে 'অন্ধ্র জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' নামে একটি জাতীয় কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

সরকারী অত্যাচার ও নিপীড়ন : সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার নিষ্ঠুরভাবে স্বদেশী আন্দোলন দমন করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর ফুলার গুর্খা সেনাবাহিনীর সাহায্যে সমগ্র পূর্ববঙ্গে সন্ত্রাস ও বিভীষিকার রাজ্য কায়েম করেছিলেন। লণ্ডনের **'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'** পত্রিকা লিখেছিল, ফুলারের অত্যাচার রাশিয়ার জারতন্ত্রের অত্যাচারকে ছাড়িয়ে গেছে। রাজদ্রোহের অপরাধে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ এবং 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। বিপিনচন্দ্র পাল ছ'মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রককে একাধিকবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। সর্বোপরি, ১৯০৮ সালে তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে **তিলক** লিখেছিলেন, ''দেশের শাসকদের চরিত্র যদি রুশ সরকারের মতো হয়, তাহলে দেশের লোকের পক্ষে রুশ-পদ্ধতির অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।'' এই তথাকথিত রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্য তিলকের ছ'বছরের জন্য কারাদণ্ড হয়। 'কাল' পত্রিকার সম্পাদক পরাঞ্জপেই-র ভাগ্যেও জুটল ঊনিশ মাসের কারাদণ্ড। মাদ্রাজের চিদাম্বরম পিল্লাই ও অন্ধ্রের হরিসর্বোত্তম রাও-কেও কারান্তরালে যেতে হোল। দমননীতির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য অরবিন্দ ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে স্বেচ্ছা-নির্বাসন গ্রহণ করলেন এবং রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ ত্যাগ ক'রে ধর্মের পথে পা বাড়ালেন। এইভাবে অসহনীয় দমন-পীড়ন চালিয়ে এবং সংবাদপত্র, জনসভা প্রভৃতির স্বাধীনতা খর্ব ক'রে সরকার স্বদেশী আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করতে সমর্থ হলেও বাংলার বিপ্লবী তরুণদের সংগ্রামী গতিপথ তারা রোধ করতে পারেনি। জন্মলাভ করল সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি, যা শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করার ঘোষণা করতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করেছিল।

❑ ২.৩.৩ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের শ্রেণী-চরিত্র

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের ঝড় বইতে শুরু করে। বাংলাদেশের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী, বিক্ষুব্ধ হিন্দু জমিদার ও তালুকদার গোষ্ঠী এবং তাদের মুখপাত্র হিসেবে শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গের ফলে দেশীয় শিল্প বিকাশের পথ সঙ্কুচিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে উদীয়মান ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী বিক্ষুব্ধ জমিদার গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তাই তাদের মুখপাত্র হিসেবে শিক্ষিত শহুরে মধ্যশ্রেণী বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এই মধ্যশ্রেণীই তাঁদের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামমুখী মনোভাবের জন্য 'চরমপন্থী' বলে পরিচিত হন। এঁদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রাই এবং বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ২৫-তম অধিবেশনে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কর্মপন্থা বলে ঘোষণা করা হয়। সুতরাং বলা যায়, দেশীয় ভূস্বামী গোষ্ঠী, বুর্জোয়া শ্রেণী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, উকিল-ব্যারিস্টার এবং বুর্জোয়াপন্থী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে একচেটিয়া ব্রিটিশ মূলধনের বিরুদ্ধে 'ব্রিটিশ পণ্য বর্জনরূপ' যে-অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে পরিচিত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক **উইলিয়াম ডুরান্ট** এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ১৯০৫ সাল থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছে অর্থাৎ, স্বদেশী আন্দোলনকে তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রথম ধাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

❑ ২.৩.৪ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

স্বদেশী আন্দোলন ও ভারতীয় পুঁজিবাদের বিকাশ : স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাগুলিও উপেক্ষণীয় নয়। **প্রথমত,** চরমপন্থী বলে পরিচিত যে-শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর হাতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল, তাঁরা ছিলেন ভারতীয় বুর্জোয়া ভূস্বামী গোষ্ঠীর প্রতিভূ এবং শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। তাই নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে তাঁরা যে-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান, তার দ্বারা কার্যত শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর কোন লাভ হয়নি; বরং, ঐ আন্দোলনের ফলে দেশীয় পুঁজিপতিরাই সর্বাধিক লাভবান হয়েছেন। এই আন্দোলনের পর বস্ত্রশিল্পে ভারতীয় পুঁজিপতিদের একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতীয়তাবাদের সঙ্গে হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার সমন্বয় সাধন : **দ্বিতীয়ত,** চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ নানা কারণে ইংরেজী ভাষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর বীতশ্রদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে প্রাচীন সনাতন হিন্দুধর্মকেই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁরা এই আন্দোলনের সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্মের মিশ্রণ ঘটান এবং তাকে 'হিন্দু স্বদেশী আন্দোলন' রূপে গড়ে তোলেন। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে কালী, দুর্গা প্রভৃতি হিন্দু দেবতাদের পূজা, জাতিভেদ, গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণের বিরোধিতা, বাল্য বিবাহের সমর্থন প্রভৃতি সনাতন হিন্দুধর্মের যাবতীয় কুসংস্কার এবং সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীলতা আসর জমিয়ে ফেলে। চরমপন্থী জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে প্রাচীন কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার সমন্বয় সাধিত হয়। এইভাবে বাংলা তথা ভারতের নতুন জাতীয়তাবাদ প্রাচীন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনমূলক 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' রূপে দেখা দেয়। এর ফলে বিপুল সংখ্যক মুসলমান এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায়। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী চরমপন্থীদের এই দুর্বলতার সুযোগে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের বীজ বপন করার সুযোগ পায়।

❑ ২.৩.৫ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্ব

তবে নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও স্বদেশী আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করে। এই আন্দোলন একদিকে যেমন কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের বন্ধ্যা নীতির অবসান ঘটায়, অন্যদিকে তেমনি ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে কিছুটা পরিমাণে শ্রমিক-কৃষককে সামিল করতে সমর্থ হয়। বোম্বাই ও পাঞ্জাবে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। ১৮৯৬ সালে তিলক মহারাষ্ট্রের কৃষকদের কর-বন্ধের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পাঞ্জাবে লাজপৎ রাই ও অজিত সিং-এর নেতৃত্বের ফলে দোয়াব অঞ্চলের কৃষক-আন্দোলন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ কৃষক সংগঠনের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে প্রধানত মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

অনুশীলনী - ১

■ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ কর।

২। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী 'স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন' সম্পর্কে আলোচনা কর। ঐ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাগুলি কী?

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। বয়কট আন্দোলনের কী কর্মসূচী ছিল?

২। স্বদেশী আন্দোলনের কী কর্মসূচী ছিল?

৩। স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্ব কী?

২.৪ নরমপন্থী ও চরমপন্থী রাজনীতি

১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'নিরাপত্তা কপাটক' হিসেবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব ঘটেছিল। জন্মের পর থেকে শুরু ক'রে প্রায় বিশ বছর ধরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার প্রতিষ্ঠাতাদের পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হয়েছিল। **রজনী পাম দত্তের** মতে, প্রথম যুগে কংগ্রেস উচ্চস্তরের বুর্জোয়াদের, বিশেষত তাঁদের মতাদর্শের প্রতিনিধি উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রতিষ্ঠান ছিল। তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি 'অবিচল শ্রদ্ধা ও আনুগত্য' প্রদর্শনের কথা বলতেন। ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করার পরিবর্তে তাকে জনপ্রিয় ক'রে তোলাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু ঊনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিশ্ব রাজনীতির কিছু কিছু পরিবর্তন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী রাজনীতির আবির্ভাবকে অবশ্যম্ভবী ক'রে তোলে। ঐ সময় দাদাভাই নৌরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, গোপলকৃষ্ণ গোখেল, ফিরোজশা মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নরমপন্থী রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ও কর্মসূচীকে চ্যালেঞ্জ ক'রে যে-চরমপন্থী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল, ঐ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লাল লাজপৎ রাই, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ।

❑ ২.৪.১ নরমপন্থী রাজনীতি

● ২.৪.১.১ নরমপন্থী রাজনীতির উৎস

নরমপন্থীরা রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তার অনুসারী ছিলেন। রামমোহন উপনিষদের বিশ্বজনীন, যুক্তিবাদী ও মানবিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে লক্, মঁতেস্কু, বেন্থাম প্রমুখের উদারনীতিবাদী চিন্তাধারার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই রামমোহন ব্রিটিশ শাসনকে 'ঈশ্বরের বিধান' বলে মনে করতেন। নরমপন্থীরাও রামমোহনের মতো ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ওপর মিল, হিউম, বেকন, বার্ক প্রমুখের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।

● ২.৪.১.২ নরমপন্থী রাজনীতির লক্ষ্য

রাজনৈতিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র ক'রে নরমপন্থীদের সঙ্গে চরমপন্থীদের তীব্র মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁদের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসকের সহযোগিতায় ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসন লাভ করা। বিবর্তনবাদী ও উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনে গভীর আস্থা থাকায় তাঁরা মনে করতেন যে, দীর্ঘদিন আইন পরিষদ, সরকারী প্রশাসন, জেলা বোর্ড ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাগুলিতে শিক্ষানবিশী ক'রেই কেবল রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করা সম্ভব। তাই ১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত বেনারস কংগ্রেস অধিবেশনে নরমপন্থীদের নেতৃত্বে যে-প্রস্তাব গৃহীত

হয়েছিল, তাতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনকে কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ঐ কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে ভাষণদানের সময় নরমপন্থী নেতা **দাদভাই নৌরাজী** ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে 'স্বরাজ' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

● ২.৪.১.৩ নরমপন্থী রাজনীতির কর্মসূচী

রাজনৈতিক লক্ষ্যগত ক্ষেত্রে নরমপন্থীদের সঙ্গে চরমপন্থীদের যথেষ্ট পার্থক্য থাকায় নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। চরমপন্থীদের মতোই নরমপন্থীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতকে শোষণ করার ব্রিটিশ নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** তাঁর 'এ নেশন ইন মেকিং' নামক গ্রন্থে তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারের উচ্চপদ থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করা হয়েছিল। তিনি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন যে, তারা ভারতীয়দের ভূমিদাস, কাঠুরে ও জলবহনকারীতে রূপান্তরিত করেছিল। **দাদাভাই নৌরাজী** তাঁর 'পোভার্টি অ্যাণ্ড আন্-ব্রিটিশ রুল ইন্ ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থে যে **'ধননিষ্কাশন'** তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন, তাতে ভারতীয়দের চরম দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে ইংরেজদের বল্গাহীন অর্থনৈতিক লুণ্ঠন নীতিকে দায়ী করা হয়। এতদসত্ত্বেও তাঁরা আবেদন-নিবেদন, আত্মপক্ষ সমর্থনে কৈফিয়ৎ প্রদান ও প্রতিবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁরা 'প্রয়োজনবোধে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা' এবং 'প্রয়োজনবোধে তাদের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতার নীতি' অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। **গোখেল** বলতেন, কেবল তদানীন্তন সময়ের জন্য নয়, ভবিষ্যতের জন্যও ব্রিটিশ শাসন প্রয়োজন। কারণ, চারিত্রিক শক্তি ও দক্ষতার দিক থেকে ভারতীয়দের তুলনায় ব্রিটিশরা অনেক বেশী উন্নত। এমতাবস্থায় প্রথমেই ভারতীয়দের চারিত্রিক শক্তি ও দক্ষতার উন্নতি সাধন প্রয়োজন। তাই তাঁরা চরমপন্থীদের বয়কট কর্মসূচীতে সমর্থন করতে পারেননি। নরমপন্থী নেতা **চিন্তামণি** মন্তব্য করেছিলেন যে, বয়কট হোল আকস্মিকভাবে ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক-ছেদ। তিনি এরূপ অবস্থাকে 'বাণিজ্যিক যুদ্ধ ঘোষণা' বলে বর্ণনা ক'রে এর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। বস্তুত, নরমপন্থীরা বাণিজ্যিক বয়কট-সহ সরকারী অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বয়কট করার বিরোধী ছিলেন। এমনকি, তাঁরা ধর্মঘট করার এবং ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার তীব্র বিরোধিতা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

● ২.৪.১.৪ নরমপন্থী রাজনীতির শ্রেণী-চরিত্র

প্রখ্যাত রুশ ইতিহাসবিদ **এ. এল. লেভ্‌কোভস্কি** ও **ই. এন. কোমারভ** নরমপন্থীদের শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের শক্তিবৃদ্ধি এবং ঔপনিবেশিক শোষণের মধ্যে নরমপন্থী বলে পরিচিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নরমপন্থার বিকাশের বিষয়গত উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন। নরমপন্থীরা ব্রিটিশ মূলধন ও ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। তাঁরা স্বদেশী মূলধনের বিস্তার ও উদ্যোগের ব্যাপারেও যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। ঐ দুই ইতিহাসবিদের মতে, **(১)** যেসব সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ক্রমবর্ধমান পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন এবং কৃষি উৎপাদনজাত লভ্যাংশ তেজারতীতে খাটিয়ে তার থেকে আর্জিত সুদ পুনরায় জমিতে

বিনিয়োগ করেছিলেন, তাঁরাই হলেন নরমপন্থী। **(২)** নরমপন্থীরা হলেন সেইসব ব্যক্তি, প্রথম দিকে যাঁরা বণিক ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে বাণিজ্য থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ জমিতে বিনিয়োগ করেছিলেন। **(৩)** পূর্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত সেইসব বুদ্ধিজীবী নরমপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁদের অধিকাংশই আইন ব্যবসায় ও সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং **(৪)** নরমপন্থীরা ছিলেন মূলত শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত বুর্জোয়া। তাই তাঁদের কাছে স্বদেশীর অর্থ ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

● ২.৪.১.৫ নরমপন্থী রাজনীতির প্রগতিশীলতা

নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও কুসংস্কারের অবসান চেয়েছিলেন। তাঁরা অসবর্ণ বিবাহ, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনাকে মৌলিক লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, বিভিন্ন আটক আইনের বাতিলকরণ প্রভৃতির দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন।

❑ ২.৪.২ চরমপন্থী রাজনীতি

● ২.৪.২.১ চরমপন্থী রাজনীতির উৎস

চরমপন্থীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের প্রভাবে অনেক বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাছাড়া, তাঁদের ওপর গীতার প্রভাবও অনস্বীকার্য। তাই বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি তাঁদের কাছে যেমন আদর্শ ছিল, তেমনি আদর্শ ছিলেন অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, রাণা প্রতাপ, শিবাজী ও লক্ষ্মীবাঈয়ের মতো বীর ও বীরাঙ্গনাগণ। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ **অমলেশ ত্রিপাঠী** বলেছেন, চরমপন্থায় বিশ্বাসী প্রায় সকলেই বিশ্বাস করতেন যে, গীতার মধ্যেই বৈদিক সংস্কৃতির সার নিহিত। প্লুটার্কের জীবনী পড়ে ফরাসী বিপ্লবের বীরেরা যেমন লিওনিডাস ও সিনসিনেটাসের মধ্যে আদর্শ খুঁজতেন, তেমনি চরমপন্থীরাও ভীষ্ম ও অর্জুনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁদের বহু আকাঙ্ক্ষিত নায়কদের। অন্যভাবে বলা যায়, নরমপন্থী চিন্তার উৎস পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত থাকলেও চরমপন্থী রাজনীতি ও রাষ্ট্রদর্শনের ভিত্তি হোল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের ধর্মশাস্ত্র, মহাকাব্য এবং দেশনায়ক।

● ২.৪.২.২ চরমপন্থী রাজনীতির লক্ষ্য

রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে চরমপন্থীদের অবস্থান ছিল নরমপন্থীদের বিপরীত মেরুতে। তিলক ও লাজপৎ রাই স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে তাঁদের মতামত জ্ঞাপন না করলেও 'স্বরাজ' অর্জনকে তাঁরা যে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, সে সম্পর্কে মতবিরোধের কোন অবকাশ নেই। তাই **তিলক** ঘোষণা করেছিলেন, ''স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার, আমি তা লাভ করবই।'' তিলকের স্বরাজ-সংক্রান্ত ধারণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে **অমলেশ ত্রিপাঠী** বলেছেন, তিলকের কাছে 'স্বরাজে'র অর্থ ছিল প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর পূর্ণ ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন, ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ নয়। কিন্তু বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের

'স্বরাজ' সম্পর্কিত ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক। **বিপিনচন্দ্র** যথার্থভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন কখনই প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন, স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্য কেবল আইন পরিষদের সম্প্রসারণ কিংবা সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণ নয়। একটি কোকিলের আকস্মিক কুহু রবে যেমন বসন্তের আগমন বার্তা ঘোষিত হয় না, তেমনি ইংরেজ সরকারের সিভিল সার্ভিসে একজন, একশ জন বা হাজার জন ভারতীয় নিযুক্ত হলেই সেই সরকার ভারতীয় হয়ে যাবে না। তাঁর দৃষ্টিতে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত দেশেই কেবল প্রকৃত স্বরাজ আসতে পারে। স্বরাজের প্রশ্নে **অরবিন্দ** আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী তুলেছিলেন। তাঁর কাছে 'স্বরাজে'র অর্থ ছিল 'পূর্ণ স্বাধীনতা'। তাঁর মতে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা হোল একটি জাতির প্রাণবায়ু। একে বাদ দিয়ে সামাজিক ও শিক্ষাগত সংস্কার, শিল্পের প্রসার, জাতির নৈতিক উন্নতি সাধনের প্রয়াস প্রভৃতি ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাঁর মতে, চরমপন্থীদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দাবীর সমালোচনা করে নরমপন্থী নেতা **গোখেল** বলেছিলেন, পাগলা গারদের বাইরে-থাকা পাগলরাই কেবল স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে বা বলতে পারেন। এখানেই চরমপন্থীদের সঙ্গে নরমপন্থীদের পার্থক্য।

● ২.৪.২.৩ চরমপন্থী রাজনীতির কর্মসূচী

চরমপন্থীরা নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিকে 'নিছক ভিক্ষাবৃত্তি' বলে সমালোচনা করতেন। তাঁদের কাছে বয়কট ছিল লক্ষ্য অর্জনের প্রধানতম হাতিয়ার। **তিলক** বয়কটকে 'একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার' হিসেবে বর্ণনা ক'রে ব্রিটিশদের সার্বিক বয়কটের জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে আয়ারল্যাণ্ড, জাপান ও রাশিয়ার অনুসৃত বয়কট পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৭ সালে তাঁর সম্পাদিত 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে'র সপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর কাছে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং বয়কট সমার্থক ছিল। ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে 'কর্মযোগীন্' প্রত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন যে, প্রশাসন প্ররিচালনায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত না হলে তারা সঙ্গত কারণেই এবং সর্বতোভাবে সরকারকে বয়কট করতে পারে। কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ইংরেজদের বিবেকবোধ জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়েছে দেখে তিনি শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদের পথ অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চরমপন্থীরা অর্থনৈতিক বয়কটকে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

বিদেশী দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠান বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে চরমপন্থীরা স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও স্বদেশী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরিকল্পিত 'স্বদেশী'র সঙ্গে নরমপন্থীদের 'স্বদেশী'র প্রকৃতিগত দিক থেকে পার্থক্য ছিল। নরমপন্থীরা স্বদেশী পণ্য সামগ্রীর ব্যাপক প্রসার চেয়েছিলেন। কারণ, তাঁদের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ অর্থনৈতিক প্রাধান্যমুক্ত ভারতীয় শিল্পের বিকাশ সাধন। তাঁরা শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের শর্ত হিসেবে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা পালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

কিন্তু চরমপন্থীরা স্বদেশী বলতে কেবল স্বদেশী পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন ও স্বদেশী প্রতিষ্ঠান স্থাপনকেই বোঝাতে চাননি, তাঁরা এটিকে দেখেছিলেন স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার একটি হাতিয়ার

হিসেবে। অন্যভাবে বলা যায়, চরমপন্থীরা স্বদেশীর বাণিজ্যিক দিকটিকে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন না। কারণ, স্বদেশীর ঐ দিকটিকে প্রধান বলে গ্রহণ করা হলে অর্থলোভী মানুষের কাছে স্বদেশীর মাধ্যমে স্বরাজ লাভের পরিবর্তে অর্থলাভই বড় হয়ে উঠবে বলে **অরবিন্দ** অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। তাই তিনি স্বদেশী বলতে জাতীয় আত্মসচেতনাতা ও জাতীয় ইচ্ছার বাস্তবায়ন এবং আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

স্বরাজ অর্জনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য চরমপন্থীরা বিদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। **ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়** কার্জনী আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলদীঘির গোলামখানা' বলে অভিহিত ক'রে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রিটিশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কটের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এরূপ আহ্বানের বিরোধিতা করার জন্য চরমপন্থীরা তাঁকে 'দেশদ্রোহী' বলে সমালোচনা করেছিলেন। নরমপন্থীরা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের বিরোধিতা না করলেও তাঁরা ব্রিটিশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কট করার জন্য চরমপন্থীরা যে-আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধাচারণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তবে একথা সত্য যে, নরমপন্থীরা শিক্ষা বিস্তারের জন্য পাশ্চাত্যের, বিশেষত ব্রিটেনের অনুকরণে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন।

কিন্তু চরমপন্থীরা পাশ্চাত্যের ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতির পরিবর্তে ভারতীয় ইতিহাস, প্রাচীন হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁদের মতে, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভারতীয়ত্বের সাধনা। **বিপিনচন্দ্র** বলেছিলেন, ''আমরা এতদিন উদ্ভিদবিদ্যা চর্চার সময় ওক্, এলন এবং বীচ্ বৃক্ষ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছি, কিন্তু উপেক্ষা করেছি আম্রকুঞ্জকে।'' নীল নদ উপত্যকা বিষয়ে তথ্য আহরণ করতে গিয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকা আমাদের ছাত্রদের কাছে অপরিচিত থেকে গেছে। লক্ষণীয় বিষয় হোল, বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনকেই জাতীয় শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন না। **বিপিনচন্দ্র** ও অরবিন্দ বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনকেই জাতীয় শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন না। 'জাতির ভাগ্য' গড়ে তোলাকেই বিপিনচন্দ্র এরূপ শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করতেন। আর, অরবিন্দ চেয়েছিলেন এমন এক ধরনের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, যা ভারতবর্ষকে তার বিস্মৃত চিন্তার সম্পদ ফিরিয়ে দেবে। বলা বাহুল্য, আধ্যাত্মিকতা ও রাজনীতির সংমিশ্রণে গড়ে-ওঠা চরমপন্থী রাজনীতি আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে অস্বীকার ক'রে জাতীয় শিক্ষার সম্প্রসারণের নামে কার্যত বৈদান্তিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

● ২.৪.২.৪ চরমপন্থী রাজনীতির শ্রেণী-চরিত্র

প্রখ্যাত রুশ ইতিহাসবিদ **লেভ্‌কোভস্কি** ও **কোমারভ** চরমপন্থীদের শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ,

(১) চরমপন্থীরা ছিলেন পাঁচমিশালী পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যাঁদের উদ্ভব ঘটেছিল ছোটখাটো ভূ-সম্পত্তির মালিক শ্রেণী এবং পুরোহিত বলে পরিচিত গ্রামীণ সমাজের মোটামুটিভাবে লেখাপড়া জানা মানুষদের মধ্যে থেকে।

(২) ছোটখাটো ব্যবসায় নিযুক্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের ফলে যাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

(৩) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে ক্ষুব্ধ স্বল্প মাইনের কেরাণী, শিক্ষক ও অধ্যাপকরা চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন।

(৪) জমি ও জীবিকাচ্যুত কারিগর ও হস্তশিল্পী সম্প্রদায়ও চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি ; এবং

(৫) কার্জনী শিক্ষানীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র সমাজের সেইসব প্রতিনিধি, যাদের সামনে ভদ্রভাবে জীবনযাপনের কোন সুযোগ ছিল না।

চরমপন্থী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকদের তালিকায় উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকজন বড় জমিদারের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এঁদের মধ্যে বাসানদার উপন্দ্রেনাথ সেন, জলাবাড়ীর বৈকুণ্ঠ বিশ্বাস ও প্রমথ বিশ্বাস, কলসকাঠির ব্রজকান্ত রায় প্রমুখের বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, উত্তরপাড়ার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কাঁথির দিগম্বর নন্দ প্রমুখের নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

● ২.৪.২.৫ চরমপন্থী রাজনীতির প্রতিক্রিয়াশীলতা

চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক দর্শনে মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা আসর জমিয়ে বসেছিল। তিলক একদিকে যেমন গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসবের আয়োজন এবং গো-রক্ষণী সভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি **'এজ্ অব্ কনসেন্ট বিল'**- এর বিরোধিতা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। অনুরূপভাবে, অরবিন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কার্যত হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত করেছিলেন। বস্তুত, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও গীতার প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধবের চিন্তা-ভাবনায় 'মাতৃ মতবাদ' যে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এইভাবে চরমপন্থীদের জাতীয়তাবাদ হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনবাদে পরিণত হওয়ার ফলে মুসলমানরা জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। বলা বাহুল্য, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা না হওয়া সত্ত্বেও চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতারূপী ফ্রাঙ্কেস্টাইনের জন্ম দিয়েছিল।

উপসংহার : নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করে যে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জঙ্গী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্রে নরমপন্থীদের তুলনায় চরমপন্থীদের ভূমিকা অনেক বেশী ইতিবাচক হলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে তাঁরা ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণার পরিপোষক। অন্যদিকে, উদীয়মান ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করায় তুলনামূলক বিচারে নরমপন্থীরা ছিলেন অনেক বেশী প্রগতিশীল। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **রজনী পাম দত্ত** যথার্থই বলেছেন যে, প্রথম যুগের কংগ্রেস-নেতারা কখনও প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তা-বিরোধী ব্রিটিশ শাসকদের অনুগত ভৃত্য ছিলেন না। বরং, তাঁরা ছিলেন ঐ সময়ের ভারতীয় সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শক্তির প্রতিনিধি।

● ২.৪.২.৬ চরমপন্থী রাজনীতির ব্যর্থতার কারণ

চরমপন্থী আন্দোলনের ব্যর্থতার পশ্চাতে যেসব কারণ ছিল, তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সঙ্গে চরমপন্থীদের তীব্র মতবিরোধ ঘটায় নরমপন্থীরা চরমপন্থীদের কঠিন কঠোর সমালোচনা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। কংগ্রেসের মধ্যে এরূপ অন্তর্বিরোধের সুযোগ গ্রহণ

করেছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার। অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল তারা। **(ক)** নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর ফুলার গোর্খা সেনাবাহিনীর সাহায্যে সমগ্র পূর্ববঙ্গে সন্ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। অন্যদিকে, **(খ)** রাজদ্রোহের অপরাধে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবাবন্ধব উপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। **(গ)** বিপিনচন্দ্র ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। (ঘ) যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রককে একাধিকবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। **(ঙ)** 'কাল' পত্রিকার সম্পাদক পরাঞ্জপেয়ী-র ভাগ্যেও জোটে ১৯ মাসের কারাদণ্ড। সর্বোপরি, **(চ)** 'কেশরী' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্য তিলকের ৬ বছরের কারাদণ্ড হয়। দমন-পীড়ন নীতির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য অরবিন্দ ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে স্বেচ্ছা-নির্বাসন গ্রহণ করেন এবং রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ ত্যাগ ক'রে ধর্মের পথে পা বাড়ান। এইভাবে অসহনীয় দমন-পীড়ন চালিয়ে এবং সংবাদপত্র, জনসভা প্রভৃতির স্বাধীনতা খর্ব ক'রে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার চরমপন্থী আন্দোলনের ধারাটিকে দুর্বল ক'রে দিতে সমর্থ হয়।

(২) কিন্তু সরকারী দমন-পীড়নেই চরমপন্থী আন্দোলনের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ নয়। চরমপন্থী আন্দোলন কার্যত প্রাচীন হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনমূলক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করলে মুসলমান সম্প্রদায় এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায়। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলন তার গতি হারিয়ে ফেলে।

(৩) চরমপন্থীরা রাজনৈতিক আন্দোলকে গজদন্ত মিনার থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করলেও তাঁদের আন্দোলন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী, কারিগর ও হস্তশিল্পী সম্প্রদায়, ছাত্র-সমাজের একাংশ এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অশিক্ষিত মানুষ এবং শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাবে চরমপন্থী আন্দোলনে গণ-আন্দোলন পরিণত হতে পারেনি। তাই এই আন্দোলনকে দমন করতে সরকারকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

(৪) প্রথম পর্যায় বয়কট আন্দোলন কিছুটা গতি লাভ করলেও পরবর্তী পর্যায়ে মাড়োয়ারী সম্প্রদায় তিলক ও খাপার্দের অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে বিলিতি দ্রব্য আমদানী করতে শুরু করে। তাছাড়া, স্বদেশী পণ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা সাধারণ মানুষকে বিলিতি দ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য করেছিল। আবার, রবীন্দ্রনাথ-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন না করায় ঐ আন্দোলনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল।

(৫) সর্বোপরি, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা বিষয়ে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের পরস্পর-বিরোধী অবস্থান এই আন্দোলনের ভিত্তিকে দুর্বল ক'রে দিয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে স্বদেশী ও বয়কটের কথা বলা যায়। বয়কট বলতে কী বোঝায়, কেবল ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট করা হবে কিনা, স্বদেশীর অর্থ কী, তা নিয়ে তিলক, লাজপৎ রাই, বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল।

উপরি-উক্ত কারণে চরমপন্থী আন্দোলন ব্যর্থতয় পর্যবসিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **অমলেশ ত্রিপাঠী** সঙ্গতভাবেই বলেছেন, ''রণহুঙ্কারের মধ্যে চরমপন্থী আন্দোলন শুরু হলেও তার অবসান হয়েছিল ব্যর্থতার ওমরানিতে।''

অনুশীলনী - ২

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১। নরমপন্থী আন্দোলনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।

২। চরমপন্থী আন্দোলনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ রচনা কর।

৩। নরমপন্থী ও চরমপন্থী রাজনীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলি বিশ্লেষণ কর।

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। নরমপন্থী আন্দোলনের লক্ষ্য কী ছিল?

২। নরমপন্থী আন্দোলনের কর্মসূচী কী ছিল?

৩। লক্ষ্যগত ক্ষেত্রে নরমপন্থীদের সঙ্গে চরমপন্থীদের কী কী মৌলিক পার্থক্য ছিল?

৪। আন্দোলনের কর্মসূচীগত ক্ষেত্রে নরমপন্থীদের সঙ্গে চরমপন্থীদের কী পার্থক্য ছিল?

৫। 'স্বদেশী' কর্মসূচীর ক্ষেত্রে নরমপন্থীদের সঙ্গে চরমপন্থীদের কী কী পার্থক্য ছিল?

৬। নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে কারা যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিলেন এবং কেন?

২.৫ সারসংক্ষেপ

১৮৮৫ সালে জন্মের পর থেকে শুরু ক'রে প্রায় বিশ বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার প্রতিষ্ঠাতাদের পরিকল্পিত পথে অর্থাৎ , আবেদন-নিবেদনের পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু ঊনিশ শতকের শেষ দিককার ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিশ্ব-রাজনীতির কিছু কিছু পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে স্বদেশী আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫-০৮)-এর পথে পা বাড়াতে বাধ্য করেছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ভারতীয়দের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ যেমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তেমনি সরকারী চাকুরির সুযোগও সীমিত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া, ইংরেজ ও ভারতীদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে ভারতবাসীর মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। আবার, কৃষক ও শ্রমিকরাও যথাক্রমে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিনীতি ও শ্রমনীতির ফলে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষের তদানীন্তন আর্থ-সামাজিক অবস্থার মতো রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল যথেষ্ট অগ্নিগর্ভ। লর্ড কার্জনের শাসনকালে কলকাতা পৌর আইন (১৮৯৯)-এর মাধ্যমে কলকাতা পৌরসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা হ্রাস, ভারতীয় সরকারী গোপনীয়তা সংশোধনী আইন প্রণয়ন (১৯০৩), বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪)-এর মাধ্যমে শিক্ষা-সংকোচন প্রভৃতি অনুসৃত হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে অসন্তোষের আগুন জ্বলতে শুরু করে। তাছাড়া, উনিশ শতকের শেষ ভাগে শক্তিশালী একটি আধুনিক জাতি হিসেবে জাপানের অভ্যুত্থান, ইথিওপিয়ার হাতে ইতালির এবং ১৯০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় ভারতবাসীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল।

এমতাবস্থায় ১৯০৫ লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়। শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনের কর্মসূচীর দু'টি দিক হোল বয়কট এবং স্বদেশী। বিদেশী পণ্য, ভাষা, খেতাব, আইনসভা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বয়কটের পাশাপাশি স্বদেশী দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন, স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রভৃতি চলতে থাকে। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোন পরিব্যাপ্তি লাভ করলে ব্রিটিশ সরকার অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়ে ঐ আন্দোলনকে স্তব্ধ ক'রে দেওয়ার চেষ্টা ক'রেও তার গতিরোধ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মূলত আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মসূচীকে কেন্দ্র ক'রে কংগ্রেসের মধ্যে দু'টি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এর একটি গোষ্ঠী নরমপন্থী এবং অপরটি চরমপন্থী গোষ্ঠী নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের ফলে ভারতীয় পুঁজিবাদের কিছুটা বিকাশ সাধিত হলেও শ্রমিক-কৃষকের কোন লাভ হয়নি। তাছাড়া, আন্দোলনের নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত চরমপন্থীদের হাতে যাওয়ার ফলে ঐ আন্দোলন কার্যত হিন্দু - পুনরুজ্জীবনমূলক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তথাপি বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্বকে কোনমতেই উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না।

২.৬ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ২.৩.১ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ২.৩.১ - ২.৩.৪ দ্রষ্টব্য।

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ২.৩.২ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ২.৩.২ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন - ২.৩.৫ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী - ২

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ২.৪.১ - ২.৪.১.৫ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ২.৪.২ - ২.৪.২.৫ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন - ২.৪ - ২.৪.২.৫ দ্রষ্টব্য।

■ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১ নং প্রশ্ন - ২.৪.১.২ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ২.৪.১.৩ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন - ২.৪.১.২ এবং ২.৪.২.২ দ্রষ্টব্য।

৪ নং প্রশ্ন - ২.৪.১.৩ এবং ২.৪.২.৩ দ্রষ্টব্য।

৫ নং প্রশ্ন - ২.৪.১.৩ এবং ২.৪.২.৩ দ্রষ্টব্য।

৬ নং প্রশ্ন - ২.৪.১.৫ এবং ২.৪.২.৫ দ্রষ্টব্য।

২.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

ESSAY-TYPE QUESTIONS

1. Give an account of the 'Swadeshi and Boycott movement' against the backdrop of partition of Bengal in 1905. What were the limitations of that movement?
2. Discuss, in brief, different trends of the *Swadeshi* movement in Bengal. What were its main limiations?
3. Analyse the factors leading to the 'Swadeshi movement' in Bengal and point out the major limitations of the movement.
4. Analyse the nature of moderate politics in India during the first decade of the last century.
5. Analyse the nature of extremist politics in India during the first decade of the last century. What were its limitations?
6. Analyse the basic differences between the moderates and the extremists.

SHORT ANSWER-TYPE QUESTIONS

1. What was the programme of the *Swadeshi* movement in Bengal?
2. What was the programme of the Boycott movement during the first decade of the 20th century?
3. What was the importance of the *Swadeshi* movement in Bengal?
4. What were the objectives of the moderates?
5. What were the programmes of the moderates?
6. What were the differences between the moderates and the extremists on the objectives of the *Swadeshi* and Boycott movements?

7. What were the differences between the modeates and the extremists on the programme of the anti-partition movement in Bengal during the first decade of the 20th century?
8. Between the moderates and extremists who were progressive and why?
9. What were the limitations of the extremists?

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

Argov, Daniel *Moderates and Extremists in the Indian National Movement, 1893-1920.*

Chandra, Bipan, Amalesh Tripathi and Barun De, *Freedom Struggle*.

Chandra, Bipan et al., *India's Struggle for Independence*.

Dutt, R. Palme, *India Today*.

Edwardes, Michael, *The Last Years of British India*.

Majumdar, R.C., *History of the Freedom Movement in India,* vol. III.

Namboodiripad, E. M. S., *A History of Indian Freedom Struggle*.

Sarkar, Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal*.

Sitaramayya, B. Pattabhi, *The History of the Indian National Congress*, vol. 1.

Tripathi, Amalesh, *The Extremist Challenge*.

গুহ, নলিনী কিশোর, *বাংলায় বিপ্লববাদ*।

চন্দ্র, বিপান, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে, *স্বাধীনতা সংগ্রাম*।

চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*।

ত্রিপাঠী, অমলেশ, *ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব*।

— , *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম*।

রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*।

— , *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড।

- o -

একক - ৩

(Unit - 3)

সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবান্দোলন

(National Armed Revolutionary Movement)

এককের গঠন-বিন্যাস

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ বিপ্লবান্দোলনের সূত্রপাত

৩.২ নামকরণ নিয়ে মতবিরোধ

৩.৩ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অবদান : বিপ্লবী সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়

৩.৩.১ পথম পর্যায় : বিশ শতকের প্রথম দশক

৩.৩.১.১ প্রথম পর্যায়ের বিপ্লবী-আন্দোলনের ত্রুটি

৩.৩.২ বিপ্লবী সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯১৪-১৯)

৩.৩.৩ বিপ্লবী সংগ্রামের তৃতীয় পর্যায় (১৯২০-২২)

৩.৩.৩.১ অসহযোগ আন্দোলনে জাতীয় বিপ্লবীদের যোগদান

৩.৩.৪ বিপ্লবী সংগ্রামের চতুর্থ পর্যায় (১৯২৩-৩১)

৩.৩.৪.১ বাংলার বিপ্লবীদের কার্যকলাপ

৩.৩.৪.২ উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের কার্যকলাপ

৩.৩.৫ বিপ্লবী সংগ্রামের পঞ্চম পর্যায় (১৯৩২-৩৮)

৩.৪ জাতীয় বিপ্লবান্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

৩.৫ উপসংহার : অবদান

৩.৬ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৩.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে দু'টি ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়। এগুলি হলো — (১) নরমপন্থী ও চরমপন্থী আন্দোলনের ধারা এবং (২) বিপ্লবান্দোলনের ধারা। মূলত বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে শুরু ক'রে বিপ্লবান্দোলনের ধারা অনেক চড়াই-উৎরাই অতিক্রম ক'রে তিরিশের দশকের একেবারে শেষ দিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিপ্লবীরা যোগদান করলে ঐ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বর্তমান এককে পাঠকদের সঙ্গে ঐ আন্দোলনের পরিচিতি ঘটানো হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রধানত পাঁচটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। বিশ শতকের শুরু থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্বের পরিব্যাপ্তি। এই পর্বটিকে 'হিংসা-নীতি'র পর্ব বা 'কাল্ট অব্ ভায়োলেন্স'-এর পর্ব বলে চিহ্নিত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে-প্রচেষ্টা বিপ্লবীরা চালিয়েছিলেন, তা দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত। বিপ্লবান্দোলনের তৃতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯২০ সাল থেকে এবং এর সমাপ্তি ঘটে ১৯২২ সালে গান্ধী কর্তৃক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নেওয়ার পর থেকে। চতুর্থ পর্বে বাংলার বিপ্লবীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি অংশ কংগ্রেসের মধ্যে থেকে বিপ্লবান্দোলন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হলেও অন্য অংশটি প্রত্যক্ষ অ্যাকশন নিতে শুরু করে। এই গোষ্ঠী 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি' নামে পরিচিত হয়। এই পর্বে ১৯২৪ সালে উত্তর ভারতের বিপ্লবীরা 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯২৮ সালে এর নতুন নাম রাখা হয় 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'। ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখের নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ অ্যাকশনমূলক কিছু কিছু কার্য সম্পাদিত হলেও এইচ. এস. আর. এ.-র সদস্যরা সমাজতন্ত্রের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই পর্বের পরিব্যাপ্তি বলে মনে করা হয়। বিপ্লবান্দোলনের সর্বশেষ পর্বের সূত্রপাত হয়েছিল মোটামুটিভাবে বিগত শতকের তিরিশের দশকটিতে। এই পর্বে জেলে থাকাকালীন অধিকাংশ বিপ্লবী মার্কসবাদে দীক্ষিত হন এবং অবশিষ্টরা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি রাজনৈতিক দলে যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৩৮-৩৯ নাগাদ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিপ্লবীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগদান করলে বিপ্লবান্দোলনের ইতি ঘটে।

৩.১ বিপ্লবান্দোলনের সূত্রপাত

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্বে পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের দু'টি ধারা সমান্তরালভাবে চলেছিল। এই দু'টি ধারা হলো — (১) কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত ধারা এবং (২) সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রামের ধারা। কংগ্রেসের দু'টি গোষ্ঠীর বাইরে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যে-ধারাটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল, তা সাধারণভাবে 'সন্ত্রাসবাদী' ধারা হিসেবে পরিচিত হলেও এই ধারাটিকে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী ধারা হিসেবে আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। বাংলার অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, উত্তর ভারতের হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (পরবর্তী সময়ের হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন) প্রভৃতি হলো এই ধারার প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন। বিপ্লবীরা কংগ্রেস-নেতৃত্বের ক্ষমতা দখলের রাজনীতি থেকে নিজেদের শত সহস্র যোজন দূরে সরিয়ে

রেখেছিলেন। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটানোর মাধ্যমে এইসব সংগঠন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব বলে মনে করত। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো — স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির আবির্ভাব ঘটেছিল বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়। কারণ, স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্বেই, বিশেষত মহারাষ্ট্র ও বাংলায় 'বিপ্লববাদী গুপ্ত সমিতি' গড়ে উঠেছিল। উদাহরণ হিসেবে সাভারকরের 'মিত্র মেলা', চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সোসাইটি ফর দ্য রিম্যুভাল অব্ অবসট্যাকল্স টু হিন্দু রিলিজিয়ন', প্রমথনাথ মিত্রের 'অনুশীলন সমিতি' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এমনকি, স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই অরবিন্দের বিপ্লবীমন্ত্রের দীক্ষাগুরু ঠাকুর সাহেব সমগ্র পশ্চিম ভারতের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি ১৯০২ সালে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি হিসেবে প্রকারকার্য চালিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত** বলেছেন, ''বিপ্লববাদ বঙ্গভঙ্গের দরুণ আক্ষেপের ফলে আবির্ভূত হয়নি। তা ছিল বাঙালীর উচ্চশিক্ষার ও রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশের ফলমাত্র। স্বদেশী আন্দোলন বিপ্লববাদের সৃষ্টি করেনি, বরং মফঃস্বলে তা বিপ্লবীদের দ্বারাই পরিচালিত ও পরিপোষকতা লাভ করত। বিপ্লববাদী সমিতিগুলির সাহায্য ও সহযোগিতার ফলেই স্বদেশী আন্দোলন গতিশীল হয়ে উঠেছিল।''

৩.২ নামকরণ নিয়ে মতবিরোধ

অনেকে জাতীয় বিপ্লবীদের (armed national revolutionaries) 'সন্ত্রাসবাদী' (terrorists), 'নৈরাজ্যবাদী' (anarchists), 'বিপ্লবী সন্তাসবাদী' (revolutionary terrorists) ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করেন। কিন্তু আমরা ঐসব দেশপ্রেমিকদের 'সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী' বলে অভিহিত করব। ব্রিটিশরাই জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁদের 'সন্ত্রাসবাদী', 'নৈরাজ্যবাদী' ইত্যাদি আখ্যা দেয়। এমনকি, গান্ধীও তাঁদের ঐসব বিশেষণে বিভূষিত করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হোল — ১৯১৮ সালের সিডিশন কমিটির রিপোর্টেও তাঁদের 'বিপ্লবী' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। বস্তুত, তাঁরা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি (terrorist method) অনুসরণ করলেও 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব্ দি সোশ্যাল সায়েন্সেস' (*Encyclopaedia of the Social Sciences*)-এ তাঁদের 'বিপ্লবী দল' (Revolutionary Party) বলা হয়েছে। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার ক'রে বলা যায়, প্রায় প্রত্যেকটি দেশে সমাজ-বিপ্লবের একেবারে প্রাথমিক বা অপরিণত পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। রাশিয়াতে নারদনিকরা এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। **লেনিন** এই পদ্ধতিকে ভ্রান্ত বলে চরম সমালোচনা করলেও একে রুশ বিপ্লবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করতেন।

৩.৩ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অবদান ঃ বিপ্লবী সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়

❑ ৩.৩.১ প্রথম পর্যায় ঃ বিশ শতকের প্রথম দশক

হিংসার মতবাদ (Cult of Violence) : কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ যখন নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করছিলেন, তখন জাতীয় বিপ্লবীরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আনয়নের জন্য হিংসাত্মক বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ঐ সময়কার জাতীয় বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর প্রভৃতির

নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা যখন কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব দখলের জন্য একে অপরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত, তখন ঐসব বিপ্লবী সংগঠন কংগ্রেসী রাজনীতির সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হয়ে সন্ত্রাসবাদী পথে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিল। অবশ্য অরবিন্দ, তিলক প্রমুখ চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বিপ্লবী সংগঠনগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বিপ্লবীরা ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিদ্রোহে'র নেতৃবৃন্দের সশস্ত্র সংগ্রামের কার্যাবলীর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা ঐ বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে মনে করতেন। মহারাষ্ট্রের **দামোদর হরি চাপেকর** ও **বালকৃষ্ণ চাপেকর** (চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত) হিন্দুদের কাছে এই আবেদন জানিয়েছিলেন যে, যেসব শত্রু হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করেছে, তাদের ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে হবে। তাঁরা একথাও বলেছিলেন যে, আমাদের দেশের নাম হিন্দুস্তান। তাই এখানে ইংরেজরা শাসন করে কীভাবে? প্রায় একই বক্তব্য সমকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ব্যক্ত করা হয়। উদাহরণ হিসেবে 'শোলাপুর সমাচার', 'সুধারক', 'কেশরী' প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। 'কেশরী' পত্রিকায় প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিলকের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ডকে হত্যা করা হয়। একইভাবে রাজনৈতিক হত্যার সপক্ষে মারাঠী সংবাদপত্র 'কল' ও 'দ্য পাইওনিয়ার মেল'-এ বিভিন্ন লেখালেখি প্রকাশিত হয়।

অনুরূপভাবে, বাংলায় ১৯০৫ সালে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্তকে প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে পড়লে জঙ্গী-জাতীয়তাবাদীরা ঘোষণা করেন যে, হিংসার প্রয়োগ ছাড়া এই কাজে সাফল্যলাভ করা অসম্ভব। তাঁরা বলেছিলেন যে, কেবল দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা আসতে পারে। তাই তাঁরা ইতালীয় ও ফরাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে হত্যার রাজনীতির মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করার পথে পা বাড়ান। বাংলার বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিল যে, ভারতীয়দের দৃষ্টিতে 'রাজদ্রোহ' কথাটির কোন অর্থই হয় না। কারণ, ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী যুদ্ধের অবস্থায় রয়েছে। তাই ব্রিটিশ শাসনের ওপর প্রতিটি আঘাতই হোল যুক্তিসঙ্গত। **'যুগান্তর'** পত্রিকায় একথাও লেখা হয়েছিল যে, ইউরোপীয়দের গুলি করার জন্য পেশীশক্তির প্রয়োজন নেই। বিপ্লবীরা জাপান, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায় বোমা তৈরীর পদ্ধতি শিক্ষালাভের জন্য বেশ কয়েকজন যুবককে প্রেরণ করেছিলেন বলে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী নরেন্দ্রনাথ গোঁসাই (পরবর্তীকালে রাজসাক্ষী হয়ে যান) জবানবন্দী থেকে জানা যায়। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান সোশ্যালিস্ট' প্রত্রিকার একটি সংখ্যায় (ডিসেম্বর, ১৯০৭) **শ্যামাজী কৃষ্ণ ভার্মা** লিখেছিলেন যে, সাধারণ নীতি হিসেবে ইউরোপীয় অফিসারদের থেকে ভারতীয় অফিসারদের বিরুদ্ধে রুশ-পদ্ধতি প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবীরা ইউরোপীয় ও ভারতীয় অফিসারদের হত্যা করতে শুরু করলেও প্রথমে তারা ভারতীয় অফিসারদের দিয়েই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।

বাংলায় অরবিন্দের লেখা 'ভবানী মন্দির' নামক পুস্তিকায় ধর্মের ভিত্তিতে বিপ্লবী হিংসার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যুবসমাজকে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। বস্তুত, 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' পত্রিকা খোলাখুলিভাবে হিংসার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে সরকারী ব্যাঙ্ক, সরকারী ট্রেজারী ও ধনশালী ব্যক্তিদের

ধন লুঠ করার কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছিল 'যুগান্তর' পত্রিকায়। এমনকি, **অ্যানি বেসান্ত** মন্তব্য করেছিলেন, ''ইংল্যাণ্ডেও রাজনৈতিক সংস্কার লাভের স্বীকৃত উপায় হোল হিংসা।'' তিনি অরবিন্দ ঘোষকে ম্যাৎসিনির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এইভাবে ভারতের বিপ্লবীরা রুশ নৈরাজ্যবাদীদের 'বোমার নীতি' (cult of the bomb) -র মধ্যে 'শিবের নীতি' অর্থাৎ , কাল্ট অব্ শিব বা ধ্বংসের নীতি অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং বলা যায়, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাস সৃষ্টি প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে **অরবিন্দ** বলেছেন :

> স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সরকারী মহলে ভয়ানক চাঞ্চল্য ও ভয়ের সৃষ্টি হয়, ফলে দমননীতি শুরু হয় ভীষণ; স্কুল- কলেজের ছেলেদের জরিমানা করা , বের ক'রে দেওয়া, জেলে পোরা, শাস্তি দেওয়া, এমনকি প্রকাশ্যে বেত মারা ইত্যাদি অত্যাচার যখন বেড়ে উঠল, তখন বিপ্লবীরা স্থির করল এর প্রতিবিধান চাই অর্থাৎ বিপ্লববাদ আস্তে আস্তে সন্ত্রাসবাদের রূপ নিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', বিবেকানন্দের রচনাবলী, গীতা প্রভৃতির গভীর প্রভাব পড়েছিল বিপ্লবীদের ওপর। তার প্রমাণ হিসেবে গীতা ছুঁয়ে ধ্বংসের দেবী কালীর সামনে শপথ গ্রহণ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যায়। তরুণ ও কিশোরদের বিপ্লবী দলে নিয়ে আসা হোত এবং শপথ গ্রহণের পর বিশেষ শিক্ষা প্রদান ক'রে তাদের অ্যাকশন নিতে পাঠিয়ে দেওয়া হোত। এইভাবে নিজেদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে অধিকাংশ বিপ্লবীই কিছু না-জেনেই এর জালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল।

● ৩.৩.১.১ প্রথম পর্যায়ের বিপ্লবী-আন্দোলনের ত্রুটি

বিশ শতকের প্রথম দশকের জাতীয় বিপ্লবীরা ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। তাই তাঁরা গণ-সংযোগের কোন চেষ্টাই করেনি। এটি ছিল তাঁদের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি। তাঁরা জনগণের পরিবর্তে একদল স্বদেশপ্রেমিক জঙ্গী কর্মীর ওপর নির্ভর ক'রে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া, বিপ্লবী কর্মীদের দলভুক্ত করার সময় হিন্দু দেবদেবীর সামনে শপথ গ্রহণ করানোর যে-রীতি প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল, তার ফলে মুসলমানরা বিপ্লবী আন্দোলনকে হিন্দুদের আন্দোলন বলে মনে ক'রে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সর্বোপরি, ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার পর কী ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চান, তার কোন সুস্পষ্ট রূপরেখা জাতীয় বিপ্লবীরা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারেননি। পেটি-বুর্জোয়াসুলভ রোমান্টিক মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটানোর স্বপ্ন দেখতেন। তাই তাঁদের আন্দোলন গণ-সমর্থন লাভ করেনি। তবে তদানীন্তন সময়ে কংগ্রেসের বন্ধ্যা রাজনীতির পরিবর্তে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলে সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবীরা যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে বিপ্লববাদীরা ভালভাবেই জানতেন যে, সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হবে না। আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত **বারীন্দ্রকুমার ঘোষ** ১৯০৮ সালের ৪ঠা মে তাঁর স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন, ''আমরা কখনই বিশ্বাস করিনি যে, রাজনৈতিক (গুপ্ত) হত্যা দ্বারা স্বাধীনতা আসবে। তবে আমাদের বিশ্বাস জন্মালো যে, জনসাধারণ এটা চাইছে।'' তিনি আরও বলেছিলেন যে, বিপ্লবীদের প্রকৃত লক্ষ্য হোল জাতীয় অভ্যুত্থান - সামগ্রিক

বিপ্লব। কিন্তু কেবল বিপ্লবের বাণী প্রচারের দ্বারা দেশকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। মানুষের মনে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মতো মনোবল জাগিয়ে তুলতে হবে। এই মনোবল জাগিয়ে তোলার জন্য বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদের পথে অগ্রসর হন।

অনুশীলনী - ১

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলায় হিংসার মতবাদ (Cult of Violence)-এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

২। বিশ শতকের প্রথম দশকে ভারতের সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবান্দোলনের ত্রুটিগুলি কী?

❑ ৩.৩.২ বিপ্লবী সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯১৪-১৯)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা : ১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রের পুণাতে দামোদর হরি চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার (চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত) অত্যাচারী প্লেগ অফিসার র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্টকে হত্যার মধ্য দিয়ে যে-সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন, তার বহ্নিশিখা ক্রমেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের কর্মীরা একের পর এক 'অ্যাকশন' নিতে শুরু করেন। তাঁদের ভয়ে ভীত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করার কথা এবং মর্লে-মিন্টো সংস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু লোভের টোপ দিয়ে বাংলার বিপ্লবীদের বশীভূত করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁরা তাঁদের নিজেদের পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। ইতোমধ্যে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বিপ্লবীরা এর সুযোগ গ্রহণ ক'রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চরম আঘাত হানার জন্য তৈরী হতে লাগলেন। ইংল্যাণ্ডের প্রতিপক্ষ জার্মানির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রে ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহ সঙঘটিত করার পরিকল্পনা করা হয়। সম্ভাব্য এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং রাসবিহারী বসু। রাসবিহারীর ওপর উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবের বিপ্লবী সংস্থাগুলিকে অধিকতর সংঘবদ্ধ করার এবং দেশীয় সৈন্যদের বিদ্রোহে সামিল করার দায়িত্ব ছিল। জার্মানদের সহায়তায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটিকে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীদের মধ্যে সংযোগ সাধন এবং জার্মান অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে তা বিতরণ করার দায়িত্ব ছিল যতীন্দ্রনাথের ওপর। যাঁরা জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, হেরম্বলাল গুপ্ত প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে বসে যতীন্দ্রনাথের কাজে সহায়তা করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ড. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ।

অন্যদিকে, রাসবিহারীর বিশ্বস্ত সহকর্মী রূপে কাজ করেছিলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেশ আচার্য প্রমুখ। রাসবিহারীর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহে যোগদানের উদ্দেশে গদর পার্টির হাজার হাজার কর্মী আমেরিকা থেকে স্বদেশের পথে পাড়ি দেন। পিংলে, বিনায়করাও কাপ্‌লে, কর্তার সিং প্রমুখ বিপ্লবী ভারতে ফিরেই

রাসবিহারীকে নেতৃপদে বরণ ক'রে নেন। ১৯১৫ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী সৈন্য-বিদ্রোহের দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু জনৈক কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতায় সরকার পূর্বাহ্নেই বিপ্লবের খবর পেয়ে যায়। তাই বিপ্লবীরা ২১ তারিখের পরিবর্তে ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহের দিন এগিয়ে নিয়ে আসন। কিন্তু বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পূর্বেই সরকার নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলকেই গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। রাসবিহারী ছদ্মবেশে জাপানে পালিয়ে যান। রাসবিহারীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও যতীন্দ্রনাথ সশস্ত্র বিদ্রোহের আশা পরিত্যাগ করেননি। তিনি জার্মান অস্ত্রশস্ত্র ভর্তি 'ম্যাভারিক' ও 'হেনরী এস্' নামক দু'টি জাহাজের অপেক্ষায় বিনিদ্র রজনী যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু জার্মান জাহাজ এসে পৌঁছলো না। এদিকে তাঁদের খবর পেয়ে টেগার্ট, ডেনহাম, বার্ড প্রমুখের নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী বালেশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বুড়িবালামের তীরে প্রচণ্ড সংঘর্ষে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী প্রাণ হারান, অন্যরা গ্রেপ্তার হন। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহের যে-আয়োজন করা হয়েছিল, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

❑ ৩.৩.৩ বিপ্লবী সংগ্রামের তৃতীয় পর্যায় (১৯২০-২২)

● ৩.৩.৩.১ অসহযোগ আন্দোলনে জাতীয় বিপ্লবীদের যোগদান

অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য বিপ্লবীদের প্রতি গান্ধীর আহ্বান : ১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর 'রাজকীয় ক্ষমা প্রদর্শনে'র ফলে ১৯২০ সাল নাগাদ ভারতরক্ষা আইনে যেসব বিপ্লবী ও রাজনৈতিক বন্দীকে আটক রাখা হয়েছিল, তাঁরা মুক্তিলাভ করেন। কারান্তরালের বাইরে এসে তাঁরা যখন ইতিকর্তব্য স্থির করতে পারছিলেন না, সেই সময় গান্ধী তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। কিন্তু হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নে গান্ধীর সঙ্গে তাঁদের তীব্র মতপার্থক্য ছিল। গান্ধী ছিলেন অহিংসার পূজারী। অপরদিকে, অহিংসা নীতির ওপর বিপ্লবীদের আদৌ আস্থা ছিল না। অনুশীলন সমিতি ব্যক্তিহত্যা বা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের রাজনীতির পরিবর্তে তখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষপাতী ছিল। অনুশীলন বিপ্লবীদের মতোই যুগান্তর এবং উত্তর ভারতের বিপ্লবীরা গান্ধীর অহিংসা নীতিকে কোনমতেই মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁরা এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন চাইছে এবং গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণ 'হিংসা' নীতির প্রতি বিরূপ মনোভাবও পোষণ করছে। এমতাবস্থায় বিপ্লবীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। সর্বোপরি, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সশস্ত্র বিপ্লবীদের তাঁদের কর্মপন্থা সম্পর্কে নতুন ক'রে ভাবিয়ে তোলে। গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আসবে — এমন কোন আশা না ক'রে বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের বিপ্লবী কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে গান্ধীর আন্দোলনে যোগদানের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন।

অপরদিকে, গান্ধীও বুঝেছিলেন যে, বিপ্লবীদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া ভারতে, বিশেষ বাংলা ও উত্তর ভারতে তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কখনই সাফল্যলাভ করতে পারবে না। সেজন্য তিনি ১৯২০ সালের ১১ই আগস্ট 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকাতে তাঁর শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনকে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য বিপ্লবীদের আহ্বান জানান। বিপ্লবীরা যখন তাঁদের মতাদর্শের সঙ্গে গান্ধীর অহিংসা নীতিকে

মেলাতে পারছিলেন না, তখন **গান্ধী** তাঁদের উদ্দেশে বলেন, ''অহিংসাকে নীতি বা কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমি এই শয়তান সরকারকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর।'' ১৯২০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর কলকাতার কুমারটুলি পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন যে, অহিংসা তাঁর নীতি হলেও এই সরকারের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য তিনি হিংসাকে স্বাগত জানাতেও দ্বিধা করবেন না। অবশ্য হিংসা একাজে সাফল্য অর্জন করবে — এই শর্তে তিনি তাঁকে স্বাগত জানাবেন। ১৯২০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকার এক জনসভায় তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

গান্ধীর আন্দোলনে বিপ্লবীদের যোগদান : গান্ধীর এইসব বক্তব্য সশস্ত্র বিপ্লবীদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের ব্যাপারে নতুন ক'রে চিন্তার সুযোগ ক'রে দেয়। অনুশীলনী সমিতি এবং যুগান্তর দলের অধিকাংশ সদস্যই গান্ধীর আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তবে একথা সত্য যে, যুগান্তর-বিপ্লবীরা অনুশীলন-বিপ্লবীদের আগেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধী কর্তৃক রচিত অসহযোগ আন্দোলনের খসড়া প্রস্তাবে কেবল 'খিলাফত' ও 'পাঞ্জাব অন্যায়ে'র প্রতিকারের জন্য অসহযোগ আন্দোলন করা হবে বলে ঘোষণা করা হলে যুগান্তর বিপ্লবীরা এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস অধিবেশন শুরু করলেও অহিংসা নীতি এবং আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁদের আপত্তি রয়েছে। খসড়া প্রস্তাবে অহিংস অসহযোগের লক্ষ্য হিসেবে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার দাবী সংযোজন করার জন্য তাঁরা কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানান। তাঁদের দাবীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি ক'রে শেষ পর্যন্ত বিজয় রাঘবাচারী ও মতিলাল নেহরু গান্ধীকে তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে 'স্বরাজের দাবী' অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করলে তিনি তা মেনে নেন। সুতরাং বলা যায়, 'স্বরাজ' অর্জনকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা ক'রে কলকাতা কংগ্রেসে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাঁর পেছনে যুগান্তর-বিপ্লবীদের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু যুগান্তর-বিপ্লীদের মতো অনুশীলন-বিপ্লবীরা গান্ধীর আন্দোলনে যোগদানের ব্যাপারে অত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ, অনুশীলন সমিতির কর্মক্ষেত্রের পরিধি কেবল বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁরা গান্ধী-আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-রূপটির প্রতি আকৃষ্ট হলেও ঐ আন্দোলনের অহিংস প্রকৃতির সঙ্গে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শকে কোনমতেই মেলাতে পারছিলেন না। ঐ সময় সমিতির অবিসংবাদিত নেতা পুলিন দাস অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করার এবং গণ-সংযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশে 'ভারত সেবক সঙ্ঘ' গঠন করেন। সঙ্ঘের সভাপতি ও সহ-সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে পুলিন দাস ও নরেন্দ্রনাথ সেন। গান্ধী একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পুলিন দাস তথা অনুশীলন সমিতির সমর্থন ছাড়া বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন কখনই সাফল্যলাভ করতে পারবে না। তাই নাগপুর কংগ্রেসের পর গান্ধীর পরামর্শক্রমে চিত্তরঞ্জন তাঁর নিজের বাড়ীতে গান্ধীর সঙ্গে পুলিন দাসের বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। গান্ধী পুলিন দাসকে অহিংসার যৌক্তিকতা সম্পর্কে বোঝাতে ব্যর্থ হন। পুলিন দাস তাঁর 'ভারত সেবক সঙ্ঘে'র মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু অনুশীলন সমিতির নেতৃবৃন্দ একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, গান্ধীর আন্দোলন যেহেতু ক্রমে ক্রমে গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হচ্ছে, সেহেতু ঐ আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকা তাঁদের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার সামিল হবে। শেষ পর্যন্ত পুলিন দাসকে এড়িয়ে অনুশীলন সমিতির নেতা ও সদস্যরা অসহযোগ আন্দোলনে

ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অনুরূপভাবে, উত্তর ভারতে চন্দ্রশেখর আজাদ, বিষ্ণুশরণ দুবলিস, রামদুলারি ত্রিবেদী, রোশন সিং, মন্মথনাথ গুপ্ত প্রমুখ বিপ্লবীর রাজনৈতিক জীবনই শুরু হয়েছিল ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে। এঁরা ছাড়াও যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী, ভগৎ সিং, শুকদেব, যতীন দাস, ভাগবতী চরণ ভোরা, যশপাল, শিব ভার্মা, গয়াপ্রসাদ ও জয়দেব কাপুরও গান্ধীর আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

গান্ধীর আন্দোলনে বিপ্লবীদের যোগদানের কারণ : উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর ও উত্তর ভারতের বিপ্লবীরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন বলেই গান্ধীর আন্দোলন অনেক বেশী গতি লাভ করেছিল। বিপ্লবীরা প্রধানত তিনটি কারণে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। এগুলি হল :

(১) কংগ্রেসের মধ্যে থেকে পুনরায় নিজেদের সংগঠিত করা;

(২) ভবিষ্যতে বিপ্লবী কার্যকলাপ চালানোর জন্য জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ , জনসংযোগ গড়ে তোলা এবং

(৩) গান্ধী অহিংসা নীতি ও অহিংস আন্দোলন পদ্ধতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করা।

বাংলায় অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী হিসেবে কাজ করলেও বিপ্লবীরা মুহূর্তের জন্যও তাঁদের উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হননি। তাই তাঁরা, বিশেষত যুগান্তর-বিপ্লবীরা বিভিন্ন স্থানে আশ্রম ও মঠ গড়ে তুলে জনসংযোগ স্থাপনের জন্য ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে বরিশালে 'শঙ্কর মঠ', খুলনা জেলার দৌলতপুরে 'সত্যাশ্রম', চট্টগ্রামের 'সাম্যাশ্রম', বহুড়াতে 'গণমঙ্গল আশ্রম', বাঁকুড়াতে 'অমর কানন' প্রভৃতি গড়ে ওঠে। আবার, বিপ্লবীরা কংগ্রেসে যোগদান করার ফলে ব্রিটিশ পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে পেরেছিলেন। কারণ, তখন তাঁরা অহিংস আন্দোলনের অহিংস কর্মী। সর্বোপরি, গান্ধীর আন্দোলন চলাকালে বিপ্লবীরা তাঁদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা সত্ত্বেও ১৯২২ সালে গান্ধী চৌরিচৌরায় হিংসার অজুহাতে আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অহিংসা সম্পর্কে বিপ্লবীদের বক্তব্যই ছিল সঠিক। সুতরাং বলা যায়, বিপ্লবীদের পূর্বোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যই মোটামুটিভাবে সাফল্যলাভ করেছিল। **গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টেও** একথা স্বীকার করা হয়েছে। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী :

> The terrorists who have been interned under the Defence of India Act and many who had been convicted for specific offences were released as a result of the amnesty which followed the Royal Proclamation of December 1919. They took advantage of the non-violent non-co-operation movement to reorganise their scattered forces. They joined the movement with that very object and many of them became organisers of bodies of volunteers for non-co-operation activities and recruited many of the volunteers as terrorists. ... In Bengal this section ... succeeded in capturing a large number of seats on the executive committees of the various Distirct

Congress organisations and became represented in the Bengal Congress Executive Committee and the All-India Congress Committee. They made several attempts to commit the Bengal Congress Committee a violent programme.

বড়লাট **লর্ড রিডিং**-ও মন্তব্য করেছিলেন যে, ১৯২০-২২ সালের মধ্যে কংগ্রেসীর ছদ্মবেশে বিপ্লবীরা তাদের নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে, ভবিষ্যৎ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা নিজেদের অনুগামী তৈরী করেছে এবং নিজেদের সংগঠনকে অনেক বেশী মজবুত ক'রে তুলতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুত, ১৯২২ সালের জুন মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের অন্তত আটটি জেলা কংগ্রেস কমিটি বিপ্লবীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রাধীনে চলে আসে এবং তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিপ্লবী স্থান পেয়েছিল। এইভাবে গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম না হলেও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ক'রে বিপ্লবীরা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অনুশীলনী - ২

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। ১৯২০-২২ সালের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বিপ্লবীরা কেন যোগদান করেছিলেন?

২। গান্ধী কর্তৃক পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-২২) বাংলার অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর কেন যোগদান করেছিল?

❑ ৩.৩.৪ বিপ্লবী সংগ্রামের চতুর্থ পর্যায় (১৯২৩-৩১)

● ৩.৩.৪.১ বাংলার বিপ্লবীদের কার্যকলাপ

বিপ্লবীদের স্বরাজ্য দলে যোগদান : ১৯২২ সালে চৌরিচৌরা ঘটনার পর চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হওয়ার পর অনুশীলন ও যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা তাতে যোগদান করেন। গয়া কংগ্রেসের পর বাংলাদেশে ফিরে এসে চিত্তরঞ্জন সুভাষ বসুর মাধ্যমে যুগান্তরের সঙ্গে এবং শ্রীশ চ্যাটার্জীর মাধ্যমে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি একথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বাংলাদেশে বিপ্লবীদের বাদ দিয়ে কংগ্রেসের কোন কর্মসূচীই সাফল্যলাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে, বিপ্লবীরাও জানতেন যে, চিত্তরঞ্জন তাঁদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাছাড়া, অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর দেশের মধ্যে যে-হতাশা দেখা দিয়েছিল, তাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য সাময়িকভাবে হলেও স্বরাজ্য পার্টির কর্মসূচী গ্রহণযোগ্য বলে তাঁদের মনে হয়। তাই প্রথমে যুগান্তর এবং পরবর্তী সময়ে অনুশীলন সমিতি স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করে। বাংলাদেশে স্বরাজ্য পার্টির সাফল্যের মূলে ছিল বিপ্লবীদের নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টা। চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য পার্টির প্রধান মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' (Forward) পত্রিকার সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও ম্যানেজারের পদে যথাক্রমে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার ও মনোমোহন ভট্টাচার্যকে নিয়োগ করেছিলেন। ঐ তিন

জনই ছিলেন যুগান্তর দলের নেতা। 'ফরওয়ার্ড' ছাড়াও 'বিজলী', 'আত্মশক্তি', 'সারথি' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে বিপ্লবীরা স্বরাজ্য পার্টির সমর্থনে প্রচারকার্য চালাতেন। ১৯২৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে বিপ্লবীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্বরাজ্য পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র যথাক্রমে মেয়র ও প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা (Chief Executive Officer) হিসেবে নির্বাচিত হন। ওই সময়ে অনেক বিপ্লবীকে তাঁরা কর্পোরেশনে চাকরি দেন।

বিপ্লবীদের কার্যকলাপের প্রশ্নে গান্ধীর সঙ্গে স্বরাজ্যপন্থীদের বিরোধ : বিপ্লবীদের সঙ্গে স্বরাজ্য পার্টির এমন গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলেন যে, ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে আর্নেস্ট ডে-র হত্যাকারী বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা-র সাহস ও দেশপ্রেমের প্রশংসা ক'রে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র ক'রে গান্ধীর সঙ্গে স্বরাজ্য দলের নেতৃবৃন্দের চরম বিরোধ বাধে। ১৯২৪ সালের ৩রা জুলাই **গান্ধী** তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় স্বরাজ্য দলের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে লেখেন যে, যাঁরা গোপীনাথ সাহা-র প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তাঁদের দর্শনে রাজনৈতিক হত্যার স্থান আছে। গান্ধীর এই কথায় সরকার পক্ষের ধারণা দৃঢ়তর হোল যে, বাংলাদেশে স্বরাজ্য পার্টি এবং যুগান্তর অভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থা মাত্র। এর পর ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর একটি অর্ডিন্যান্স জারি ক'রে সরকার স্বরাজ্য পার্টি এবং অনুশীলন ও যুগান্তর দলের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে। যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, অনিলবরণ রায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অমর ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র চৌধুরী, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন।

গান্ধী-চিত্তরঞ্জন আপস : কিন্তু বিপ্লবীদের সঙ্গে স্বরাজ্য পার্টির নেতা চিত্তরঞ্জনের এই মধুর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ মিটে যাওয়ার পর ১৯২৫ সালে ফরিদপুর সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন বিপ্লবীদের হিংসাত্মক কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা করেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে ভারতীয় জনগণের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। এর পরে জাতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের বিরোধ শুরু হয়। তবে স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত ক'রে বিপ্লবীরা নিজেদের যেমন ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তেমনি জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এদিক থেকে তাঁদের অনুসৃত কৌশল কিছুটা সাফল্যলাভ করেছিল বলে মনে করা হয়।

বিপ্লবী ও বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সমঝোতা এবং পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপনে বিপ্লবীদের ভূমিকা : পরবর্তী সময়ে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতীয় বিপ্লবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিপ্লবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কংগ্রেস - নেতৃবৃন্দের সহায়তায় আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম চালাবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। বাংলাদেশে এই উদ্দেশ্যে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাঁরা 'কংগ্রেস কর্মী সঙ্ঘ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। পুলিশের গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কর্মী সঙ্ঘের বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একটি বোঝাপড়া হয় যে, তাঁরা তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে পরিচালনা করবেন। ঐ কর্মী সঙ্ঘের প্রচেষ্টার ফলে জওহরলাল নেহরু ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি তুলেছিলেন। অনুরূপভাবে, বিপ্লবীদের প্রচেষ্টাতেই সর্বপ্রথম 'স্বাধীনতা সঙ্ঘ' (Independence Leauge) গঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সঙ্ঘকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার উদ্দেশে সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু, কিরণশঙ্কর রায়, জে. এম. সেনগুপ্ত, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার

প্রমুখ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় বামপন্থী নেতৃবৃন্দকে এর দায়িত্বশীল পদ প্রদান করা হয়। স্বাধীনতা সঙ্ঘের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জোরালোভাবে উপস্থিত করা হয়। ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবের সংশোধনী হিসেবে সুভাষচন্দ্র যে-পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তার নেপথ্যে জাতীয় বিপ্লবীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কলকাতা কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সভায় গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, আয়েঙ্গার প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবৃন্দের এই আপসরফা হয় যে, তাঁরা গান্ধীর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবটির বিরোধিতা করবেন না। কিন্তু জাতীয় বিপ্লবীরা বামপন্থী নেতৃবৃন্দের এই আপসকামী মনোভাব মেনে নিতে পারলেন না। তাঁরা বাংলার প্রতিনিধিদের জন্য নির্ধারিত ক্যাম্পে এ ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র গান্ধীর প্রস্তাবের বিরোধিতা ক'রে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব সংশোধনী আকারে উত্থাপন করেন। সুভাষচন্দ্র বসু নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। এর পর সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বিরোধ শুরু হলে বাংলার দু'টি প্রধান বিপ্লবী দল এই বিরোধে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা সুভাষচন্দ্রকে এবং অনুশীলন সমিতি সেনগুপ্তকে সমর্থন করেন। ফলে বিপ্লবী শক্তি কার্যত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র কর্তৃক আনীত 'সমান্তরাল সরকার' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত হয়। কংগ্রেসের গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বে নিজেদের জড়িয়ে ফেলার জন্য উভয় গোষ্ঠীর তরুণ কর্মীরা পুরাতন নেতৃত্বের সমালোচনা ক'রে পুনরায় সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই গোষ্ঠী 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি' (New Violence Party) নামে পরিচিত হয়।

আইন অমান্য আন্দোলনে বিপ্লবীদের যোগদান : ১৯৩০ সালে গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার পশ্চাতে জাতীয় বিপ্লবীদের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লবী-আন্দোলনের ভয়ে গান্ধী ভীত হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিপ্লবীরা জাতির সম্মুখে 'একটি বিকল্প নেতৃত্ব' (an alternative leadership) তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। বিপ্লবীদের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার জন্য তিনি দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। ১৯৩০ সালের ২রা মার্চ বড়লাটকে লিখিত একটি পত্রে গান্ধীর এই মনোভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছিলেন যে, দেশের মধ্যে হিংসাত্মক কর্মপন্থায় বিশ্বাসী দল ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে। তিনি অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের সংগঠিত হিংসা এবং হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী দলের অসংগঠিত হিংসাকে প্রতিরোধ করতে চান। এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকার অর্থ উভয় হিংসাকে বাড়ার সুযোগ ক'রে দেওয়া। এ প্রসঙ্গে **গান্ধীর** নিজের মন্তব্য হোল :

> ... the party of violence is gaining ground and making itself felt ... It is my purpose to set in motion that force as well against the organised violent force of the British rule as against the unorganised violent force of the growing party of violence. To sit still would be to give reign to both the forces above mentioned.

যাই হোক্, গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের কর্মীরা তাতে যোগদান করেন। তবে এই সময় সুভাষ-সেনগুপ্তের নেতৃত্বাধীন 'বঙ্গীয় আইন অমান্য পর্ষদ' (Bengal Council

of Civil Disobedience) এবং সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন 'আইন অমান্য কমিটি' (Civil Disobedience Committee)। প্রথমটির সভাপতি ছিলেন খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশচন্দ্র সামন্ত এবং দ্বিতীয়টির সভাপতি ছিলেন যুগান্তর দলের অন্যতম প্রধান নেতা পূর্ণচন্দ্র দাস। অনুশীলন সমিতির সদস্যরা 'বঙ্গীয় আইন অমান্য পর্ষদে'র অধীনে এবং যুগান্তর দলের কর্মীরা 'আইন অমান্য কমিটি'তে যোগদান ক'রে বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলনকে সফল করার চেষ্টা করেন। ঐ সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে যুগান্তর-বিপ্লবীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালিত করার কাজে তাঁদের অধিক পরিমাণে আত্মনিয়োগ করতে হয়। পূর্ণচন্দ্র দাস, হরিকুমার চক্রবর্তী, জীবনলাল চ্যাটার্জী ও অশ্বিনী গাঙ্গুলী একের পর এক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন এবং আইন অমান্য ও লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। যুগান্তের দলের অন্যতম নেতা সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কংগ্রেসের সরকারী সংগঠনকে পেছন থেকে পরিচালনা করতেন। বাংলাদেশের এই দু'টি বিপ্লবী দলের ছাত্র-সংগঠনগুলিও আইন অমান্য আন্দোলনে সামিল হয়। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর ছাড়াও সূর্য সেনের নেতৃত্বাধীন চট্টগ্রাম গোষ্ঠী এবং হেমচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' (BV)-ও গান্ধীর - আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম বিপ্লবী গোষ্ঠীর নেতা সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সভপতি ছিলেন এবং অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন প্রমুখ বিপ্লবী ছিলেন এর সদস্য। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের কংগ্রেস-নেতৃত্ব পুরোপুরি এই গোষ্ঠীর হাতেই ছিল। অনুরূপভাবে, বি. ভি.-র সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষও ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশক কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সম্পাদক। ১৯৩০ সালে 'ছাত্র সমাজের প্রতি আবেদন' (To the Students of Bengal) নামে একটি প্রচারপত্রে তিনি বাংলাদেশর ছাত্রসমাজকে লাঠি, বুলেট, বেয়নেট প্রভৃতি উপেক্ষা ক'রে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। এইভাবে প্রধানত বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন সাফল্যলাভ করতে পেরেছিল।

বিপ্লবীদের দ্বৈত - নীতি অনুসরণ : প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের বিপ্লবী দলগুলি ঐ সময় একই সঙ্গে কংগ্রেস আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তারা বাহ্যত কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করলেও একথা মনে করত যে, গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস গণ- আন্দোলনকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হবে না। মধ্যপথে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আপসরফা ক'রে গান্ধী অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় রেখে আন্দোলনের ইতি টানবেন। ওই সময় প্রয়োজন হবে বিপ্লবী কার্যকলাপের। বিপ্লবী গোষ্ঠীর অনেকে আবার কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে থেকে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে যুগান্তরের সূর্য সেন-গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ১৯৩১ সালে আন্তঃ-প্রাদেশিক অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে, বি.ভি.-র নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী 'অ্যাকশন' চলতে থাকে। বিপ্লবীদের হাতে একের পর এক সিম্পসন, পেডী, গার্লিক, স্টীফেন্স, ডগলাস, বার্জ প্রমুখ উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী প্রাণ হারান। এইভাবে বাংলার বিপ্লবীরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনার সময় অহিংস ও সহিংস উভয় পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন।

● ৩.৩.৪.২ উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের কার্যকলাপ

হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও তার প্রকৃতি : বাংলাদেশের জাতীয় বিপ্লবী দলগুলি যখন কংগ্রেসের মধ্যে থেকে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছিলেন, তখন উত্তর ভারতের বিপ্লবীরা ১৯২৪ সালে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (Hindustan

Republican Association) গঠন ক'রে কংগ্রেস-নিরপেক্ষভাবে বিপ্লবী কার্যধারা অনুসরণ করতে থাকেন। গান্ধীর অহিংসা নীতির প্রতি তাঁদের কোনও মোহ ছিল না। তাঁরা গান্ধীর 'স্বরাজ' অর্জনের লক্ষ্যকেও সমর্থন করতে পারেননি। সংগঠিত সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে 'একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র' (a Federated Republic of the United States of India) হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল তাঁদের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। ঐ যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতি হবে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন করা এবং মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটানো। হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন করা সম্ভব নয় বলেই মনে করতেন। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্রের মোকাবিলা কেবল অস্ত্রের সাহায্যেই করা সম্ভব বলে তাঁরা প্রচার করতেন। কিন্তু উত্তর ভারতের বিপ্লবীরা নিজেদের সন্ত্রাসবাদী কিংবা নৈরাজ্যবাদী বলে অভিহিত করতে ঘৃণাবোধ করতেন। তাঁরা একথা ভালভাবেই জানতেন যে, সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা কখনই সম্ভব হবে না। তবে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয়দের সন্ত্রাসবাদের পথে সাময়িকভাবে অগ্রসর হতে হবে বলে তাঁরা অভিমত পোষণ করতেন। উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে দু'টি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। **প্রথমত,** উত্তর ভারতের জাতীয় বিপ্লবীরা রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লবের আদর্শে কিছুটা অনুপ্রাণিত হলেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তখনও তাঁদের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন্মেনি। তাই পোটি-বুর্জোয়াসুলভ রোমান্টিক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের চিন্তা তাঁদের মন থেকে মুছে যায়নি। **দ্বিতীয়ত,** প্রয়োজনবোধে কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কাজ করার কথা ঘোষণা করলেও কার্যত তাঁরা চরম গান্ধী-বিরোধী ছিলেন। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের কার্যাবলীকে নিজেদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা প্রয়োজনবোধে কংগ্রসের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার নীতি অনুসরণ করছিলেন।

অ্যাসোসিয়েশনের নাম পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ : ১৯২৫ সালে কাকোরী নামক স্থানে ট্রেন থামিয়ে সরকারী ক্যাশ লুঠ করার অভিযোগে উত্তর ভারতের ২৩ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার ক'রে তাঁদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক উপায়ে সরকারকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়। বিচারে রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও রোশন সিং-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অন্যদের হয় নির্বাসন, নয়তো দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। 'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা'র পর উত্তর ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু ব্যাপক গ্রেপ্তার ও পুলিশী নির্যাতনের পরেও উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে যায়নি। অ্যাসোসিয়েশনের তরুণ সদস্যরা একথা উপলব্ধি করতে পারলেন যে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করলে ভারতের প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে **ভগৎ সিং** লিখেছেন :

> My previous faith and convictions underwent a remarkable modification. The romance of the violent methods alone which was so predominant amongst our predecessors, was replaced by serious ideas. No more mysticism, no more blind faith, realism becomes our cult.

উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন তাঁদের বিপ্লবী দলের নাম পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। ১৯২৮ সালে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তে দলের নতুন নাম হয় হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (HSRA)। এই দলের নেতা ছিলেন ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, যশপাল, কুন্দনলাল, গয়াপ্রসাদ, ভগবতীচরণ, শুকদেব, এহ্‌শান ইলাহী প্রমুখ। এই নতুন দল সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করার কথা ঘোষণা করে। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে প্রচারিত একটি ইস্তেহারে জানানো হয় যে, কেবল সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ঐ ইস্তেহারে একথাও বলা হয় যে, সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে বৈদেশিক আধিপত্যের হাত থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে বিপ্লবীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আবার, লবণ সত্যাগ্রহ চলাকালে **ভগৎ সিং** তাঁর এক বন্ধুকে জেল থেকে দেওয়া একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ''গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত দু'টি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কর্মসূচী নির্ধারণ করা বিশেষ জরুরী হয়ে পড়েছে। এই 'সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মসূচী'র প্রমাণ পাওয়া যায় অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক ইস্তেহারের মধ্যে। এরূপ একটি ইস্তেহারে বলা হয় যে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ও জনসাধারণের প্রগতির দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য ভারতীয় সমাজকে পুনর্গঠিত করাই হোল অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য অ্যাসোসিয়েসন যেসব কর্মসূচী গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিল, সেগুলি হোল — **(১)** নির্যাতিত ও শোষিত জনগণ কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ; **(২)** ভারতীয় রাজ্যসমূহ ও পরজীবী জমিদারতন্ত্রের অবসান ; **(৩)** জমি, জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদনকারী সংস্থা, খনিজ সম্পদ ও ব্যাঙ্কসমূহের জাতীয়করণ ; **(৪)** শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ; **(৫)** বিদেশী সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ-সংক্রান্ত চুক্তিসমূহের বিনা শর্তে বাতিলকরণ এবং **(৬)** শ্রমিক ও কৃষকগণ কর্তৃক দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ, যাতে ক'রে ভাগ্যবান কিছু মানুষ জাতীয় স্বাধীনতার সুফল আত্মসাৎ করতে না পারে। ঐ ইস্তেহারে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ; ন্যূনতম বেতন প্রদান; দিনে আট ঘণ্টা কার্যসময় নির্ধারণ ; শ্রমিকদের ঋণ মকুব ; বেকারদের আর্থিক সাহায্যদান ; অসুস্থতা ও বৃদ্ধাবস্থার মতো সময়ে নিয়োগকর্তার ব্যয়ে বীমাকরণের ব্যবস্থা ; ধর্মঘটের অধিকার ; শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার অধিকার প্রদান প্রভৃতির দাবী জানানো হয়। তাছাড়া, কারিগরদের জন্যও সংগঠন বিভিন্ন ধরনের যেসব দাবী তুলেছিল, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোল দিনে আট ঘণ্টা কার্যসময় নির্ধারণ, কারিগরদের ঋণ মকুবের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, বছরে সর্বাধিক ৬ শতাংশ হারে সুদের বিনিময়ে তাদের ঋণদানের ব্যবস্থা, পরোক্ষ কর-ব্যবস্থার বিলোপ সাধন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার, ৫০ শতাংশ ভূমিরাজস্ব হ্রাস, ঋণ ও খাজনা মকুব, বছরে সর্বাধিক ৬ শতাংশ হারে সুদ প্রদান, পরোক্ষ করের বিলোপ সাধন প্রভৃতি দাবীতে কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলন ও সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল।

এইচ. এস. আর. এ.-র অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা ভগৎ সিং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথমদিকে নৈরাজ্যবাদীদের দ্বারা কিছুটা যে-প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভার অভ্যন্তরে বোমা নিক্ষেপ করার পর তিনি ও তাঁর সহকর্মী বটুকেশ্বর দত্ত কর্তৃক ছড়িয়ে-দেওয়া প্রচারপত্রে। তাতে বলা হয়েছিল, ''বধিরকে শোনাতে হলে উচ্চকণ্ঠের প্রয়োজন।' — একথা বলেছিলেন অসম সাহসী ফরাসী

নৈরাজ্যবাদী শহীদ ভেলিয়াঁ। যে-পরিস্থিতিতে তিনি একথা বলেছিলেন, অনুরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে আমরাও তাঁর কথাটি প্রতিধ্বনিত করলাম।'' কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীদের 'নৈরাজ্যবাদী' বলে মনে করা হলেও তাঁরা যে নৈরাজ্যবাদীদের মতো রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের তত্ত্বে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না, তা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায়। বরং , মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজের আমূল পরিবর্তনের তত্ত্বে তাঁরা ছিলেন গভীরভাবে আস্থাশীল। সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এমন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে ভগৎ সিং চেয়েছিলেন, যেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য ও শোষণ থাকবে না। এরূপ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তাই ভগৎ সিং ও তাঁর বিপ্লবী কর্মরেডরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনটি শ্লোগান দিয়েছিলেন। এগুলি হোল — **(১)** 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্), **(২)** 'প্রলেতারিয়েত দীর্ঘজীবী হোক্' এবং **(৩)** সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্।

প্রথম শ্লোগানটির মধ্য দিয়ে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেই ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। যতদিন পর্যন্ত মানুষের দ্বারা মানুষের ও জাতির দ্বারা জাতির শোষণের অবসান না ঘটবে এবং বিশ্বব্যাপী শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন বৈপ্লবিক আন্দোলন ও সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

দ্বিতীয় শ্লোগানের মাধ্যমে ভগৎ সিং প্রলেতারীয় শ্রেণীকে বিপ্লবের প্রধান চালিক শক্তি হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয় শ্লোগানের মাধ্যমে তিনি একথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের অধীন একটি জাতি কখনই শ্রেণীহীন সমাজের যেমন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, তেমনি শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে সাম্যভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয় না। এরূপ জাতি গঠনের জন্য প্রথমেই সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করতে হবে। এইভাবে সমগ্র বিশ্ব থেকে সাম্রাজ্যবাদের শেষ অস্তিত্ব মুছে ফেলার মধ্য দিয়েই কেবল সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে ভগৎ সিং মনে করতেন। এইচ. এস. আর. এ. - বিপ্লবীরা, বিশেষত ভগৎ সিং সমাজতন্ত্রের প্রতি যে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি যে শ্রেণীহীন ও শোষণহীন একটি ভারতীয় সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন বিবৃতি, চিঠিপত্র ও জেলে থাকাকালীন লেখা ডায়েরী থেকে। অ্যাসেম্বলি বোমা মামলার আসামী হিসেবে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লীর সেশন জজের আদালতে ১৯২৯ সালের ৬ই জুন যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে তাঁরা বলেছিলেন, ''যতদিন মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ এবং জাতির দ্বারা জাতির শোষণ চলতে থাকবে, ততদিন এর থেকে উদ্ভূত যন্ত্রণা ও অপমান থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা যাবে না এবং যুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান ও বিশ্বশান্তির নয়া যুগ প্রতিষ্ঠার সব প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে''। সুতরাং বলা যায়, হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, গান্ধীবাদ নয়।

রোমান্টিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অনুসরণ : কিন্তু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে গণ-সংগঠন না ক'রে কার্যত বিপ্লবীরা রোমান্টিক সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা সন্ত্রাসবাদকে 'বিপ্লবের একটি প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী স্তর'

(a necessary and inevitable phase of the revolution) বলে মনে করতেন। তাই ১৯২৮ সালে উত্তর ভারতের বিপ্লবীরা লাজপত রাই-এর মৃত্যুর জন্য দায়ী সন্ডার্সকে হত্যা, ১৯২৯ সালে বড়লাটের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে দেশবাসীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। এইসব কাজের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রতি তাঁদের আসক্তি প্রকাশ পেলেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের অবদান উপেক্ষণীয় নয়। লাহোরে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যে-ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়, তা সংগঠন করেছিল হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের গণ-সংগঠন 'নওজোয়ান ভারত সভা'। তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য বলে গ্রহণ ক'রে উত্তর ভারতের বিপ্লবীরা প্রচলিত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দিতে চাননি। পরবর্তী সময়ে উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের একটি বৃহৎ অংশ নিজেদের কর্ম-পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে পেরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন এবং শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর সংগঠন গড়ে তুলে তাদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

অনুশীলনী - ৩

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। বিশের দশকে বাংলার রাজনীতিকে সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবীরা কীভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

২। হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের রাজনৈতিক মতাদর্শ কী ছিল?

❑ ৩.৩.৫ বিপ্লবী সংগ্রামের পঞ্চম পর্যায় (১৯৩২-৩৮)

সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ ক'রে বিভিন্ন বামপন্থী দলে যোগদান : বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জেলে থাকাকালীন অবস্থায় সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবীরা আত্মানুন্ধানের সুযোগ পান। পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের ফলে তাঁরা নিজেদের ভুল-ত্রুটি বুঝতে পারেন। তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন যে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা কোনদিন দেশকে মুক্ত করতে পারবেন না। সেজন্য প্রয়োজন সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের। তাই ১৯৩৮ সাল নাগাদ মুক্তি পাওয়ার পর জাতীয় বিপ্লবীদের প্রায় সকলেই কোন-না-কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। এইভাবে বি. ভি. গোষ্ঠী, বেণু গোষ্ঠী প্রভৃতি সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকে; হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন, অনুশীলন সমিতি, চট্টগ্রাম গোষ্ঠী প্রভৃতির অধিকাংশ সদস্য কমিউনিস্ট পার্টিতে এবং মূল যুগান্তর দলের অধিকাংশ সদস্য কংগ্রেসে যোগদান করেন। অনুশীলন সমিতি এবং হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের একটি বৃহৎ অংশ 'বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল' (Revolutionary Socialist Party) গঠন করেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের মধ্যে যে বাম-দক্ষিণ বিরোধ চলে, তাতে পূর্বোক্ত বামপন্থী দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে সাময়িকভাবে হলেও সুভাষচন্দ্রের পেছনে এসে দাঁড়ায় এবং কংগ্রেসের আপসকামী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করে।

৩.৪ জাতীয় বিপ্লবান্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

ভারতের সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিগত শতকের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে বিপ্লবীরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিপথকে বেশ কিছুটা পরিমাণে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, তাঁরা গান্ধী তথা কংগ্রেস-নেতৃত্বের বিকল্প কোন নেতৃত্ব দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার পেছনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে, সেগুলি হোল —

(১) জন্মলগ্ন থেকেই বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে ঐক্যের অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ছাড়াও রাজনৈতিক মতাদর্শ ও কর্মসূচীগত ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিরোধ ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনকে যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বল ক'রে দিয়েছিল। অনেক সময় আবার নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত সেই দুর্বলতাকে সংকটজনক অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষতি সাধন করেছে।

(২) বিপ্লবীদের তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব কার্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না অর্থাৎ , তাঁরা তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তত্ত্বগতভাবে তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁরা ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠীগত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ঊর্ধ্বে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তাছাড়া, তত্ত্বগতভাবে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার জন্য গণ-সংযোগ ও গণ-সংগঠনের কথা বললেও কার্যত তাঁরা সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কখনই দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হননি। ফলে শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর ওপর তাঁরা প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এইভাবে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন কার্যক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় মধ্যশ্রেণীর আন্দোলনের পর্যায়েই থেকে গেছে। সর্বোপরি, হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের মতো বিপ্লবী সংগঠন মার্কসীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও দলের সদস্যদের মার্কসবাদ শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। ফলে দলের সাধারণ কর্মীরা মার্কসবাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারেননি। তাই তাঁদের চেতনার স্তর জাতীয়তাবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।

(৩) বিপ্লবীরা গান্ধী-নেতৃত্বের বিরোধিতা ক'রে দেশবাসীর সামনে 'বিকল্প নেতৃত্ব' প্রদান করতে চাইলেও তাঁদের মধ্যে এমন কোনও সর্বভারতীয় জননেতা ছিলেন না, যাঁকে গান্ধীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বস্তুত, গান্ধীর ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও জনপ্রিয়তার কাছে তাঁরা এতই ক্ষুদ্র ছিলেন যে, গান্ধীর সঙ্গে যে-কোনও সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁদের বামপন্থী কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ, প্রধানত সুভাষচন্দ্রের ওপর নির্ভর করতে হোত। ফলে কার্যত গান্ধীবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁরা কোন রকম কার্যকরী 'চ্যালেঞ্জ' জানাতে সমর্থ হননি। তাই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব আপসকামী গান্ধী ও গান্ধীবাদীদের হাতেই থেকে গেছে।

(৪) ভারতের বিপ্লবীদের শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। তাই তাঁরা তাঁদের বুর্জোয়া মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে **ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত** মন্তব্য করেছেন। আবার, উত্তর ভারতের বিপ্লবীরা সমাজতন্ত্রের প্রতি

গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেও তাঁরা পেটি-বুর্জোয়া সুলভ মানসিকতা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে পারেননি। এমনকি, ভগৎ সিং-ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই তিনি বলেছিলেন যে, সন্ত্রাসবাদ পূর্ণ বিপ্লববাদ নয়, কিন্তু সন্ত্রাসবাদ ছাড়া বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সন্ত্রাসবাদ হোল বিপ্লবের প্রয়োজনীয় একটি অঙ্গ।

(৫) সবশেষে বলা যায়, ভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন কার্যত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের নামান্তর হয়ে দাঁড়াবার ফলে অহিন্দু, বিশেষত মুসলমানদের কাছে তার কোন আকর্ষণ ছিল না। বাংলা ও মহারাষ্ট্রে, এমনকি উত্তর ভারতেও বিপ্লববাদ কার্যত হিন্দুর দেবদেবী, হিন্দুধর্মের আচার-আচরণ, হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যের প্রভাব ইত্যাদির ওপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত** বলেছেন, ''ভারতীয় জাতীয়তা আজ হিন্দুধর্ম পুনরুত্থানকারীদের ছায়ায় আসিয়া আর্যামী ও হিন্দুজাতি পুনরুত্থান মতবাদেই পরিণত হইয়াছিল। ... বিপ্লববাদ সনাতনী হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে অনেকেই আবার হিন্দুধর্ম পুনরুত্থানকারীর দলে ছিলেন। কাজেই বিপ্লববাদ হিন্দু-জাতীয়তায় পরিণত হইল।'' এর ফলে বিপ্লবী আন্দোলন কার্যত হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে তা সর্বজনীন চরিত্র লাভ করতে পারেনি।

অনুশীলনী - ৪

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলন কেন ব্যর্থ হয়েছিল?

২। ভারতে বিপ্লবান্দোলন ব্যর্থ হওয়ার যে-কোন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিশ্লেষণ কর।

৩.৫ উপসংহার : অবদান

পরিশেষে বলা যায়, নানা প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অবদানকে কোনমতেই উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে **বিপান চন্দ্র** লিখেছেন, '' সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা জাগিয়ে তোলার কাজে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা বিরাট সফলতা অর্জন করতে সফল হয়েছিলেন। এই সাফল্য খুব কম নয়। কিন্তু তাঁদের সাফল্যের ফল কুড়িয়েছিল সনাতন কংগ্রেস নেতৃত্ব, যাঁদের তাঁরা বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে নিন্দা করেছিলেন এবং যাঁদের জায়গা তাঁরা অধিকার করবেন বলে আশা করেছিলেন...।'' ভারতীয় বিপ্লবান্দোলনের এই ট্র্যাজিক পরিণতি আজ তাই গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩.৬ সারসংক্ষেপ

গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে-দু'টি ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়, সেগুলির অন্যতম হোল সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত বিপ্লবান্দোলন। পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ ক'রে বিপ্লবান্দোলনকে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ , বিশ শতকের প্রথম দশকে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে, বিশেষত বাংলায়

'হিংসার মতবাদ' বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে। ব্যক্তি-হত্যা, ব্যক্তি-সন্ত্রাস প্রভৃতির মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন বিপ্লবীরা। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশে তাঁরা ব্যাঙ্ক, সরকারী কোষাগার, ডাকঘর প্রভৃতি লুঠ করার কৌশল অবলম্বন করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ , প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলায় এবং উত্তর ভারতে যথাক্রমে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর কর্মসূচী গ্রহণ করা হলেও তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ , ১৯২০-২২ সালে গান্ধী কর্তৃক পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বিপ্লবীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যোগদান করেন এবং সেই কাজে কিছুটা সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। চতুর্থ পর্যায়ে (অর্থাৎ , ১৯২৩ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত) বাংলার বিপ্লবীরা স্বরাজ্য দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গান্ধীর বিরোধিতা করেছিলেন এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র , জওহরলাল নেহরু প্রমুখ বামপন্থী কংগ্রেসীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই পর্বে বাংলায় 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি' নামে বিপ্লবীদের একটি অংশ কংগ্রেস-রাজনীতি বর্জন ক'রে হিংসার পথে অগ্রসর হয়। আবার, উত্তর ভারতে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন / হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী রোমান্টিক কার্যকলাপ চালালেও কার্যত তাঁরা গান্ধীবাদ পরিহার ক'রে মার্কসবাদকে তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পঞ্চম তথা শেষ পর্যায়ে বিপ্লবীরা জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন। বিপ্লবী আন্দোলনের নানা প্রকার সীমাবদ্ধতার জন্য বিপ্লবীরা জাতির সামনে গান্ধী-নেতৃত্বের বিকল্প কোন নেতৃত্ব খাড়া করতে পারেননি। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অবদানকে কোনমতেই উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না।

৩.৭ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৩.৩.১ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৩.৩.১.১ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী - ২

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৩.৩.৩.১ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৩.৩.৩.১ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী - ৩

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৩.৩.৪.১ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৩.৩.৪.২ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী - ৪

■ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১ নং প্রশ্ন - ৩.৪ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৩.৪ দ্রষ্টব্য।

৩.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

ESSAY - TYPE QUESTIONS

1. Examine the role of the 'national armed revolutionaries' in India's freedom struggle.
2. Analyse the role of the national armed revolutionaries in India's freedom struggle. What were their limitations ?

SHORT ANSWER - TYPE QUESTIONS

1. Write a short note on he cult of violence in India during the first decade of the twentieth century.
2. Why did the revolutionaries join the Gandhian movement during 1920-22 ?
3. What was the role of the revolutionaries in Bengal politics during the twenties of the last century ?
4. What were the limitations of the national armed revolutionary movement in India ?
5. Why did the Indian national armed revolutionary movement fail ?

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Besant A., *How India Wrought for Freedom*.

Bhattacharyya, Buddhadeva (ed.), *Freedom Struggle and Anushilan Samiti*.

Chandra Bipan, *Nationalism and Colonialism in Modern India*.

Chatterjee, Jogesh Chandra, *In Search of Freedom*.

Dutt, R. Palme, *India Today*.

Ghosh, Ajoy, *Bhagat Singh and His Comrades*.

Guha, Arunchandra, *Aurobindo and Jugantar*.

Gupta, Manmathnath, *They Lived Dangerously*.

—, *History of the Indian Revolutionary Movement*.

—, *Bhagat Singh and His Times*.

Hale, H. W., *Political Trouble in India 1917-37*.

Josh, Sohan Singh, *My Meeting with Bhagat Singh and on Other Early Revolutionaries*.

Pramanik, Nimai, *Gandhi and the Indian National Revolutionaries*.

Tegart, Charles, *Terrorism in India*.

Tendulkar, D. G., *Mahatma,* vol. II.

গুহ, নলিনী কিশোর, *বাংলায় বিপ্লববাদ*।

চন্দ্র, বিপান, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে, *স্বাধীনতা সংগ্রাম*।

চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবকাশ*।

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, 'বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতের বিপ্লবান্দোলন', শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *গান্ধী পরিক্রমা*।

পাকড়াশী, সতীশ, *অগ্নিযুগের কথা*।

প্রামাণিক, নিমাই, 'সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন', নরহরি কবিরাজ (সম্পাদিত), *অসমাপ্ত বিপ্লব অপূর্ণ আকাঙ্খা : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস*।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড।

মুখোপ্যাধ্যায়, যদুগোপাল, *বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি*।

রক্ষিত রায়, ভূপোন্দ্র কিশোর, *ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব*।

সত্যানন্দ, স্বামী, *হে অতীত কথা কও*, প্রথম খণ্ড।

- o -

একক - ৪

(Unit - 4)

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২)

(Non-voilent Non-Cooperation Movement, 1920-22)

এককের গঠন-বিন্যাস

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ ভূমিকা : সর্বভারতীয় গণভিত্তিক আন্দোলন

৪.২ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি

৪.২.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থা

৪.২.২ রাজনৈতিক অবস্থা

৪.২.৩ বিশ্ব-রাজনীতির পরিবর্তন ও ভারতের ওপর তার প্রভাব

৪.২.৪ ব্রিটিশ সরকারের 'সংস্কার সাধন ও দমন-পীড়ন নীতি' এবং তার ফলাফল

৪.৩ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২)

৪.৩.১ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য

৪.৩.২ অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন দিক

৪.৩.৩ অসহযোগ আন্দোলনের পরিব্যাপ্তি

৪.৩.৪ আন্দোলনের হিংসাত্মক রূপ

৪.৪ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার

৪.৪.১ আন্দোলন প্রত্যাহার ও তার প্রতিক্রিয়া

৪.৪.২ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের কারণ

৪.৫ গান্ধী-নেতৃত্বের প্রকৃতি

৪.৬ সারসংক্ষেপ

৪.৭ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৪.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান ইউনিটের উদ্দেশ্য হোল গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত সর্বপ্রথম গণ-আন্দোলন অর্থাৎ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) সম্পর্কে আলোচনা করা। প্রথমেই এই আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার পর আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং তার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া, আন্দোলনের পরিব্যাপ্তি এবং কীভাবে আন্দোলন অহিংসার গণ্ডি ছাড়িয়ে হিংসার পথে পা বাড়িয়েছে, তা-ও বর্তমান ইউনিটের আলোচ্য বিষয়। হিংসার আধিক্য ঘটায় গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। গান্ধী কেন আন্দোলন অহিংসার গণ্ডি আন্দোল প্রত্যাহার ক'রে নিলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। গান্ধী কেন আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন, সে বিষয়েও বর্তমান ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে, গান্ধী-নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করা এই ইউনিটের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

৪.১ ভূমিকা : সর্বভারতীয় গণভিত্তিক আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষার্ধে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ১৯২০ সালে তিনি যে-অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার সর্বভারতীয় গণভিত্তিক জাতীয় চরিত্র তাকে প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের স্তরে উন্নীত করেছিল। প্রথম দশকে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রথম জাতীয় আন্দোলন হলেও তা প্রধানত বাংলাদেশ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া, সেই আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণী ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেনি। তাই অসহযোগ আন্দোলনের মতো তা পরিপূর্ণতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বস্তুত, অসহযোগ আন্দোলনই হোল ভারতবর্ষের প্রথম ও প্রকৃত গণভিত্তিক জাতীয় আন্দোলন।

৪.২ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি

❑ ৪.২.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থা

কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন আকস্মিকভাবে ঘটেনি। সমকালীন ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এই আন্দোলনের উৎস লুকিয়ে ছিল। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় :

(১) ঐ সময় বৈদেশিক বাণিজ্যের লক্ষ্যণীয় অবনতি ঘটার ফলে ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজার দেশীয় পুঁজিপতিদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। দেশীয় শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের ফলে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদিত হতে থাকে। ব্রিটিশরা যুদ্ধ-সামগ্রী মজুত করার উদ্দেশে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করতে শুরু করলে পণ্য-মূল্য বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ভারতীয়দের কর্মসংস্থানের সুযোগ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ মানুষ তার ফল ভোগ করতে পারেনি। তাছাড়া, যুদ্ধের সময় 'ইণ্ডিয়ান মিউনিসনস্ বোর্ড' (Indian Munitions Board) ভারত থেকে যুদ্ধোপকরণ ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও ভারতীয় পুঁজিপতিরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। কারণ, যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বলবৎ থাকায় এবং পরিবহনোপযোগী জাহাজের অভাব ভারতীয় পণ্য রপ্তানির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

(২) যুদ্ধের সময় শিল্পজাত পণ্যের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও কৃষিজাত পণ্যের দাম নিম্নমুখী হতে থাকে। এর ফলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে শুরু করে। মাঝারি ও গরীব কৃষকরা তাদের জমি বন্ধক দিতে বা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়।

(৩) যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারতীয়দের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অসহনীয় বোঝা চাপানো হয়। ঐ সময় উভয় প্রকার করের হার পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

(৪) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রক্রিয়ার বিষময় ফল ফলতে শুরু করলে ভারতের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ওপর প্রচণ্ড আঘাত আসে। ঐসব শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের আয় যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। এক কথায়, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের সর্ববিধ্বংসী অর্থনৈতিক নীতির ফলে দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ব্যাপক আকার ধারণ করে। যুদ্ধাবসানের প্রাক্কালে কেবল ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। সমকালীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে **রজনী পাম দত্ত** বলেছেন, ''যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে দারিদ্র্য-পীড়িত ভারতবর্ষ যে-প্রচুর পরিমাণ ধন-সম্পদ যোগাতে বাধ্য হয়, তার ফলে অর্থনৈতিক দায়ের বোঝা মারাত্মাক হয়ে দাঁড়ায়। পণ্য-মূল্য বৃদ্ধি ও নির্দয় মুনাফাবৃত্তি দেশের জনসাধারণকে চূড়ান্ত দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিল। দেখা দিল মহামারী।''

❑ ৪.২.২ রাজনৈতিক অবস্থা

ব্রিটিশদের ন্যায়পরায়ণতার ওপর আস্থাশীল নেতৃবৃন্দের একাংশের মোহভঙ্গ ঘটার ফলে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অবস্থা যাতে আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে না পারে, সেজন্য ব্রিটিশ সরকার 'ভারত রক্ষা আইনে'র মতো কয়েকটি জরুরী আইন প্রণয়ন ক'রে তদানীন্তন ভারতীয় বিপ্লবী দলের কর্মীদের কারারুদ্ধ করতে শুরু করে। স্বাধীনতাকামীদের দমন করার এই কাজে কংগ্রেসের কিছু কিছু নেতা ব্রিটিশ সরকারকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করেছিলেন। তাছাড়া, নরমপন্থী নেতাদের প্রভাবাধীন কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে ব্রিটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এমনকি, যুদ্ধের প্রাক্কালে লালা লাজপৎ রাই, মহম্মদ আলি জিন্না, সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিন্‌হা প্রমুখ যেসব ভারতীয় নেতা লণ্ডনে ছিলেন, তাঁরাও তদানীন্তন ভারত-সচিবের নিকট লিখিত এক পত্রে যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করা হবে বলে ঘোষণা করেন। ঐ পত্রে লেখা হয়:

> ... the Prince and people of India will readily and willingly co-operate to the best of their ability and afford opportunities of securing that end by placing the resources of their country at His Majesty's disposal for a speedy victory for the Empire.

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে লণ্ডনে আসার পর **গান্ধী** ভারত-সচিবের নিকট লিখিত ও অনেকের স্বাক্ষরযুক্ত এক পত্রে জানান, '' ... সাম্রাজ্যের এই ঘোর সংকটের সময় যেসব ভারতীয় ইংল্যাণ্ডে রয়েছেন কিংবা ভবিষ্যতে থেকে যেতে পারেন, তাঁরা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট কাজ করার জন্য বিনা শর্তে নিজেদের সমর্পণ করবেন।'' চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের সকলের পক্ষ থেকে আমরা যুদ্ধের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব পেশ করছি।'' এর পর তিনি লণ্ডনে স্বেচ্ছাসেবক অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর ১৯১৮ সালের শেষ দিকে তিনি সৈন্য সংগ্রহের কাজে মনোনিবেশ করেন। গুজরাটের কৃষকদের যুদ্ধে যোগদানের মাধ্যমে স্বরাজ লাভ করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। কিন্তু অহিংস মতবাদের চরম সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো সহিংস কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি কীভাবে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, তা বোঝা মুস্কিল! এইভাবে একদিকে যখন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, অন্যদিকে তখন বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। গুপ্ত হত্যা, রাজনৈতিক ডাকাতি প্রভৃতি ছাড়াও বিপ্লবীরা সামরিক অভ্যুত্থান, সশস্ত্র বিদ্রোহ ইত্যাদি ঘটানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ ব্যাপারে ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র কিংবা রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র উত্তর ভারতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রচেষ্টার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সময় পাঞ্জাবের গদর পার্টির বিপ্লবী ভূমিকা ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। এইসব বিপ্লবী আন্দোলন ছাড়াও অ্যানি বেসান্ত ও বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে যে-'হোম রুল' আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কোন মতে অস্বীকার করা যায় না। এদিকে গান্ধী-পরিচালিত আন্দোলনগুলিকেও সব সময় অহিংসার গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব হয়নি। বিহারের চম্পারণ জেলায় নীলচাষের বিরুদ্ধে গান্ধী যে-সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন, তা এক সময় হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে, খেদা কৃষক-আন্দোলনও হিংসাত্মক আকার ধারণ করলে গান্ধী অত্যন্ত রুষ্ট হন।

❑ ৪.২.৩ বিশ্ব-রাজনীতির পরিবর্তন ও ভারতের ওপর তার প্রভাব

এইভাবে নানা কারণে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ও অসন্তোষ যখন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল, সেই সময় বিশ্ব-রাজনীতির বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হোল ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে জার-শাসিত রাশিয়ায় পুঁজিবাদ ও আধা-সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস সাধন ক'রে রুশ-বিপ্লবী কমিউনিস্টরা বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর জার-শাসিত উপনিবেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার তাঁরা ফিরিয়ে দেন। সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্গত সব এশীয় জাতি সমান মর্যাদা লাভ করল। ''স্বদেশের অন্তর্বিরোধ, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির হস্তক্ষেপ সবকিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল রাশিয়ার সাধারণ মানুষ — রাশিয়ার বিপ্লবে ঘোষিত হয়েছিল সাধারণ

মানুষেরই মাহাত্ম্য। তাদের শক্তি এবং তেজ ঔপনিবেশিক শাসনে নিপীড়িত সব মানুষের কাছে নিয়ে এল জীবনের আশ্বাস। যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈনিকদের মাধ্যমে বিপ্লবের খবর ছড়িয়ে পড়ল সুদূর গ্রামাঞ্চলে। ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি - বন্টনের যেসব নির্দেশ লেনিন জারি করলেন, বুদ্ধিজীবীদের মনেও তা জোগাল নতুন প্রেরণা।'' রুশ-বিপ্লবের প্রভাব কংগ্রেসের ওপরেও যথেষ্ট পড়েছিল। ১৯১৭ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ প্রদানের সময় **অ্যানি বেসান্ত** বলেছিলেন, ''রুশ বিপ্লব এবং ইউরোপ ও এশিয়ার রুশ প্রজাতন্ত্রের সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠা ভারতের পূর্বেকার অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ... ভারত আর তার এশীয় প্রতিবেশীদের জারের পদানত হিসেবে দেখবে না।'' ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানের দাবি জানানো হয়। ১৯১৯ সালে **বিপিনচন্দ্র পাল** সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ১৯২০ সালে **লাজপৎ** রাই বলশেভিক ন্যায়-নীতিকে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ন্যায়-নীতি অপেক্ষা 'অনেক শ্রেয়, নির্ভরযোগ্য ও মানবিক' বলে বর্ণনা করেন। রুশ বিপ্লব ছাড়াও আয়ারল্যাণ্ডের সিন ফেইন দলের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতীয়দের মনে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। অমানুষিক দমন-নীতি অনুসরণ ক'রে ব্রিটিশরা আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি-সংগ্রামকে দুর্বল ক'রে মধ্য প্রাচ্যের ঘটনাবলীও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতবাসীকে বিরূপ ক'রে তুলেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জগলুল পাশার নেতৃত্বাধীন মিশরের 'জাতীয়তাবাদী দল' (Nationalist) যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ শাসকরা তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করলে মিশরে যে-গণ অভ্যুত্থান শুরু হয়, ব্রিটিশরা তা নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে মিশরের স্বাধীনতা ঘোষিত হোল। প্রায় একই সময়ে তুরস্কের কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্ক দখলকারী মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং অস্থায়ী সরকার গঠন ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিয়ে তোলে।

❑ ৪.২.৪ ব্রিটিশ সরকারের 'সংস্কার সাধন ও দমন-পীড়ননীতি' এবং তার ফলাফল

সমকালীন ভারতের পরিস্থিতি এবং বিশ্ব-রাজনীতির ঐসব পরিবর্তন ব্রিটিশ শাসকদের যথেষ্ট শঙ্কিত ক'রে তোলে। তারা কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দানের মাধ্যমে ভারতীয়দের সন্তুষ্ট রাখার নীতি গ্রহণ করে। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের পতনের পর মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার আকস্মিকভাবে ঘোষণা করে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলাই হোল ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য। এই ঘোষণা মন্টেগু-ঘোষণা নামে খ্যাত। এর পর ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই মন্টেগু একটি শাসন-সংস্কারমূলক রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ঐ রিপোর্টকে কেন্দ্র ক'রে কংগ্রেসের মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে তীব্র বিরোধ শুরু হয়। মধ্যপন্থীরা রিপোর্টটিকে স্বাগত জানালেও চরমপন্থীরা তাকে 'সম্পূর্ণরূপে গ্রহণের অযোগ্য' বলে ঘোষণা করেন। ১৯১৮ সালের বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারকে 'অসঙ্গত ও নৈরাশ্যজনক' বলে অভিহিত করা হয়। ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯১৯ সলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত শাসন আইন' নামে একটি সংস্কার আইন প্রণয়ন করা হয়। ঐ আইন 'মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড' আইন বা মন্টফোর্ড আইন বা মন্টফোর্ড আইন নামে পরিচিত। এরূপ সংস্কার আইনকে গ্রহণ করার প্রশ্নে কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয় পড়ে। ইতোমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। ইংরেজদের অনুসৃত 'সংস্কার সাধন ও দমন-পীড়ন নীতি' (the policy of reform-cum-

repression) অনুযায়ী শাসন সংস্কারের পাশাপাশি দমন-পীড়ন চালানোর উদ্দেশে ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে প্রণীত হয়েছিল রাওলাট আইন। কিন্তু 'শাসন-সংস্কারের মখমলের দস্তানার নীচে সাম্রাজ্যবাদের লৌহ হস্ত' (the iron hand of imperialism beneath the velvet glove of reform) যে লুকিয়ে আছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের। মন্টফোর্ড শাসন-সংস্কারের মোহমুক্ত না হলেও গান্ধী রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি সত্যাগ্রহ লীগ গঠন করলেন। ১৯১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাঁর *ইয়ং ইণ্ডিয়া* পত্রিকায় **গান্ধী** লিখেছিলেন :

> Our duty therefore is not to subject the Reforms to carping criticism, but to settle down quitely to work so as to make them a success.

লীগ ৬ই এপ্রিল সারা ভারতে হরতাল পালনের ডাক দেয়। ঐ দিন ভারতের বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। দিল্লীতে জনতার ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। কিন্তু রাওলাট আইন-বিরোধী আন্দোলন ক্রমে ক্রমে অহিংসার বাঁধন কেটে হিংসাত্মক আকার ধারণ করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত এপ্রিল মাসে গান্ধী আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দেওয়াকে 'পর্বত প্রমাণ ভুল' (Himalayan Miscalculation) বলে অভিহিত করেন এবং ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিন দিন উপবাস পালন করেন। এদিকে পাঞ্জাবে রাওলাট আইন-বিরোধী হরতাল চরম সাফল্যলাভ করলে সেখানে ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়ন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এই চণ্ডনীতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ ১৩ই এপ্রিলের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। **জেনারেল ডায়ার** প্রাচীরবেষ্টিত জালিয়ানওয়ালাবাগের জনসভায় সমবেত নিরস্ত্র মানুষের ওপর প্রায় ষোল'শ রাউণ্ড গুলি চালান। 'সমগ্র পাঞ্জাবকে সামরিক দিক থেকে একটি নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য' এরূপ করা হয়েছে বলে জেনারেল ডায়ার সগর্বে বিবৃতি দেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সরকার-প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন। বলা বাহুল্য, 'পাঞ্জাব ট্রাজেডি'ই গান্ধীকে ভারতীয় রাজনীতির পুরোভাগে নিয়ে এসেছিল বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু **রজনী পাম দত্তের** মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট 'বিপ্লবাত্মক' পরিস্থিতিতে 'স্বভাব ও ঐতিহ্যের দিক থেকে বিপ্লববিমুখ নেতৃবৃন্দ' ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে কোন্ পথে পরিচালিত করবেন তা নিয়ে যখন সমস্যায় পড়েছেন, তখন গান্ধী আন্দোলনের নতুন পথ নির্দেশ করলেন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি তৈরী করলেন 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের এক পরিকল্পনা'।

অনুশীলনী - ১

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-২২) পটভূমি আলোচনা কর।

২। কোন্ পরিস্থিতিতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) শুরু হয়েছিল?

৩। ১৯২০-২২ সালের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান ইস্যুগুলি কী ছিল?

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। ভারতবর্ষের কোন্ আর্থ-সামাজিক অবস্থায় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) শুরু হয়েছিল?

২। ভারতবর্ষের কোন্ রাজনৈতিক অবস্থায় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) শুরু হয়েছিল?

৪.৩ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২)

❑ ৪.৩.১ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য

১৯২০ সালে গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই তিনি জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন। **(ক)** অহিংস অসহযোগ এবং **(খ)** আইন অমান্য — এই দু'টি নতুন অস্ত্রের সাহায্যে তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। ১৯২০ সালের ২রা জুন অনুষ্ঠিত এক সভায় খিলাফৎ কমিটি সর্ববিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার উদ্দেশে একটি অসহযোগ কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটি একটি ইস্তেহারে ১লা আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী রূপায়ণের কথা ঘোষণা করে। ১লা আগস্ট ভারতবর্ষব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় এবং ঐ দিন গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পদক ফেরৎ দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। এর পর ৪ঠা জুলাই কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসে। লাজপৎ রাই-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় গান্ধী খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অবিচারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব আনেন। মূল প্রস্তাবের খসড়াতে 'স্বরাজ' অর্জনকে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিজয়রাঘবাচারি ও মতিলাল নেহরুর পরামর্শে গান্ধী উপরি-উক্ত দু'টি বিষয়ের সঙ্গে 'স্বরাজ' অর্জনকে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা ক'রে প্রস্তাব আনেন। তিনি ঘোষণা করেন, দেশের মানুষ তাঁর আহ্বানে যথেষ্ট সাড়া দিলে 'এক বছরের মধ্যেই' দেশে 'স্বরাজ' আসবে। চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখের বিরোধিতা সত্ত্বেও অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য চিত্তরঞ্জন সদলবলে উপস্থিত হন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি গান্ধী-বিরোধিতার পথ পরিত্যাগ করেন এবং নিজেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এইভাবে ১৯২০ সালের কলকাতা কংগ্রেসের পর কংগ্রেস তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে 'গান্ধী-যুগে'র (Gandhi era) সূত্রপাত ঘটে।

❑ ৪.৩.২ অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন দিক

গান্ধী যে-অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার দু'টি দিক ছিল, যথা — **(ক)** গঠনাত্মক এবং **(খ)** বর্জনাত্মক। গঠনাত্মক কার্যের মধ্যে প্রধান ছিল চরকা ও তাঁতের প্রচলন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মদ্যপান নিবারণ, হিন্দু-মুসলমানের মিলন এবং তিলক তহবিলের জন্য এক কোটি টাকা চাঁদা সংগ্রহ। বর্জন নীতির প্রধান লক্ষ্য

ছিল আইনসভা, আদালত, সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সরকার-প্রদত্ত উপাধি ইত্যাদি পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় নীতিটির সাফল্যের জন্য কিছু কিছু গঠনমূলক কার্য, যেমন — সালিসী আদালত, জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সরকার-প্রদত্ত উপাধি ইত্যাদি পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় নীতিটির সাফল্যের জন্য কিছু কিছু গঠনমূলক কার্য, যেমন — সালিসী আদালত, জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল। তিনি প্রথম থেকেই আন্দোলনকে অহিংস পথে পরিচালনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ, তাঁর আদর্শ ও কর্মপন্থার মূল ভিত্তি ছিল আহিংসা নীতি। **গান্ধী** নিজেই বলতেন : ''Non-violence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed.'' তাঁর বিশ্বাস ছিল কেবল অহিংস উপায়েই স্বরাজ অর্জন সম্ভব।

❑ ৪.৩.৩ অসহযোগ আন্দোলনের পরিব্যাপ্তি

গান্ধীজীর আহ্বানে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ জেগে ওঠে। তারা অসহযোগ আন্দোলনকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯২১ সাল থেকে অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত নতুন ভারত শাসন আইন ৩রা জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়। এই উপলক্ষে ডিউক অব্ কনট ভারতবর্ষে এলে কংগ্রেস তাকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই হরতাল, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁকে 'অভ্যর্থনা' জানানো হয়। তিলক তহবিলের জন্য এক কোটি পনেরো লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। কংগ্রেসকে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্দেশে ইতঃপূর্বে সভ্য-চাঁদার হার হ্রাস করা হয়। ফলে কংগ্রেসের নতুন সদস্যসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষেরও অধিক বৃদ্ধি পায়। প্রায় কুড়ি লক্ষাধিক চরকায় ঘরে ঘরে সুতো কাটা চলতে থাকে। সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বয়কটের সিদ্ধান্তে সাড়া দিয়ে ১২ই জানুয়ারী কলকাতায় 'ছাত্র দিবস' পালন করা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপক হারে স্কুল-কলেজ বর্জন করে। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরুর মতো প্রথিতযশা আইনজীবীরা আইন ব্যবসা ত্যাগ ক'রে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু সরকারী খেতাব বর্জন ও সরকারী চাকুরী ত্যাগের কর্মসূচী আদৌ সাড়া জাগাতে পারেনি। এমনকি, মাদকদ্রব্য বর্জনের কর্মসূচী প্রাথমিক পর্যায়ে পিকেটিং করার ফলে কিছুটা সফল হলেও পরবর্তী সময়ে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আইনসভা বর্জনের কর্মসূচীরও একই অবস্থা। কোন কংগ্রেস-সদস্য আইনসভায় নির্বাচনপ্রার্থী না হলেও ভোটদাতাদের অন্তত এক-চতুর্থাংশ ভোট দিয়েছিল এবং সব আসনেই অন্যান্য দলের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ভারতের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একটি বৃহৎ অংশ গান্ধীর আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। বিদেশী বস্ত্র পুড়িয়ে ফেলার যে-কর্মসূচী গান্ধী গ্রহণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

❑ ৪.৩.৪ আন্দোলনের হিংসাত্মক রূপ

কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন সর্বক্ষেত্রে অহিংস পথে পরিচালিত হয়নি। ব্রিটিশ যুবরাজ ভারত পরিদর্শনে এসে বোম্বাইতে উপনীত হলে সেখানে বিক্ষোভ হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় বোম্বাই-এর হিংসাত্মক ঘটনায় অন্তত ৫৩ জন নিহত এবং ৪০০ জন আহত হয়েছিল। গান্ধী এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেছিলেন, ''গত দু'দিনে যে-স্বরাজের দৃশ্য দেখেছি,

তার গন্ধে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি (stank in my nostrils)।'' প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি অনশন আরম্ভ করেন এবং বারদৌলি নামক স্থানে প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখেন। বোম্বাই শহর ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে অসহযোগ আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ ধারণ করে। ১৯২১ সালের ৫ই জুলাই আলিগড়ে মালকান সিং নামক জনৈক রাজনৈতিক কর্মীর বিচার চলাকালে উত্তেজিত জনতা আদালত অক্রমণ করে এবং ট্রেজারী-সহ কয়েকটি সরকারী অফিসে অগ্নি-সংযোগ করে। ১২ই জুলাই হায়দ্রাবাদের মতিয়ারীতে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হোল — মালাবার অঞ্চলে মোপলা বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা হিংসাত্মক আকার ধারণ করলেও **গান্ধী** ঐ আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে বলেছিলেন, ''ঈশ্বর-বিশ্বাসী বীর মোপলারা তাদের ধর্মীয় আদর্শ অনুযায়ী যা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করছে, তার জন্য সংগ্রাম করছে।''

অনুশীলনী - ২

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

২। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-২২) গঠনাত্মক ও বর্জনাত্মক দিকের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৪.৪ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার

❑ ৪.৪.১ আন্দোলন প্রত্যাহার ও তার প্রতিক্রিয়া

১৯২২ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী গান্ধী বড়লাটকে একটি চরমপত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, অবিলম্বে সর্বপ্রকার দমন-পীড়ন বন্ধ না করলে, সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করা না হলে, সব রাজবন্দীকে মুক্তি না দিলে এবং শান্তিপূর্ণ অহিংস পথে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন চালানোর সুযোগ না দিলে সুরাট জেলার বারদৌলী তালুকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে। গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তে সমগ্র ভারতবর্ষ চঞ্চল হয়ে উঠল। সংগ্রামের অপেক্ষায় ভারতবাসী প্রহর গুনতে লাগল। কিন্তু ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীর একটি ঘটনা অসহযোগ আন্দোলনের গতিপথ পরিবর্তন ক'রে দেয়। উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরা নামক স্থানে নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের ওপর পুলিশের আকস্মিক গুলি চালনায় ক্ষিপ্ত হয়ে জনতা পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন লাগায় এবং জনতার প্রহারে কয়েকজন পুলিশ প্রাণ হারায়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিংসার কারণে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করেন।

গান্ধীর এই সিদ্ধান্ত বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ভারতবাসীকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছিল। সমগ্র দেশে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দেশের মানুষ ব্যাপক হতাশা আর ক্ষোভে ফেটে পড়ে। **লুই ফিশার** লিখেছেন, গান্ধীর একটি কথাতেই ভারতবর্ষ বিদ্রোহে ফেটে পড়তে পারত। কিন্তু সেই কথাটি তিনি বললেন না। তার পরিবর্তে সমস্ত আগ্রহ ও আত্মদানের প্রচেষ্টাকে অহিংসা মতবাদের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হল। চিত্তরঞ্জন দাশ,

মতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রাই প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দুঃখে, ক্ষোভে হতাশায় ফেটে পড়েন। লাজপৎ রাই গান্ধীর কাজের তীব্র নিন্দা করে জেল থেকে তাঁকেও ৭০ পৃষ্ঠার একটি চিঠি দেন। আন্দোলন প্রত্যাহারে ব্যথিত হয়ে সুদূর ফ্রান্স থেকে **রোমাঁ রোলাঁ** লিখেছিলেন, একজন মাত্র ব্যক্তির হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পিত হলে তার যে কতখানি অপপ্রয়োগ হতে পারে, এই ঘটনা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

❑ ৪.৪.২ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের কারণ

শুরু থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে হিংসা জড়িত ছিল। এমনকি, মোপলা বিদ্রোহের মতো ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনার পরেও গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নেননি। অথচ চৌরিচৌরার সামান্য হিংসাত্মক ঘটনার অজুহাতে তিনি সমগ্র দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করে দিয়ে আন্দোলনে ইতি টানলেন। কেন তিনি এই আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রধানত চার ধরনের মতামত লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, জওহরলাল নহরু তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন, ''১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি বর্জনের কারণ কার্যত কেবলমাত্র 'চৌরিচৌরা' নহে, অথচ অধিকাংশ লোকের তাহাই বিশ্বাস। 'চৌরিচৌরা' একটি পরিণতি মাত্র।'' জওহরলালের মতে, ঐ সময় গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সংগঠন দৃশ্যত শক্তিশালী ও গণভিত্তিক হলেও কার্যত তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া, জনসাধারণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার শিক্ষাও প্রদান করা হয়নি। এমতাবস্থায় আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া ছাড়া গান্ধীর অন্য কোন উপায় ছিল না।

দ্বিতীয়ত, সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর 'ভারতীয় সংগ্রাম' (Indian Struggle) নামক গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বারদৌলীতে গান্ধীর করবন্ধের কর্মসূচীকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার জন্য সরকার গোপনে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ইতোমধ্যে ঐ অঞ্চলে নির্ধারিত করের একটি বৃহৎ অংশ আগাম হিসেবে আদায় করা হয়েছিল। গান্ধীর প্রতি সহানুভূতিশীল সরকারী কর্মচারীরা এই বিষয় সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করান এবং জানান যে, কর-বন্ধের আন্দোলন শুরু করা হলে তা অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় গান্ধী ব্যর্থতা অপেক্ষা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়াকেই শ্রেয় বলে মনে করেন এবং চৌরিচৌরাকে একটি অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

তৃতীয়ত, মার্কসবাদীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া সম্পর্কে ভিন্ন কথা বলেন। তাঁদের মতে, গান্ধীর মতো বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর তা গণভিত্তিক হয়ে ওঠে এবং বোম্বাই, মালাবার, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলায় তা জঙ্গী শ্রমিক ও কৃষক-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এতে কংগ্রেস-নেতৃত্ব ভয় পেয়ে যায়। সেই সময় দেশের মধ্যে যে-বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল, তাকে তাঁরা স্বাভাবিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে রাজী ছিলেন না। কারণ, এ ধরনের সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান সাফল্য অর্জন করলে তাঁদের হাত থেকে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব বিপ্লবী শ্রেণীগুলির হাতে চলে যাওয়ার সম্ভবনা ছিল। তাই তাঁরা আন্দোলনের গতিকে সব সময় সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আটক রাখতে চাইতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও তা করা হল। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে **রজনী পাম দত্ত** বলেছেন, গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব অসহযোগ

আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। কারণ, জাগ্রত জনগণ সেই সম্পত্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত দিতে উদ্যত হয়েছিল, যে-শ্রেণীর সঙ্গে তাঁরা বাস্তবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। 'হিংসা' কিংবা 'অহিংসা'র প্রশ্ন নয়, আসলে গণ-আন্দোলন-বিরোধী শ্রেণী-স্বার্থই ১৯২২ সালের জাতীয় সংগ্রাম প্রত্যাহারের একমাত্র কারণ বলে তিনি অভিমত পোষণ করেছেন। অনুরূপ মন্তব্য করেছেন **এম. এন. রায়, ফিলিপ স্প্রাট, আইজাক্ এজিকিয়েল, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নাম্বুদিরিপাদ, সৈয়দ সাহেদুল্লাহ্** প্রমুখ মার্কসবাদী। **মার্কসবাদীদের মতে, অসহযোগ আন্দোলন** প্রত্যাহারের মাধ্যমে কংগ্রেস নেতৃত্বের দ্বৈত চরিত্রটি প্রকাশিত হোল। একদিকে তাঁরা যেমন নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন, অন্যদিকে তেমনি গণ-আন্দোলনে ভয় পেয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আপসরফা করতেও দ্বিধা করেন না। এখানেই বুর্জোয়া নেতৃত্বের দুর্বলতা।

চতুর্থত, বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জী প্রমুখ তাঁদের লেখা 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' নামক গ্রন্থে পূর্বোক্ত তিনটি অভিমতের কোনটিকেই মেনে নিতে রাজী নন। তাঁরা যুক্তি দিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, পূর্বোক্ত তিনটি অভিমতই অত্যন্ত দুর্বল। তাঁদের মতে, ''১৯২১-এর প্রথমার্ধে সারা দেশ জুড়ে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল, তা সম্ভবত স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ক্যাডার ও সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক হলেও এই ধরনের একটা গণ-আন্দোলনে শুধু অত্যন্ত সচেতন মানুষদের নয় সাধারণ মানুষেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। ... আন্দোলন প্রত্যাহারের পিছনে যেসব কারণ কাজ করেছে, তার মধ্যে এই কারণও থাকতে পারে। গান্ধীজীর সমালোচকরা প্রায়শই বুঝতে পারেন না সব গণ-আন্দোলনেরই একটা পর্যায়ে পৌঁছানর পর সহজাত ভাটার প্রবণতা থাকে। মানুষের দমন-পীড়ন সহ্য করার ও আত্মত্যাগ করার ক্ষমতাও সীমাহীন নয়। একটা সময় আসে যখন পরবর্তী পর্যায়ের সংগ্রামের জন্য শক্তি সংহত, পুনরুদ্ধার ও সঞ্চয় করতে দম ফেলার দরকার পড়ে। আর তাই, আন্দোলন প্রত্যাহার কিংবা সংঘাতে না যাওয়ার পথ নেওয়াটা গণভিত্তিক রাজনৈতিক সংগ্রামের রণনীতির একটা সহজাত অংশ। আন্দোলন প্রত্যাহারের অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা নয়; তা রণনীতিরই অপরিহার্য অংশ। ... আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতে হত কিংবা পিছু হটলে সেটা ছত্রভঙ্গ হওয়ার মত দেখাত। কিন্তু তা হওয়ার আগেই চৌরিচৌরা সসম্মানে পিছু হটার সুযোগ করে দিয়েছিল।''

অনুশীলনী - ৩

■ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। কেন গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছিলেন?

২। কেবল হিংসার কারণেই গান্ধী ১৯২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছিলেন বলে কি তুমি মনে কর? তোমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৪.৫ গান্ধী-নেতৃত্বের প্রকৃতি

গান্ধী-নেতৃত্বের নানা প্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। গান্ধীই ভারতবর্ষের প্রথম নেতা, যিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে গণমুখী করেছিলেন এবং তাকে গণ-চরিত্র দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে **এ. কমারোভ** মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

> তিনিই প্রথম ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী সংগঠিত গণ-সংগ্রাম চালাতে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। জনগণের কাছে তিনি শুধু সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বকে নয়, বুর্জোয়া সভ্যতাকেও তীব্র সমালোচনা করেন, মেহনতীদের ওপর জমিদারী ও পুঁজিবাদী শোষণের নিন্দা করেন, লড়েন বর্ণাশ্রম প্রথার জুলুমের বিরুদ্ধে, চেষ্টা করেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের। সেই সঙ্গে ... দেশের ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও শ্রেণীগত বিরোধ তিনি সমাধানের আশা করেছিলেন আপসের পথে, নৈতিক প্রচার মারফৎ সম্পত্তিবান শ্রেণীদের বুঝিয়ে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিফলিত হয় জাতীয়তাবাদের অন্তর্বিরোধশীলতা ও সীমাবদ্ধতা, বহু পরিমাণে তাই থেকেই আসে গান্ধীর এই অটল দাবী যে, ব্রিটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধেই হোক্ বা সামাজিক পীড়নের বিরুদ্ধেই হোক্, গণ-ক্রিয়াকে সর্বাবস্থাতেই হতে হবে একান্তরূপে অহিংস চরিত্রের। তাহলেও তখনকার ভারতের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের তখনকার বিকাশ মাত্রায় ও দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ও শ্রেণীগত শক্তি অনুপাতের ক্ষেত্রে প্রধান তাৎপর্য ধরেছিল জাতীয় মুক্তির জন্য গান্ধীর প্রয়াস, ব্রিটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রাম সংগঠনের জন্য তাঁর ক্রিয়াকলাপ, মেহনতীদের শোষণ ও পীড়নের ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতা। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে গান্ধীর আগমন এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের নেতা হিসেবে তাঁর আত্মোৎসর্গী কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয় নতুন, আগের চেয়ে উঁচু একটা স্তরে ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনের উন্নয়ন এবং সেই সঙ্গে তা সে উন্নয়নকে সুসাধ্যও করে।

তৎকালীন সময়ে গান্ধীর এই বিপ্লবী ভূমিকার জন্য **লেনিন** ভারতীয় কমিউনিস্টদের গান্ধী-পরিচালিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে মিশে না গিয়েও তাকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

গান্ধী-নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে **বিপান চন্দ্র** প্রমুখ মন্তব্য করেছেন যে, ভারতের কোটি কোটি দরিদ্র মূক মানুষকে গান্ধীজী মুখর ক'রে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতাও যে ঐসব মানুষের রয়েছে, তা অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রমাণিত হোল। তবে তারা হয়তো তখনও পর্যন্ত এই আন্দোলনের তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করতে কিংবা সুশৃঙ্খলভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার উপযুক্ত ক'রে নিজেদের গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু এঁদের অনেকেরই জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আধুনিক জগতের এবং জাতীয়তাবাদের মতাদর্শের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটেছে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে। শহরের জাতীয়তাবাদীরা, স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা কিংবা গ্রামের শিক্ষিত রাজনীতি-সচেতন মানুষেরাও পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মতাদর্শকে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। তাছাড়া, এই আন্দোলনে মুসলমানদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে অসহযোগ

আন্দোলনকে প্রকৃত অর্থেই গণ-চরিত্র দান করেছিল। বলা বাহুল্য, এ সবকিছুরই কৃতিত্ব গান্ধীজীর প্রাপ্য। কিন্তু ভারতের বর্তমান কয়েকজন ঐতিহাসিকের এরূপ বক্তব্যকে সম্মান জানিয়েও একথা বলা যেতে পারে যে, গান্ধী ছিলেন সমকালীন ভারতের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাই তাঁর নেতৃত্বের দ্বৈত-প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া নেতৃত্বের মতো একদিকে তিনি জনসাধারণকে আন্দোলনের মঞ্চে টেনে আনার জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। কিন্তু জনসাধারণ যখন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখন তাদের কাছে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন গৌণ হয়ে পড়েছে। গণ-অভ্যুত্থান দেখে হয়তো গান্ধী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষার তাগিদেই তিনি আন্দোলনের রাশ নিজের হাতে রেখে দেওয়ার জন্য আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছিলেন বলে বামপন্থীরা যে-অভিযোগ করেন, তার সত্যতাকে কোনমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অনুশীলনী - ৪

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-২২) গান্ধী-নেতৃত্বের গুরুত্ব কী ছিল?

২। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-২২) গান্ধী-নেতৃত্বের প্রকৃতি কী ছিল?

৪.৬ সারসংক্ষেপ

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাবের ফলে কংগ্রেস তথা ভারতীয় রাজনীতিতে গণ-আন্দোলনের যুগ শুরু হয়। বর্তমান ইউনিটের উদ্দেশ্য হোল গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম গণ-আন্দোলন অর্থাৎ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-২২) সঙ্গে পাঠকদের পরিচিতি ঘটানো। এই আন্দোলনের পেছনে যেসব কারণ ছিল, সেগুলিকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ ক'রে আলোচনা করা হয়েছে। **প্রথমত,** প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের লক্ষণীয় অবনতি, অস্বাভাবিক পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস, কৃষিজাত পণ্যের নিম্নমুখী দাম, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অসহনীয় বোঝা, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের ওপর প্রচণ্ড আঘাত প্রভৃতি কারণে দেশের মানুষ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ভারত-রক্ষা আইনের মতো কয়েকটি কুখ্যাত প্রণয়ন ক'রে বিপ্লবী দলের কর্মীদের কারারুদ্ধ করলেও গান্ধী-সহ কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে নিঃশর্তভাবে সমর্থন জানান। অন্যদিকে, বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর কাজে যেমন আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তেমনি অ্যানি বেসান্ত ও বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল হোমরূল আন্দোলন। এইসব কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঘটনা, যেগুলি ভারতবাসীকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন করার জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোল ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব, আয়ারল্যাণ্ডের সিন ফেইন দলের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রভৃতি। ব্রিটিশ সরকার একদিকে সংস্কার সাধন এবং অন্যদিকে চূড়ান্ত দমন-পীড়ন নীতি চালিয়ে গণ-অসন্তোষকে

চাপা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা গান্ধীকে ভারতীয় রাজনীতির পুরোভাগে এনে দেয়। তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।

এই আন্দোলনের দু'টি দিক ছিল, যথা — গঠনাত্মক ও বর্জনাত্মক। গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আন্দোলন পুরোপুরি অহিংসার পথ ধরে অগ্রসর হয়নি। ১৯২২ সালে চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিলে সারা ভারতব্যাপী তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গান্ধী কেন আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন, তা নিয়ে পরস্পর-বিরোধী চারটি অভিমত রয়েছে। বর্তমান ইউনিটে সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে গান্ধী-নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণ রয়েছে।

৪.৭ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৪.২ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৪.২ দ্রষ্টব্য।

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৪.২.১ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৪.২.১ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী - ২

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৪.৩.১ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৪.৩.২ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী - ৩

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৪.৪.২ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৪.৪.২ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী - ৪

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৪.৫ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৪.৫ দ্রষ্টব্য।

৪.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

ESSAY-TYPE QUESTIONS

1. Explain the circumstances leading to the Non-violent Non-cooperation Movement of 1920-22. What was the importance of the Gandhian leadership in the movement?
2. Analyse the factors leading to the Non-violent Non-cooperation Movement of 1920-22. What was the nature of Gandhian leadership in the movement?
3. What were the principal issues of the Non-violent Non-cooperation Movement (1920-22)? Evaluate the nature of Gandhian leadership in the movement.

SHORT ANSWER-TYPE QUESTION

1. What were the socio-economic reasons for the Non-violent Non-cooperation Movement of 1920-22?
2. What were the objectives of the Non-violent Non-cooperation Movement of 1920-22?
3. Why did Gandhi withdraw the Non-violent Non-cooperation Movement in 1922?
4. What was the reaction for the withdrawal of the Non-violent Non-cooperation Movement in 1922?
5. What was the importance of the Gandhian leadership in the Non-violent Non-cooperation Movement of 1920-22?
6. What was the nature of Gandhian leadership in the Non-violent Non-cooperation Movement of 1920-22?

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Bose, Subhas Chandra, *The Indian Struggle*.

Chandra Bipan, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K. N. Panikkar and Sucheta Mahajan, *India's Struggle for Independence*.

Dutt, R. Palme, *India Today*.

Ezekial, Issac A., *Swaraj or Surrender*.

Mukherjee, Hirendranath, *Gandhiji : A Study*.

Namboodiripad, E. M. S., *The Mahatma and the Ism*.

Roy, M. N., *The Aftermath of Non-co-operation*.

Sarkar, Sumit, *Modern India : 1885-1947*.

Spratt, P., *Gandhism : An Analysis*.

Tendulkar, D. G., *Mahatma,* vol. II.

কমারোভ, এ., *লেনিন ও ভারতবর্ষ*।

গুহ, নলিনী কিশোর, *বাংলায় বিপ্লববাদ*।

চন্দ্র, বিপান, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে, *স্বাধীনতা সংগ্রাম*।

চন্দ্র, বিপান, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী, কে. এন. পানিক্কর ও সুচেতা মহাজন, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম*।

চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*।

নেহরু, জওহরলাল, *আত্মচরিত*।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম*।

রক্ষিত-রায়, ভূপেন্দ্রকিশোর, *ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব*।

সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭*।

সাহেদুল্লাহ, সৈয়দ, *লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদ*।

– ০ –

একক - ৫

(Unit - 5)

আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০ - ৩৪)

(Civil Disobedience Movement)

এককের গঠন-বিন্যাস

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমি

৫.১.১ আর্থ-সামাজিক পটভূমি

৫.১.২ বামপন্থী শ্রমিক-আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি

৫.১.৩ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি

৫.১.৪ সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের ব্যাপারে গান্ধীর দ্বিধা

৫.১.৫ গান্ধীর আপসকামী মনোভাব : 'এগারো দফা দাবী'

৫.২ আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা ও পরিব্যাপ্তি

৫.২.১ আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা

৫.২.২ গান্ধী-আরউইন চুক্তি

৫.২.৩ দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

৫.২.৪ পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু

৫.৩ মূল্যায়ন

৫.৪ সারসংক্ষেপ

৫.৫ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৫.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫.০ উদ্দেশ্য

বিশ শতকের তিরিশের দশকে গান্ধীর নেতৃত্বে যে-আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩৪) শুরু হয়েছিল, তা ছিল দ্বিতীয় গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলন কেন শুরু হয়েছিল, বর্তমান ইউনিটে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশের মানুষ প্রস্তুত হলেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতা গান্ধী কর্মসূচী নির্ধারণের ব্যাপারে কেন দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন, সে বিষয়েও এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। গান্ধীর আপসকামী মনোভাবের ফলশ্রুতি হিসেবে 'এগারো-দফা দাবী' পেশ এবং তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করাও এই ইউনিটের উদ্দেশ্য। আন্দোলন চলাকালে সম্পাদিত হয় গান্ধী-আরউইন চুক্তি। কিন্তু এই চুক্তি ভারতীয় জনগণকে কার্যত কোনকিছুই দিতে পারেনি। তাই শূন্য হাতে ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফেরার পর গান্ধীর নেতৃত্বে পুনরায় শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন এবং তা বিশেষভাবে ব্যাপকতা লাভ করে। কিন্তু আন্দোলন চলাকালে আন্দোলনকারীরা যথেষ্ট শান্তিপূর্ণ থাকলেও গান্ধী আন্দোলনকে কেন শেষ পর্যন্ত অপমৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন, তা বিশ্লেষণ করাও বর্তমান এককের উদ্দেশ্য। এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও তার যে একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে, তা বর্তমান আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

৫.১ আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমি

❑ ৫.১.১ আর্থ-সামাজিক পটভূমি

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথমদিকে গান্ধীর নেতৃত্বে যে-আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছিল, তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে পরিচিত। এই আন্দোলনের কারণ অন্বেষণ করতে হলে আমাদের সমকালীন ভারতবর্ষে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা যেমন পর্যালোচনা করতে হবে, তেমনি বিশ্লেষণ করতে হবে বিশ্ব-পরিস্থিতিকে। দ্বিতীয় দশকের শেষ এবং তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে কেবল সোভিয়েত ইউনিয়ন বাদে সমগ্র বিশ্বে চরম অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এই সংকটের হাত থেকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির মতো উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি যেমন রেহাই পায়নি, তেমনি রেহাই পায়নি ভারতের মতো অনগ্রসর ও শোষিত পরাধীন দেশগুলি। বলা বাহুল্য, এই সংকট ছিল 'অতি-উৎপাদনের ফলে সৃষ্ট সংকট' (crisis arising out of over-production)। ১৯২৯ সালে এই অর্থনৈতিক সংকট ভারতের অর্থনীতিতে মারাত্মক আঘাত হেনেছিল। অবশ্য ১৯২৭-২৮ সাল থেকেই কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রীর ক্ষেত্রে মন্দা-সহ সামগ্রিকভাবে এক কৃষি-সংকট দেখা দিয়েছিল। এর ফলে প্রধান প্রধান কৃষি-পণ্যের দাম যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে গমের দাম ৫০ শতাংশ ও পাটের দাম ৫০-৬০ শতাংশ হ্রাসের কথা উল্লেখ করা যায়। ঐ সময় ঔপনিবেশিক সরকার যথেষ্ট পরিমাণ খাজনা বৃদ্ধির উদ্দেশে ভূমি-রাজস্বের হার পুনর্বিন্যাস করে। এর ফলে কার্যত কৃষকদের আয় পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী হ্রাস পায়। প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য জমিদাররা দ্রব্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে খাজনা আদায় করতে শুরু করে। ফলে অধিক সংখ্যক রায়ত-চাষী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষী দেউলিয়া হয়ে পড়তে থাকে। ক্ষুদ্র ও মধ্যশ্রেণীর কৃষকরা তাদের জমি বন্ধক রাখতে বা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। বস্তুত, ঐ সময় ক্ষুদ্র ও মধ্যশ্রেণীর কৃষকদের জমি-জায়গা ক্রমবর্ধমানভাবে জমিদার,

মহাজন ও ধনী কৃষকদের কুক্ষিগত হতে থাকে। এই সর্বব্যাপী সংকটের হাত থেকে শহরগুলিও রক্ষা পায়নি। কারখানা ও ছোট ছোট শিল্প-সংস্থাগুলি তখন অচল হয়ে পড়েছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে পুনর্গঠনের নাম ক'রে ব্যাপকভাবে শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই, কলকারখানা বন্ধ ও বেতন-হ্রাস চলতে থাকে। ফলে শ্রমিক-শ্রেণীর ও সাধারণ কর্মচারীদের আর্থিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। এইভাবে ''তৎকালীন জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি এবং বহু ক্ষুদ্র সংস্থা দেউলিয়া হওয়ার প্রেক্ষিতে অনেক ভারতীয়ই তাদের সঞ্চয়টুকু (প্রথানুযায়ী রূপা ও সোনার অলঙ্কারের আকারে সঞ্চিত) খরচ করতে বাধ্য হয়েছিল। ঐ সংকটকালে ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলি তাদের মহাজন-দালালদের মাধ্যমে ৩০০ কোটি টাকা মূল্যের মূল্যবান ধাতু ভারতের বাইরে পাচার করেছিল।'' এমতাবস্থায় বিশের দশকের শেষ দিকে ভারতবর্ষে চরম অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী এরূপ অর্থনৈতিক সংকট চলতে থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন কীভাবে তার হাত থেকে মুক্ত থাকল, তা নিয়ে সমকালীন ভারতের নেতৃবৃন্দের একাংশ চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছিলেন। এর ফলে ভারতের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বামপন্থী মতাদর্শ, বিশেষত সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা কিছুটা পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হোল। ইউরোপ থেকে সদ্য প্রত্যাগত জওহরলাল নেহরু সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সপক্ষে বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রসের মধ্যে বামপন্থী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটল। এই গোষ্ঠী কার্যত গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের আপসমুখী নীতিকে 'চ্যালেঞ্জ' জানাল।

পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী সংকট বিভিন্ন দেশের শ্রমিক-কৃষকদের মতো শ্রমজীবী মানুষের ওপরেই কেবল নিত্য-নতুন বোঝা চাপায়নি, সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী দুনিয়াকেই প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংকটের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়লে পুঁজিবাদী দেশগুলি অধিকতর বাজার দখলের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এমতাবস্থায় ব্রিটেন ভারতের বাজার সম্পূর্ণভাবে নিজের কুক্ষিগত রাখার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গরীব ও মধ্যবিত্ত মানুষের মতো জমিদার ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের ওপর নানা ধরনের বোঝা তারা চাপাতে শুরু করে। এর ফলে বাধ্য হয়েই জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হয়ে ওঠে। ভাইসরয়কে লেখা গান্ধীর চিঠিপত্র-সহ কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের তৈরী-করা বিভিন্ন দলিলপত্রে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল এবং ক্ষেত্র বিশেষে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানানো হয়েছিল। ব্রিটিশ পাউণ্ডের সঙ্গে ভারতীয় টাকার সমতা রক্ষা, ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে শুল্ক-নীতি নির্ধারণ, জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানির জন্য জাহাজের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের নীতি ও কার্যাবলীকে কংগ্রেস কঠোরভাবে সমালোচনা করে। তাছাড়া, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত 'সাম্রাজ্যিক পছন্দ (Imperial Preference)-এর নীতি কংগ্রেস কোনমতেই মেনে নিতে পারেনি। এই নীতি অনুসারে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যাদি আমদানি করতে হলে যে-শুল্ক দিতে হবে, তার থেকে অনেক বেশী শুল্ক লাগবে জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশের পণ্যদ্রব্য আমদানি করতে হলে। যখন 'সাম্রাজ্যিক পছন্দ বিল' কেন্দ্রীয় আইনসভায় আলোচনার জন্য পেশ করা হয়, তখন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও দেওয়ান চমনলালের মতো ব্যক্তিরাও তার বিরোধিতা ক'রে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। এইভাবে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করলে গান্ধী, মতিলাল নেহরু প্রমুখ দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অতি সহজেই জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্রের মতো বামপন্থী কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

❑ ৫.১.২ বামপন্থী শ্রমিক-আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি

বিশের দশকের শেষ দিকে ভারতবর্ষে শ্রমিক-আন্দোলন এক নতুন রূপ ধারণ করে। কেবল ১৯২৮ সালেই দেশে কমপক্ষে ২০৩টি ধর্মঘট হয় এবং মোট ৫,০৫,০০০ জন শ্রমিক-কর্মচারী এইসব ধর্মঘটে সামিল হন। এইসব ধর্মঘটের ফলে মোট ৩ কোটি ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ঘণ্টা শ্রম-সময় নষ্ট হয়। বোম্বাই ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে বস্ত্রশিল্পকর্মীদের মধ্যে বিপ্লবী গিরনি কামগর সংগঠনের সদস্যসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। 'দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ে' এবং মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মারহাট্টা রেলওয়ে' কর্মীরা বিপ্লবী কর্মপন্থার ভিত্তিতে শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। দেশের বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত 'কীর্তি', 'মজদুর', 'স্পার্ক', 'ক্রান্তি' প্রভৃতি কমিউনিস্ট পত্রিকা শ্রমিক-সংগঠন ও শ্রমিক-আন্দোলনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক'রে প্রচারকার্য চালাতে থাকে। শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট ভাবধারার হাত থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করার উদ্দেশে ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আইনসভায় 'জননিরাপত্তা বিল' (Public Safty Bill) এবং 'শ্রম-বিরোধ বিল' (Trade Disputes Bill) আনা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিল দু'টি অগ্রাহ্য হলেও ১৯২৯ সালে বড়লাট একটি বিশেষ অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে তা কার্যকর করার ব্যবস্থা করেন। শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে কমিউনস্টদের এরূপ প্রভাব বৃদ্ধিতে সংস্কারবাদী কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ প্রমাদ গুণলেন। তাঁরা 'ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে অনর্থ সৃষ্টিকারীদের উচ্ছেদ করার' শপথ গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালের মে মাসে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি **শিব রাও** এক বক্তৃতায় বলেছিলেন :

> The time has come when the trade union movement in India should weed out of its organisation mischief-makers. A warning is all the more necessary because there are certain individuals who go about preaching the gospel of strike.

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'সাইমন কমিশন' বয়কট আন্দোলনে বামপন্থীরা ও শ্রমিক-সংগঠনগুলি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল — একথা উপলব্ধি করতে পেরে শ্রমিকদের অবস্থার তথাকথিত উন্নতি সাধনের ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য হুইটলি কমিশন নিয়োগ করা হয়। সংস্কারবাদী এই কমিশন ভারতে এসে পৌঁছালে বামপন্থী প্রভাবিত শ্রমিক-সংগঠনগুলি সেই কমিশন বয়কট করে। এদিকে 'কমিউনিস্ট ভাবধারার বিপজ্জনক প্রসারে উৎকণ্ঠিত' হয়ে ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ সরকার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তেত্রিশ জন প্রখ্যাত শ্রমিক-নেতাকে 'রাজশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে' গ্রেপ্তার করে। এঁদের মধ্যে মুজফ্‌ফর আহমেদ, ডাঙ্গে, মিরাজকর, পি. সি. যোশী, বেঞ্জামিন ব্যাডলি, ফিলিপ স্প্র্যাট প্রমুখ শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন। শুরু হোল ঐতিহাসিক 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা'।

❑ ৫.১.৩ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি

একদিকে যখন শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, অন্যদিকে তখন পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বাংলাদেশ প্রভৃতি প্রদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত যুব-সমাজ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। ১৯২৮ সালের ৩০শে অক্টোবর লাহোরে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময়

পাঞ্জাবের প্রবীণ নেতা লালা লাজপৎ রাই পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হন এবং ১৭ই নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ সন্ডার্সের নির্দেশে লাঠি চালানো হয়েছিল বলে পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা তাঁকে হত্যা ক'রে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল পাঞ্জাবের হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের দুই নেতা ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার কক্ষের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ ক'রে 'জননিরাপত্তা বিল' ও 'শ্রম-বিরোধ বিলে'র বিরুদ্ধে তাঁদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে শুরু হোল বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। বিচারাধীন বন্দীদের রাজবন্দীর মর্যাদা দেওয়ার দাবীতে ৬৪ দিন অনশন ধর্মঘট চালিয়ে বাংলার তরুণ বিপ্লবী যতীন দাশ ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে মারা যান। তাঁর এই আত্মত্যাগ সমগ্র ভারতের যুব-মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এইভাবে কমিউনিস্ট ও সন্ত্রাসবাদী জাতীয় বিপ্লবীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে গান্ধী-সহ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতৃবৃন্দ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরা একথা উপলব্ধি করতে পারেন যে, অবিলম্বে ব্রিটিশ-বিরোধী কোন সংগ্রাম শুরু করা না হলে তাঁদের হাত থেকে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব এঁদের হাতে চলে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। **গান্ধী** তাঁর এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে বড়লাটের নিকট এক পত্রে লিখেছিলেন:

> হিংসাশ্রয়ী দলের (the party of violence) শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে ... ব্রিটিশ শাসনের সংগঠিত হিংসা এবং বর্ধিষ্ণু হিংসাশ্রয়ী দলের অসংগঠিত হিংসা এই উভয় শক্তির বিরুদ্ধে অহিংসা শক্তির প্রয়োগ করাই হোল আমার অভিপ্রায়। এ সময় চুপ ক'রে বসে থাকার অর্থ এদের হাতে অবাধ ক্ষমতা তুলে দেওয়া।

গান্ধীর এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে **রজনী পাম দত্ত** বলেছেন, উভয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই মনোভাব ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শ্রেণীর মনোভাবের সঙ্গে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গণ-আন্দোলনের সংঘর্ষে অবস্থা যখন চরমে ওঠে, তখন শঙ্কিত গান্ধী আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য অগ্রসর হন। আন্দোলনকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ 'বেপরোয়া ঝুঁকি' (mad risk) নিতে দ্বিধা করেন না। সেই সঙ্গে তিনি উভয় পক্ষকেই তাঁর 'অহিংসার যাদুদণ্ডে' (magic wand of non-violence) বশীভূত করতে চেষ্টা করেন।

❑ ৫.১.৪ সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের ব্যাপারে গান্ধীর দ্বিধা

উপরি-উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ভারতের সর্বত্র একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকে। দেশের মানুষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করার জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সংগ্রামের জন্য জনসাধারণ প্রস্তুত থাকলেও নেতৃবৃন্দ প্রস্তুত ছিলেন না। এমনকি, স্বয়ং গান্ধী নিজেই তাঁর ইতিকর্তব্য স্থির করতে পারছিলেন না। ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রশ্নের উত্তরে **গান্ধী** তাঁকে জানান, ''আমি দিনরাত্রি এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছি, কিন্তু চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে কোনও আলো দেখতে পাচ্ছি না।'' ১৯৩০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী সি. এফ. এণ্ড্রুজকে লেখা এক পত্রে তিনি জানেন :

কর্ম-পদ্ধতি এখনও আমরা নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়। এটা আইন অমান্য হবে। কিন্তু কীভাবে তা শুরু করা হবে, তা আমি নিজেই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি না।

কিন্তু **প্রশ্ন** হোল — কেন গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনর পথে পা বাড়ালেন? এর উত্তর স্বয়ং গান্ধীই দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন :

> একমাত্র আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বারাই দেশকে চরম বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। কারণ, দেশে এমন একটি দল রয়েছে, যারা আলোচনা, বক্তৃতা কিংবা প্রস্তাব কোনকিছুই শুনতে রাজি নয়, যারা বিশ্বাস করে শুধু প্রত্যক্ষ সংগ্রামে।

❑ ৫.১.৫ গান্ধীর আপসকামী মনোভাব : 'এগারো দফা দাবী'

১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাস শুরু হওয়ার পর ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল উত্তেজনায় যেন টগবগ্ ক'রে ফুটতে লাগল। ২৬শে জানুয়ারী দিনটিকে 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে পালন করা হয়। সমগ্র দেশে প্রকাশ্য জনসভায় পূর্ণ স্বরাজের প্রতিজ্ঞাপত্র বা ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। এই প্রতিজ্ঞাপত্রে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যত্নশীল হওয়ার কথা ঘোষিত হয়। প্রতিজ্ঞাপত্রে বলা হয়, ''ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রকার যোগাযোগ ছিন্ন ক'রে, কর না দিয়ে এবং আইন অমান্য করার জন্য নিজেদের সব রকম উপায়ে প্রস্তুত ক'রে তুলতে হবে।'' দেশ যখন আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত, তখন হঠাৎ গান্ধী ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে আইন ও শাসন-সংক্রান্ত সংস্কার সম্পর্কিত ১১-দফা প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করেন। গান্ধীর '১১-দফা দাবীগুলি হোল :

(১) মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধকরণ;

(২) টাকার বিনিময় হার ১ শিলিং ৪ পেনি ধার্যকরণ;

(৩) ভূমিরাজস্বের পরিমাণ অন্তত ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগটিকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন;

(৪) লবণ করের রহিতকরণ ;

(৫) সামরিক ব্যয় ছাঁটাইয়ের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তার অন্তত ৫০ ভাগ হ্রাসকরণ ;

(৬) রাজস্বখাতে আয়ের পরিমাণ হ্রাস করার অনুপাতে সিভিল সার্ভিসের সবচেয়ে মোটা মাইনের অফিসারদের বেতনের অন্তত অর্ধাংশ হ্রাসকরণ ;

(৭) বিদেশী বস্ত্রের ওপর সংরক্ষণ শুল্ক আরোপ ;

(৮) উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ আইন প্রবর্তন ;

(৯) হত্যা বা ভীতি প্রদর্শনের জন্য আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি ছাড়া সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ও সব রাজনৈতিক মামলার প্রত্যাহার ;

(১০) সি. আই. ডি. বিভাগের বিলোপ সাধন কিংবা ঐ বিভাগকে জনগণের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন এবং

(১১) আত্মরক্ষার জন্য জনগণকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের লাইসেন্স প্রদান।

'এগারো দফা দাবী' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সংগ্রামী জনগণ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়ে। কংগ্রেস-নেতৃত্বের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। ১১-দফা দাবী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে **জওহরলাল নেহরু** লিখেছেন :

> গান্ধীজী 'এগারো দফা দাবী' ঘোষণা করায় আরও বিস্ময় বাড়িয়া গেল। যদিও প্রস্তাবগুলি ভাল সন্দেহ নাই, তথাপি যখন আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলিতেছি, তখন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারমূলক কতকগুলি প্রস্তাবের সার্থকতা কি? পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে আমারা যাহা বুঝি, গান্ধীজীও কি তাহাই বোঝেন, অথবা আমাদের বলিবার ভাষা স্বতন্ত্র?

গান্ধীর ১১-দফা সম্পর্কে **সুভাষচন্দ্রের** বক্তব্য হোল :

> আইন অমান্য অভিযান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আপসের দরজা তিনি খোলা রাখিতে চাহিয়াছিলেন এবং উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাবটি একটি বাধা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার ধনী সমর্থকদিগের মধ্যে কেহ কেহ — ভারতীয় পুঁজিপতিগণ — লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিতে ভয় পাইয়া গিয়াছেন। সেজন্য কোনও এক প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষত এই কারণে যে, 'স্বাধীনতা' শব্দটির দ্বারা ব্রিটিশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ বুঝাইয়াছিল। ৩০শে জানুয়ারী তারিখে তিনি তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এই বলিয়া বিবৃতি দিলেন যে, যাহা 'স্বাধীনতার মর্ম', উহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন এবং ঐ কথার অর্থ ব্যাখ্য করিবার জন্য তিনি এগারোটি দফার উল্লেখ করিলেন।

ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ গান্ধীর ১১-দফা দাবী সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস' (৩য় খণ্ড) নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

> এই ''এগারো দফা'' দাবিটাকে ভালো করে দেখলেই এর পেছনকার শ্রেণী-স্বার্থটাকে বেশ চিনতে পারা যায়। এই সমস্ত দাবির অধিকাংশই হচ্ছে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা যা চায়, সেই সবই। জমির খাজনা, নুনের ওপরে কর ইত্যাদি কমানোর কিংবা তা উঠিয়ে দেওয়ার দাবিগুলো বিপুলসংখ্যক গরিব চাষীর, ভূমিহীন মানুষের, শ্রমিকের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈকি। এইসব দাবিতে গরিব মানুষদের, মধ্যবিত্ত মানুষদের বিপুল সংখ্যায় কংগ্রেসের আন্দোলনে টেনে আনতে পারা গিয়েছিল। কিন্তু এতে তো জমিদার-পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে টুস্কি লাগারও কথা নয়। কৃষক সমাজের বিষম ভারী খাজনার বোঝা, সুদের বোঝা, শ্রমিকদের-মধ্যবিত্তশ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায্য মজুরী, বেতন — এইসব ব্যাপারকে ভারতবর্ষের হতদরিদ্র মানুষদের জ্বলন্ত সমস্যাবলীর মধ্যে গান্ধী যে অন্তর্ভুক্ত করলেন না, তা অর্থবহ বৈকি। ... গান্ধী যে এখন 'এগারো দফা' দাবিতে নেমে এসেছেন, তাঁর এই রাজনীতিটা হচ্ছে প্রতিপক্ষের ইচ্ছা-অভিলাষটা কেমন, তার হদিস পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ঘুড়ি ওড়ানো। তবে গান্ধীর এই যে-ঘুড়িটা উড়ছিল, তা ব্রিটিশ সরকারের

বিরোধিতার ঝড়ো বাতাস লেগে গোত্তা খেয়ে পড়ে গেল! সুতরাং আর কী; কংগ্রেস-বুর্জোয়া নেতৃত্ব এবার লড়াই-এ নামার চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হলেন।

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারীর শুরুতে পরিস্থিতি গান্ধীর পক্ষে অনুকূল হয়ে দাঁড়াল। কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য তাঁর হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী 'মহাত্মা' তাঁর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। তিনি তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখেছিলেন :

> হিংসাত্মক শক্তিগুলিকে সংযত রাখিবার জন্য যদিও ধারণাযোগ্য ও সম্ভাব্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা করা হইবে, তথাপি এবার আইন অমান্য একবার শুরু হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আইন অমান্যকারীও মুক্ত কিংবা জীবিত থাকিবেন, ততক্ষণ উহা বন্ধ করা যাইবে না এবং হইবে না।

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **সুভাষচন্দ্র** লিখেছেন, ''চৌরিচৌরাতে জনতার হিংসা প্রদর্শনের পর ১৯২২ সালে বারদৌলীতে পশ্চাদপসরণ করায় যাঁহারা তীব্র আপত্তি জানাইয়াছিলেন, শেষ বিবৃতিটি হইতে তাঁহারা দৃঢ় আশ্বাস লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।'' যাই হোক্, ৬ই মার্চ গান্ধী লর্ড আরউইনকে জানালেন যে, অবিলম্বে ১১-দফা প্রস্তাব কার্যকর করা না হলে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হবেন। গান্ধীজীর পত্রের উত্তরে বড়লাট জানালেন, আইনভঙ্গ আন্দোলন শুরু করা হলে তাঁর করার কিছুই নেই। কারণ, আইন ভঙ্গের অর্থ হোল দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা। ভাইসরয়ের এই উত্তরের পর আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ছাড়া গান্ধীর সামনে অন্য কোন বিকল্প ছিল না।

অনুশীলনী - ১

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১। আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা কর।

২। আইন অমান্য আন্দোলনের পেছনে যেসব কারণ ছিল, সেগুলি বিশ্লেষণ কর।

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। আইন অমান্য অন্দোলনের আর্থ-সামাজিক কারণগুলি কী?

২। গান্ধীর 'এগরো দফা দাবী'র ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৫.২ আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা ও পরিব্যাপ্তি

❑ ৫.২.১ আইন অমান্য আন্দোলনের সুচনা

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন (১৯২৯) খাজনা দেওয়া বন্ধ করা এবং আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী রূপায়ণ করার দায়িত্ব কার্যনির্বাহী সমিতিকে প্রদান করেছিল। এই অধিবেশন মঞ্চ থেকে সব স্তরের আইনসভার সদস্যদের পদত্যাগ করার জন্যও আহ্বান জানানো হয়েছিল। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কার্যনির্বাহী সমিতির বৈঠক বসে সবরমতী আশ্রমে। ঐ বৈঠকে গান্ধীজীকে তাঁর পছন্দমতো সময় ও স্থান

থেকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। গান্ধীজীর ১১-দফা দাবী উপেক্ষিত হওয়ায় তাঁর সামনে তখন একটিই মাত্র পথ খোলা ছিল। তা হোল আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা।

গান্ধী ডাণ্ডিতে গিয়ে লবণ আইন অমান্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর পর শুরু হয় ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযান। এই অভিযানের বেশ কিছুদিন পূর্বে (২রা মার্চ) তিনি ভাইসরয়কে একটি চিঠি লেখেন। তাতে কেন তিনি ব্রিটিশ শাসনকে 'অভিশাপ' বলে মনে করেন, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। তাঁর ভাষায়, ''এই শাসন ক্রমবর্ধমান শোষণের এক ব্যবস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি মূক মানুষকে হতদরিদ্রে পরিণত করেছে। ... রাজনৈতিকভাবে এই শাসন আমাদের দাসত্বের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। শুষে নিয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তির প্রাণরস। ... আত্মিক দিক থেকে আমাদের করেছে হতমান।'' ঐ চিঠিতে তিনি তাঁর সম্ভাব্য পরিকল্পনার কথা ভাইসরয়কে জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। **গান্ধী** লিখেছিলেন :

> এই মাসের ১১ তারিখে আশ্রমের যত বেশি সহকর্মীকে পাব, তাদের নিয়ে লবণ আইন অমান্য করতে যাব। ... আমি জানি, আমাকে গ্রেপ্তার করে আমার পরিকল্পনা বাঞ্চাল ক'রে দেওয়ার সুযোগ আপনার হাতে রয়েছে। আমি আশা করব, আমার পর আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য হাজার হাজার কর্মী সুশৃঙ্খলভাবে তৈরী থাকবে। তারা লবণ আইন অমান্য ক'রে এমন আইনের শাস্তি ভোগ করার জন্য নিজেদের সমর্পণ ক'রে দেবেন, যে-আইন দিয়ে কখনও আইনের বই কলঙ্কিত করা উচিত নয়।

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ গান্ধী তাঁর সবরমতী আশ্রমের একান্ত অনুগত ৭৮ জন পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে লবণ আইন অমান্য করার উদ্দেশে ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। মোট ২৪ দিনে ২৪১ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে তাঁরা ৫ই এপ্রিল ডাণ্ডির সমুদ্র উপকূলে উপস্থিত হন। ঐ ঐতিহাসিক পদযাত্রায় অসংখ্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান্ধীকে অনুসরণ করেছিল। বস্তুত, গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান গণ-অভিযানের প্রতীক বলে বিবেচিত হতে পারে। ৬ই এপ্রিল নিজেই লবণ প্রস্তুত ক'রে তিনি লবণ আইন অমান্য করেন। এর পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঐ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলাদেশের মেদিনীপুরে কর বন্ধ আন্দোলন শুরু হোল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুর্ধর্ষ পাঠানরা আব্দুল গফ্‌ফর খানের নেতৃত্বে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনে সামিল হয়। এছাড়া, শুরু হোল বিদেশী পণ্য ও মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন। ১০ই এপ্রিল ভারতের নারী-সমাজকে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানালে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। এর পর সুরাট জেলার ধারসানায় অবস্থিত লবণ গুদাম অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পূর্বেই ৪ঠা মে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গান্ধীর গ্রেপ্তার হওয়ার পর ঐ দায়িত্ব পালন করেন সরোজিনী নাইডু। এইভাবে লবণ আন্দোলন ও বয়কট কর্মসূচী সারা ভারতবর্ষে ব্যাপক আকার ধারণ করে।

১৯৩০-৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলন যে কতখানি পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল, তা দু'চারটি উদাহরণ থেকেই উপলব্ধি করা সম্ভব। অহিংস সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী মার্কিন সাংবাদিক **ওয়েব মিলার** লিখেছেন, অহিংস সত্যাগ্রহীরা পুলিশের লাঠির আঘাতে জর্জরিত হলেও একজনও পুলিশকে প্রত্যাঘাত করেনি। প্রথম দিনেই অন্তত ৩২০ জন লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল এবং বেশ কিছু মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। কেবল ওয়াদলাতে প্রায় ১৫০০০ সত্যাগ্রহী লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হলে তার

প্রতিবাদে বোম্বাই শহরে লক্ষাধিক মানুষের একটি বিক্ষোভ মিছিল বেরোয়। আইন অমান্য আন্দোলনের পাশাপাশি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চলতে থাকায় ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে 'বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল' পুনরায় চালু করা হয় এবং 'প্রেস অর্ডিন্যান্স'-এর মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। কংগ্রেসের সংগঠনগুলিকে বেআইনি বলে যেমন ঘোষণা করা হয়, তেমনি নিষিদ্ধ করা হয় জনসভা ও শোভাযাত্রা। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঐ সময় ৬০,০০০-এরও বেশী মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। বহু সত্যাগ্রহীকে মিথ্যা ফৌজদারী মামলায় জড়ানো হয়। সরকারী হিসেব অনুযায়ী ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে নিহত ও আহতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৫ ও ১১২। মে মাসে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫৬ ও ৩০৮ -এ দাঁড়ায়।

❑ ৫.২.২ গান্ধী - আরউইন চুক্তি

১৯৩০ সালের ৭ই জুন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৫ই আগস্ট কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবী স্বীকার ক'রে না নিলে কংগ্রেস অন্য কোন সমাধানের সূত্র গ্রহণ করতে রাজী হবে না। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে উপেক্ষা ক'রে ১৯৩১ সালে লণ্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে। এই বৈঠকে কংগ্রেস কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করেনি। কিন্তু ভারতের বৃহত্তম গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কংগ্রেসের অনুপস্থিতি গোলটেবিল বৈঠককে গুরুত্বহীন ক'রে তোলে। শেষ পর্যন্ত ১৯৩১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রচেষ্টায় গান্ধীর সঙ্গে বড়লাট আরউইনের সাক্ষাৎকার ঘটে এবং ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল চারটি, যথা —

(১) আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হবে ;

(২) গোলটেবিল বৈঠকে প্রস্তাবিত মূল নীতিগুলির ওপর ভিত্তি ক'রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিতে ভারতের জন্য সংবিধান তৈরী করা হবে ;

(৩) ভবিষ্যতে এইসব বিষয় আলোচনার সময় কংগ্রেস প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হবে এবং

(৪) অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনে যেসব ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সরকার তাদের সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করবে।

লক্ষণীয় বিষয় হোল — বিপ্লবী ভগৎ সিং ও তাঁর দুই সহকর্মী শুকদেব ও রাজগুরুর মৃত্যুদণ্ড রদের জন্য ভাইসরয়ের কাছে দাবী জানানোর জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ গান্ধীর কাছে আবেদন জানান। কিন্তু গান্ধী সে বিষয়ে যে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখাননি, তার প্রমাণ হোল গান্ধী-আরউইন চুক্তি। ভগৎ সিং ও তার সহকর্মীদের ফাঁসির আদেশ রদ করাকে এই চুক্তির অন্যতম শর্ত হিসেবে রাখা যেত। কিন্তু গান্ধী তা করেননি। তাই ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত যে-করাচী কংগ্রেসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদিত হয়, সেই কংগ্রেসে যোগদানের জন্য গান্ধী উপস্থিত হলে তাঁকে সমবেত যুব সমাজ কালো পতাকা দেখিয়ে এবং কালো ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তাছাড়া, তাদের শ্লোগান থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তারা ভগৎ সিং-দের ফাঁসির জন্য কার্যত গান্ধীকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল।

❑ ৫.২.৩ দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

গান্ধী-আরউইন চুক্তির মাধ্যমে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কার্যত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী বাতিল ক'রে দিয়েছিল। করাচী কংগ্রেসে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের এই মনোভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সভাপতির ভাষণে প্যাটেল পূর্ণ স্বাধীনতার কথাটিকে এড়িয়ে গিয়ে পুনরায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে ভারতবাসীর লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। যাই হোক্, কংগ্রেস প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করলেও নতুন ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে গান্ধী লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কংগ্রেসের কোনও শীর্ষস্থানীয় নেতা ঐ বৈঠকে গান্ধীর সঙ্গে না থাকলেও সমকালীন ভারতবর্ষের অনতম পুঁজিপতি ঘনশ্যামদাস বিড়লা গান্ধীর সঙ্গে লণ্ডন গিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত যে যথাযথ হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। কারণ, তথ্যাবলী সম্পর্কে গান্ধীর বিশেষ কোন ধারণা ছিল না এবং ভারতীয় পরিস্থিতির খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছুই জানতেন না। তাই **নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য** তাঁর লেখা 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ''যে-ঈশ্বরকে ভরসা ক'রে গান্ধী গিয়েছিলেন, সেই ঈশ্বরই গান্ধীকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। কংগ্রেস যে সর্ববৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধী সেটাই প্রমাণ করতে পারেননি। সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিই ভারতের প্রধান, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে এটাই প্রতিভাত হয়েছিল।'' তাই শেষ পর্যন্ত ২৮শে ডিসেম্বর তাঁকে শূন্য হাতেই স্বদেশে ফিরে আসতে হয়।

❑ ৫.২.৪ পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু

১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধী পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। উত্তরপ্রদেশে পুনরায় খাজনা বন্ধের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে জওহরলাল, পুরুষোত্তম দাস টেন্ডন প্রমুখ গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার বরণ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গফ্ফর খানের 'খুদাই খিদমৎগার' বা লালকোর্তা দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশেও সরকারী দমন-পীড়ন ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। নানা প্রকার দমনমূলক অর্ডিন্যান্স জারী ক'রে সরকার ১৯৩২ সালে গান্ধী, প্যাটেল-সহ প্রথম শ্রেণীর কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ এবং নব্বই হাজারেরও বেশী কংগ্রেস-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। কংগ্রেস ৬-১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত 'জাতীয় সপ্তাহ' পালনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানায়। সারা ভারতবর্ষ কংগ্রেসের আহ্বানে অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। ১৯৩০-৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সরকার যেরূপ দমন-পীড়ন চালিয়েছিল, ১৯৩২-৩৩ সালে তার থেকে অনেক বেশী দমন-পীড়ন চালানো হয়েছিল। ১৯৩২ সালের ২রা মে প্রদত্ত **পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের রিপোর্ট** থেকে জানা যায় যে, ১৯৩২ সালের প্রথম চার মাসে মোট ৮০ হাজার লোক আইন অমান্য ক'রে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বেআইনী অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয় যে, ঐ বছরের মার্চ মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত পনেরো মাসে গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার। তাছাড়া, পাইকারী হারে নিপীড়ন, প্রহার, গুলিবর্ষণ, পিটুনি, পুলিশী নির্যাতন, গ্রামে গ্রামে পাইকারী জরিমানা ও গ্রামবাসীদের জমি ও বিষয়-আশয় বাজেয়াপ্ত করার অনেক তথ্য 'ইণ্ডিয়া লীগ' ডেলিগেশনের রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। ১৯৩২ সালের ১৭ই আগস্ট রামসে ম্যাকডোনাল্ড তাঁর বিখ্যাত

'সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা' (Communal Award)-র কথা ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে গান্ধী ২০শে সেপ্টেম্বর অনশন শুরু করেন। সমগ্র দেশ আইন অমান্য অপেক্ষা গান্ধীর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ফলে কার্যত আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। এর পর হঠাৎ তিনি আত্মশুদ্ধি ও হরিজনদের কল্যাণের জন্য ২১ দিন অনশন শুরু করলেন এবং সাময়িকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। এই সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ হয়ে সেই সময় বিদেশে অবস্থানকারী **সুভাষচন্দ্র** ও **ভিটলভাই প্যাটেল** এক ইস্তেহার প্রকাশ ক'রে তাতে বলেন : মিঃ গান্ধীর আইন স্থাগিত রাখার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত পরাজয়ের স্বীকৃতি মাত্র। ... আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত হোল — রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মিঃ গান্ধী ব্যর্থ হয়েছেন। নতুন নীতি ও নতুন কর্ম-পদ্ধতির ওপর ভিত্তি ক'রে কংগ্রেস সংগঠনকে পুনর্গঠিত করার সময় উপস্থিত হয়েছে। এই কাজের জন্য একজন নতুন নেতার প্রয়োজন।

এর পর ১৯৩৩ সালের ১লা আগস্ট তিনি ব্যক্তিগত আইন আমান্য আন্দোলন শুরু করার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু আন্দোলন শুরু করার পূর্বদিনে তিনি ৩৪ জন সহযোগী-সহ গ্রেপ্তার হন। এইভাবে আইন অমান্য আন্দোলন যখন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক সেই সময় ১৯৩৪ সালের ১৬ই জানুয়ারী বিহারের সর্ববিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়।

অনুশীলনী - ২

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্তগুলি কী?

২। গান্ধী-আরউইন চুক্তির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৫.৩ মূল্যায়ন

কিন্তু **প্রশ্ন** হোল — ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকা সত্ত্বেও কেন গান্ধী লবণ আইন অমান্য ও বিদেশী পণ্য বর্জনের মধ্যে আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন? গান্ধীর **মার্কসবাদী সমালোচকরা** মনে করেন যে, এরূপ করার পেছনে গান্ধীর শ্রেণী-মানসিকতা কাজ করেছিলে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **রজনী পাম দত্ত** বলেছেন, সংগ্রামের এরূপ ধারণার সঙ্গে গান্ধীর রণকৌশলের চমৎকার মিল ছিল। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামকে জয়ের শীর্ষদেশে পৌঁছাতে না দেওয়া। বরং, অপ্রতিরোধ্য বিপ্লবী অবস্থার মধ্যে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজের হাতে রেখে সেই আন্দোলনের গতিবেগ যথাসাধ্য সীমাবদ্ধ ও প্রশমিত ক'রে রাখাই ছিল গান্ধীর লক্ষ্য। আন্দোলনের প্রথম অস্ত্রটির নির্বাচন অর্থাৎ, লবণ আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ হোল তাঁর রণকৌশলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি সরকারের একচেটিয়া লবণ ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, এরূপ সংগ্রামে কলকারখানার শ্রমিকদের অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা যথেষ্ট কম ছিল। ইতঃপূর্বে তিনি শ্রমিক-আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ভীতির কথা বার বার ঘোষণা করেছিলেন। তাছাড়া, কৃষকদের এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সামিল করা গেলে

স্বাভাবিকভাবে তাদের দৃষ্টি জমিদার-বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাবে। আবার, আন্দোলনে বিদেশী পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় পুঁজিপতিদের পুঁজি-বিকাশের পথ প্রশস্ত করা। তাই দেখা যায়, গান্ধী-পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মতো হিংসাত্মক হয়ে না উঠলেও গান্ধী তা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হন। এইভাবে গান্ধী-নেতৃত্বের আপসকামী মনোবৃত্তি ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের দ্বৈত-চরিত্র প্রকাশ ক'রে দিয়েছে।

আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কোনমতেই অস্বীকার বা উপেক্ষা কার যায় না। এ প্রসঙ্গে **রজনী পাম দত্তের** মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন :

> ১৯৩০-৩৪ সালের বিরাট আন্দোলনের এমন শোচনীয় পরিণতি ঘটলেও আমরা যেন মুহূর্তের জন্যও তার ঐতিহাসিক কীর্তি, গভীর শিক্ষা ও অপরিসীম স্থায়ী ফললাভের কথা বিস্মৃত না হই। যে-আন্দোলনের পশ্চাতে জনসাধারণের অপরিসীম সমর্থন, উদ্দীপনা ও দুঃখবরণ ছিল, যে-আন্দোলন সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছেছিল, তার এই বেদনাদায়ক ব্যর্থতার কারণগুলি ভাববার, বোঝবার ও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বারে বারে পর্যালোচনা করার বিষয়। ... যাই হোক্, জাতীয় আন্দোলনের ঐ ক'বছরের ইতিহাস গর্বের বস্তু। ঐ ক'বছরে নির্যাতনের সর্বপ্রকার আধুনিক আয়ুধ প্রয়োগ করেও সাম্রাজ্যবাদ ভারতের জনগণকে বশ্যতা মানাবার ও তাদের স্বাধীনতার আন্দোলন চূর্ণ করার যে স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে। ... সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি। ঐ ক'বছরের অগ্নি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এক নতুন ও বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য, আত্মবিশ্বাস, গর্ব ও দৃঢ় সংকল্প।

অনুশীলনী - ৩

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। ১৯৩০-৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধী-নেতৃত্বের প্রকৃতি কী?

২। ১৯৩০-৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধী-নেতৃত্বের গুরুত্ব কী?

৫.৪ সারসংক্ষেপ

গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত দ্বিতীয় গণ-আন্দোলন হোল আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩৪)। এই আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ ও তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে যে-অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তার ফলে ভারতীয় সমাজের সর্বত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী সংকটের হাত থকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলি বিশ্বের বাজার দখল করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। তার ফলে ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থ বিনষ্ট হলে তারা কংগ্রেসের মঞ্চে এসে সমবেত হয়। অন্যদিকে, ব্যপকভাবে শ্রমিক আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তীব্রতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকলে গান্ধী হিংসাশ্রয়ী দলের শক্তি বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে কার্যত আন্দোলন করার কথা চিন্তা করেন। বস্তুত, সমগ্র ভারতবর্ষ যখন গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ, সেই সময় কর্ম-পদ্ধতি

নির্ধারণের ক্ষেত্রে গান্ধীর দ্বিধা এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরও গান্ধীর আপসকামী মনোভাব তাঁর 'এগারো-দফা কর্মসূচী' ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপসরফা করার সব প্রয়াস ব্যর্থ হলে ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ১৯৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করলেও গান্ধী তথা কংগ্রেস সেই বৈঠক বয়কট করেন। তাই দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন সরকার এবং সেখানেই সম্পাদিত হয় গান্ধী-আরউইন চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কার্যত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী বাতিল ক'রে দিয়েছিল। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস তথা ভারতবাসী কার্যত কোনকিছু লাভ করতে পারেনি। তাই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধী পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন এবং সেই আন্দোলন যখন ব্যাপকতা লাভ করেছে, ঠিক সেই সময় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত 'সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা'র প্রতিবাদে গান্ধী ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনশন শুরু করেন। সমগ্র দেশ তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ফলে আইন অমান্য আন্দোলন কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এর পর হঠাৎ তিনি আত্মশুদ্ধি ও হরিজন-কল্যাণের জন্য অনশন শুরু করেন। ১৯৩৩ সালে পুনরায় তিনি ব্যক্তিগত আইন অমান্য কর্মসূচী গ্রহণ করলেও ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে বিহারের সর্ববিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর সেই আন্দোলন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। পরিশেষে এই আন্দোলনে গান্ধী-নেতৃত্বের প্রকৃতির মূল্যায়ন করা হয়েছে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত আন্দোলনের সময় একটিও হিংসার ঘটনা না-ঘটা সত্ত্বেও গান্ধী তাঁর শ্রেণী-চরিত্রের জন্যই আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও বলা যায়, গান্ধীর নেতৃত্বে পরচালিত আইন অমান্য আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বা তাৎপর্যকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

৫.৫ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৫.১ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৫.১ দ্রষ্টব্য।

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৫.১.১ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৫.১.৫ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী - ২

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৫.২.২ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৫.১.৫ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী - ৩

■ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১ নং প্রশ্ন - ৫.৩ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৫.৩ দ্রষ্টব্য।

৫.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

ESSAY - TYPE QUESTIONS

1. Expalin the circumstances leading to the Civil Disobedience Movement of 1930-34. What was the importance of the Gandhian Leadership in the movement ?
2. Analyse the factors leading to the Civil Disobedience Movement of 1930-34. What was the nature of Gandhian leadership in the movement ?

SHORT ANSWER - TYPE QUESTIONS

1. What were the socio-economic reasons for the Civil Disobedience Movement of 1930-34 ?
2. Write a short note on the 11-Point Demands of Gandhi.
3. What were the provisions of the Gandhi-Irwin Pact ?
4. What was the importance of the Gadhian leadership in the Civil Disobedience Movement of 1930-34 ?
5. What was the nature of the Gandhian leadership in the Civil Disobedience Movement of 1930-34 ?

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

Bose, Subhas Chandra, *The Indian Struggle*.

Chandra Bipan, Mridula Mukerjee, Aditya Mukherjee, K. N. Panikkar and Sucheta Mahajan, *India's Struggle for Independence*.

Dutt, R. Palme, *India Today*.

Josh, Sohan Singh, *The Great Attack : Meerut Conspiracy Case*.

Namboodiridpad, E. M. S., *A History of Indian Freedom Struggle*.

Sarkar, Sumit, *Modern India : 1885-1947*.

Tendulkar, D. G., *Mahatma*, vol. III.

আন্তোনভা, কো., গ্রি. বোন্‌গার্দ-লেভিন, গ্রি. কতোভস্কি, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*।

চন্দ্র, বিপান, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে, *স্বাধীনতা সংগ্রাম*।

চন্দ্র, বিপান, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী, কে. এন. পানিক্কর ও সুচেতা মহাজন, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম*।

চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*।

ত্রিপাঠী, অমলেশ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*।

নাম্বুদিরিপাদ, ই. এম. এস., *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড।

নেহরু, জওহরলাল, *আত্মচরিত*।

বসু, সুভাষচন্দ্র, *ভারতের মুক্তি সংগ্রাম*, ১৯২০-১৯৪২, প্রথম খণ্ড।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম*।

সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭*।

- o -

একক - ৬

(Unit - 6)

আগস্ট আন্দোলন, ১৯৪২

(August Movement, 1942)

এককের গঠন-বিন্যাস

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ আগস্ট আন্দোলনের পটভূমি

৬.১.১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি

৬.১.২ ভারতবর্ষে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

৬.১.৩ সংগ্রামের প্রকৃতি নিয়ে কংগ্রসের মধ্যে মতবিরোধ

৬.১.৪ আপস-বিরোধী সম্মেলন

৬.১.৫ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আপসমুখী মনোভাব

৬.১.৬ আগস্ট প্রস্তাব (১৯৪০) ও তার প্রতিক্রিয়া

৬.১.৭ ক্রিপস্ প্রস্তাব ও তার প্রত্যাখ্যানের কারণ

৬.১.৮ কংগ্রেস কর্তৃক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব (১৯৪২) গ্রহণ

৬.২ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন : গতি - প্রকৃতি

৬.২.১ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের হিংসাত্মক রূপ

৬.২.২ আগস্ট বিপ্লবের গণ-চরিত্র

৬.৩ গান্ধী-নেতৃত্বের মূল্যায়ন

৬.৪ সারসংক্ষেপ

৬.৫ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৬.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৬.০ উদ্দেশ্য

গান্ধীজীর নেতৃত্বে শেষ গণ-আন্দোলন হোল আগস্ট আন্দোলন বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন (১৯৪২)। কোন্ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করেছিল, বর্তমান ইউনিটে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংগ্রামের প্রকৃতি নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে এই ইউনিটে যেমন আলোচনা রয়েছে, তেমনি আবার কংগ্রেস নেতৃত্বের আপসমুখী মনোভাব সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক চাপে ব্রিটিশ সরকার ভারতে ক্রিপস্ মিশন পাঠায় এবং কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যথারীতি ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এর পর ১৯৪২ সালে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে গান্ধীর নেতৃত্বে তৃতীয় তথা সর্বশেষ গণ-আন্দোলনের বার্তা ঘোষিত হয়। কিন্তু ৮ই আগস্ট গভীর রাতে সেই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার গান্ধী-সহ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সব সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হলেও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন অহিংসার গণ্ডি অতিক্রম ক'রে হিংসার পথে অগ্রসর হয়। উপরি-উক্ত বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে তুলে ধরাই হোল বর্তমান এককের উদ্দেশ্য।

৬.১ আগস্ট আন্দোলনের পটভূমি

❑ ৬.১.১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত গণ-আন্দোলনগুলির তৃতীয় তথা সর্বশেষ আন্দোলন হোল ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন বা 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' (Quit India Movement)। এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করতে হলে সমকালীন ভারত তথা বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জার্মান-ফ্যাসিবাদ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকারী শক্তি ও যুদ্ধের সর্বপ্রধান প্ররোচকের ভূমিকা গ্রহণ করে। তীব্র কমিউনিস্ট-বিরোধী মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে জার্মানি ১৯৩৬ সালে ইতালি ও জাপানের সঙ্গে কমিন্টার্ন-বিরোধী এক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কার্যত একটি 'বৈধ আগ্রাসী সামরিক জোট' গড়ে তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার কাজে এই সামরিক জোটকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলির একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ঐ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে সম্পাদিত হয় মিউনিক চুক্তি। ১৯৩৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির মাধ্যমে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি চেকোশ্লোভাকিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সীমান্তবর্তী অঞ্চল জার্মানিকে প্রদান করে। লক্ষণীয় বিষয় হোল — হিটলার ও মুসোলিনীকে তোষণ করার আতিশয্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এদুয়ার্দ দাদালিয়ের চেক-প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতেই চেকোশ্লোভাকিয়াকে খণ্ড-বিখণ্ড করার উদ্দেশে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। মিউনিক চুক্তি সম্পাদনের পুরস্কার হিসেবে জার্মানি ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে আক্রমণ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করে। ৩০শে সেপ্টেম্বর দ্বি-পাক্ষিক ইঙ্গ-জার্মান ঘোষণাপত্র কিংবা ৬ই ডিসেম্বরের ফরাসী-জার্মান ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বিশ্ববাসী এই অনাক্রমণ চুক্তির কথা জানতে পারে। কিন্তু তথাকথিত

বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশে মিউনিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বলে প্রচার করা সত্ত্বেও এর মাধ্যমে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি যে নিজেদের সৃষ্ট ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের হাতে নিজেরাই আক্রান্ত হতে পারে, তা তখনও তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ চেম্বারলেনের ভূমিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন —

> এই বুড়োটা আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যুর রায় স্বাক্ষর করল এবং এই রায়টিকে কার্যকর করার জন্য তাতে আমাদের কেবল একটি তারিখ বসালেই চলবে।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী ও সোভিয়েত-বিরোধী নীতি কেবল ফ্যাসিস্ট জার্মানিকেই নয়, সেই সঙ্গে সমরবাদী জাপানকেও স্বাধীনভাবে কাজ করার স্বীকৃতি দিয়ে কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। এমতাবস্থায় ১৯৩৯ সালের ১৭ই এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধের উদ্দেশে সোভিয়েত-ইঙ্গ-ফরাসী সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করে। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি তিনটি দেশের সামরিক প্রতিনিধিবৃন্দ মস্কোয় সমবেত হয়ে পূর্বোক্ত পরিকল্পনা পেশ করে। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি তিনটি দেশের সামরিক প্রতিনিধিবৃন্দ মস্কোয় সমবেত হয়ে পূর্বোক্ত পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হন। কিন্তু একই সময়ে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার গোপনে হিটলারকে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করার এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। এইভাবে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের শাসকশ্রেণীর দোষে মস্কো-আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল অনুসরণ ক'রে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হয়। এর ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু ফ্যাসিবাদী জার্মানীর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে পোল্যাণ্ডের ওপর। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে ওঠে।

❑ ৬.১.২ ভারতবর্ষে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

মিত্র দেশ পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে ৩রা সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারতের জনসাধারণ কিংবা তাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই ব্রিটিশ সরকার ভারতকে 'যুদ্ধরত' (belligerent) দেশ বলে ঘোষণা করে এবং মালয় ও দূর প্রাচ্যে ভারতীয় সেনা প্রেরণ করতে শুরু করে। সমগ্র ভারতবর্ষে এর মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। পাঞ্জাব, বাংলা ও সিন্ধুপ্রদেশের অকংগ্রেসী সরকারগুলি ব্রিটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। দেশীয় রাজন্যবর্গও সরকারের পেছনে এসে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন ও হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশ সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ও ফরওয়ার্ড ব্লক ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম শুরু করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানায়। কিন্তু মুসলিম লীগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনকে শর্তাধীনে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়। লীগের মতে, ভারতের কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। ঐসব প্রদেশে মুসলমানদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও মর্যাদা বিপন্ন হচ্ছে বলে নেতৃবৃন্দ মনে করেন। তাই ঐসব প্রদেশে মুসলমানদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাদেশিক গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করার নির্দেশ সরকার প্রদান করলে মুসলিম লীগ ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলে ঘোষণা করে।

নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকায় শুরুতে কংগ্রেস কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯৩৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর **জওহরলাল** ঘোষণা করেন যে, একদিকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা এবং অন্যদিকে ফ্যাসিবাদ ও আক্রমণ — এই দু'এর মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের সহানুভূতি অবশ্যই থাকবে। তবে তিনি এবং কংগ্রেসের অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দ ভারতীয় জনগণ কিংবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন রকম পরামর্শ ছাড়াই ভারতকে 'যুদ্ধরত' দেশ বলে ঘোষণা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের দাবী হোল — যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে হবে এবং ভারতের জনপ্রতিনিধিদের হাতে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। কিন্তু ঠিক তার পরের দিন **গান্ধী** তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন, ''আমি এই মুহূর্তে ভারতের মুক্তির কথা (India's deliverance) চিন্তা করছি না।'' তাঁর ভাষায় :

> I am not just now thinking of India's deliverance. It will come, but what will it be worth if England and France fall, or if they come out victorious over Germany ruined and humbled ?

তিনি বিনা শর্তে ইংল্যাণ্ডকে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানান। দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকার যে-কর্মসূচী গ্রহণ করবে, তাকে কার্যর করার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে বলে অভিমত পোষণ করেন। এমনকি, সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে ভাইসরয়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে গান্ধী তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতি তাঁর সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু বিশ্ব-রাজনীতি ও ভারতের ব্যাপারে ব্রিটেনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা ক'রে নেহরু একাধিক বিবৃতি দেন। গান্ধী-নেহরুর মতবিরোধ চলাকালীন অবস্থায় ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঐ প্রস্তাবে দ্বিধাহীনভাবে ন্যাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের সমালোচনা করা হয় এবং জার্মানি কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়। প্রস্তাবে একথাও বলা হয় যে, গণতন্ত্রের যথার্থ মাপকাঠি হোল সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ উভয়েরই অবসান এবং অতীত ও বর্তমানে তাদের সঙ্গে জড়িত আক্রমণের পরিসমাপ্তি। বলা বাহুল্য, এর ওপর ভিত্তি ক'রে যে-নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে, সেই ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে কার্যকরী সমিতি সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কিন্তু যে-যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ধারায় প্রবাহিত এবং ভারত ও অন্যান্য স্থানে সাম্রাজ্যবাদকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, তার সঙ্গে সমিতি কোনমতেই নিজেকে যুক্ত করতে পারে না। ঐ প্রস্তাবে কার্যকরী সমিতি পরিষ্কারভাবে সরকারকে একথা জানিয়ে দেয় যে, যতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার তাদের যুদ্ধ-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান না করবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কংগ্রেস পূর্ণ সহযোগিতা করবে না। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে জওহরলাল নেহরুর যুদ্ধ-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিমতের প্রতিফলন যতখানি লক্ষ্য করা যায়, গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিমতের প্রতিফলন ততখানি ঘটেনি। অন্যদিকে, কমিউনিস্টরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে। তাছাড়া, ভারতীয় জনগণের মতামত না নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতকে জড়িয়ে ফেলার জন্য তাঁরা ব্রিটিশ সরকারকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। তাঁরা যুদ্ধ-সংকটকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের কাজে ব্যবহার করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান। কিন্তু কংগ্রেসের আপসকামী ও বুর্জোয়া নেতৃত্ব তা করতে রাজী ছিলেন না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নীরবতা কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ

অংশকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। তাঁরা বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভা থেকে পদত্যাগ করার মাধ্যমে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। এমনকি, কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী (Congress Socialists) ও সুভাষপন্থীরা কংগ্রেসের পদত্যাগের দাবীতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এমতাবস্থায় গান্ধী-সহ কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হন। ১৯৩৯ সালের ৯-১০ই অক্টোবর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (A.I.C.C.)-র সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ৩১ শে অক্টোবরের মধ্যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগের পূর্বে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির বিশেষ অধিবেশন আহ্বান ক'রে এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে যে, ভারতের জনগণের মতামতকে উপেক্ষা ক'রে ব্রিটিশ সরকার যেভাবে ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করেছে এবং যুদ্ধের সময় গৃহীত ব্যবস্থাবলীর মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা যেভাবে খর্ব করেছে, এই আইনসভা তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে। আইনসভা এই সুপারিশ করছে যে, ব্রিটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারতীয় জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে হলে ব্রিটিশ সরকারকে মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা-সহ গণতন্ত্রের নীতিগুলি অনুসরণ করতে হবে। সেই সঙ্গে ভারতকে এমন একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে, যে তার সংবিধান প্রণয়ন করার অধিকারী। লক্ষণীয় বিষয় হোল — ১৪ই সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবের মতো এই প্রস্তাবের মধ্যেও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির পদত্যাগের পর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের আলাপ-আলোচনার পথ উন্মুক্ত রাখা হয়। তাছাড়া, এই প্রস্তাবটিকে গান্ধী ও নেহরুর আপসরফার ফল বলে মনে করা যেতে পারে। এদিকে ভাইসরয় ১৭ই অক্টোবর ঘোষণা করলেন যে, যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ইতঃপূর্বে যা বলেছেন, তার চেয়ে বেশী কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে অদূর ভবিষ্যতে তিনি আরও কিছু ভারতীয়কে তাঁর 'শাসন পর্ষদ (Executive Council)-এর সদস্য ক'রে নেবেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় শাসন-ক্ষমতা প্রায় পুরোপুরিভাবে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া অসম্ভব বলে তিনি ঘোষণা করেন। এর ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হন। এমতাবস্থায় বড়লাট গান্ধী, তদানীন্তন কংগ্রেস-সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ও মুসলিম লীগ-সভাপতি জিন্নাকে আলাপ-আলোচনার জন্য আহ্বান জানান। সেখানে তিনি কংগ্রেস ও লীগ-প্রতিনিধিদের অবিলম্বে স্থান দেওয়ার জন্য তাঁর 'শাসন পর্ষদে'র সম্প্রসারণের প্রস্তাব দেন। এই উদ্দেশ্যকে সফল ক'রে তোলার জন্য তিনি প্রাদেশিক প্রশাসনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার জন্য কংগ্রেস ও লীগকে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করার পরামর্শ দেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা বড়লাটের এই প্রস্তাব মানতে পারলেন না। লক্ষণীয় বিষয় হোল — কংগ্রেসের যে-দৃষ্টিভঙ্গীকে গান্ধী এক সময় মেনে নিতে পারেননি, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থনে একের পর এক বিবৃতি দিতে থাকেন।

৬.১.৩ সংগ্রামের প্রকৃতি নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা অধিকতর খারাপ হয়ে ওঠে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। নূন্যতম জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়-বৃদ্ধির ফলে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শ্রমিক-সংগঠনগুলি ও অন্যান্য গণ-সংগঠন মূল্য-বৃদ্ধির আনুপাতিক হারে বেতন-বৃদ্ধির দাবী জানায়। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য বামপন্থী কংগ্রেসীরা জনসাধারণের ন্যায্য দাবীর সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেতৃত্ব প্রদান করতে থাকেন। একদিকে যখন গণ-বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে,

অন্যদিকে তখন সরকারী পীড়নযন্ত্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। দমন-পীড়নমূলক আইনগুলিকে কঠোরভাবে কার্যকর করা হতে থাকে। এরূপ পটভূমিতে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন। শেষ পর্যন্ত সমকালীন ভারতের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে কংগ্রেসের পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ করার উদ্দেশে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে বিহারের রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এই অধিবেশনে ভারতীয় জনগণের বিনা সম্মতিতে ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। তাছাড়া, পূর্ণ স্বাধীনতা, ভারতীয় জনগণ কর্তৃক ভারতের সংবিধান রচনা, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণ-পরষদ কর্তৃক সংবিধান রচনা প্রভৃতির দাবী জানিয়ে রামগড় কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই সঙ্গে কংগ্রেস গান্ধীর নেতৃত্বে সংগ্রাম শুরু করার প্রস্তাবও গ্রহণ করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কী ধরনের সংগ্রাম পরিচালিত হবে, তা নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে থাকা বামপন্থীদের মতবিরোধ ঘটে। কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সমিতিতে কিংবা প্রকাশ্য অধিবেশনে **গান্ধী** একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য বামপন্থী কংগ্রেসীরা যে-ধরনের গণ-সংগ্রামের কথা বলেন, তিনি সেই ধরনের কোন গণ-আন্দোলন করবেন না। তিনি প্রতিনিধিদের এই বলে সতর্ক ক'রে দেন যে, আসন্ন সংগ্রাম হোল একটি কঠিন সংগ্রাম। এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁকে দু'ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, যথা — **(১)** বাহ্যিক সমস্যা এবং **(২)** আভ্যন্তরীণ সমস্যা। যুদ্ধরত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা হলে স্বাভাবিক কারণে তারা বিব্রত হয়ে পড়বে — এটা ছিল গান্ধীর আসন্ন সংগ্রাম পরিচালনার বাহ্যিক সমস্যা। আর আভ্যন্তরীণ সমস্যা হোল ক্ষমতালোভী আজেবাজে লোকদের কংগ্রেসের মধ্যে অনুপ্রবেশ। তাঁর ভাষায় :

> The external difficulties are due to the fact that we have declared what we want and the Government have also declared their intentions as clearly as possible. Then there is the fact that the British Government are engaged in a world war and naturally, if we engage them in a fight, we ask for enough trouble. ... Our internal difficulties are increasing. Our Congress registers are full of bogus members and members who have swelled them because they know that getting into the Congress means gettings into power. Those who, therefore, never before thought of entering the Congress have come into it and corrupted it.

সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা হবে, তা কেবল তিনিই ঠিক করবেন বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেছিলেন :

> আমি অসংখ্যবার একথা বলেছি যে, তোমরা যদি আমার সৈন্যবাহিনীতে সৈন্য হিসেবে কাজ করতে চাও, তাহলে জেনে রাখ, ঐ সংগঠনে গণতান্ত্রের কোন স্থান নেই। সৈন্যবাহিনী একটি গণতান্ত্রিক সংগঠনের অংশ হলেও এর মধ্যে কোন রকম গণতন্ত্র থাকতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, যে-কোন সৈন্যবাহিনীতে সেনাপতির কথাই যেমন আইন, তেমনি কংগ্রেস দলের সেনাপতি হিসেবে তাঁর কথা প্রতিটি কংগ্রেস কর্মীকে মেনে নিতে হবে। আর সেনাপতি হিসেবে তিনি ঘোষণা করছেন যে, তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করবেন না। এই মতের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীরা

যদি একমত হতে না পারেন, তবে তাঁরা যেন অন্য একজনকে সেনাপতি পদে মনোনীত করেন। কারণ, কংগ্রেস-কর্মীরা তাঁদের শর্তাধীনে রেখে গান্ধীকে সেনাপতি নিয়োগ করতে পারেন না। তাই তিনি তাঁর শর্তাবলী মেনে নিতে সবাইকে অনুরোধ জানান। তাঁর ভাষায় :

> I have said times without number that if you will be soldiers in my army, understand that there is no room for democracy in that organisation. The army may be a part of a democratic organisation, but there can be no democracy in it. ... I am supposed to be your general ... let me declare to you that I cannot launch civil disobedience, and you must select another general. You cannot make me your general on your terms. Please, know therefore, that I will insist on my conditions.

যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সংগ্রাম করার পক্ষপাতী, সেইসব কংগ্রেসীদের তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বাইরে গিয়ে সংগ্রাম করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

> I do not want to stand in the way of those who want to fight at once. But if they have any sense of honour, I should advise them to do so only after getting out of the Congress.

এখানে গান্ধী-নেতৃত্বের আপসমুখী চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর যে-কোন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন চালাবার সময় আপস-মীমাংসার দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত ক'রে রাখতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উক্তি হোল — ''আপস-মীমাংসা হোল আমার চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমি যদি প্রয়োজন মনে করি, তাহলে বড়লাটের কাছেপঞ্চাশ বার যেতে পারি''। (''Compromise is a part and parcel of my nature. I will go to the Viceroy fifty times, if I feel like it.")। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত রামগড় কংগ্রেস ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য ভারতের প্রতিটি কংগ্রেস কমিটিকে সত্যাগ্রহ কমিটিতে পরিণত ক'রে সংগ্রাম শুরু করার জন্য আহ্বান জানায়। লক্ষণীয় বিষয় হোল — কংগ্রেস তার যুদ্ধ-নীতি সম্পর্কে রামগড় অধিবেশনে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেনি। এইভাবে কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ আশা করেছিলেন যে, তাঁরা যদি এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে ব্রিটিশ শাসকরা তাঁদের অনমনীয় মনোভাব কিছুটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।

❑ ৬.১.৪ আপস - বিরোধী সম্মেলন

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রামগড় কংগ্রেসে গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ঠিক সেই সময় ভারতীয় রাজনীতিতে আরও দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। **প্রথমটি** হোল — মার্চ মাসের শেষ দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলন। এই সম্মেলন-মঞ্চ থেকে ঐতিহাসিক 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণ করা হয়। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আর **দ্বিতীয়** উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল — মার্চ মাসে রামগড়ে আপস-বিরোধী সম্মেলনের

অনুষ্ঠান। সুভাষচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লক এবং স্বামী সহজানন্দের কিষাণসভা ছিল এই সম্মেলনের আহ্বায়ক। আপস-বিরোধী সম্মেলন যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রশ্ন ও ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে অবিলম্বে সংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাছাড়া, ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে 'জাতীয় সপ্তাহ' (৬-১৩ই এপ্রিল) পালনের সময় ফরওয়ার্ড ব্লক দেশব্যাপী আইন অমান্য করতে শুরু করে। এর পর ১৯৪০ সালের জুন মাসে কারারুদ্ধ হওয়ার পূর্বে সুভাষচন্দ্র গান্ধীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শুরু করার জন্য আবেদন জানিয়েও ব্যর্থ হন। এ প্রসেঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেছেন :

> ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে ধ্বসে পড়বে, সেকথা তখন দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, এবং এ-যুদ্ধে ভারতবর্ষের তখন আপন ভূমিকা গ্রহণ করবার সময়। তা সত্ত্বেও মহাত্মা স্পষ্ট কিছু বললেন না। পুনর্বার তিনি বললেন যে, তাঁর মতে, দেশ তখনও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়; তাড়াহুড়ো ক'রে কিছু করতে গেলে ভারতবর্ষের তাতে শুভর চাইতে অশুভই হবে বেশী।

❑ ৬.১.৫ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আপসমুখী মনোভাব

১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে ফ্যাসিস্ট 'ব্লিৎসক্রিগ' (*Blitzkrieg*) অর্থাৎ , 'বিদ্যুৎগতির যুদ্ধ' নীতি অনুসরণ ক'রে যুদ্ধ পরিচালনা করার ফলে সমগ্র যুদ্ধের প্রকৃতিই পাল্টে যায়। ন্যাৎসী বাহিনী ক্ষিপ্রগতিতে পশ্চিম ইউরোপে প্রবেশ ক'রে ফ্রান্স-সহ পশ্চিম ইউরোপের দেশেগুলিকে দখল ক'রে নেয়। লণ্ডন-সহ ব্রিটেনের অপরাপর শহরগুলির ওপর জার্মান-বাহিনী বেপরোয়াভাবে বোমা বর্ষণ করতে থাকে। যে-কোন সময় ব্রিটেনের পরাজয় ঘটতে পারে এমন আশঙ্কাও দেখা দেয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ও ফ্রান্সের এই দুরবস্থার সুযোগে ইন্দো-চীন, ফিলিপিনস্, মালয় প্রভৃতি উপনিবেশের বিপ্লবীরা নিজ নিজ দেশের মুক্তি-সংগ্রামকে তীব্রতর ক'রে তোলেন। এই সময় হো-চি-মিন, জেনারেল গিয়াপ ও লে দুয়ানের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের জনগণ ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাঁদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু করেন। কিন্তু ভারতের মতো দেশে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির শক্তি অত্যন্ত কম থাকায় এইসব দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম সশস্ত্র রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। বরং , ঐসব দেশের মুক্তি-আন্দোলন সংস্কারমুখী আপসকামী নেতৃত্বের হাতে পড়ে সংগ্রাম-বিমুখ হয়ে পড়েছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, ১৯৪০ সালের ২০শে মে **জওহরলাল নেহরুর** একটি বিবৃতির মধ্যে। ঐ দিন প্রদত্ত বিবৃতিতে তিনি ঘোষণা করেন, ''ব্রিটেন যে-সময়ে তার জীবন-মরণের সংগ্রামে ব্যাপৃত রয়েছে, সেই সময়ে আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হলে ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা সম্মান হানিকর কাজ হবে।'' একইভাবে **গান্ধী** ঘোষণা করলেন, ''ব্রিটেনের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ আমাদের কাম্য নয়। সে পথ অহিংসার নয়।'' নেতৃত্বের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে **সুভাষচন্দ্রের** মন্তব্য হোল, ''স্পষ্টতই বোঝা গেল যে, ব্রিটেনের সঙ্গে একটা আপসরফা করবার জন্য গান্ধীবাদী দল যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে।''

যাই হোক, ব্রিটেনের দুর্দিনে তার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করা হবে কিনা, সাহায্য করা হলে সেই সাহায্য শর্তাধীন হবে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। জুন মাসে ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় এবং জুলাই মাসে পুণাতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এই মতবিরোধ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। অহিংসা নীতির মানদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে **গান্ধী** এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কোন অবস্থাতেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ভারতের উচিত নয়। তাঁর মতে, বিষয়টির সঙ্গে কেবল শান্তির প্রশ্ন জড়িত, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন নয়। কিন্তু **মৌলানা আজাদ** প্রমুখের কাছে অহিংসা হোল একটি 'কর্মপন্থা' (policy)। তাঁরা একে

'নীতি' (creed) হিসেবে মেনে নিতে রাজী নন। তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি 'শান্তিবাদী সংস্থা' (pacifist organisation) নয়; এটি হোল ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের একটি সংস্থা (one of achieving India's freedom)। তাই তাঁরা মনে করেন, স্বাধীনতা অর্জনের অন্য কোন পথ খোলা না থাকলে ভারতীয়রা হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু গান্ধী কংগ্রেসকে একটি 'শান্তিকামী সংস্থা' হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন, অন্য কোন কিছু হিসেবে নয়। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সঙ্গে গান্ধীর মতপার্থক্যের অন্যান্য কারণও ছিল। আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ চেয়েছিলেন যে, কংগ্রেস যেসব প্রদেশের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল, সেখানে পুনরায় তারা মন্ত্রিসভা গঠন করুক এবং কেন্দ্রীয় শাসন পর্ষদ (Central Council)-এ কংগ্রেসীরা পুনরায় যোগদান করুন। গান্ধী কিন্তু এসবের বিরোধিতা করেন। জুলাই মাসের ৩-৭ তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভায় পূর্বোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে 'ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা (full independence of India) এবং বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করার জন্য ভারতের নিজস্ব সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী রাখার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ মাসের শেষ দিকে পুণাতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এইভাবে কংগ্রেস গান্ধীর নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছু দিন পরেই জওহরলাল, রাজা গোপালচারী, আসফ আলী ও সৈয়দ মহম্মদ ছাড়া কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতির সব সদস্যই কোনও এক অজ্ঞাত কারণে গান্ধীর বক্তব্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন ক'রে সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করার জন্য কংগ্রেস-সভাপতি আজাদের নিকট পত্র লেখেন।

❑ ৬.১.৬ আগস্ট প্রস্তাব (১৯৪০) ও তার প্রতিক্রিয়া

কংগ্রেসের শর্তাধীন সহযোগিতার প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। সরকারের বক্তব্য হোল — মুসলিম লীগ ও দেশীয় রাজন্যবর্গ কংগ্রেসের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হবে না। তাই ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট বড়লাট কংগ্রেসের কাছে একটি নতুন প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব 'আগস্ট প্রস্তাব' (The August Offer) নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবে একথা বলা হয় যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জাতীয় জীবনের প্রধান অংশগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করা হবে এবং ঐ সংস্থাই সংবিধানের কাঠামো রচনা করবে। বড়লাটের প্রস্তাবে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তাঁর 'শাসন পর্ষদে'র সম্প্রসারণ এবং ভারতীয় ও দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'একটি যুদ্ধ-পরামর্শদাতা পর্ষদ' (War Advisory Council) গঠনের কথাও বলা হয়। 'আগস্ট প্রস্তাবে'র বিরুদ্ধে ভারতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। **জওহরলাল নেহরুর** মতে, আগস্ট প্রস্তাব ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের সমগ্র ধারণাটিকেই কবরস্থ করল ("The whole conception of Dominion Status for India was as dead as a doornail.")। ১৮ই আগস্ট ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে ব্রিটিশ সরকার প্রমাণ ক'রে দিল যে, তারা তলোয়ারের সাহায্যে ভারত শাসনে বদ্ধপরিকর।

সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারের আগস্ট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। বিভিন্ন শহরে ও শিল্পনগরীতে শ্রমিকরা ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট পার্টি-সহ অন্যান্য বামপন্থী দল যুদ্ধ-বিরোধী প্রাচারে আত্মনিয়োগ ক'রে বিভিন্ন গণ-সংগ্রামকে সুসংগঠিত পথে পরিচালনার কাজে নেতৃত্ব

দিতে থাকে। সাধারণ কংগ্রেস-কর্মীদের একাংশ এবং কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মতো বামপন্থীদের প্রভাবাধীন কংগ্রেস কমিটিগুলি যুদ্ধ-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করার জন্য আহ্বান জানায়। গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস - নেতৃবৃন্দ এই ধরনের ঘটনায় অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েন। আন্দোলনকে যাতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায়, সেজন্য তাঁরা সচেষ্ট হন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর স্থির হয় যে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৯৩০-৩২ সালের মতো গণ-সংগ্রাম শুরু করার পরিবর্তে ১৯৩৩ সালের মতো ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করা হবে। এ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন :

> ... ১৯৪০ সনের জুলাই মাসে আমাকে কারারুদ্ধ করবার পর, ক্রমবর্ধমান উদ্যোগে ফরওয়ার্ড ব্লকের আন্দোলন চলতে লাগল। এই আন্দোলনের ফলে গান্ধীপন্থী দলের সাধারণ কর্মীদের মনে প্রবল দোলা লাগে। গান্ধীপন্থী দলের অনুগামীদের ওপর নির্দেশ ছিল, তাঁরা যেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শুরু না করেন। তা সত্ত্বেও এই দলের সাধারণ কর্মীবৃন্দ, বিশেষ ক'রে স্বেচ্ছাসেবকরা, কয়েকটি প্রদেশে আন্দোলনে যোগদান করেন। তাতে ক'রে গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সঞ্চার হোল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য মহাত্মাকে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলেন, অন্যথায়, দেশে তাঁদের সমস্ত প্রভাব ও মর্যাদা নষ্ট হবে। অন্যের নির্দেশের প্রতীক্ষায় না থেকে তাঁরা ধীরে ধীরে সংগ্রামে যোগ দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীকে তাঁদের কথা মেনে নিতে হোল। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস তার সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাহার ক'রে নেয় এবং মহাত্মাকে পুনর্বার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানায়।

এর পর গান্ধীর নেতৃত্বে যে-ব্যাক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়, তাতে প্রথম ও দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী হিসেবে যথাক্রমে বিনোবা ভাবে ও জওহরলাল নেহরু গান্ধী কর্তৃক মনোনীত হন। কিন্তু ১৯২১ অথবা ১৯৩০-৩২ সালে গান্ধী-পরিচালিত আন্দোলনের মধ্যে যে-উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, ১৯৪০-৪১ সালের আন্দোলনে তা ছিল না। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, সেই সময় সংগ্রামের জন্য দেশ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী প্রস্তুত ছিল। কিন্তু গান্ধী কিংবা দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস-নেতারা তখনও ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে আপসরফার সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন বলেই তাঁরা আন্দোলনকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে রাজী ছিলেন না, যার ফলে তিক্ততার সৃষ্টি হতে পারে। তাই সুভাষ বসুর মতো একজন জাতীয়তাবাদী নেতা গান্ধীর আন্দোলনে সত্যাগ্রহী হিসেবে যোগদান করতে চাইলেও তাঁকে তা করতে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া, এরকম সত্যাগ্রহে কোন লাভ হচ্ছিল না। যাঁরা কারাবরণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে এরূপ আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নেওয়ার জন্য গান্ধীকে অনুরোধ জানান। কিন্তু গান্ধী তা করেননি, অথচ আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনেও রূপান্তরিত করতে রাজী ছিলেন না। কারণ, তখনও তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর নমনীয়তায় খুশী হয়ে ব্রিটিশ সরকার আপস করবে।

❑ ৬.১.৭ ক্রিপস্ প্রস্তাব ও তার প্রত্যাখ্যানের কারণ

১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপের যুদ্ধ-পরিস্থিতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে অক্ষশক্তির অনুকূলে চলে যায়। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক চাপে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা

করতে বাধ্য হন যে, ভারত-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপায় অন্বেষণের জন্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হবে। ২৩শে মার্চ ক্রিপস্ দিল্লীতে এসে পৌঁছান। তিনি যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোল :

(১) যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পুর্ণ ডোমিনিয়নের মর্যাদাসম্পন্ন একটি নতুন ভারত-ইউনিয়ন গঠন করা হবে;

(২) ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি গণ-পরিষদ গঠন করা হবে এবং এ ব্যাপারে প্রধান প্রধান দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে নির্বাচনের মাধ্যমে উক্তি পরিষদ গঠিত হবে;

(৩) ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারত এবং দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হবে;

(৪) যদি কোন একটি বা একাধিক প্রদেশ নতুন সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হতে না চায়, তাহলে সেই প্রদেশ বা প্রদেশগুলি ঐ একই নিয়ম অনুযায়ী গঠিত নিজেদের গণ-পরিষদের মাধ্যমে সংবিধান রচনা করতে পারবে;

(৫) দেশীয় রাজ্যগুলিও অনুরূপ সুযোগ লাভ করবে;

(৬) ব্রিটিশ সরকার ও গণ-পরিষদের মধ্যে সন্ধির মাধ্যমে ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তরের কাজ সম্পাদিত হবে;

(৭) নতুন সংবিধান তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ যুদ্ধনীতির অঙ্গ হিসেবে সৈন্যবাহিনীর ওপর সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় থাকবে এবং ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতীয় সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে;

(৮) ভারতের যে-কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকতে এবং ব্রিটিনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা চালাতে পারবে এবং

(৯) উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, সর্বদলীয় শিখ সম্মেলন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ ক্রিপস্-প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করার প্রস্তাব থাকায় হিন্দু মহাসভা ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ঐ প্রস্তাবে মুসলিম লীগের পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী কার্যত মেনে নেওয়া সত্ত্বেও প্রস্তাবে ভারত বিভাগ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোন কথা বলা হয়নি বলে লীগ তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। আবার, প্রস্তাবের মধ্যে তাদের স্বার্থরক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার জন্য অনুন্নত সম্প্রদায়, শিখ সম্প্রদায়, ইঙ্গ-ভারতীয় ও ভারতীয় খ্রীস্টান সম্প্রদায়ও ক্রিপস্ প্রস্তাব মেনে নেবে না বলে ঘোষণা করে। ক্রিপস্ প্রস্তাব বর্জনের ব্যাপারে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রথমদিকে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দিলেও পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস প্রধানত চারটি কারণে কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এগুলি হোল —

(ক) ক্রিপস্‌রে প্রস্তাবাবলীতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে;

(খ) দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণের মতামতকে উপেক্ষা ক'রে রাজন্যবর্গের হাতে গণ-পরিষদের সদস্য মনোনয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে;

(গ) প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান না করার স্বাধীনতা নিয়ে ক্রিপস্ কার্যত ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের পরিবর্তে তাকে খণ্ডবিখণ্ড করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং

(ঘ) প্রতিরক্ষাকে ভারতীয়দের হাতে না রাখার ফলে ভারতবাসীর স্বদেশ রক্ষার অধিকার খর্ব করা হয়েছিল।

১১ই এপ্রিল ক্রিপস্‌এর ভারত ত্যাগের পর ১৯শে এপ্রিল তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় **গান্ধী** লেখেন যে, যথা সময়ে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশরা চলে গেলে তার দ্বারা ব্রিটেন ও ভারত উভয়েরই স্বার্থ রক্ষিত হবে। এর পর সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার উদ্দেশে ২৭শে এপ্রিল থেকে এলাহাবাদের কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠক বসে। ১লা মে ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং কোনও বিদেশী সৈন্যবাহিনী ভারতে প্রবেশ করলে অহিংস অসহযোগের আশ্রয় করার সংকল্প জ্ঞাপন ক'রে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধী ঐ বৈঠকে যোগদান না করলেও আলোচনার জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব প্রেরণ করেছিলেন। ঐ প্রস্তাবের একটি অংশ ছিল :

> জাপানের বিরোধ ভারতবর্ষের সঙ্গে নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেই সে যুদ্ধরত। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে খুব সম্ভব জাপানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করাই হবে তার প্রথম কাজ। কংগ্রেস মনে করে যে, ব্রিটিশ-শক্তি যদি ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেয়, সেক্ষেত্রে জাপানী বা অন্য কোনও অভিযানকারী দ্বারা আক্রান্ত হলেও ভারতবর্ষ নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

ঐ খসড়া প্রস্তাবে জাপ-সরকার ও জাপানের জনসাধারণকে আশ্বাস প্রদান ক'রে বলা হয় যে, জাপানের প্রতি ভারতবর্ষ আদৌ শত্রুভাবাপন্ন নয়। কিন্তু আজাদ, নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ গান্ধী-প্রেরিত খসড়া প্রস্তাবের কঠোর সমলোচনা করেন। **নেহরু** বলেছিলেন, এই খসড়াটি গ্রহণ করলে সমগ্র বিশ্ব মনে করবে যে, 'পরোক্ষভাবে আমরা অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।' এর পর তিনি নিজেই একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং আজাদের প্রচেষ্টায় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীতও হয়। কিন্তু মে মাসে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি (AICC)-র সভায় যে প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়, তা ছিল কার্যত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সম্মুখে উত্থাপিত গান্ধী ও নেহরুর প্রস্তাব দু'টির সমন্বয় সাধন। এই প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, কেবল স্বাধীনতার ভিত্তিতেই ভারত ব্রিটেন-সহ অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। লক্ষণীয় বিষয় হোল - এই প্রস্তাবে জাপানী আক্রমণ কিংবা তার প্রতিরোধের বিষয়ে কোন কথা বলা হয়নি। কেবল একথা বলা হয়েছিল যে, ভারত আক্রান্ত হলে কেবলমাত্র অহিংস অসহযোগিতার মাধ্যমে তার মোকাবিলা করা হবে। এইভাবে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধী কংগ্রেসের যে-নেতৃপদ হারিয়েছিলেন, ১৯৪২ সালের মে মাসে তিনি তা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। তিনি তাঁর অভিমত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মে-জুন মাসে 'হরিজন' পত্রিকায় একের পর এক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। ৩রা মে ও ১০ই মে তারিখে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে, ভারতে ব্রিটেনের উপস্থিতিই জাপানকে ভারত আক্রমণে প্ররোচিত করেছে। তাই ব্রিটেন ভারত ত্যাগ করলে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা বিদূরিত হবে ("The presence of the British in India is an invitation to Japan to invade India. Their withdrawel removes the bait.")। আর একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে, কংগ্রেস অথবা হিন্দুদের হাতে ভারতকে অর্পণ করার জন্য তিনি ব্রিটিশকে বলবেন না।

তারা ভারতকে ঈশ্বরের হাতে কিংবা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেও ফেলে দিয়ে চলে গেলে তাঁর আপত্তি থাকবে না। কারণ, তখন সব দল কুকুরের মতো নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা একটি যুক্তিসঙ্গত বোঝাপড়ায় উপনীত হতে পারবে। তাঁর ভাষায় :

> I have not asked the British to hand over India to the Congress or to the Hindus. Let them entrust India to God or in modern parlance to anarchy. Then all the parties will fight one another like dogs, or will, when real responsibility faces them, come to reasonable agreement. I shall expect non-violence to arise out of the chaos.

এইভাবে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে গান্ধীর পরিবর্তিত যে-মনোভাব পরিলক্ষিত হয়, তা কিন্তু নেহরু, আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সমর্থিত হয়নি। তাঁরা মনে করতেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন অক্ষশক্তির অগ্রগতি অব্যাহতভাবে চলছে, যখন জাপান ভারতের অভ্যন্তরে বোমা বর্ষণ করতে শুরু করেছে, তখন গান্ধীর দাবী জাপানকে ভারত-অধিকার অধিকতর উৎসাহিত করবে। আর জাপান ভারতবর্ষ অধিকার ক'রে নিলে জনসাধারণ তাদের কাছে অসহয়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। তাছাড়া, ফ্যাসিবাদীদের হাতে মিত্রশক্তির পরাজয় ঘটতে পারে — একথা ভেবে নেহরু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সর্বোপরি, ঐ সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন শুরু করার অর্থ সংগ্রামী রাশিয়া ও চীন-সহ সমগ্র মিত্রশক্তির পক্ষ ত্যাগ করা। এইসব কারণে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ গান্ধীর আন্দোলনমুখী মনোভাবের সঙ্গে একমত হতে পারিছিলেন না। ''দীর্ঘদিন এ নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনা, অনেক তিক্ততারও সৃষ্টি হয়। গান্ধীজী কিন্তু অনমনীয়ই থাকেন। শুধু তাই নয়, নিজের মতকে গ্রাহ্য ক'রে তোলার ব্যাপারে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা দেখান। তিনি অবশ্য মেনে নিলেন যে, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ভারতে যেতে পারে। তবে তা একমাত্র শর্তে : অবিলম্বে ভারতের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। কংগ্রেস যদি এই মতটুকু মেনে না নেয়, তাহলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করবেন এবং ভারতের মাটি থেকেই কংগ্রেসের চেয়ে বৃহত্তর এক আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধীর কাছে নেহরু, আজাদ, প্যাটেল-সহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

❑ ৬.১.৮ কংগ্রেস কর্তৃক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব (১৯৪২) গ্রহণ

১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই ওয়ার্ধাতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভায় যে-দীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবটিকে দু'টি অংশে বিভক্ত করা যায়, যথা — প্রস্তাবনা এবং কর্ম-প্রণালী। প্রস্তাবনায় বলা হয়, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আশু অবসান প্রয়োজন। সমগ্র বিশ্বের নিরাপত্তা এবং ন্যাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ, সামরিকবাদ ও সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিগুলির ওপর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই তা বিশেষভাবে প্রয়োজন। প্রস্তাবে ব্রিটিশ শক্তির ভারত ত্যাগের পর অস্থায়ী জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং গণ-পরিষদ গঠনের কথাও বলা হয়। সেই সঙ্গে ব্রিটেন তথা মিত্রশক্তিকে বিব্রত করার কোন ইচ্ছাই কংগ্রেসের নেই বলে এবং জাপান বা অন্য কোন অক্ষশক্তির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মিত্রশক্তিকে ভারতের অভ্যন্তরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দিতে কংগ্রেস সম্মত বলে প্রস্তাবনায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়।

প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে ব্রিটেনের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রে বলা হয় যে, ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী মেনে নিয়ে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ না করলে ''কংগ্রেস অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হবে এবং ১৯২০ সাল থেকে যত অহিংস শক্তি তাঁরা সঞ্চয় করেছেন, তা এই সংগ্রামে বাধ্য হয়েই তাঁরা ব্যবহার করবেন।'' কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এই প্রস্তাব আলোচনা ও সমর্থনের জন্য ৭ই আগস্ট বোম্বাইতে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহ্বানের দিন ধার্য করা হয়। ইতোমধ্যে চীনের জেনারেল চিয়াং কাইশেক ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের আপসরফা করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু চার্চিল ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিনিময়ে কোনরকম আপসরফা কারার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, ''ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পৌরোহিত্য করার জন্য আমি ব্রিটিশ-রাজের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিনি।''

কিন্তু গান্ধীর সংগ্রামের যে-আপসমুখী দিক, তা অনুসরণ ক'রেই তিনি বড়লাটকে তাঁর সম্ভাব্য সংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত করানোর জন্য মীরা বেনকে প্রেরণ করেন। বড়লাট মীরা বেনের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলেন। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত ৭ই আগস্ট বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় কার্যকরী সমিতি কর্তৃক পূর্বে গৃহীত 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। লক্ষণীয় বিষয় হোল — স্বয়ং জওহরলাল নেহরু এই সভায় উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। অবশ্য 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবটিকে একেবারে আপসহীন বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ, প্রস্তাবের মধ্যে ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যদানের যেমন আশ্বাস ছিল, তেমনি ছিল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান। প্রস্তাবের উপসংহারে ঘোষণা করা হয় :

> যে-জাতি আজ সাম্রাজ্যবাদী, স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নিজের সংকল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে ব্রতী, তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা আর কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। ... ব্যাপকভাবে অহিংস গণ-অভ্যুত্থানকে জাগ্রত করার যে-সংকল্প ... কমিটি আজ তাকে অনুমোদন করার প্রস্তাব নিচ্ছে ...। এই সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা গান্ধীজী।

প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর গান্ধী সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেন :

> প্রকৃত সংগ্রাম যে এই মুহূর্তেই শুরু হচ্ছে, তা নয়। আপনারা আমার হাতে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন; সেই ক্ষমতার ভিতিতে আমার প্রথম কাজ মহামান্য ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে কংগ্রেসের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করা। এ কাজে দু'সপ্তাহ, এমনকি, তিন সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। ততদিন আপনারা কী করবেন? চরকা অবশ্য আছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কিছু আছে, যা অনুভবের। পুরুষই হোন বা মহিলাই হোন, আপনাদের প্রত্যেককে এই মুহূর্ত থেকে অনুভব করতে হবে যে, আপনারা মুক্ত; আপনাদের স্বাধীনভাবে আচরণ করতে হবে, মনে রাখতে হবে আপনারা আর সাম্রাজ্যবাদের পদানত নন।

গান্ধীর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' রণধ্বনি তখনই উচ্চারিত হোল। তিনি ঘোষণা করলেন, ''পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কম কোনকিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হব না ... আমরা করব অথবা মরব। হয় আমরা ভারতকে মুক্ত করব, না হয় সেই প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করব।'' কিন্তু মজার ব্যাপার হোল — গান্ধী কিংবা কংগ্রেস কেউই সংগ্রামের কোন

সুস্পষ্ট রূপরেখা জনগণের সামনে তুলে ধরেননি। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **জওহরলাল** বলেছেন, প্রকাশ্যে কিংবা কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠকে গান্ধী একদিনের সাধারণ ধর্মঘট ছাড়া সংগ্রামের অন্য কোন কর্মসূচী উপস্থিত করেননি। তাঁর ভাষায় :

> Neither in pulic nor in private at the meetings of the Congress Working Committee did he (Gandhi) hint at the nature of action he had in mind, except a one-day general strike. So neither he nor the Congress Working Committee issued any kind of directions, public or private, except that people should be prepared for all developments and should in any event adhere to the policy of peaceful and non-violent action.

বস্তুত, গান্ধী জাতীয় আন্দোলনকে ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর পূর্ব-কথিত 'ঈশ্বরের হাতে' অথবা 'বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছেড়ে দিতে' বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। এদিকে ৮ই আগস্ট গভীর রাত্রে কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার গান্ধী-সহ কার্যকরী সমিতির সব সদস্যকে গ্রেপ্তার ক'রে বিশেষ ট্রেনে বোম্বাই থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

অনুশীলনী - ১

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ কর।

২। কোন্ পরিস্থিতিতে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন (১৯৪২) শুরু হয়েছিল?

৩। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের প্রধান ইস্যুগুলি কী ছিল?

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। আপস-বিরোধী সম্মেলনের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

২। 'আগস্ট প্রস্তাব' (August Offer)(১৯৪০)-এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৩। ক্রিপস্ মিশনের প্রস্তাবগুলি কী ছিল?

৪। ক্রিপস্‌ের প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ কী?

৫। কংগ্রেস কেন ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল?

৬। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব (১৯৪২)-এ কী বলা হয়েছিল?

৭। আগস্ট প্রস্তাব (August Resolution) (১৯৪২)-এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টাকা লেখ।

৬.২ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন : গতি - প্রকৃতি

❑ ৬.২.১ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের হিংসাত্মক রূপ

৯ই আগস্ট সকালে ভারতবাসী একই সঙ্গে কংগ্রেস কর্তৃক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ এবং সরকার কর্তৃক গান্ধী-সহ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ জানতে পারে। ''দেশের লোক এ সংবাদের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না; স্তম্ভিত হয়ে গেল তারা। অবিলম্বে এর যে-প্রতিক্রিয়া হোল, তা যেমনই চকিত, তেমনই স্বতঃস্ফূর্ত। সারা

দেশে জীবনযাত্রা অচল হয়ে গেল, কাজের চাকা গেল থেমে। প্রত্যেক শহরে, প্রত্যেক শহরাঞ্চলে হরতাল পালিত হোল, সংগঠিত হোল বিক্ষোভ আর মিছিল। জাতীয় সঙ্গীত ও শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে দেশবাসী দাবী করল নেতাদের মুক্তি। কোনরকম হিংস্রতা কিন্তু তখনো দেখা দেয়নি, যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হলেও জনতা তখনও মোটামুটি শান্ত ছিল। কিন্তু চারিদিকে চাপা উত্তেজনা, বিপুল জনসমুদ্র দেখে সরকার বিচলিত হয়ে উঠলেন। যেখানেই জনতা সরকারী সতর্কবাণী মেনে নিতে বা ছত্রভঙ্গ হতে অস্বীকার করল, সেখনেই চলল পুলিশের গুলিবর্ষণ। শুধু দিল্লীতেই ১১ ও ১২ই আগস্ট এই দুই তারিখে বিভিন্ন জায়গায় নিরস্ত্র জনতার ওপর পুলিশ ৪৭ বার গুলিবর্ষণ করে। ফলে ৭৬ জন নিহত হন এবং গুরুতরভাবে আহত হন ১১৪ জন। গণ-বিক্ষোভ, পুলিশী অত্যাচার, গুলিবর্ষণ, গ্রেপ্তার - একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় প্রতিটি জায়গায়।'' অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। নেতাদের মধ্যে তখনও যাঁরা গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁরা আত্মগোপন ক'রে ছিলেন। এমতাবস্থায় নেতৃত্বহীন জনতা কংগ্রেস কর্তৃক আইন অমান্যের আহ্বান না জানানো সত্ত্বেও আইন অমান্য, ছোটখাটো প্রতিরোধ, এমনকি সংঘর্ষের পথে পা বাড়াতেও দ্বিধাবোধ করল না। তারা আন্দোলনকে কার্যত গণ-বিদ্রোহের পর্যায়ে উন্নীত করল। ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকরা এই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালো। স্কুল, কলেজ ও কলকাখানায় ধর্মঘট শুরু হোল। ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন প্রভৃতিকে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রতীক বলে ধরে নিয়ে জনসাধারণ সেগুলির ওপর আক্রমণ চালালো। সেই সঙ্গে ট্রেন লাইনচ্যুত করা কিংবা টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতির তার কেটে দেওয়ার মতো অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ বেপরোয়াভাবে চলতে থাকে। কৃষকরা নানা স্থানে খাজনা বন্ধ ক'রে দিতে শুরু করে। কোন কোন অঞ্চলে আন্দোলনকারীরা কার্যত বিকল্প সরকার গঠন করে। মেদিনীপুর জেলার তমলুকে একটি স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে, উত্তরপ্রদেশের বালিয়া ও মহারাষ্ট্রের সাতারাতেও জাতীয় সরকার গড়ে ওঠে। জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলী, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। এইভাবে ৪২-এর আন্দোলন গান্ধী-নির্দিষ্ট অহিংসার পথে চলেনি; বরং, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সহিংস পথে অগ্রসর হয়েছিল। কংগ্রেসের তরুণ নেতৃবৃন্দ হিংসা-অহিংসার তত্ত্ব অপেক্ষা দেশের মুক্তিকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই আন্দোলন অহিংসার বাঁধন কেটে বাইরে যেতে পেরেছিল। আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বে **গান্ধী** বলেছিলেন যে, অহিংস আন্দোলন চলাকালে যদি হিংসার উদ্ভব হয়, তাহলেও তিনি পিছিয়ে আসবেন না। সম্ভবত গান্ধীর এই উক্তি কংগ্রেসের তরুণ সদস্যদের উৎসাহ যুগিয়েছিল। তবে একথা সত্য যে, গান্ধী আগস্ট আন্দোলনকে অহিংসার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। তাই জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আন্দোলনের সহিংস অভ্যুত্থানের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেন।

❑ ৬.২.২ আগস্ট বিপ্লবের গণ-চরিত্র

আগস্ট বিপ্লব যে গণ-চরিত্র লাভ করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৯৪৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী একটি সরকারী ঘোষণায় বলা হয় যে, ১৯৪২ সালেই ৫৩৮ বার গুলি চালানো হয়েছে, এবং এর ফলে ৯৪০ জনের মৃত্যু ঘটেছে ও ১৮৩০ জন আহত হয়েছে। কিন্তু **জওহরলাল নেহরুর** মতে, ঐ বছরগুলিতে অন্তত দশ হাজার লোকের প্রাণহানি হয়েছিল। ৯ই আগস্ট থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ৬০,২২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ২৬,০০০ জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ১৮,০০০ বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছিল। গণ-অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ২৫০টি রেল স্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত এবং ৮০০টি ডাকঘর আক্রান্ত,

ক্ষতিগ্রস্ত বা দগ্ধ হয়েছিল। ৩,৫০০টি স্থানে টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়েছিল, ৭০টি থানা এবং ৮৫টি সরকারী ভবন ধুলিসাৎ হয়েছিল। অন্যদিকে, সরকার ১৯৩টি কংগ্রেস শিবির ও কংগ্রেস কর্মীদের আবাস পুড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান সাংগঠনিক বার্থতার জন্য সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই কার্যত গতিবেগ হরিয়ে ফেলে।

৬.৩ গান্ধী-নেতত্বের মূল্যায়ন

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। তিনিই সর্বপ্রথম আন্দোলনকে গণমুখী ক'রে তোলেন এবং একে গণচরিত্র দান করেন। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিরবিচ্ছন্ন গণ-সংগ্রাম পরিচালনা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। যখনই আন্দোলন ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করার চেষ্টা করেছে, তখনই তিনি হিংসা, হরিজন সেবা ইত্যাদির অজুহাত দিয়ে আন্দোলনের গতি রুদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। **মার্কসবাদী লেখকদের** মতে, এখানেই গান্ধী-নেতৃত্বের দুর্বলতা; এখানেই গান্ধী-নেতৃত্বের দ্বৈত-চরিত্রের প্রকাশ। তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর চাপ সৃষ্টি ক'রে কিছুটা রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য জনসাধারণকে আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনেন। কিন্তু যখনই 'গণ-আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের' পথে অগ্রসর হয়েছে, তখনই তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আপস ক'রে সেই আন্দোলনের ইতি টেনেছেন। গান্ধীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার সমগ্র কৌশলকে **বিপান চন্দ্র** 'চাপসৃষ্টি-আপসরফা-চাপসৃষ্টি' (Pressure-Compromise-Pressure) কৌশল বলে বর্ণনা করেছেনে। তিনি বলেছেন, গান্ধী কখনই সাম্রাজ্যবাদীদের আকস্মিকভাবে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে কিংবা এক আঘাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করতে চাননি বলেই তিনি এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীর এই আপসমুখী রাজনীতিকে বামপন্থী শক্তিগুলি, এমনকি সুভাষচন্দ্র প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দও সুনজরে দেখেননি। তাই গান্ধীর সঙ্গে তাঁদের তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। তাছাড়া, গান্ধীর কাছে অহিংসার গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। কেবল অহিংসার পথেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসতে পারে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, হিংসাত্মক উপায়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা অপেক্ষা প্রয়োজন হলে যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করতেও তিনি রাজী আছেন। বলা বহুল্য, সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা গান্ধী- নেতৃত্বের এই দুর্বলতার সুযোগ পূর্ণভাবেই গ্রহণ করেছিল।

অনুশীলনী - ২

■ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। আগস্ট আন্দালনের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

২। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে গান্ধী-নেতৃত্বের মূল্যয়ন কর।

৩। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে গান্ধী-নেতৃত্বের বিশ্লেষণ কর।

৬.৪ সারসংক্ষেপে

গান্ধী তথা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত তৃতীয় তথা সর্বশেষ গণ-আন্দোলন হোল আগস্ট আন্দোলন বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন (১৯৪২)। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। মিত্র দেশ পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে ৩রা সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কিংবা ভারতীয় জনগণের সঙ্গে আলোচনা না ক'রেই ভারতকে যুদ্ধরত দেশ হিসেবে ঘোষণা ক'রে মালয় ও দূর প্রাচ্যে ভারতীয় সেনাদের প্রেরণ করতে শুরু করে। এর ফলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু যুদ্ধের শুরুতে যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী কী হবে, তা নিয়ে জওহরলালের সঙ্গে গান্ধীর তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। অপরদিকে, কমিউনিস্ট ও সুভাষপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কঠোর সমালোচনা ক'রে যেসব প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন রয়েছে, তাদের পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় যে-প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, তা ছিল গান্ধী-নেহরুর আপসরফার ফল।

এর পর ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়, যেগুলির মধ্যে বিশেষ গরুত্বপূর্ণ ছিল গান্ধীর নেতৃত্বে সংগ্রাম গুরু করার প্রস্তাব। কিন্তু গান্ধী তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রাম শুরু করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্যদিকে, একই বছরে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হয়। এবং রামগড়ে অনুষ্ঠিত সুভাষ বসু ও সহজানন্দের আহ্বানে আপস-বিরোধী সম্মেলন আহূত হয়।

ভারতের যুদ্ধে যোগদান করার প্রশ্নে গান্ধীর সঙ্গে নেহরু, আজাদ প্রমুখের তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ভাইসরয় ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট কংগ্রেসের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠান। ঐ প্রস্তাব আগস্ট প্রস্তাব (The August Offer) নামে পরিচিত। ফরওয়ার্ড ব্লক ও কমিউনিস্ট পার্টি-সহ অন্যান্য বামপন্থী দলের মতো কংগ্রেসও ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তার পর শুরু হয় গান্ধীর নেতৃত্বে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে অক্ষশক্তির অনুকূলে চলে গেলে আন্তর্জাতিক চাপে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল শেষ পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে ভারতে প্রেরণ করেন। তিনি কতকগুলি প্রস্তাব দেন এবং কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, অনুন্নত সম্প্রদায়, শিখ সম্প্রদায় প্রভৃতি নানা কারণে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। শেষ পর্যন্ত অনেক টানাপোড়েনের পর ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু প্রস্তাব গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ৮ই আগস্ট মধ্যরাত্রে গান্ধী-সহ কংগ্রেসের প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় নেতা গ্রেপ্তার হন।

কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অনুপস্থিতির ফলে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দ আন্দোলন পরিচালনার জন্য এগিয়ে আসেন। আন্দোলন গণ-চরিত্র লাভ করলেও তা কিন্তু গান্ধী-নির্দিষ্ট অহিংসার পথে অগ্রসর হয়নি। এই আন্দোলনে গান্ধী-নেতৃত্বের দ্বৈত চরিত্রের প্রকাশ ঘটে। তাঁর সংগ্রাম পরিচালনার কৌশলকে **বিপান চন্দ্র** 'চাপসৃষ্টি-আপসরফা-চাপসৃষ্টি'র কৌশল বলে চিহ্নিত করেছেন।

৬.৫ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৬.১.১ থেকে ৬.১.৮ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৬.১.১ থেকে ৬.১.৮ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন - ৬.১.১ থেকে ৬.১.৮ দ্রষ্টব্য।

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৬.১.৪ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৬.১.৬ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন - ৬.১.৭ দ্রষ্টব্য।

৪ নং প্রশ্ন - ৬.১.৭ দ্রষ্টব্য।

৫ নং প্রশ্ন - ৬.১.৭ দ্রষ্টব্য।

৬ নং প্রশ্ন - ৬.১.৮ দ্রষ্টব্য।

৭ নং প্রশ্ন - ৬.১.৮ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী - ২

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন - ৬.২.২ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৬.৩ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন - ৬.৩ দ্রষ্টব্য।

৬.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

ESSAY - TYPE QUESTIONS

1. Explain the circumstances leading to the Quit India Movement. What was the nature of Gandhi's leadership in the movement ?
2. What were the reasons for August Movement (1942) ? Analyse the nature of Gandhi's leadership in that movement ?

SHORT ANSWER - TYPE QUESTIONS

1. Write a short note on the 'August Offer' of 1942.
2. What were the implications of the 'August Offer' of 1942 ?
3. What were the proposals put forward by the Cripps Mission ?
4. Why did Congress reject the Cripps' Proposals ?
5. Write a short note on the Anti-compromise Conference of 1940.
6. What was the nature of Gandhian leadership in the 1942 Movement ?
7. Write a short note on the 'August Resolution' of 1942.

৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

Azad, Abul Kalam, *India Wins Freedom*.

Bose, Subhas Chandra, *The Indian Struggle*.

Chandra, Bipan, *Nationalism and Colonialism in Modern India*.

Chandra, Bipan, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K. N. Panikkar and Sucheta Mahajan, *India's Struggle for Independence*.

Collected Works of Mahatma Gandhi (CWMG), vol. LXX.

—, vol. LXXI.

Coupland, *The Constitutional Problem in India,* vol. II.

Majumder, R. C., *History of the Freedom Movement in India,* vol. III.

—, *History and Culture of the Indian People,* vol. II.

Namboodiripad, E. M. S., *A History of Indian Freedom Struggle,* vol. II.

Tendulkar, D. G., *Mahatma,* vol. III.

—, vol. V.

The Statesman, 10 September, 1939.

চন্দ্র, বিপান, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে, *স্বাধীনতা সংগ্রাম*।

চন্দ্র, বিপান, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী, কে. এন. পানিক্কর ও সুচেতা মহাজন, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম*।

ত্রিপাঠী, অমলেশ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*।

নাম্বুদিরিপাদ, ই. এম. এস., *ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড।

বসু, সুভাষচন্দ্র, *মুক্তি-সংগ্রাম (১৯৩৫-৪২)*।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম*।

মাৎসুলেনকো, ভিক্টর, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*।

সত্যানন্দ, স্বামী, *হে অতীত কথা কও*, ১ম খণ্ড।

সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭*।

- o -

রাষ্ট্র বিজ্ঞান

চতুর্থ পত্র ঃ প্রথমার্ধ

পর্যায় - ২

একক - ৭

(Unit - 7)

শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম

(Working Class Movement)

এককের গঠন-বিন্যাস

৭.০ : উদ্দেশ্য

৭.১ : ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম

৭.২ : সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রমিকআন্দোলন

৭.২.১ : নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কারবাদী আন্দোলন

৭.২.২ : শ্রমিক-আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশ

৭.২.৩ : অল ইণ্ডিয়া ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেন্টস্ পার্টি

৭.২.৪ : শ্রমিক-আন্দোলনের ওপর কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি রোধের প্রয়াস

৭.২.৫ : মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯)

৭.২.৬ : ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ভাঙন

৭.২.৭ : সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্ত মোর্চা গঠন

৭.২.৮ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শ্রমিকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম

৭.২.৯ : ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা

৭.২.১০ : যুদ্ধোত্তর সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম

৭.৩ : সারসংক্ষেপ

৭.৪ : অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৭.৫ : নমুনা প্রশ্নাবলী

৭.৬ : গ্রন্থপঞ্জী

৭.০ : উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনটি মুখ্য ধারার অন্যতম হোল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক ও কৃষক-আন্দোলনের ধারা। বর্তমান ইউনিটের উদ্দেশ্য হোল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রমিক-আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করা। তা করতে গিয়ে একদিকে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংস্কারবাদী কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ কর্তৃক শ্রমিক-আন্দোলনকে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার চারদেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখার প্রয়াস এবং অন্যদিকে কমিউনিস্টদের প্রভাবে শ্রমিক আন্দোলনে কীভাবে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বিকাশলাভ করেছে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মতাদর্শগত বিরোধের জন্য ট্রেড ইউনিয়নে আন্দোলনে ভাঙন এবং পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তমোর্চা গঠনের উদ্দেশ্যে পুনরায় ট্রেড ইউনিয়নে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার পরবর্তী সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে পাঠকদের পরিচিতি ঘটানো হোল বর্তমান ইউনিটের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৭.১ : ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হলেও ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল ১৮৮০ সালের পরবর্তী সময়ে। দেশের মধ্যে কলকারখানার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যাও ততই বাড়তে থাকে। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আধুনিক বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩০,০০,০০০। কিন্তু ১৯২০ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯০,০০,০০০-এ দাঁড়ায়। তবে মোটামুটিভাবে ১৮৫০ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যবর্তী পঞ্চাশ বছরকে ভারতে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের সময়কাল বলে চিহ্নিত করা হয়। জন্মের প্রথম থেকেই পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হোত। ব্রিটিশ পুঁজির অধীন বাগিচা শিল্পের শ্রমিকরা ছিল কার্যত চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস। অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা ছিল একই রকম। নামমাত্র মজুরির বিনিময়ে তাদের দৈনিক ১৮-২০ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে হোত। এই অসহনীয় অবস্থার অবসান ঘটানোর দাবিতে শ্রমিকরা মাঝে মাঝে ধর্মঘটের পথে পা বাড়াতো। ভারতে শিল্প-শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট হয়েছিল ১৮৬২ সালের এপ্রিল-মে মাসে। কিন্তু রজনী পাম দত্ত বলেছেন, ১৮৭৭ সালে নাগপুরের এম্প্রেস মিলের ধর্মঘটই হোল প্রথম শ্রমিক-ধর্মঘট। হাওড়া স্টেশনের প্রায় ১২০০ রেল-শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে এই ধর্মঘট করেছিল। এই ধর্মঘটের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হোল — ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে ঐতিহাসিক মে দিবসের ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার ২৪ বছর পূর্বেই ভারতের রেল-শ্রমিকরা অনুরূপ দাবির ভিত্তিতে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। এরপর ১৮৭৭ সালে নাগপুরের এম্প্রেস মিলের শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে। এইভাবে ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রায় ২৫টি শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল। ১৮৯২ ও ১৮৯৩

সালে বোম্বাই-এর বিভিন্ন বস্ত্রকলের প্রায় ১২,০০০-১৪,০০০ শ্রমিক মজুরি হ্রাসের প্রতিবাদে ধর্মঘট করেছিল। ১৮৯৫ সালে আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলিতে এবং ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ সালে বজবজের চটকলে ধর্মঘট হয়। ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অবস্থিত ভারত সরকারের প্রেসের শ্রমিকরা রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে বেতন না দেওয়া, অন্যায়ভাবে জরিমানা করা, ওভারটাইমের জন্য নামমাত্র বেতন দেওয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রায় এক মাস ধরে ধর্মঘট করেছিল। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত যে-শ্রমিক আন্দোলন ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ করা যায়, তা ছিল প্রধানত অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের আন্দোলন। কোনো শ্রমিক সঙ্ঘ বা ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের রাজনৈতিক উদ্দেশে তখনও পর্যন্ত শ্রমিকরা সুসংগঠিতভাবে আন্দোলন শুরু করেনি। অবশ্য এর একমাত্র ব্যতিক্রম হোল ১৯০৮ সালে তিলকের গ্রেপ্তার ও ছবছর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে জুলাই মাসে বোম্বাই-এর শ্রমিকদের ছ'দিনব্যাপী হরতাল পালন। এটি ছিল ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট। ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশে এই রাজনৈতিক ধর্মঘটের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন, "ভারতেও শ্রমিকশ্রেণী ইতোমধ্যেই সচেতন রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করেছে। এর ফলে ভারতে রুশ-ধরনের ব্রিটিশ শাসনের দিন ফুরিয়ে এসেছে।" কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের লিখিত ইতিহাস কিংবা জনগণের মধ্যে প্রচলিত কাহিনিগুলির মধ্যে এই ধর্মঘটের কোনো স্থান নেই। "যারা আমাদের দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে, সেইসব সাম্রাজ্যবাদী অথবা বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এই ঘটনাকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কারণ, উভয়েই শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন কার্যকলাপে মারাত্মকভাবে ভীত ছিল।"

৭.২ : সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রমিক-আন্দোলন

❑ ৭.২.১ : নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কারবাদী আন্দোলন

১৯১০ সালে বোম্বাই-এর মানবকল্যাণীরা 'কামগর হিতবর্তক সভা' বা 'শ্রমিক কল্যাণ সঙ্ঘ' গঠন করেন। সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করা এবং আপসের মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক বিরোধের নিষ্পত্তি করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন বি. আর. নারে, এস. কে. বোলে এবং এন. এ. তালাস্কারকার। প্রায় একই সময়ে মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন নামে দু'টি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ব্যারিস্টার, কলকারখানার কেরানি প্রমুখের উদ্যোগে এই সংগঠন দু'টি গড়ে ওঠে। কিন্তু এগুলি 'কাগুজে সংগঠন' ছাড়া আর কিছুই নয়। পূর্বোক্ত সংগঠনগুলি শ্রমিকদের স্বার্থে কোনো রকম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রণয়ন করেনি। ফলে শ্রমিকেরা যে-তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই থেকে গেল। এমন সময় ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই সময় ব্রিটিশ ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের কলকারখানাগুলির উৎপাদিত সামগ্রী যুদ্ধের স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে ভারতে বিদেশি শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পায়। ফলে ভারতীয়

শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাছাড়া, ভারতে কাঁচামাল ও মজুরি সুলভে পাওয়া যেত বলে এখানকার কারখানাগুলি প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের কন্ট্রাক্ট পায়। তবে একথা সত্য যে, যুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি ঘটলেও তা ছিল যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। যুদ্ধের সময় দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করলেও ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে এসে পড়েছিল। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে শ্রমিকদের অত্যল্প বেতন প্রদান, অধিক মুনাফা লাভের জন্য মালিকশ্রেণী কর্তৃক অবাধে শ্রমিক-শোষণ প্রভৃতি ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এই সময় রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ায় সেখানে মালিকশ্রেণীর শোষণের অবসান ঘটে। রাশিয়ার বিপ্লব ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী-সচেতনতা এনে দেয় এবং তাদের নতুন ক'রে সংগঠিতভাবে সংগ্রাম শুরু করার অনুপ্রেরণা যোগায়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **রজনী পাম দত্ত** বলেছেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের শ্রমিক-আন্দেলন যেন এক লাফে পূর্ণ কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে এসে দাঁড়ায়। ভারতে শুরু হয় আধুনিক শ্রমিক আন্দোলন। যে-ধর্মঘটের ঢেউ ১৯১৮ সালে উঠেছিল, তা ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে সমগ্র দেশের বুকে আছড়ে পড়ল। ১৯১৮ সালের শেষভাগে বোম্বাই-এর কাপড়ের কলগুলিতে ধর্মঘট হয়। ১৯১৯ সালের বসন্তকালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে হরতালে যোগদানের যে-আবেদন জানানো হয়, তাতে বিপুলভাবে সাড়া দিয়ে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী একথাই প্রমাণ ক'রে দিলে যে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যোগদান ক'রে নিজেদের রাজনৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ১৯২০ সালের প্রথম ছ'মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রায় ২০০টি ধর্মঘটে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিল। এমতাবস্থায় ১৯২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বোম্বাই-এর 'এম্পায়ার থিয়েটার' হলে সর্বপ্রথম '**নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস**' (All India Trade Union Congress – AITUC) নামে একটি সর্বভারতীয় শ্রমিক-সংগঠন গঠিত হয়। লালা লাজপৎ রাই ও যোসেফ বাতিস্তা এই সংগঠনের যথাক্রমে সভাপতি ও সহ-সভাপতি হন। লক্ষণীয় বিষয় হোল — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিকরা বড় বড় ধর্মঘট করতে শুরু করলে মধ্যশ্রেণীর জাতীয় নেতৃবৃন্দ শ্রমিকশ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে টেনে আনতে চাইলেন; কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন আন্দোলনের পক্ষপাতী তাঁরা ছিলেন না। **সরকারি গোপন রিপোর্টে** বলা হয়েছে :

> পার্টি হিসেবে কংগ্রেস ধর্মঘট সংগঠিত করছে কিনা তা বলা শক্ত। কিন্তু আমাদের কাছে সংবাদ আছে যে, অসহযোগ আন্দোলনের উদ্যোক্তারা সরকারকে বেকায়দায় ফেলার কৌশল হিসেবে ধর্মঘট নামক অস্ত্রটির কার্যকারিতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিকে নিজেদের বুর্জোয়া রাজনীতির স্বার্থানুযায়ী ব্যবহার করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সংস্কারবাদের পথে পরিচালিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে মালিকরাই হোল শ্রমিকদের ট্রাস্টি — **গান্ধী** প্রচারিত এই তত্ত্বের কথা উল্লেখ করা যায়। এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে **সুকোমল সেন** মন্তব্য করেছেন :

শ্রেণী-দ্বন্দ্বের পরিবর্তে শ্রেণী-সমন্বয়, শোষণের বিলোপের পরিবর্তে শোষণকে জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই এই তত্ত্ব রচিত। পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষককে জঙ্গী আন্দোলনের পথ থেকে বিরত করা এবং একদিকে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের, অন্যদিকে জমিদার ও কৃষকের সহাবস্থান বজায় রেখে শ্রেণি শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে বহাল তবিয়তে রক্ষা করাই ছিল এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য।

গান্ধী শ্রমিকদের আন্দোলনকে মূলত অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইতেন এবং কোনো রাজনীতির সংস্পর্শে আসা তাদের উচিত নয় বলে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। তাই স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় তিনি দেশের জনসাধারণকে বারংবার হরতাল বা ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানালেও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শ্রমিকদের তা থেকে দূরে রেখেছেন। গান্ধীর মতোই **চিত্তরঞ্জন দাস** ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ৪র্থ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে 'শ্রেণী-শান্তি' (class peace) সংরক্ষণ এবং শ্রমিকদের নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি অবশ্য শ্রমিকদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য শ্রমিক-কল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। এমনকী, ঐ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ধর্মঘট করার অধিকারকেও অনেক সময় সমর্থন করত না। ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কানপুর সম্মেলনে **সাধারণ সম্পাদকের প্রদত্ত রিপোর্ট** থেকে একথা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছিলেন।

> During the period under report no strike was authorised by the Executive Council; but owing to very acute industrial conditions obtaining in different trades and different parts of India there occurred some strikes and lock-outs in which the officials of the Congress had to interest themselves.

সুতরাং বলা যায় যে, ১৯২৭ সাল পর্যন্ত শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে নিখিল ভারত ট্রেড-ইউনিয়নের বাস্তব সংযোগ ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তা সত্ত্বেও এই সংগঠনের মধ্যে নবগঠিত ইউনিয়নগুলির নেতারা এক স্থানে সমবেত হওয়ার সুযোগ লাভ করলেন। এই মিলনক্ষেত্রে প্রকৃত শ্রমিক-আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছাল ১৯২৭ সালে। ঐ বছরের মধ্যেই ৫৭টি শ্রমিক-ইউনিয়ন ঐ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে এর মোট সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৫৫ জনে দাঁড়ায়।

❑ ৭.২.২ : শ্রমিক-আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশ

১৯২০ সালের পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট মতাদর্শ সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। কলকাতা, বোম্বাই ও লাহোরের মতো শিল্পপ্রধান শহরে কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে। কলকাতা ও বোম্বাই-এ এই কাজে বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে মুজফ্‌ফর আহমেদ এবং এস. এ. ডাঙ্গে। ১৯২৪ সালে ডাঙ্গের সম্পাদনায় 'সোশ্যালিস্ট' নামে একটি পত্রিকা বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

অনুরূপভাবে, বাংলার প্রখ্যাত শ্রমিক-নেত্রী সন্তোষ কুমারী গুপ্তা সম্পাদিত 'শ্রমিক', মুজফ্‌ফর আহমেদ ও নজরুল ইসলাম-প্রতিষ্ঠিত 'লাঙল' ও 'গণবাণী', কুতুবুদ্দিন আহমদের 'মজদুর' এবং ভারতের অন্যান্য শহর থেকে প্রকাশিত 'কীর্তি-কিষাণ', 'স্পার্ক', 'ক্রান্তি' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা, পুঁজিবাদী শোষণের চরিত্র, পুঁজি ও মজুরির সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতে থাকে। এর ফলে জনসাধারণের মনে যেমন শ্রমিক, কৃষক ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দেয়, তেমনি শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রভাব অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু শ্রমিক-আন্দোলনের ওপর যাতে কমিউনিস্টদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে না পারে, সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার ক'রে তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ এনে ১৯২৩ সালে পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা এবং ১৯২৪ সালে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। শেষোক্ত মামলায় ডাঙ্গে, সওকৎ ওসমানি, মুজফ্‌ফর আহমেদ ও দাশগুপ্তকে চার বছর কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। কিন্তু গ্রেপ্তার, অত্যাচার প্রভৃতির মাধ্যমেও সরকার ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগতি রোধ করতে পারল না। ১৯২৬-২৭ সালের মধ্যেই তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হোল। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে কৃষক ও শ্রমিকদল প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে এই পার্টি গড়ে ওঠে।

❑ ৭.২.৩ : অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস্ পার্টি

১৯২৮ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কৃষক ও শ্রমিক দলকে ঐক্যবদ্ধ করে 'নিখিল ভারত শ্রমিক ও কৃষক দল' বা 'অল ইন্ডিয়া ওয়াকার্স অ্যান্ড পেজেন্টস্ পার্টি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম কংগ্রেসে উপস্থাপিত থিসিস, রাজনৈতিক প্রস্তাব, সভাপতির ভাষণ প্রভৃতি থেকে এই দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

শ্রমিক ও কৃষক দলের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ছিল :

(১) সংস্কারবাদী বুর্জোয়া নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ থেকে শ্রমিক ও কৃষকদের মুক্ত ক'রে মার্কসবাদের ভিত্তিতে তাদের শ্রেণী-সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

(২) শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন/সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার-সহ অন্যান্য অধিকারের প্রতিষ্ঠা;

(৩) শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতন আন্দোলন/সংগ্রামের মাধ্যমে জমিদারতন্ত্রের বিলোপ সাধন ও কৃষকদের স্বার্থে নানা প্রকার কর্মসূচী প্রণয়ণে সরকারকে বাধ্য করা;

(৪) সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা; এবং

(৫) সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

এইসব উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শ্রমিক ও কৃষক দল ব্যাপক ও বহুবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। এই কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল : শ্রমিক ধর্মঘট ও কৃষি আন্দোলন সংগঠিত করা; শ্রম-বিরোধ

আইন, সাইমন কমিশন প্রভৃতির বিরোধিতা; ৮ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ; শ্রমিক ইউনিয়নের স্বীকৃতি, মাসিক ন্যূনতম ৩০ টাকা বেতন প্রদান; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ সাধন; রায়তওয়ারী ও তালুকদারি ব্যবস্থার অবসান; কৃষকদের ন্যূনতম খাজনা নির্ধারণ; কৃষি-যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য সমবায়িক ভিত্তিতে ঋণদান ব্যবস্থার প্রবর্তন; বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক ভিত্তিতে ঋণদান ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতির দাবিতে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা ইত্যাদি।

❑ ৭.২.৪ : শ্রমিক-আন্দোলনের ওপর কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি রোধের প্রয়াস

ইতঃপূর্বে ১৯২৭ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম গঠনতন্ত্র রচিত হয়। এই পার্টির মাধ্যমে কমিউনিস্টরা প্রথম থেকেই নিজেদের শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতের শ্রমিক-আন্দোলন সংস্কারবাদী পথ ত্যাগ ক'রে সংগ্রামশীল রূপ ধারণ করে। ১৯২৭ সালের মে মাসে সর্বপ্রথম বোম্বাই-এর শ্রমিকরা শ্রমিক দিবস উদ্‌যাপন করে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনের সচেতন অংশ রূপে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের এক নতুন যুগের উদ্বোধন হোল। তাছাড়া, ঐ বছর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাগপুর সম্মেলনে শ্রমিকদের নিজস্ব একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী গৃহীত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে ভারতবর্ষের পূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি সাধন এবং পুঁজিবাদীদের উচ্ছেদ সাধন ক'রে শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়। লক্ষণীয় বিষয় হোল — কানপুর অধিবেশনে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে ফিলিপ স্প্রাট এবং ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে মুজফ্‌ফর আহমেদ, ডাঙ্গে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এর পর থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। ১৯২৭ সালের প্রথম থেকে দেশব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর যে-ধর্মঘট সংগ্রাম শুরু হয়, ১৯২৮-২৯ সালে তা চরম আকার ধারণ করে। ১৯২৭ সালে কেবল বোম্বাই ও বাংলাতে যথাক্রমে ৫৪টি ও ৩৪টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ বছরের সংগ্রামগুলির শিল্পভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মোট সংগ্রামের শতকরা ৪৬.৫১ ভাগ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বস্ত্রশিল্পে। সারা বছরে যত শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল, তার ৬১.৯ ভাগই হয়েছিল রেলওয়ে শ্রমিক ধর্মঘটের মাধ্যমে। খড়গপুরে বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে দু'টি দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের ফলে বিনষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা ছিল ৮,৮০,২১৮। ১৯২৮ সালে মোট ৩১.৫ মিলিয়ন শ্রমদিবস নষ্ট হয়। ঐ বছর বোম্বাইতে ১১১টি, বাংলায় ৬০টি, বিহার ও উড়িষ্যায় ৮টি, মাদ্রাজে ৭টি এবং পাঞ্জাবে ২টি শ্রমিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বছরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল সাইমন কমিশন বর্জনের ব্যাপারে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। ফেব্রুয়রি মাসে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ভারতের জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়ায়। এতকাল পর্যন্ত শ্রমিকরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহী হিসেবে কাজ করলেও এবার তারা কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্বাধীন শক্তি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ফলে বোম্বাই-এর গিরনি কামগর (লাল ঝান্ডা) ইউনিয়ন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই ইউনিয়ন যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এর সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩২৪। কিন্তু ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি

পেয়ে ৬৫,০০০-এ দাঁড়ায়। অপরদিকে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংস্কারবাদী সম্পাদক এন.এম. যোশীর নেতৃত্বে ১৯২৬ সালে গঠিত বম্বে টেক্সটাইল লেবার ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে ছিল ৮,৪৩৬। কিন্তু ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে তা হ্রাস পেয়ে ৬,৭৪৯-এ দাঁড়ায়। এর থেকেই বোঝা যায়, ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী সংস্কারবাদী ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ ক'রে সংগ্রামমুখী হয়ে উঠেছিলো। বস্তুত, ১৯২৬ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের যে-ঝড় ওঠে, তার পুরোভাগে ছিলেন ভারতের কমিউনিস্টরা। ঐ সময়ের মধ্যে বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন, খড়গপুর-সহ ভারতের বিভিন্ন রেলওয়েতে নিযুক্ত রেল-শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চটকল-শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সফল নেতৃত্বদানের জন্যই কমিউনিস্টরা অতি দ্রুত শ্রমিক-আন্দোলনের নেতৃত্বে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

❑ ৭.২.৫ : মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯)

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ওপর কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধিতে সরকারের মতোই কংগ্রেস ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংস্কারকামী নেতৃবৃন্দ প্রমাদ গুণলেন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক্সিকিউটিভ কমিটির সভাপতি শিব রাও ১৯২৮ সালের মে মাসে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, ''ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলন থেকে দুষ্কৃতিকারীদের উপড়ে ফেলতে হবে। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন, কারণ কিছু কিছু ব্যক্তি ক্রমাগত ধর্মঘটের আদর্শ প্রচার ক'রে চলেছে।'' ১৯২৮ সালের ১৪ই জুন 'টাইমস্' পত্রিকা লিখল, যদি ভারতে প্রেরিত ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-মিশনের চেষ্টায় সেখানকার শ্রমিক ইউনিয়নগুলি থেকে কমিউনিস্টদের বিতাড়িত ক'রে সুষ্ঠু সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হয়, তাহলে তার ফল ভাল হবে। ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে আইনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় লর্ড আরউইন মন্তব্য করেন যে, কমিউনিস্ট ভাবধারার ব্যাপক সম্প্রসারণ সরকারের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক্, কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ১৯২৮ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকার পাবলিক সেফ্‌টি বিল পেশ করে। কিন্তু আইনসভায় ভোটে বাতিল হয়ে গেলেও শাসকগোষ্ঠী বিলটিকে অর্ডিন্যান্সের রূপ দিয়ে কার্যকর করে। এরপর ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে শ্রমিকদের ওপর কমিউনিস্টদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করার উপায় অন্বেষণের জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে হুইটলি কমিশন প্রেরণ করে। কিন্তু ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সেই কমিশন বয়কট ক'রে তাদের সংগ্রামী চেতনার পরিচয় দেয়। শ্রমিক-আন্দোলন যাতে বৈপ্লবিক পথে অগ্রসর হতে না পারে, সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী 'দ্য ট্রেড ডিসপিউটস্ অ্যাক্ট' বা শ্রম-বিরোধ আইন পাশ ক'রে শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট করার অধিকার খর্ব করে।

কিন্তু এত সব ক'রেও যখন ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলন থেকে কমিউনিস্টদের প্রভাব হ্রাস করা সম্ভব হোল না, তখন ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ সরকার সমগ্র দেশের শীর্ষস্থানীয় ৩১জন কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এঁদের মধ্যে মুজাফফর আহমেদ, গঙ্গাধর অধিকারী, পি. সি. যোশী, সওকত উসমানি, ফিলিপ স্প্র্যাট, ব্রেন ব্রাডলে, গোপেন চক্রবর্তী প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন। এই মামলা ভারতের ইতিহাসে '**মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা**' নামে পরিচিত। 'আসামী'দের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল— ''ব্রিটিশ ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে রাজা সম্রাটকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা একে

অপরের সঙ্গে এবং ব্রিটিশ ভারতের ভিতরে ও বাইরে বহু পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের রচিত ও নির্ধারিত কর্মসূচী এবং প্রচার পরিকল্পনা ব্যবহারের ষড়যন্ত্রও তাঁরা করেছেন।" ৪ বছর ধরে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলে। মীরাট বন্দীদের মধ্যে ১৮ জন কমিউনিস্ট আলাপ-আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আদালতে ন্যায়-বিচারের প্রত্যাশা না করলেও আদালত কক্ষকে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদের প্রচার মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করবেন। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বপ্রকার সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সংগঠনের অবলুপ্তির জন্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের কর্মসূচীর সপক্ষে তাঁরা প্রচারকার্য চালাবেন বলে স্থির করেন। সেইসঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের চরিত্র উদঘাটন ক'রে কমিউনিজমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করার জন্য তাঁরা আদালতকে প্রচার মঞ্চে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আদালতের সম্মুখে **কমিউনিস্টরা** একথা বলেছিলেন যে, দেশের মুক্তির এবং দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিপ্লব সংগঠিত করার অধিকার হোল তাঁদের সহজাত অধিকার। তাঁদের এই প্রচারের ফলে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বিশ্ববাসী অবহিত হলেন। মীরাট-বন্দীদের মুক্তির দাবিতে রোমা রোলাঁ, বার্নার্ড শ-র মতো বিশ্ববিখ্যাত মনীষীবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি জানালেন। মতপার্থক্য সত্ত্বেও গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐসব নির্ভীক সহযোদ্ধাকে অভিনন্দন জানাতে মীরাট জেলে গিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে মীরাট মামলার রায় বেরুলো এবং আসামিদের কম-বেশি সাজাও হোল। এইভাবে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার যবনিকা পতন ঘটলেও ভারতবাসী কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

❑ ৭.২.৬ : ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ভাঙন

কিন্তু মীরাট মামলার মাধ্যমে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনাকে যে ধবংস করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দশম অধিবেশন। ঐ অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংস্কারবাদী নেতৃত্ব বামপন্থীদের কাছে পরাজিত হন। এরপর কংগ্রেসের সংখ্যালঘু অংশ এন. এম. যোশী, চমনলাল, ভি. ভি. গিরি প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯২৯ সালের ১লা ডিসেম্বর একটি পৃথক সভায় মিলিত হয়ে 'ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' গঠন করেন। এই নতুন ট্রেড ইউনিয়নটি ছিল ভারতের শ্রমিক-আন্দোলনের এক দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের প্রতিভূস্বরূপ। তাই ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ ট্রেড ইউনিয়নস্ এই নতুন সংগঠনটিকে আর্থিক সাহায্য দান করে।

১৯৩৩ সালে ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ ইউনিয়নস্-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু শ্রমিক-আন্দোলনে বামপন্থী নেতৃত্বের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক থাকায় তাঁদের মধ্যেও ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একাদশ অধিবেশনে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকার প্রশ্নে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়।

কমিউনিস্টরা এই অধিবেশনে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্ব দিলে অন্যরা তার তীব্র বিরোধিতা করেন। ফলে এস. ভি. দেশপাণ্ডের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা মূল সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসে 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' নামে একটি স্বতন্ত্র শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৩১ সালের ৬ই জুলাই মেটিয়াবুরুজে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নতুন সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন ডি. বি. কুলকার্নি এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন এন. ভি. দেশপান্ডে, বঙ্কিম মুখার্জী ও এস. সি. সরদেশাই। ড. ভূপেন দত্ত কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এই সংগঠনের নেতৃত্বে শ্রমিক-আন্দোলন জঙ্গী রূপ ধারণ করে। **সরকারের বার্ষিক রিপোর্টে** এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয় যে, মীরাট নেতৃত্ব এখন জেলের মধ্যে থাকলেও কমিউনিস্ট বিপদ কিন্তু থেকেই গেছে এবং ক্রমশ তা গভীরতর হচ্ছে। সরকারের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩৩-৩৪ সালের ধর্মঘটগুলির মাধ্যমে। ১৯৩৩ সালে মোট ১৪৬টি ধর্মঘটে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৩৮ জন শ্রমিক যোগ দেয়। ১৯৩৪ সালে মিল-মালিকদের 'রেশনাইলিজেশন' বা শ্রমিক সংখ্যা হ্রাস ক'রে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ১৫৯টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ঐসব ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার ৮০৮জন। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত বোম্বাইতে এবং ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত শোলাপুরে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা দৃঢ়ভাবে সাধারণ ধর্মঘট পালনের মাধ্যমে একথা প্রমাণ ক'রে দিল যে, প্রচন্ড নির্যাতন সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী তাদের ছিন্নভিন্ন শক্তি সংহত ক'রে পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং তারা সংগ্রামোন্মুখ এক নতুন নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুত, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত শ্রমিক ধর্মঘটগুলি সমীক্ষা করলে দেখা যায় যে, বোম্বাই-এর কাপড়ের কলগুলির শ্রমিকরা এই সময় ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা সংগঠিত অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক সংকটের বিরুদ্ধে সর্ববৃহৎ লড়াই পরিচালনা করেছিল। এই সময় মোট ৫৮৯টি শ্রমবিরোধে ৭,১৬,৮৫৩ জন শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিলেন। কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিকদের তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের পথে পরিচালিত করার ফলে তাদের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ সালে গিরণি কামগর ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৮০০-তে নেমে এসেছিল। কিন্তু মাত্র ২ বছরের মধ্যে ১৯৩২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭,৫৩৫-এ দাঁড়ায়। অপরদিকে, সংস্কারপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত বোম্বাই টেক্সটাইল লেবার ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা আলোচ্য সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণে সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যাতে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন কমিউনিস্টদের হাতে পড়ে জঙ্গীরূপ ধারণ করতে না পারে, সেজন্য ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি-সহ এক ডজনেরও বেশি রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন এবং ইয়ং ওয়ার্কার্স লীগকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। সরকার বহু কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলনের নেতাকে বিনা বিচারে আটক করে।

❑ ৭.২.৭ : সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্ত মোর্চা গঠন

নানা ধরনের অর্ডিন্যান্স ও কুখ্যাত আইন-কানুনের সাহায্যে ধর্মঘট বেআইনী করার চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৩৫ সালে মোট ১৪৫টি ধর্মঘটে ১,৪৪,২১৭ জন শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৩৬ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ১৫৭টি এবং ঐসব ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,৬৮,০২৯ জন। সংগ্রামী

ট্রেড ইউনিয়নগুলির ওপর নির্মম আঘাত নেমে আসে। ১৯৩৫ সালের ৯ই জানুয়ারি গিরণি কামগর ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল ক'রে দেওয়া হয়। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের কাছে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও জনতার অন্যান্য অংশের সংগঠন গড়ে তোলার, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এদের সবাইকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্ত মোর্চা গঠন এবং ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ও তার দেশীয় অনুচরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানায়। কিছুদিনের মধ্যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে বামপন্থী শক্তির উদ্ভব হয়। এঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। কেরালা, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর প্রাদেশিক কমিটিতে এঁরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। ঐ সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চা গঠন করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি সচেষ্ট হয়। ফলে ১৯৩৫ সালে 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' এবং 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' পুনরায় একসঙ্গে মিলিত হয়। এরপর কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে সমঝোতা ক'রে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চা গঠনের জন্য সচেষ্ট হয়। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, অল ইন্ডিয়া কৃষক সভা, অল ইন্ডিয়া স্টেটস্ পিপলস্ কনফারেন্স ও সাধারণ কংগ্রেসীরা এই প্রচেষ্টার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বাংলা, পাঞ্জাব, আসাম ও সিন্ধু বাদে অন্য সব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সরকার গঠন করে। প্রথম পর্যায়ে কংগ্রেস-সরকারগুলি কিছু কিছু প্রগতিশীল কাজ করলেও কিছুদিন পরে তারা গণ আন্দোলনের বিরোধিতা করতে শুরু করে এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের পথে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে কংগ্রেস-সরকার যে-নীতি গ্রহণ করেছিল, ১৯৩৭ সালের পরবর্তী আড়াই বছরের স্বায়ত্তশাসনকালে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভাগুলি কর্তৃক গৃহীত শ্রমনীতি ছিল তার মহড়া মাত্র। ঐ সময় বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস ও অকংগ্রেস-মন্ত্রিসভাগুলি ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর ওপর চরম নির্যাতন চালিয়েছিল। কিন্তু ঐসব প্রাদেশিক সরকারের শ্রমিক-বিরোধী তথা জন-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করে। ১৯৩৭ সালে ৩৭৯টি শ্রমবিরোধে মোট ৬,৪৭,৮০১জন শ্রমিক এবং ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে ৩৯৯ ও ৪০৬টি শ্রমবিরোধে যথাক্রমে ৪,০১,০৭০ জন ও ৪,০৯,০৭৫জন শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশে ইউনিয়নের স্বীকৃতি, কাটা বেতন পুনরুদ্ধার, চাকরির নিরাপত্তা, ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল, দমন-পীড়ন বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে চটকল-শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। ফজলুল হক-মন্ত্রিসভার বক্তব্য ছিল, ঐ ধর্মঘটের কোনো অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই। কমিউনিস্ট নেতারা একে ভারতে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় হোল— গান্ধীর শ্রেণী-শান্তিবাদের দুর্গ আমেদাবাদেও ঐ সময় ধর্মঘটের ঢেউ এসে পৌঁছেছিল। একে প্রতিহত করার জন্য বোম্বাই-এর কংগ্রেস-সরকার ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৪ ধারা জারি ক'রে পাঁচ বা ততোধিক লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। ভারতের এই শ্রমিক-জাগরণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে **রজনী পাম দত্ত** বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদের অনাচারের বিরুদ্ধে জাতীয় দাবির সমর্থনে রাজনৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ইতোমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিরোধের এক শক্তিশালী ও সুসংগঠিত অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমতাবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি উঠল এবং এই দাবির সমর্থনে আন্দোলন শুরু হোল। কিন্তু কংগ্রেসের

দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ এতে প্রমাদ গুণলেন। তাঁরা শ্রমিক-আন্দোলনে ভাঙন ধরাবার জন্য এবং আন্দোলনকে সংস্কারবাদী পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের নিজেদের লোকজন নিয়ে পাল্টা ইউনিয়ন তৈরি করতে শুরু করেন। সেইসঙ্গে তাঁরা শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার অপহরণ করার জন্য আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হন। বোম্বাই-এর সরকার 'শিল্প বিরোধ বিল' (Industrial Disputes Bill) আইনসভায় পেশ করে। অন্যান্য প্রদেশের সরকারগুলিও বোম্বাই সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করে। এতে দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিরা খুশি হয় এবং দাবি জানাতে থাকে যে, এই আইন কেন্দ্রীয় আইনসভায় পাশ ক'রে সমগ্র দেশে কার্যকর করা হোক্। কিন্তু বোম্বাই-এর প্রায় ৯০ হাজারেরও অধিক সংগ্রামী শ্রমিক এই আইনের বিরোধিতা ক'রে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ৭ই নভেম্বর তারা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে একদিনের ধর্মঘট পালন করে।

❑ ৭.২.৮ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শ্রমিকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম

ঐ সময় ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' ও মারাঠা ভাষায় প্রকাশিত 'ক্রান্তি' নামক পত্রিকায় কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের ক্রমবর্ধমান সংকটের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতীয় মোর্চা গঠনের সপক্ষে ক্রমাগত প্রচার করতে থাকেন। ঐ দু'টি পত্রিকায় শ্রমিক, কৃষক ও দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণের সংগ্রামে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য সমগ্র দেশবাসীকে বারংবার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু কমিউনিস্টদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংযুক্ত মোর্চা গঠনের প্রচেষ্টা কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মিনু মাসানীর মতো দক্ষিণপন্থী নেতাদের জন্য যথেষ্ট সাফল্যলাভ করতে পারেনি। ১৯৩৮ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত এই পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের ঐক্যবদ্ধ দাবি এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, শেষপর্যন্ত দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ পার্টি ভেঙে দেওয়ার ভীতি প্রদর্শন ক'রে সেই দাবিকে চেপে দিতে সমর্থ হন। যাইহোক্, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারতীয় জনগণ বা তাদের প্রতিনিধিদের বিনা সম্মতিতে ইংল্যান্ড ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করলে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ কালক্ষেপ করতে থাকলেও শ্রমিকরা কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে এলেন। ১৯৩৯ সালের ২রা অক্টোবর এক রাজনৈতিক প্রতিবাদ ধর্মঘট ক'রে বোম্বাই-এর ৯০ হাজার শ্রমিক একদিন কাজ বন্ধ রাখল। এইভাবে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধ-বিরোধী দিবস পালনের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দেয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধবিরোধী ধর্মঘট। এরপর কানপুর বস্ত্রশিল্পের ২০ হাজার শ্রমিক, কলকাতা কর্পোরেশনের ২০ হাজার মজুর, বাংলা ও বিহারের চটকল-মজুর, আসামের ডিগবয় তৈল খনির শ্রমিক, ঝরিয়া ও ধানবাদের কয়লাখনির মজুর এবং জামসেদপুরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকরা মাগ্‌গী ভাতার দাবিতে ধর্মঘট করল। এইভাবে সমগ্র ভারতে শ্রমিক-আন্দোলনের ব্যাপকতা লক্ষ্য ক'রে সরকার এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার উদ্দেশে 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' ও 'ক্রান্তি' পত্রিকা দু'টিকে বেআইনী বলে ঘোষণা করে এবং 'ভারত রক্ষা আইন' (Defence of India Rule)-এর সাহায্যে কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলনের জঙ্গী-নেতৃবৃন্দকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করতে শুরু করে। ঐ সময় কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী নেতারা পার্টি থেকে কমিউনিস্টদের বহিষ্কার করতে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ হোল— কমিউনিস্টরা গান্ধীবাদী অহিংসার গন্ডির মধ্যে আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ না রেখে হিংসার

পথে পরিচালনা করছেন। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের এই মনোভাবের ফলে ঐ দলের প্রায় প্রতিটি জঙ্গী কর্মী দলত্যাগ ক'রে বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

❑ ৭.২.৯ : ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা

এরপর যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ব্যাপকতর করার প্রয়োজনে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে ন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ ট্রেড ইউনিয়নের সংযুক্তি ঘটে। এই সংযুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল— সর্বপ্রকার রাজনৈতিক প্রশ্ন, ধর্মঘট এবং কোনো বিদেশি সংগঠনের স্বীকৃতির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হবে। শ্রমিক-আন্দোলনের ঐক্যের খাতিরে শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী অংশ এই শর্ত মেনে নেয়। কিন্তু ১৯৪১ সালে ফ্যাসিস্ট জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি নতুন পর্বের সূচনা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর জার্মানির আক্রমণের ফলে যে-দুরূহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাতে বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে চতুর্দিক থেকে উপস্থিত হোল মানবজাতির চরমতম শত্রু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী করার সমস্যা। ফ্যাসিবাদী আক্রমণ শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধেই নয়, বিশ্বের সব জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধেও তা ছিল মারাত্মক আঘাত স্বরূপ। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করা ফ্যাসিবাদের দ্বারা আক্রান্ত সব জাতির কাছে নিজেদের প্রতিরক্ষার সামিল হয়ে দাঁড়ালো। এমতাবস্থায় ভারতের কমিউনিস্টরাও তাঁদের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আন্তর্জাতিক কতর্ব্য পালন ও জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানান। তাঁদের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর যুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই যুদ্ধ এখন আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়, গত ক্ষেত্রে তা হোল গণতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিবাদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ফ্যাসিবাদ জয়ী হলে ভারতবর্ষ-সহ বিশ্বের সর্বত্র গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। তাই প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রিয় ভারতবাসীর কর্তব্য হোল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে ইংরেজদের সহায়তা করা। এমতাবস্থায় ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রা নির্বাহ করা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জাপ-বাহিনী মালয় ও ব্রহ্মদেশ অধিকার করার কাজে ব্যাপৃত; যে কোনো মুহূর্তে ভারত আক্রমণের জন্য তারা প্রস্তুত। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এরূপ পরিস্থিতিতেও যখন কোনো সুস্পষ্ট রাজনৈতিক নির্দেশ প্রদান করতে পারছেন না, সেই সময় কানপুর অধিবেশনে জাতীয় আত্মরক্ষার স্বার্থে বিনা শর্তে ব্রিটিশদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সমর্থন এবং দেশরক্ষার ব্যবস্থা কার্যকর করার উদ্দেশে জাতীয় দাবিসমূহের সনদ আদায়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করার আবেদন জানিয়ে কমিউনিস্টরা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধির সমর্থন লাভ করলেও প্রয়োজনীয় তিন-চতুর্থাংশের সমর্থন লাভ করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত শ্রমিক-আন্দোলনের প্রতিটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে নিজ নিজ নীতি অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তবে একথাও সত্য যে, ভারতের কমিউনিস্টরা ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার দাবি উপেক্ষা ক'রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেননি। তাই কমিউনিস্ট পার্টি দাবি তুলেছিল— ভারতের স্বাধীনতার অধিকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মেনে নিতে হবে এবং অবিলম্বে ভারতবর্ষে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন

করতে হবে। ঐ সময় কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ায়। ১৯৪২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর দমন-বিরোধী দিবস পালনের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এক আবেদন প্রচার করে। এই কংগ্রেস দেশরক্ষার প্রয়োজনের কথা যেমন প্রচার করতে থাকে, তেমনি পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মাথাপিছু খাদ্য বরাদ্দ প্রথা চালু করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। তাছাড়া, বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদের উত্তেজনা সৃষ্টির ফাঁদে কিংবা জাপানের আশ্বাসদানের কুহকে ধরা না দেওয়ার জন্যও বারবার সতর্ক ক'রে দেয়। এর ফলে ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলন শক্তিশালী হয় এবং সেই আন্দোলনে কমিউনিস্টদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ ৮ বছর বেআইনি থাকার পর কমিউনিস্ট পার্টি পুনরায় বৈধ সংগঠনের স্বীকৃতি লাভ করে এবং কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ মুক্তিলাভ করেন।

❑ ৭.২.১০ : যুদ্ধোত্তর সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম

যুদ্ধকালীন অবস্থায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর কলকারখানা, খনি, ডক প্রভৃতিতে ব্যাপকভাবে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়। তাছাড়া, মালিকগোষ্ঠী শ্রমিকদের বেতন হ্রাস, বোনাস বন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। এর বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। শুরু হয় ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট। ১৯৪৬ সালের ১,৬২৯টি ধর্মঘটে মোট ২৯,৬১,৯৪৮জন শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিল। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি প্রদেশের শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হন। এইসব জঙ্গী-সংগ্রাম দমনের জন্য বহু জায়গায় পুলিশকে গুলি বর্ষণ করতে হয়। তাতে বহু শ্রমিক হতাহত হয়। সরকারি বিভাগগুলিও এই ধর্মঘটের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৪৬ সালের ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করা যায়। বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছাড়াও বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠন ও গণ-সংগঠনগুলিও এই ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস দলের মুখ্য-সচেতক সত্যনারায়ণ সিংহ ১৯শে জুলাই সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে এই ধর্মঘটকে 'অবিবেচনাপ্রসূত' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং ২রা আগস্ট আবুল কালাম আজাদ, শরৎচন্দ্র বসু ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ জনসাধারণের অসুবিধার কথা চিন্তা ক'রে ধর্মঘট প্রত্যাহার ক'রে নেওয়ার জন্য ধর্মঘটীদের নিকট আবেদন জানান। এদিকে ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসারদের বিচার শুরু হয়। ঐ বিচারে ফৌজের সেনাধ্যক্ষ শাহ নওয়াজ খাঁ এবং অপর দুই অফিসারের দীর্ঘমেয়াদী কারাদন্ড হলে সমগ্র দেশে প্রবল গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। কলকাতার গণ-বিক্ষোভ এক সাধারণ ধর্মঘটের রূপ পরিগ্রহ করে। ঐ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে শ্রমিকরাও অংশগ্রহণ করে। এরপর ১৯৪৬ সালে নৌ-বিদ্রোহের সময় কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপকভাবে ধর্মঘটে সামিল হয়। বোম্বাই শহরে একদিকে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী এবং অন্যদিকে ধর্মঘটী শ্রমিক ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যারিকেড লড়াই চলে। ফলে তিন শতাধিক মানুষ নিহত এবং প্রায় দু'হাজার লোক আহত হয়। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী যখন তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের কাজে তৎপর, ঠিক সেই সময়ে 'কংগ্রেস-নেতৃত্ব সংগঠিত শক্তি ও নিবিড় ঐক্যকে ব্যাহত করবার চক্রান্তে লিপ্ত' হলেন। ''যে-পণ্ডিত নেহরু

স্বয়ং এ. আই. টি. ইউ. সি.-র মঞ্চে দাঁড়িয়ে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলেছেন, তিনিই সংগ্রামের জোয়ারে আতঙ্কিত হয়ে তাঁর প্রকৃত শ্রেণী-চরিত্র নগ্নরূপে প্রকাশ ক'রে প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন।" ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভায় সংগঠন থেকে কমিউনিস্টদের সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য ১৯৪৭ সালের মে মাসে কংগ্রেস-পরিচালিত হিন্দুস্থান মজদুর সেবক সঙ্ঘ দিল্লীতে এক সম্মেলন আহ্বান করে। ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। জওহরলাল নেহরু, জগজ্জীবন রাম, জে. বি. কৃপালনী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঐ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এমনকী, রামমনোহর লোহিয়া, অশোক মেহতার মতো সমাজতন্ত্রী নেতৃবৃন্দও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জীর প্রস্তাবক্রমে শ্রমিক-আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ পথে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনার উদ্দেশে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে একটি নতুন শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এইভাবে "সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ ক'রে পুঁজিপতি-জমিদার শ্রেণী কর্তৃক একদিকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল এবং অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের সংগঠন তৈরি ক'রে তারা যে-পরিস্থিতির সূচনা করল, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে সেই নতুন পরিস্থিতিতে নতুন পরিপ্রেক্ষিত সামনে নিয়ে সুকঠোর শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত হতে হোল, যে-সংগ্রাম আজও চলছে তীব্র আর অব্যাহত গতিতে।"

অনুশীলনী - ১

❑ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। দু'টি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের শ্রমিক-আন্দোলনের ওপর একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা কর।

৩। দু'টি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের শ্রমিক-আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (এ. আই. টি. ইউ. সি.) ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

২। ভারতের শ্রমিক ও কৃষক দলের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী কী ছিল?

৩। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৪। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা কী ছিল?

৭.৩ : সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনটি ধারার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হোল মূলত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক-আন্দোলনের ধারা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে ভারতবর্ষে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শ্রমিকদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হলেও বিগত শতকের বিশের দশকের পূর্বে কার্যত কোনো শ্রমিক-সংগঠন এদেশে গড়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিল। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' (এ. আই. টি. ইউ. সি.) নামে একটি শ্রমিক সংগঠন গঠিত হয়। কিন্তু লালা লাজপৎ রাই, যোসেফ বাপতিস্তা প্রমুখ মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত শ্রমিক-নেতৃবৃন্দ শ্রমিকশ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে টেনে আনতে চাইলেও তারা শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। অনুরূপভাবে, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ কংগ্রেস নেতারাও শ্রেণী-দ্বন্দ্বের পরিবর্তে শ্রেণী-সমন্বয় সাধনের এবং শ্রেণী-শান্তি সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকারকেও তাঁরা সমর্থন করতেন না। কিন্তু ১৯২০ সালের পরবর্তী সময়ে কলকাতা, বোম্বাই ও লাহোরের মতো শিল্পপ্রধান শহরগুলিতে কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে। শ্রমিকদের মধ্যে তাদের প্রভাব অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করলে সাম্রাজ্যবাদী সরকার শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৩) ও কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪) শুরু করে। এতদসত্ত্বেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কৃষক ও শ্রমিক দল গঠিত হয় এবং ১৯২৮ সালে ঐ দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে 'অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস্ পার্টি' গঠিত হয়। ঐ বছর অনুষ্ঠিত এ. আই. টি. ইউ. সি.-র নাগপুর সম্মেলনে শ্রমিকদের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মসূচী গৃহীত হয়। ঐ কর্মসূচীতে একথা ঘোষণা করা হয় যে, ভারতবর্ষের পূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তিসাধন এবং পুঁজিবাদীদের উচ্ছেদ সাধনের মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই হোল শ্রমিক-আন্দোলনের লক্ষ্য। এরপর শুরু হয় বোম্বাই, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে শ্রমিক-ধর্মঘট। এমনকী, সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ভারতের জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়ায়। এর ফলে এ. আই. টি. ইউ. সি-র কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি **শিবরাও** ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে দুষ্কৃতিকারীদের অর্থাৎ, কমিউনিস্টদের উপড়ে ফেলতে হবে বলে মন্তব্য করেন। অন্যদিকে, ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে **লর্ড আরউইনও** কমিউনিস্ট ভাবধারার ব্যাপক সম্প্রসারণ সরকারের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ভাষণদানের সময় মন্তব্য করেন। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের প্রভাব হ্রাসের উদ্দেশে ৩১জন কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেপ্তার ক'রে তাদের বিরুদ্ধে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করা হয়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়ায়। এ.আই.টি.ইউ.সি. থেকে বেরিয়ে গিয়ে ভি.ভি. গিরি, চমনলাল প্রমুখের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন

ফেডারেশন' নামে একটি দক্ষিণপন্থী শ্রমিক সংগঠন গঠিত হয়। আবার, ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এ.আই.টি.ইউ.সি.-র অধিবেশনে শ্রমিকদের স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের প্রশ্নে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিলে এস.বি. দেশপান্ডের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা মূল সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসে 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' নামে একটি পৃথক শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। বস্তুত, তিরিশের দশকটি ছিল শ্রমিকদের ধর্মঘটের দশক। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তমোর্চা গঠনের উদ্দেশে এ.আই.টি.ইউ.সি.-র সঙ্গে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস মাত্র চারটি প্রদেশ বাদে অন্যান্য প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ঐসব প্রদেশের কংগ্রেস সরকার শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নির্যাতন চালালে তার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক এক মাস পরে ২রা অক্টোবর দিনটিকে বোম্বাই-এর ৯০ হাজার শ্রমিক 'যুদ্ধ বিরোধী দিবস' হিসেবে পালন করে। এর পর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম তীব্রতর করার প্রয়োজনে এ.আই.টি.ইউ.সি.-র সঙ্গে ন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ ট্রেড ইউনিয়নের সংযুক্তি ঘটে। কিন্তু ১৯৪১ সালের ফ্যাসিস্ট জার্মানী সোভিয়েত আক্রমণ করলে যুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে বলে কমিউনিস্ট-প্রভাবিত শ্রমিকশ্রেণী ঘোষণা করে। অবশ্য তা নিয়ে শ্রমিক-আন্দোলনের মধ্যে কিছুটা ভাঙন লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে শ্রমিকশ্রেণী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির দাবিতে এবং নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর এরূপ ভূমিকা পালনকে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ সুনজরে যে দেখেননি, তার প্রমাণ হোল ১৯৪৭ সালের মে মাসে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' (আই.এন.টি.ইউ.সি.)-এর গঠন।

৭.৪ : অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

❑ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১ নং প্রশ্ন - ৭.২.১-৭.২.১০ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৭.২.১-৭.২.৮ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন - ৭.২.১-৭.২.৮ দ্রষ্টব্য।

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১ নং প্রশ্ন - ৭.২.১ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন - ৭.২.৩ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন - ৭.২.৫ দ্রষ্টব্য।

৪ নং প্রশ্ন - ৭.২.৯ দ্রষ্টব্য।

৭.৫ : নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay-Type Questions

1. Analyse the role of the working class in India's freedom struggle.
2. Trace the growth of the working class movement in India between the two world wars.

Short Answer-Type Questions

1. Write a short note on the A.I.T.U.C.
2. What were the main objectives and programmes of the Workers and Peasants' Party of India ?
3. Write a short note on Meerut Conspiracy Case.
4. What was the role of the Indian working class in the anti-facist struggle ?

৭.৬ : গ্রন্থপঞ্জী

Das R. K., *The Labour Movement in India.*

Dutt, R.P., *India Today.*

Industrial Unrest in India, Government of India, Home Department, Pol. – B. Proceedings, December, 1920, No. 262-66.

Nambodiripad, E.M.S., *A History of Indian Freedom Struggle.*

Petrie, Sir David, *Communism in India*, *1924-1927.*

Punnekar, S.D., *Trade Unionism in India.*

Ranadive, B.T., *On Trade Union Movement,* vols. I and II.

Saha, P., History of *Working Class Movement in Bengal.*

Sarkar, Sumit, *Modern India* : *1885-1947.*

Sen, Sukomal, *Working Class of India : History of Emergence and Movement (1830-1970).*

কবিরাজ, নরহরি, *অসমাপ্ত বিপ্লব অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা*।

দত্ত, রজনী পাম, *আজিকার ভারত*।

নাম্বুদিরিবাদ, ই.এম.এস., *ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস*, তৃতীয় খন্ড।

রায়, মনোরঞ্জন, *সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন*।

সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭*।

সেন, সুকোমল, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস*, ১ম ও ২য় খন্ড।

একক - ৮
(Unit - 8)

কৃষক-আন্দোলন

(Prasants' Movement)

এককের গঠন-বিন্যাস

৮.০ : উদ্দেশ্য

৮.১ : বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পূর্ববর্তী কৃষক-বিদ্রোহসমূহ ও সেগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি

৮.২ : বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কৃষক-আন্দোলনও সংগ্রাম

৮.২.১ : কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক-আন্দোলনের প্রকৃতি

৮.২.২ : কৃষক সংগঠন গড়ার কাজে কমিউনিস্টদের ভূমিকা

৮.২.৩ : সারা ভারত কৃষক সভা প্রতিষ্ঠা

৮.২.৪ : কৃষক সভার রাজনৈতিক সংগ্রাম

৮.২.৫ : কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির কৃষকস্বার্থ-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কৃষক সভার সংগ্রাম

৮.২.৬ : সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের উদ্দেশে সংযুক্ত মোর্চা গঠনের প্রয়াস

৮.২.৭ : যুদ্ধোত্তর ভারতে কৃষক-আন্দোলন ও সংগ্রাম

৮.২.৭.১ : তেভাগার কৃষক-আন্দোলন

৮.২.৭.২ : পুন্নাপ্রা-ভায়ালারের কৃষক-আন্দোলন

৮.২.৭.৩ : তেলেঙ্গানা কৃষক-সংগ্রাম

৮.৩ : সারসংক্ষেপ

৮.৪ : অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৮.৫ : নমুনা প্রশ্নাবলী

৮.৬ : গ্রন্থপঞ্জী

৮.০ : উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে শ্রমিক-আন্দোলনের মতো কৃষক-আন্দোলনও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বর্তমান ইউনিটের উদ্দেশ্য হোল কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক-আন্দোলনগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। অন্যদিকে আবার, কমিউনিস্টরা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ১৯২৬ সাল থেকে গড়ে উঠেছিল 'কৃষক ও শ্রমিক দল'। সেগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে ১৯২৮ সালে গড়ে তোলা হয় নিখিল ভারত শ্রমিক ও কৃষক দল। কমিউনিস্টরা ভারতবর্ষের মতো একটি ঔপনিবেশিক দেশে ভূমি-বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লবকে কৃষকশ্রেণীর শোষণমুক্তির নিশ্চিত ও অপরিহার্য পথ বলে মনে করলেও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ সেই ধরনের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে যেতে আদৌ রাজী ছিলেন না। যাই হোক্, ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সারা ভারত কৃষক সভা'। ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচী কৃষক সভা গ্রহণ করে। ঐ বছর বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু তাতে কৃষকদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তাই বিহার, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র প্রভৃতি প্রদেশের কৃষকরা কীভাবে আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, সে সম্পর্কে অবহিত করা বর্তমান ইউনিটের উদ্দেশ্য। তাছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন কৃষকসভা কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল, সে সম্পর্কে বর্তমান ইউনিটে পাঠকদের অবহিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, যুদ্ধোত্তর ভারতে বাংলায় তেভাগা আন্দোলন, ত্রিবাঙ্কুরের পুন্নাপ্রা-ভায়ালার অঞ্চলের কৃষক-সংগ্রাম এবং হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষক-সংগ্রামের ওপর বর্তমান ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

৮.১ : বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পূর্ববর্তী কৃষক-বিদ্রোহসমূহ এবং সেগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি

ভারতবর্ষে শ্রমিক-আন্দোলনের মতো কৃষক-আন্দোলনও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ভারতীয় কৃষকরা নানাভাবে শোষিত হওয়ার ফলে এক দুর্বিষহ জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছিল। প্রধানত তিন ধরনের শোষণ তাদের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো বসে থাকত। এগুলি হোল — (১) জমিদারী শোষণ (খাজনা প্রভৃতির চাপ), (২) মহাজনী শোষণ (ঋণের বোঝা ও সুদের চাপ) এবং (৩) সরকারি শোষণ (করের বোঝা)। বিভিন্ন সময়ে এই ত্রিবিধ শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিক্ষোভ, আন্দোলন, এমনকী সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অংশে যেসব স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে নীল বিদ্রোহ (১৭৭৮-১৮০০, ১৮৩০-৪৮, ১৮৫৯-৬১), ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৩১ ও ১৮৫৭-৭০), ফরায়েজী বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৮), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭), জয়ন্তিয়া বিদ্রোহ (১৮৭৩-৯৬) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বাত্মক ধ্বংস ও পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে ঐসব কৃষক বিদ্রোহের সমাপ্তি

ঘটেছিল। প্রধানত শ্রেণী-সচেতনতার অভাব, উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতি, উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও তার ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞতা, সংগ্রামে রাজনৈতিক মতাদর্শের অভাব, বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার ব্যবস্থাহীনতা প্রভৃতি কারণে ঐসব বিদ্রোহ সুসংগঠিত আকার ধারণ করতে কিংবা সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহগুলি ব্যর্থ হয়েছিল বলে সেগুলির কোনোও ঐতিহাসিক মূল্য নেই — একথা বলা যায় না। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় জমিদার - মহাজনগোষ্ঠী ভারতের সর্বত্র যে-আনুষঙ্গিক শোষণ ও উৎপীড়নের তান্ডব চালাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে কৃষকদের ঐসব সংগ্রাম ও তার শিক্ষা বিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী শক্তিগুলির কাছে মহামূল্যবান বৈপ্লবিক সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। ঐসব সংগ্রামের ব্যর্থতা থেকে পরবর্তীকালের সংগ্রামী কৃষকরা শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং সেই শিক্ষার আলোকে অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে সংশোধন ক'রে নিয়ে অগ্রসর হতে পেরেছে। এই পথে অগ্রসর হতে হতে একসময় ভারতের কৃষকশ্রেণী সংগ্রামী রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং সংগ্রামী নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে তার আপন ভূমিকা পালনে তৎপর হতে পেরেছিল। এখানেই পূর্ববর্তী সময়কার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কৃষক বিদ্রোহগুলির ঐতিহাসিক সার্থকতা।

৮.২ : বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কৃষক-আন্দোলন ও সংগ্রাম

❑ ৮.২.১ : কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক-আন্দোলনের প্রকৃতি

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় রাজনীতেতে গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত কৃষকদের সম্পর্কে কংগ্রেস সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। তারা ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কাজেই মূলত ব্যস্ত থাকত। মাঝে মাঝে নেহাৎ দায়সারাভাবে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার ও লবণ কর বিলোপের মতো দু'একটি দাবি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তোলা হোত। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের ফলে কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়লে স্বাভাবিক কারণে তাদের মধ্যে সরকার-বিরোধী মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে। ঐ সময় ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধী-যুগের সূত্রপাত ঘটে। তিনি গণ-আন্দোলন শুরু করতে গিয়ে একথা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, কৃষকদের বাদ দিয়ে কোনো আন্দোলনই সফল হতে পারবে না। তাই তিনি গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য কমিটি গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর নেতৃত্বে কৃষক-সমাজ ১৯১৭-১৮ সালে চম্পারণ সত্যাগ্রহ, ১৯১৮ সালে বারদৌলী সত্যাগ্রহ প্রভৃতি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। ১৯২২ সালে যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় জমিদারি জুলুমের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। অত্যাচারী জমিদারদের রক্ষায় ব্রিটিশ সরকার এগিয়ে এলে কৃষকরা স্বাভাবিক কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় হিংসার অজুহাতে গান্ধী শুধু কৃষক-সংগ্রাম নয়, সমগ্র জাতীয় আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নেন। গান্ধী-সহ কংগ্রেসের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ কৃষকদের সামান্য কিছু সুবিধাদানের জন্য আন্দোলন করলেও তাঁরা তাঁদের পরিচালিত কৃষক-আন্দোলনকে কখনই জমিদার শ্রেণীর বিরোধী আন্দোলনে

রূপান্তরিত করতে চাননি। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত কৃষক-নেতা আবদুল্লাহ রসুল বলেছেন :

> ..... জমিদার-বিরোধী কৃষক-সাধারণের শ্রেণী-আন্দোলনকে গান্ধীজী কখনোই সমর্থন করতে বা হজম করতে পারেননি।

তাই গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস-নেতারা অহিংসার গণ্ডির মধ্যে কৃষক-আন্দোলনকে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন তাঁদের এই শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই ১৯২১ সালের মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ, ১৯২৬ সালের পাবনার কৃষক বিদ্রোহ প্রভৃতিকে 'সাম্প্রদায়িক' বিরোধ বলে প্রচার করা হয়েছিল। ঐসব কংগ্রেস-নেতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ১৯২৬ সালের ১৮ই মার্চ 'লাঙল' পত্রিকায় মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছিলেন :

> কংগ্রেসের নেতারা চাষী আর মজুরের জন্য মায়াকান্না অনেক কেঁদেছেন। কিন্তু ধনী ও বিত্তশালী লোকদের সহিত উৎপন্নকারীদের সংঘর্ষ যখনই বেধেছে, তখনই কংগ্রেসের নেতারা ধনী ও বিত্তশালী লোকদেরই পক্ষাবলম্বন করেছেন। চৌরিচৌরা ও মালাবারের কৃষকদের বিদ্রোহের কথা সকলেই জানে, আর মহাত্মা গান্ধী যে এ দু' ব্যাপারকেই খুব বেশীরূপ নিন্দা করেছেন, তা-ও কাহারও অজানা নেই। ... আমরা জানি, বিদ্রোহ করতে গিয়ে চৌরিচৌরা ও মালাবারের কৃষকরা অনেক অন্যায় কাজও করেছে, তবে যে-কারণে তারা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল, সে কারণটি তো মোটেই মিথ্যা নয়। সত্যপ্রিয় মহাত্মা গান্ধী কিন্তু এখানে সত্যের পক্ষ অবলম্বন করেননি, কেননা, মিথ্যার পক্ষে ছিল বিত্তশালী সম্প্রদায়।

❑ ৮.২.২ : কৃষক সংগঠন গড়ার কাজে কমিউনিস্টদের ভূমিকা

কংগ্রেস যখন জমিদারি প্রথা বিদ্যমান রেখে তথাকথিত কৃষক-আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন, তখন কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯২৭ সালের 'গণবাণী'তে লেখা হয় :

> সরকার ও কৃষকদের মধ্যে কোনো মধ্যস্বত্ববান থাকবে না। আমরা চাই ভূমি সোজাসুজি কৃষককেই বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। ভূমির মালিক হবে একমাত্র কৃষক, আর কেউ নয়। ... কৃষকদের মধ্যে সমস্বার্থ-সংযোগ ও ঐক্য স্থাপনের জন্য কৃষক-সঙ্ঘসমূহ গড়ে তুলতেই হবে।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়ার পর ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট ভাবধারা সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। এই মতাদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিরা ভারতবর্ষে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এর ফলে ১৯২৬ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল' (Bengal Peasants' and Workers' Party) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ সালের ১৪ই এপ্রিল 'গণবাণী'তে এ প্রসঙ্গে লেখা হয় :

> ..... একটা নতুন রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই দল জনগণের দল। আমরা এর নাম দিয়েছি 'কৃষক ও শ্রমিক দল'। শোষণের কল্যাণে যারা সমস্ত সম্পত্তি

> হারিয়ে আপনাদের পরিশ্রম ধনিকদের নিকটে বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে, শুধু যে সেই সর্বহারা (Proletariat) এই দলে থাকবে তা-ই নয়, কৃষকরা ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোকেরাও এতে থাকবে। ... শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোকদের নিয়ে আমাদের এই নতুন দল। সর্বহারা শ্রমিকগণ ভারতের এই জাতীয় সংগ্রামের অগ্রণী হবে আর কৃষক-সাধারণ তাদের অপরিমিত জনবল নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগদান করবে।

এর পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কৃষক ও শ্রমিক দলকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে ১৯২৮ সালে 'নিখিল ভারত শ্রমিক ও কৃষক দল' (All India Peasants' and Workers' Party) গঠিত হয় এবং ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে এর প্রথম অধিবেশন বসে। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কৃষ্ণনগর সম্মেলনে কৃষকদের জন্য স্বতন্ত্র কৃষক সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মেদিনীপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে। এইসব সমিতির পতাকা ছিল লাল। ত্রিপুরা জেলার কৃষক সমিতির লাল পতাকার ওপর কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্ন ছিল। এইভাবে কমিউনিস্টদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত কৃষক সমিতিগুলি মনে করত যে, ভারতের মতো ঔপনিবেশিক দেশে ভূমি-বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লব হোল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তার মেরুদণ্ড। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **আবদুল্লাহ রসুল** বলেছেন :

> সমগ্র জাতির স্বার্থে, সমস্ত মেহনতকারী শ্রেণীগুলির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তি অর্জনই প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতার ও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বনিয়াদ, এবং এই বনিয়াদের, ওপর নির্ভর ক'রে স্বাধীন ভারতের অগ্রগতি, কৃষি ও শিল্পের অবাধ উন্নয়ন ও বিকাশ, দেশের শিল্পায়ন ও সাংস্কৃতিক জীবনের জয়যাত্রা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৯২০ সালে ব্যারিস্টার জে. এন. রায় প্রাদেশিক স্তরে এবং কোনো কোনো জেলায় 'রায়ত সভা' গঠনের কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই সংগঠন স্থায়িত্বলাভ করেনি। এরপর ১৯২১ সালে নদীয়া জেলার কাপাসডাঙা গ্রামে জনৈক স্থানীয় ইতালীয় মিশনারির উদ্যোগে একটি কৃষক সমিতি গঠিত হয়েছিল এবং তার সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৫-২৬ সালে হাওড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় 'রায়ত সভা' গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ঐসব আঞ্চলিক কৃষক-সংগঠন কৃষকদের মধ্যে বিশেষ কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। তবে ঐ সময় স্যার আবদুর রহিম, মৌলানা মহম্মদ আক্রম খাঁ, শামসুদ্দিন আহমেদ প্রমুখের উদ্যোগে 'প্রজা সমিতি' গঠিত হয় এবং ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরবঙ্গের বগুড়া শহরে রাজীবুদ্দিন তরফদারের উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত এর দ্বিতীয় সম্মেলনে 'কৃষক ও শ্রমিক দল' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

❑ ৮.২.৩ : সারা ভারত কৃষক সভা প্রতিষ্ঠা

দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস-নেতৃত্ব কৃষক-সমাজকে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেও তাঁরা কৃষক আন্দোলনকে কখনই শ্রেণী-সংগ্রামের পথে নিয়ে যেতে চাইতেন না। অপরদিকে, কমিউনিস্টরা প্রথম থেকেই কৃষক-সমাজকে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। ১৯২৬ সালের ১৮ই মার্চ '**লাঙল**' পত্রিকায় লেখা হয় :

কেউ স্বীকার করুন আর না-ই করুন, বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব সমাজে বর্তমান রয়েছে, আর এই বিভিন্ন শ্রেণীর উন্নতি অনুসারেই আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পন্থা নিরূপিত হয়ে থাকে। ... বিভিন্ন স্থানের শ্রমিক ধর্মঘট ও কৃষক বিদ্রোহ হতে এ আন্দোলনের সত্তা আজ আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারছি। ... কৃষক-শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হবে, তাদের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে নেয়, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। তাদের দাবি যতদিন না পূর্ণ হবে, যতদিন বিদেশী শোষণ-শাসনের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন আমাদের শ্রমিক ও কৃষকগণই আমাদের জাতীয়তা মুক্তি-সংগ্রাম চালাবে। ... কৃষক ও শ্রমিকের সংগঠন ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সংগঠন। তাদের শ্রেণী-সংগ্রামকে যাঁরা ভুল বোঝেন, তাঁরা কিছুই বোঝেন না।

কমিউনিস্টরা ভারতের মতো ঔপনিবেশিক দেশে ভূমি-বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লবকে কৃষক-শ্রেণীর 'শোষণ-মুক্তির নিশ্চিত ও অপরিহার্য উপায়' বলে মনে করলেও কংগ্রেস-নেতৃত্ব সেই ধরনের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে যেতে আদৌ রাজী ছিলেন না। তাই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপসরফা করার সময়েও তাঁরা কৃষকদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করতে কোনোরকম উৎসাহ প্রদর্শন করতেন না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার পূর্বে বড়লাটের কাছে গান্ধী যে-১১ দফা দাবি পেশ করেছিলেন, তার মধ্যে কৃষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কোনো কথাই বলা হয়নি। অনুরূপভাবে, গান্ধী-আরউইন চুক্তির মধ্যেও কৃষকদের স্বার্থে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি। এর ফলে কৃষক-সমাজ জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। প্রধানত এই মোহভঙ্গ ও শ্রেণী-চিন্তার ফলেই কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা হয়। এই দল মার্কসীয় মতাদর্শ ও জাতীয়তাবাদ — উভয়কেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। মোটামুটিভাবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে নেওয়ার ফলে বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এই দলের সম্পর্ক নিবিড় হতে থাকে। এই দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়। এর ফলে ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষকসভা গঠিত হয়। সারা ভারত কৃষকসভার লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ থেকে কৃষকদের পূর্ণ মুক্তি সাধন করা এবং অন্যান্য শ্রেণী ও গণ-সংগঠনগুলির সঙ্গে, বিশেষত জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এমন পূর্ণ জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্র কায়েম করা, যাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হতে ন্যস্ত থাকবে।

❑ ৮.২.৪ : কৃষক সভার রাজনৈতিক সংগ্রাম

সারা ভারত কৃষক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৩৭ সালে অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাদেশেও মে দিবস (১লা মে), সারা ভারত কৃষক দিবস (১লা সেপ্টেম্বর), ঋণ মকুব দিবস, কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনি ঘোষণা করার দাবি দিবস, বিহার কৃষক দিবস (১৮ই অক্টোবর) ও চীন দিবস পালন করা হয়। এইসব দাবি থেকেই কৃষক সংগঠনের ওপর কমিউনিস্ট পার্টির কতখানি প্রভাব ছিল, তা প্রমাণিত হয়। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক কমিটির সভায় কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত

লাল পতাকাকে কৃষকসভার পতাকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বলা হয় যে, কৃষকরা এবং কৃষকসভাগুলি ও কৃষক কমিটিগুলি যেন এই লাল পতাকাকেই নিজেদের পতাকা বলে গ্রহণ করে আর সেই সঙ্গে তারা যেন কংগ্রেসের পতাকাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রতীক বলে মেনে নেয় ও মর্যাদা দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে বনগাঁয় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক সভার পঞ্চদশ অধিবেশনে এই পতাকার পরিবর্তন সাধন ক'রে লাল পতাকার ওপর কাস্তে-হাতুড়ির জায়গায় কেবল কাস্তে চিহ্ন রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এই পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন করা হয়েছিল যে, কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্ন কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতেও আছে বলে কংগ্রেসী কৃষকরা সভায় যোগ দিতে চায় না। এই পরিবর্তন ঐসব কৃষককে কৃষক সভায় যোগ দিতে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করবে।

❑ ৮.২.৫ : কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির কৃষকস্বার্থ-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কৃষক সভার সংগ্রাম

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু ঐসব মন্ত্রিসভা জমিদার-প্রীতি ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করতে থাকলে কৃষকরা সংগ্রামের পথে পা বাড়ায়। ১৯৩৭ সালের ২৩শে আগস্ট বিহারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ষাট হাজার কৃষক পাটনাতে সমবেত হয়ে খাজনা ও জলকর হ্রাসের দাবি জানায়। সেইসঙ্গে কৃষকসভা কৃষকদের যেসব জমি জমিদাররা বেদখল করেছে, তা ফিরিয়ে দেওয়ার এবং কৃষি আইনের আমূল পরিবর্তন সাধনের দাবি তোলে। কৃষক-আন্দোলনের চাপে বিহার সরকার সেপ্টেম্বর মাসে বিধানসভায় খাজনা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু এই আইনে সন্তোষজনক কোনো কিছু না থাকায় কৃষক সভা এর সংশোধন দাবি করে। ১৮ই অক্টোবর সমগ্র বিহারে কৃষক-সমাজ 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করে। অনুরূপভাবে, ১৯৩৮ সালের ১০ই জানুয়ারি উত্তর প্রদেশের প্রায় ৮০ হাজার কৃষক মিছিল ক'রে সরকারের নিকট দাবি সনদ পেশ করে। অন্ধ্রের কৃষকরাও এই ধরনের আন্দোলনে সামিল হয়। জঙ্গী কৃষক-আন্দোলনে আতঙ্কিত হয়ে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কৃষক-আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশে বিহার কৃষকসভার পাল্টা সংগঠন হিসেবে 'ক্ষেতমজুর সভা' গঠন করেন। তাছাড়া, ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কিছু লোক হিংসা, হত্যা, সম্পত্তি-নষ্ট প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত রয়েছে। এদের হাত থেকে জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব কংগ্রেস গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবের উত্থাপক ভূলাভাই দেশাই এ ব্যাপারে কৃষকসভাকে সোজাসুজি দায়ী করেন। প্রচণ্ড বিতর্কের পর প্রস্তাবটি যখন গৃহীত হওয়ার মুখে তখন প্রায় ৬০ জন বামপন্থী সদস্য কৃষক স্বার্থ-বিরোধী এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। গান্ধী বামপন্থীদের উদ্দেশে বলেন, বামপন্থীদের উচিত কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাওয়া। এর উত্তরে অধ্যাপক রঙ্গ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, যতদিন পর্যন্ত দক্ষিণপন্থীরা বলপূর্বক তাদের বহিষ্কৃত না করবে, ততদিন পর্যন্ত কৃষকরা কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কাজ চালিয়ে যাবে। এর পর ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে গয়াতে সারা ভারত কৃষক সভার চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে দৃঢ়ভাবে একথা ঘোষণা করা হয় :

> সময় এসে গেছে যখন কংগ্রেস, দেশীয় রাজ্যের জনগণ, কৃষকরা, শ্রমিকরা এবং সাধারণভাবে সংগঠনগুলি ও জনগণ সমেত দেশের সম্মিলিত শক্তিগুলির উচিত এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে

সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব বজায় রাখার এই যে-গোলামীর সংবিধান, তার ওপর আঘাত হানা, যাতে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা ও ভারতীয় জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করা যায় এবং তা থেকে শেষপর্যন্ত কৃষক-মজুর রাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এইভাবে কৃষকসভা একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় সামন্ত অনুচরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, অন্যদিকে তেমনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গেও নিজেদের যুক্ত করেছিল।

❑ ৮.২.৬ : সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের উদ্দেশে সংযুক্ত মোর্চা গঠনের প্রয়াস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন কৃষকসভা বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার জন্য সংযুক্ত মোর্চা গঠনের জন্য সচেষ্ট হয়। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে অন্ধ্রের পালসায় সারা ভারত কৃষকসভার পঞ্চম অধিবেশন বসে। এই সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয় :

> ... যেহেতু কৃষকদের শান্তির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, সেহেতু তারা নিজেরাই শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিতভাবে বিদেশী সরকারের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ ক'রে এবং দেশের সমস্ত সম্পদ বেরিয়া যাওয়া প্রতিরোধ ক'রে মুক্তি-সংগ্রামের পুরোধা হবে। সেই লক্ষ্য নিয়ে কৃষকদের এখনই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেইসঙ্গে দেশীয় রাজাদের, জমিদারদের ও সাহুকারদের (মহাজনদের) — যারা দেশে সেই শক্তির স্তম্ভ — তাদের সভার নেতৃত্বে দৈনন্দিন সংগ্রাম শুরু করতে ও তীব্র করতে হবে। এই সমস্ত সংগ্রামকে তীব্রতর ক'রে এবং ব্যাপকতর এলাকায় ছড়িয়ে অতি সত্বর এমন এক দেশব্যাপী ট্যাক্স-বন্ধ ও খাজনা-বন্ধ আন্দোলনে সংহত করতে হবে, যা সাম্রাজ্যবাদের এই সমস্ত পরগাছার আর্থনীতিক ক্ষমতাকে খতম করতে পারে এবং এদেশে ব্রিটিশ সরকারের রাজনীতিক শক্তিকে কাঁপিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সালে, মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় দু'বছর ধরে সরকারি দমন-পীড়নের জন্য কৃষক সভার প্রকাশ্য আন্দোলনের কাজে তেমন কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়নি। পরে ১৯৪১ সালে জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর যুদ্ধের প্রকৃতি পাল্টে যায়। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত নাগপুর সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কৃষক কাউন্সিল এই যুদ্ধকে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধ এবং স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে অভিহিত করে। দেশের সর্বত্র কৃষক সভা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ব্যাপকভাবে প্রয়াস চালায়। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধ উপলক্ষে কৃষক সভার নেতৃত্বে বিভিন্ন জেলার যেসব জনরক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছিল, কয়েক মাসের মধ্যে মোট ১৫,৭২০ জন কৃষক তার স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করে। তাছাড়া, গান্ধী-সহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে আটক রাখার ফলে যে-জাতীয় রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়, তার অবসানের জন্যও কৃষক সভা এগিয়ে আসে। কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪২ সালে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহকে 'ঐক্য সপ্তাহ' বলে ঘোষণা করে। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবিতে কমিউনিস্ট পার্টি যে-ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করার ডাক দেয়, তাতে কৃষকসভাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, কৃষকসভার ওপর কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর যুদ্ধের প্রকৃতিগত পরিবর্তন-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত হতে না পেরে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যপক রঙ্গ এবং পরের বছর আগস্ট মাসে ইন্দুলাল যাজ্ঞিক কৃষক সভা ত্যাগ করেন। এরপর 'কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে, না পেরে ১৯৪৪ সালে স্বামী সহজানন্দও কৃষক সভা থেকে বেরিয়ে যান এবং ১৯৪৮ সালে 'সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণসভা' গঠন করেন। যাই হোক্, সোভিয়েত লাল ফৌজের বার্লিন জয়ের মধ্যে দিয়ে ১৯৪৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এর দু'মাস আগে অর্থাৎ, মার্চ মাসে অক্ষশক্তির পরাজয় আসন্ন হয়ে উঠলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা তার অষ্টম সম্মেলনে লাল ফৌজকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে।

❑ ৮.২.৭ : যুদ্ধোত্তর ভারতে কৃষক-আন্দোলন ও সংগ্রাম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-বিরোধী ক্ষোভে যেন ফেটে পড়তে চাইছিল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, বোম্বাই ও করাচীর নৌ-বিদ্রোহ ও তার সমর্থনে দেশজোড়া গণ-জাগরণ ও শ্রমিক ধর্মঘট, বিক্ষোভ সমাবেশ ইত্যাদি ছিল ভারতবাসীর সংগ্রামমুখী মনোভাবের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। এমতাবস্থায় কিন্তু কংগ্রেস দেশব্যাপী ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার পরিবর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপসরফার মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করার কাজে ব্যস্ত ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবে ঐ সময়কার গণ-সংগ্রামগুলি কমিউনিস্ট পার্টি ও তার গণ-সংগঠনগুলির দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে নিদারুণ সংকটের আবর্তে পড়ে কৃষকরা যখন হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন কমিউনিস্ট পার্টি ও তার কৃষকসভা সুতীব্র গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগ্রাম গড়ে তুলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত নড়িয়ে দিল। গ্রাম-বাংলার বিস্ফোরক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৯৪৬ সালের ২৬শে জুলাই 'দি ইস্টার্ন ইকনমিস্ট' পত্রিকা লিখেছিল, "বর্তমান প্রজন্মের মানুষেরা স্মরণকালের মধ্যে এই প্রথম শুনতে পেলেন, দাবি না মানা হলে ক্ষেতমজুররা জমিদারদের কাজ করতে অস্বীকার করছে।" কমিউনিস্ট পার্টি ভারতীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ক'রে ঘোষণা করল, "ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলন প্রবেশ করেছে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে।" ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কৃষক-আন্দোলন পরিচালনা করতে চাইছিল। ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা ছিল :

> ইংরেজ বিজেতারা আমাদের গ্রামগুলির ওপর জমিদারী প্রথা চাপাইয়া নিজেদের শোষণ-নীতিকে কায়েম করিয়াছে। তাহারা ভারতবর্ষকে শোষণ করিবার জন্য প্রতিটি গ্রামে তিন ধরনের শোষক সৃষ্টি করিয়াছে — প্রথম হইতেছে অকর্মণ্য জমিদার — অপদার্থতার প্রতীক ইহারা। দ্বিতীয় হইতেছে মহাজন — কৃষকের জমির ওপর লোভের প্রতীক। তৃতীয় হইতেছে ধূর্ত ব্যবসায়ী — ইহারা সস্তা দরে কৃষিজ দ্রব্য কিনিয়া গ্রামাঞ্চলে চড়া দামে শিল্পের জিনিস বিক্রয় করে। এই তিন দল গ্রাম্য-শোষকের সমর্থক ও রক্ষক হইতেছে ব্রিটিশ শাসন — তাহার আইন, আদালত, পুলিশ। ইহারাও সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণের বনিয়াদ।

কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী কৃষক-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ সাধন ও নির্বাচিত গণতান্ত্রিক কমিটির মাধ্যমে জমির পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ, সুদখোরী প্রথার নিষিদ্ধকরণ ও সমবায় ব্যাঙ্কের

মাধ্যমে কৃষক ও কারিগরদের ঋণদান, খাদ্য ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর পাইকারদের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ও সমবায় ক্রয়-বিক্রয় সমিতি গঠন প্রভৃতি দাবি নিয়ে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে প্রচার চালাতে থাকেন। এর ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কৃষক বিদ্রোহ ও কৃষক-সংগ্রাম শুরু হয়।

● ৮.২.৭.১ : তেভাগার কৃষক-আন্দোলন

♦ **পটভূমি :** ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা 'ফ্লাউড কমিশনে'র সুপারিশ কার্যকর করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। এই কমিশন উৎপন্ন শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগচাষীকে প্রদান করার সুপারিশ করেছিল। কৃষক সভা জোতদারদের জমিতে কর্মরত ভাগচাষি ও বর্গাদারকে উৎপন্ন শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ প্রদানের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে ফসল কাটার সময় দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিং, রংপুর, মালদা, চব্বিশ পরগণা, খুলনা, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাতে এই আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করে। কিন্তু পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হলে কৃষকরা সমবেতভাবে সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। "তেভাগার দাবিতে সংগ্রামী কৃষকদের পদভারে জোতদার-জমিদারদের বুকে কাঁপন জাগে।" ১৯৪৭ সালের ১৯শে মার্চ তেভাগা আন্দোলনের বর্ণনা প্রসঙ্গে কলকাতার '**স্টেটস্‌ম্যান**' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছিলেন :

> বিগত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে (কৃষক) ছিল নিশ্চুপ; আজ এক শ্লোগানের আওয়াজে সে হয়েছে মুখর। সাথীদের সঙ্গে নিয়ে তারা মাঠ ভেঙে চলে, সবার কাঁধের ওপর রাইফেলের মতো ক'রে ধরা লাঠি মিছিলের সামনে তাদের লালঝাণ্ডা — দেখে অনুপ্রেরণা জাগে। গ্রামের নিঝুম ঝোপঝাড়ের পাশে নিজেদের মুষ্টিবদ্ধ হাত কপালের কাছে তুলে তারা যখন সহযোগী সাথীদের 'ইনকিলাব, কমরেড' বলে সম্বোধন করে, তা' শুনে বুকের ভেতরটা যেন গুরু গুরু করে।... হিংসার ঘোর বিরোধী তারা, তবে প্রয়োজন হলে ঐ লাঠি তাঁরা ব্যবহার করবেন না, তাও নয়।

♦ **আন্দোলনের প্রকৃতি :** ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার ব্যাপারে জোতদারদের জমিতে কর্মরত ভাগচাষি ও বর্গাদারদের উৎপন্ন শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ প্রদানের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। নভেম্বর মাসে ফসল কাটার সময় বাংলার ২৫টি জেলাতেই ঐ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক ঐ ঐতিহাসিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। কয়েকটি দিক থেকে তেভাগা আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে :

প্রথমত, এই আন্দোলন ছিল মূলত অর্থনৈতিক সংগ্রাম; শ্রেণী-সংগ্রাম নয়। তাই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করার লক্ষ্য নিয়ে তা পরিচালিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃতিগতভাবে এই আন্দোলন কৃষি-বিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত না হওয়ায় কৃষকদের এই সংগ্রামকে সমর্থন করার বা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শ্রমিকশ্রেণী এগিয়ে আসেনি। অথচ যে-

কোনো কৃষি-বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব একান্তভাবেই প্রয়োজন। ফলে এই আন্দোলন সঠিক পথে এবং সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারেনি।

তৃতীয়ত, এই আন্দোলন সংকীর্ণতাবাদী ও হঠকারী নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। কারণ, জোতদার, জমিদারদের সঙ্গে ধনী কৃষককেও আন্দোলনকারীরা শত্রু বলে মনে করত। ফলে শেষ পর্যন্ত ধনী কৃষকরা তো বটেই, এমনকী মাঝারি কৃষকরাও পর্যন্ত এই আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে তা ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি।

চতুর্থত, কৃষকসভা অনেক রাজনৈতিক শ্লোগান দিলেও তেভাগা আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করার আদৌ চেষ্টা করেনি। ফলে তা দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

পঞ্চমত, তেভাগা আন্দোলন জাতপাত ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ বেড়াজালে যে আটকে পড়েনি, তার প্রমাণ হোল — যেখানে ঐ আন্দোলন হয়েছে, সেখানে একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ঘটেনি।

♦ **ব্যর্থতার কারণ :** ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা যে-তেভাগা আন্দোলন শুরু করেছিল, নানা কারণে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। এইসব কারণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোল :

(১) সংগ্রামী ভাগচাষি এবং ক্ষেতমজুরদের এই রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়নি যে, গ্রামাঞ্চল থেকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মূলোচ্ছেদ ক'রেই কেবল কৃষকশ্রেণীর পূর্ণ মুক্তি সম্ভব। এই রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবই তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ বলে বিবেচিত হয়।

(২) কৃষকদের এই সংগ্রামকে সমর্থন করার বা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শ্রমিকশ্রেণী এগিয়ে আসেনি। ফলে সাংগঠনিক এবং অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি অনিবার্যভাবে দেখা দেওয়ায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

(৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরূপতাকে তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ বলে ধনাগারে, কুপার প্রমুখ চিহ্নিত করেছেন।

(৪) আবদুল্লা রসুলের মতে, এই আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে কৃষকদের শ্রেণী-স্বার্থ সম্বন্ধে সংস্কারবাদী ধারণার আধিক্য এবং আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্থার অভাবের জন্যই তা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

(৫) বদরুদ্দিন উমর বলেছেন যে, কৃষক সভা অনেক রাজনৈতিক শ্লোগান দিলেও তেভাগা আন্দোলনকে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী' সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করার আদৌ কোনো চেষ্টা করেনি। ফলে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করতে না পারায় অতি সহজেই সরকারী আন্দোলনকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিল।

(৬) যে-কমিউনিস্ট পার্টির গণ-সংগঠন হিসেবে কৃষক সভা ঐ আন্দোলন পরিচালনা করেছিল, ঐ সময় সেই কমিউনিস্ট পার্টিরই নিজস্ব কোনো কর্মসূচী ছিল না। ফলে সঠিক রণনীতি ও রণকৌশলের অভাবে ঐ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

(৭) তাছাড়া, বাংলার মুসলিম লীগ সরকার সীমাহীন দমন-পীড়নের মাধ্যমে তেভাগা আন্দোলনকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল। প্রাদেশিক কৃষক সভার রিপোর্ট অনুযায়ী তেভাগা ও অন্যান্য দাবিতে কৃষক-আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে কেবল চবিবশ পরগণা, রংপুর, দিনাজপুর, মেদিনীপুর ও ময়মনসিং জেলায় ৩,১১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। প্রায় ৭০ জন কৃষক পুলিশ ও জোতদারের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল। হাজার হাজার কৃষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এমনকি, কৃষক-রমণীরাও পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ বঙ্গীয় আইনসভায় জ্যোতি বসু দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে, কৃষকদের আত্মবলিদান কখনই ব্যর্থ হবে না।

● ৮.২.৭.২ : পুন্নার্প্রা-ভায়ালারের কৃষক-আন্দোলন

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ত্রিবাঙ্কুরের পুন্নার্প্রা-ভায়ালার অঞ্চলের কৃষক-সংগ্রাম ভারতের কৃষক-আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছিল। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান রামস্বামী আয়ার ঐ দেশীয় রাজ্যটিকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে একটি পৃথক সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করলে সেখানকার কৃষক ও সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়ায়। এই প্রতিরোধ ধবংস করার জন্য পুলিশ ও সামরিক বাহিনী প্রেরিত হয়। আলেপ্পি অঞ্চলের কৃষকরা এদের মোকাবিলা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও শিবির গঠন করে। শেষপর্যন্ত কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধের ফলে রামস্বামী আয়ারের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

● ৮.২.৭.৩ : তেলেঙ্গানা কৃষক-সংগ্রাম

♦ **পটভূমি :** সামন্ত-শাসন, দেশমুখ জায়গীরদারদের নিষ্ঠুর শোষণ এবং ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯৪৬ সালের হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকরা যে-সর্ববৃহৎ সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল, তা ভারতের ইতিহাসে তেলেঙ্গানা-সংগ্রাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। নিজাম-শাসিত এই দেশীয় রাজ্যটিতে মধ্যযুগীয় সামন্ত-শোষণের জাতাকলে পিষ্ট হয়ে সেখানকার কৃষকরা কার্যত শ্রমদাসে পরিণত হয়েছিল। হিন্দু দেশমুখ আর মুসলমান জায়গীরদাররা বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করতে দরিদ্র কৃষকদের বাধ্য করত। এই সামন্ত-শোষণ এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তেলেঙ্গানার প্রায় ৩০ লক্ষ কৃষক সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। নিজামের রক্ষীবাহিনী, সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী এবং দেশমুখ-জায়গীরদারদের সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানার সংগ্রামী কৃষকরা প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলে।

♦ **কর্মসূচী :** বিদ্রোহী কৃষকরা 'সোভিয়েত' হিসেবে গড়ে-ওঠা গ্রামগুলিতে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান প্রথার অবসান, কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, কৃষকদের মধ্যে পতিত ও উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন প্রভৃতির সঙ্গে

সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কৃষকদের পারস্পরিক বিরোধের নিষ্পত্তিকরণ, সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, স্ত্রীলোকের মর্যাদা সংরক্ষণ প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করে। এ প্রসঙ্গে **পি. সুন্দরাইয়া** লিখেছেন :

> তেলেঙ্গানার সংগ্রামী কৃষকদের এবং এই লোকপ্রিয় কৃষক অভ্যুত্থানে নেতৃত্বের ভার পড়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির যে বিশাল অন্ধ্র রাজ্য ইউনিটের ওপর তার কাছ থেকে এই সংগ্রাম আদায় করেছিল বিরাট ত্যাগ। কমিউনিস্ট জঙ্গী কৃষক নিহত হয়েছেন, ৩ থেকে ৪ বছরের জন্য প্রায় দশ হাজার কমিউনিস্ট কর্মী ও জনগণের সংগ্রামী মানুষ জেলে ও বন্দীশিবিরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ধরে মারধর, অত্যাচার ও সন্ত্রস্ত করার জন্য কম করেও ৫০ হাজার মানুষকে মাঝে মাঝেই পুলিশ ও মিলিটারি ক্যাম্পে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, হাজার হাজার গ্রামে কয়েক লক্ষ মানুষ পুলিশ ও মিলিটারির হানার শিকার হয়েছেন, নিষ্ঠুর লাঠি চার্জ সহ্য করেছেন, ওই সব মিলিটারি ও পুলিশের হানার জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে, লুঠ অথবা ধ্বংস করা হয়েছে, হাজার হাজার নারী ধর্ষিতা যাবতীয় অবমাননা ও অমর্যাদার শিকার হয়েছেন। এক কথায়, সমগ্র অঞ্চলটা পুরো পাঁচ বছরের জন্য, প্রথমে নিজাম ও তার রাজাকারদের সশস্ত্র দলগুলির এবং পরে কেন্দ্রীয় সরকারের ও হায়দ্রাবাদ রাজ্য-সরকারের সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনীর বর্বর পুলিশী ও মিলিটারি সন্ত্রাসের শাসনের শিকারে পরিণত হয়েছিল। পুলিশী ব্যবস্থার পরে বিভিন্ন পর্যায়ের ৫০ হাজার সশস্ত্র ফৌজ নিয়োগ করা হয়েছিল হিংস্রভাবে আন্দোলন দমন ও বিধবস্ত ভূস্বামী-শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। বেসরকারী কয়েকটি হিসেবে ১৯৪৭-৪৮ সালে কাশ্মীরের প্রশ্নে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারত সরকারের যে-অর্থ ও উপকরণ ব্যয় হয়েছে, হায়দ্রাবাদেও ভারত সরকার সমপরিমাণ ব্যয় করেছে।
>
> অবশ্য আর একটি দিকের তথ্য ছাড়া চিত্রটি সম্পূর্ণ হবে না। সে দিকটি হোল কৃষক অভ্যুত্থানে লব্ধ কীর্তি ও জয়গুলির কথা — যা মানুষের মনে ছাপ ফেলে। সংগ্রামের সময় প্রায় ১৬ হাজার বর্গমাইল এলাকাব্যাপী আনুমানিক ৩০ লক্ষ নরনারী অধ্যুষিত প্রায় ৩ হাজার গ্রামের, প্রধানত নালগোন্ডা, ওয়ারাঙ্গল ও খাম্মাম — এই তিনটি জেলার কৃষকরা সংগ্রামী গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে গ্রাম-রাজ স্থাপনে সফল হয়েছিল। এই গ্রামগুলিতে ঘৃণিত ভূস্বামীরা — নিজামের স্বৈরতন্ত্রের গ্রামীণ এলাকার স্তরগুলি — তাদের দুর্গের মতো বাড়ীগুলি থেকে — গদি থেকে ও জমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং সে জমি কৃষকরা দখল ক'রে নিয়েছিল। গণ-কমিটিগুলির মারফত প্রায় দশ লক্ষ একর জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। সমস্ত উচ্ছেদ বন্ধ করা হয়েছিল আর অত্যধিক চড়া হারে সুদ হয় অত্যন্ত কমানো হয়েছিল, নয়তো একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ক্ষেতমজুরদের দিন-মজুরির হার বাড়ানো হয়েছিল এবং একটি ন্যূনতম মজুরি বলবৎ করা হয়েছিল। বনাঞ্চলগুলির নিকটবর্তী এলাকার উপজাতীয় মানুষ ও জনসাধারণ তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে পেরেছিল। ১২ থেকে ১৮ মাস কাল এই অঞ্চলগুলির সমগ্র প্রশাসন পরিচালনা করেছে গ্রামের কৃষক কমিটিগুলি। নিজামের

স্বৈরশাহীর বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের সময় জনগণ ১০ হাজার সদস্যের গ্রাম স্কোয়াড ও প্রায় ২ হাজার সদস্যের নিয়মিত গেরিলা স্কোয়াড সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল রাজাকার ও নিজামের পুলিশের সশস্ত্র আক্রমণের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য। লক্ষ লক্ষ কৃষক তাদের জীবনে এই সর্বপ্রথম দিনে দুবেলা খেতে পেয়েছিল। এক কথায়, এই ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহ আসফজাহী বংশের মধ্যযুগীয় স্বৈরশাহীর শিকড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছিল, এর ওপর মরণ আঘাত হেনেছিল।

♦ **আন্দোলনের প্রকৃতি : (১)** নিজামের শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান, (২) কৃষকের হাতে জমি প্রদান, এবং **(৩)** মাদ্রাজের তেলেগু ভাষা-ভাষী অঞ্চল ও তেলেঙ্গানাকে নিয়ে 'বিশাল অন্ধ্র' নামে একটি ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকরা যে-সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল, তা তেলেঙ্গানা সংগ্রাম নামে পরিচিত। নানা দিক থেকে এই সংগ্রামের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে :

প্রথমত, ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক, মাঝারি কৃষক, এমনকী প্রথম পর্যায়ে ধনী কষকদের নিয়ে যে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল হায়দ্রাবাদ শহরাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী ও ছাত্র-সমাজ। ফলে তেলেঙ্গানার কৃষক-সংগ্রাম ব্যাপক গণভিত্তি লাভ করেছিল।

দ্বিতীয়ত, ৩ হাজার গ্রামের ৩০ লক্ষ মানুষকে নিয়ে সংগ্রামী কৃষকরা যে-বিকল্প শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, তাকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রদুত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

তৃতীয়ত, ঐসব অঞ্চলে বিনা মজুরিতে শ্রমদান প্রথার অবসান, কৃষিক-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, কৃষকদের মধ্যে পতিত ও উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠন ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

চতুর্থত, সংকীর্ণ জাতপাত ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল।

পঞ্চমত, তেলেঙ্গানার কৃষকরা কেবল সামন্ততান্ত্রিক নিজামশাহী ও তার পৃষ্ঠপোষক নেহরু-প্যাটেল সরকারের ওপরই আঘাত হানেনি, সেইসঙ্গে হায়দ্রাবাদকে স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত ক'রে সেটিকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করার ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

♦ **ব্যর্থতার কারণ :** ১৯৪৬-৫১ সাল পর্যন্ত হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকরা যে-সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল, তা তেলেঙ্গানা সংগ্রাম নামে পরিচিত। এই সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পেছনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল, সেগুলি হোল :

(১) প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বস্তরের কৃষক এই আন্দোলনে যোগদান করলেও পরবর্তী সময়ে ধনী কৃষকরা এই আন্দোলনের চরম বিরোধিতা করে।

(২) সুন্দরাইয়া, ধনাগারে প্রমুখের মতে, 'অন্ধ্র মহাসভা' তেলেঙ্গানা সংগ্রামকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলেও শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে না ওঠায় তাঁদের সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল।

(৩) 'অন্ধ্র পার্টি চিঠি' থেকে জানা যায় যে ঐ আন্দোলনের নেতারা মাও-এর নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া বুর্জোয়া গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে না থাকায় এবং গেরিলা যুদ্ধ শেষপর্যন্ত ব্যক্তি-সন্ত্রাসে রূপান্তরিত হওয়ায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল বলে সুনীল সেন মন্তব্য করেছেন।

(৪) স্বাধীনতা লাভের পর প্যাটেল-চক্রকে পরাজিত করার জন্য নেহরু-সরকারকে সর্বতোভাবে সমর্থন করার প্রশ্নে পার্টির মধ্যে বির্তক শুরু হলে জঙ্গী কৃষক-সংগ্রাম চালানোর প্রশ্নটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এর ফলে সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস পায়।

(৫) তেলেঙ্গানার কৃষক-সংগ্রামকে সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত করার কোনো কর্মসূচী নেতৃবৃন্দের না থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে কার্যত আন্দোলনের মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছিল। এইসব কারণে কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫১ সালে আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিতে বাধ্য হয়।

তেলেঙ্গানার কৃষক-সংগ্রাম শেষপর্যন্ত তার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেনি। ১৯৪৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর এক বিশাল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী হায়দ্রাবাদে প্রেরণ করা হয়। তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে দুই সহস্রাধিক কৃষক ও পার্টি-কর্মী প্রাণ হারান। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার সংগ্রামী কৃষক ও কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষপর্যন্ত ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) গৃহীত প্রস্তাবে একথা বলা হয় যে, সংকীর্ণতাবাদী ও হঠকারী লাইনের জন্য পূর্বোক্ত কৃষক-আন্দোলন বা সংগ্রামগুলিতে ধনী ও মাঝারি কৃষক, এমনকী গরীব কৃষকের ব্যাপকতম অংশকে টেনে আনা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তথাপি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ঐসব কৃষক-আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল পূর্বেকার আন্দোলনগুলির তুলনায় অনেক বেশি। কারণ, ঐসব আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর সামন্তবাদের বিরুদ্ধে এবং পরিচালনা করেছিল বিপ্লবী রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ কৃষকরাই।

অনুশীলনী - ১

■ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃষকশ্রেণীর ভূমিকা-সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। তেভাগা আন্দোলনের বিশেষ উল্লেখ-সহ ১৯৩৬-১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের কৃষক-আন্দোলনের বিকাশ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

৩। তেলেঙ্গানা কৃষক-সংগ্রামের বিশেষ উল্লেখ-সহ ১৯৩৬-১৯৪৭ সালের কৃষক-আন্দোলনের বিকাশ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

■ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। সারা ভারত কৃষক সভার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

২। তেভাগা আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

৩। তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলি কী ?

৪। তেলেঙ্গানা কৃষক-সংগ্রামের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

৫। তেলেঙ্গানা কৃষক-সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণগুলি কী ?

৮.৩ : সারসংক্ষেপ

জমিদারি শোষণ, মহাজনি শোষণ ও সরকারি শোষণ — এই ত্রিবিধ শোষণের জাঁতাকলে ভারতবর্ষের কৃষকসমাজ দীর্ঘদিন ধরে পিষ্ট হচ্ছিল। তাই বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অংশে দেখা দিয়েছিল নীল বিদ্রোহ, ওয়াহাবী বিদ্রোহ, ফরায়েজী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতির মতো স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক-বিদ্রোহ। কিন্তু নানা কারণে ঐসব বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে গান্ধী তথা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চম্পারণ সত্যাগ্রহ, বারদৌলি সত্যাগ্রহ প্রভৃতি কৃষক-আন্দোলন পরিচালনা করলেও ঐসব আন্দোলন কখনই জমিদারশ্রেণীর বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়নি। অপরদিকে, ভারতের কমিউনিস্টরা শ্রমিক-কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট হন। ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ১৯২৬ সাল থেকে গড়ে ওঠে 'কৃষক ও শ্রমিক দল'। ঐ দলগুলিকে একত্রিত ক'রে ১৯২৮ সালে নিখিল 'ভারত কৃষক ও শ্রমিক দল' গঠিত হয়। ভারতবর্ষের মতো একটি ঔপনিবেশিক দেশে ভূমি-বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লবকে কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তার মেরুদন্ড বলে মনে করতেন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৩৬ সালে গঠিত হয় 'সারা ভারত কৃষক সভা'। এর লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের হাত থেকে কৃষকদের এবং সেইসঙ্গে দেশীয় রাজন্যবর্গের, জমিদারদের ও সাহুকারদের বিরুদ্ধে কৃষক সভার নেতৃত্বে সংগ্রাম শুরু করা এবং সেই সংগ্রামকে তীব্রতর ক'রে গড়ে তোলা। ১৯৩৭ সালে অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাদেশেও মে দিবস, সারা ভারত কৃষক দিবস, ঋণ মকুব দিবস, বিহার কৃষক দিবস, চীন দিবস প্রভৃতি পালনের মাধ্যমে কৃষক সভা তার রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের জন্য যে প্রস্তুত, তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সরকারি দমন-পীড়নের জন্য কৃষক সভা প্রকাশ্য আন্দোলনের কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৪১ সালে জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর যুদ্ধের প্রকৃতি পাল্টে যায়। কৃষক সভার নাগপুর সম্মেলনে (১৯৪২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধ এবং স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করা হয়। ঐ সময়

কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহকে 'ঐক্য সপ্তাহ' বলে ঘোষণা ক'রে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করার ডাক দিলে তাতে কৃষক সভাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির দাবিতে এবং নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে দেশজোড়া গণ-জাগরণ ও শ্রমিক-ধর্মঘট ব্যাপকভাবে শুরু হয়। ঐ সময় সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী কৃষক-আন্দোলন ও সংগ্রাম যে ব্যাপকতা লাভ করেছিল, তার প্রমাণ হলো বাংলাদেশের তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬) এবং হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা কৃষক-সংগ্রাম (১৯৪৬-১৯৫১)। কিন্তু নানা কারণে ঐসব আন্দোলন ও সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও সেগুলির রাজনৈতিক তাৎপর্যকে কোনোমতেই উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না।

৮.৪ : অনুশীলন পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

❑ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১ নং প্রশ্ন — ৮.২.১-৮.২.৭.৩ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন — ৮.২.৩-৮.২.৭.৩ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন — ৮.২.৩-৮.২.৭.৩ দ্রষ্টব্য।

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১ নং প্রশ্ন — ৮.২.৩-৮.২.৪ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন — ৮.২.৭.১ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন — ৮.২.৭.১ দ্রষ্টব্য।

৪ নং প্রশ্ন — ৮.২.৭.৩ দ্রষ্টব্য।

৫ নং প্রশ্ন — ৮.২.৭.৩ দ্রষ্টব্য।

৮.৫ : নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay-Type Questions

1. Analyse the rise and growth of the peasant movements in India during 1920-1947.

2. Trace the growth of the peasant movements in India during 1936-47 with special reference to the Tebhaga Peasants' Movement.
3. Trace the growth of the peasant movements in India during 1936-47 with special reference to the Telangana Peasants' Struggle.

Short Answer-Type Questions

1. Write a short note on the *All-India Kishan Sabha*.
2. What was the nature of the Tebhaga Movement in Bengal ?
3. Why did the Tebhaga Movement in Bengal fail ?
4. What was the nature of the Telangana Peasants' Struggle ?
5. Why did the Telangana Peasants' Struggle fail ?

৮.৬ : গ্রন্থপঞ্জী

Desai, A. R. (ed.), *Peasant Struggles in India*.

Dhanagare, D. N., *Peasant Movements in India, 1920-1950*.

—, 'Social Origin of Peasant Insurrection in Telengana (1946-51)', A. R. Desai (ed.), *Peasant Struggles in India*.

Dutt, R. P., *India Today*.

Indian Annual Register, 1938, vol. I.

Majumder, R. C., *History of the Freedom Movement in India*, vol. III.

Mehta, Uday, 'Peasant Movement in India', A. R. Desai (ed.), *Peasant Struggles in India*.

Namboodiripad, E. M. S., *A History of Indian Freedom Struggle*.

Rao, A. R., *The Telangana Movement : an investigative focus*.

Rao, C. R., *The Historic Telangana Struggle : Some Useful Lessons from its Rich Experience*.

Rasul, Abdullaha, *A History of the All-India Kishan Sabha*.

Sen, Sunil, 'The Kishan Sabha', A. R. Desai (ed.), *Peasant Struggles in India*.

—, 'Tebhaga Chai', A. R. Desai (ed.), *Peasant Struggles in India*.

—, *Agrarian Struggle in Bengal, 1946-47*.

Sundarayya, P., *Telangana People's Struggle and its Lessons*.

Tirth, Swami R., *Memory of Hyderabad Freedom Struggle*.

আহ্‌মদ, মুজফ্‌ফর, *প্রবন্ধ সংকলন*।

—, *নির্বাচিত রচনা সংকলন*।

কবিরাজ, নরহরি, *অসমাপ্ত বিপ্লব অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা*।

দত্ত, রজনী পাম, *আজিকার ভারত*।

নাম্বুদিরিপাদ, ই. এম. এস., *ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড।

ভট্টাচার্য, জয়ন্ত, *বাংলার সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের ধারা*।

—, *বাংলার তেভাগা তেভাগার সংগ্রাম*।

রসুল, আব্দুল্লাহ্‌, *কৃষক সভার ইতিহাস*।

রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, ১ম খণ্ড।

— *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড।

সুন্দরাইয়া, পি., *তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা*।

একক - ৯

(Unit - 9)

চল্লিশের দশকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

(Communal Politics in the 1940s)

এককের গঠন-বিন্যাস

৯.০ : উদ্দেশ্য

৯.১ : ভূমিকা

৯.২ : সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ

৯.২.১ : তিরিশের দশকে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার

৯.৩ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্বে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

৯.৩.১ : জিন্না ও তাঁর 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব'

৯.৩.২ : লীগের লাহোর অধিবেশন ও 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব'

৯.৩.৩ : 'লাহোর প্রস্তাব'

৯.৩.৪ : 'লাহোর প্রস্তাব'-এর পরিণাম

৯.৪ : 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' : ফিরে দেখা

৯.৫ : সাম্প্রদায়িকতা প্রসারে জাতীয় নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব

৯.৬ : সারসংক্ষেপ

৯.৭ : অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৯.৮ : নমুনা প্রশ্নাবলী

৯.৯ : গ্রন্থপঞ্জী

৯.০ : উদ্দেশ্য

গোখেল ও সরোজিনী নাইডু যে-জিন্নাকে এক সময় 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের রাজদূত' বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং যে-জিন্না ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনের চরম বিরোধিতা করেছিলেন, বিগত শতকের চল্লিশের দশকে সেই জিন্নাই হয়ে উঠেছিলেন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সর্বপ্রধান প্রবক্তা। ১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে তিনি যে-ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে সুস্পষ্টভাবে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র সপক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছিল। ঐ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের (যা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে সাধারণভাবে পরিচিত) ভিত্তিতে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে'র দাবিতে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ চালায়। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট দিনটিকে মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' হিসেবে পালন করে। ঐ দিন থেকেই শুরু হয় ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। শেষপর্যন্ত ভারত দ্বি-খণ্ডিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে উৎপত্তি ঘটে 'পাকিস্তান' নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের। বিগত শতকের চল্লিশের দশকে এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রকৃতি ও পরিণতি সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করার উদ্দেশেই বর্তমান ইউনিটটি রচিত হয়েছে।

৯.১ : ভূমিকা

বর্তমান ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে সাম্প্রদায়িকতাকে চিহ্নিত করা হয়। অনেকের মতে, "ভারতীয় ঐতিহাসিক বিবর্তনের যুক্তিপরম্পরাগত এবং স্বাভাবিক বা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হোল সাম্প্রদায়িকতা।" কারণ, সুদীর্ঘকাল একসঙ্গে বসবাস করা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও ভাষাভুক্ত মানুষের মধ্যে আত্মিক বন্ধন কোনোদিনই গড়ে ওঠেনি; গড়ে ওঠা সম্ভবও নয়। সেইসঙ্গে একথাও সত্য যে, প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাস হোল 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এবং 'বিবিধের মাঝে মিলনের' ইতিহাস। তাই ভারতীয় সংস্কৃতি হোল 'মিশ্র সংস্কৃতি'। বস্তুত, আকবর থেকে দারা শিকোহ পর্যন্ত একটি সমন্বয়ী ধারা কখনও জোয়ার, আবার কখনও বা ভাঁটার টানে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের পেছনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকা কম ছিল না। এ প্রসঙ্গে **রজনী পাম দত্ত** যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছিলেন যে, তৎকালীন ভারতে সরকারি নীতির পক্ষে উদীয়মান মধ্যশ্রেণীগুলির মধ্যেকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত বিরোধগুলিকে কাজে লাগিয়ে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ হয়েছিল। **বিপান চন্দ্রের** অভিমত হোল, "সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও ব্রিটিশ নীতি ছিল সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের নিয়ন্তা।"

৯.২ : সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ

ব্রিটিশদের আগমনের পর থেকে নানা কারণে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় দু'টির মধ্যে ধীরে ধীরে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে ওঠে। **প্রথমত**, নিজেদের সামাজিক স্বার্থে তারা ভারতে যে-শিক্ষা, সংস্কৃতি,

জীবনচর্চা ইত্যাদির প্রবর্তন করেছিল, হিন্দুরা তাকে সাগ্রহে গ্রহণ করলেও রক্ষণশীল মুসলমানরা ধর্মীয় গোঁড়ামির চারদেয়ালের মধ্যেও নিজেদের আটকে রেখেছিল। ফলে সরকারি চাকুরি থেকে শুরু ক'রে সর্বক্ষেত্রেই হিন্দুদের বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু ঐসব থেকে দূরে সরে থাকার ফলে মুসলমানরা যে-তিমিরে ছিল, সেখানেই থেকে যায়। **দ্বিতীয়ত**, ব্রিটিশরা মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার ফলে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের কোনোদিনই ভাল মনে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আদৌ রাজী ছিল না। **তৃতীয়ত**, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে লাভ হয়েছিল প্রধানত হিন্দু জমিদারদের। অপরদিকে, ঐসব জমিদারদের মুসলমান প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে থাকে। ফলে মুসলমানদের মনে সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে যে, ব্রিটিশ শাসন ভারতে হিন্দুদের পরিপোষণ করার নীতি গ্রহণ করেছে। **চতুর্থত**, 'ঔপনিবেশিক অর্থনীতি' হিন্দু মহাজনদের ঋণের নাগপাশে সমগ্র কৃষক-সমাজকে, বিশেষত দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের বেঁধে ফেলার ব্যবস্থা করেছিল। ঋণের দায়ে শেষ পর্যন্ত তাদের জমি হারাতে হয়েছিল। তাছাড়া, বাধ্যতামূলক বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনের নীতি চালু করা হলে কৃষিক্ষেত্রে মুসলমান-সহ সব সম্প্রদায়ের কৃষকদের নির্ভর করতে হোত হিন্দু ব্যবসায়ীদের দয়ার ওপর। **পঞ্চমত**, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও আইনের কাঠামো ভূস্বামী ও কৃষকদের আদালত ও হিন্দু আইনজীবীদের দ্বারস্থ হতে এবং কারিগরদের হিন্দু ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়তে বাধ্য করেছিল। বলা বাহুল্য, এর শিক্ষাদীক্ষা ফলেয়ে অনগ্রসর ও দরিদ্র মুসলমান কৃষক ও কারিগরদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। **ষষ্ঠত**, ব্রিটিশ শাসকরা লক্ষ্য করছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে যেসব আন্দোলন ও বিদ্রোহ হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে বঙ্গদেশে ওয়াহাবি আন্দোলন ও ফরিদপুরের ফরায়েজী বিদ্রোহ এবং মহাবিদ্রোহের মতো অনেকগুলি আন্দোলন ও বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল মুসলমানদের নেতৃত্বে। বিশেষত, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর মুসলমানদের ওপর ব্রিটিশ শাসকদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী উভয় সম্প্রদায়ের মনে পারস্পরিক সন্দেহের বীজ বপন করে।

১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন বড়লাট হয়ে আসার পর ভারতে ব্রিটিশ বিভেদ নীতি দৃঢ়তা লাভ করে। ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই তিনি বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর তা করার আগে তিনি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সারা ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার পর ১৯০৭ সালে পাঞ্জাবে হিন্দু মহাসভা স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে এই সভা অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার জন্ম দেয়। বিশের দশকের প্রথম দিকে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যোগদান করলেও ১৯২২ সালে গান্ধী একতরফাভাবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নেওয়ার পর বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে নেহেরু কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে জিন্না কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং পাঞ্জাব ও বাংলার আইনসভায় মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হলে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মুসলিম লীগ-নেতৃবৃন্দের মতপার্থক্য তীব্র আকার ধারণ করে। ঐ মতপার্থক্য দূর করার জন্য ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে জিন্না তাঁর বিখ্যাত ১৪-দফা দাবি পেশ করেন।

❑ ৯.২.১ তিরিশের দশকে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার

ব্রিটিশ সরকার মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে যে-কতখানি পরিপোষণ করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ৩০-এর দশকের প্রথম দিকে অবস্থিত গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি মনোনয়নের সময়। তাছাড়া, ১৯৩২ সালে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' সম্পর্কিত ঘোষণা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ফাটল ধরায়। এই ঘোষণার ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইনে' মুসলমানদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা ভারতীয় জনগণের ঐক্য ও সংহতির মূলে কুঠারঘাত করেছিল। এদিকে ১৯৩৭-৩৯ সালের মধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির কাজকর্ম খতিয়ে দেখার জন্য মুসলিম লীগ একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করে। কমিটির রিপোর্ট 'পীরপুর রিপোর্ট' নামে পরিচিত। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার নামে রিপোর্টের তৃতীয় অধ্যায়ে এমন সব রোমহর্ষক কাহিনি ও তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, যা থেকে একথা মনে হতে পারে যে, কংগ্রেসী শাসনে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। রিপোর্টের মূল বক্তব্য ছিল — অসহায় ও সংখ্যালঘু ইসলাম সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের স্বেচ্ছাচারী আচার-আচরণ ও অত্যাচার-অবিচারে জর্জরিত হচ্ছিল। রিপোর্টে অভিযোগ করা হয় যে, মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস সরকারের 'বিদ্যামন্দির' পরিকল্পনা মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা ও আচার-আচরণের পরিপন্থী। ঐ সরকার সরকারি বিদ্যালয়কে 'মন্দির' হিসেবে বিবেচনা করায় মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কারণ, হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনার স্থান হোল মন্দির। তাছাড়া, পৌত্তলিকতা-বিরোধী মুসলমানদের পক্ষে মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকা ইসলাম-বিরোধিতার নামান্তর মাত্র। রিপোর্টে আরও অভিযোগ করা হয় যে, বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত বাধ্যতামূলক করা, হিন্দু-মুসলমান নির্বেশেষে সব ছাত্র-ছাত্রীকে গান্ধীর ছবির সামনে দাঁড় করিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য করা প্রভৃতির মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশের সরকার কার্যত ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। বলা বাহুল্য, রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য নানা ধরনের কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত কাহিনি তুলে ধরা হয়েছিল।

৯.৩ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্বে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

ব্রিটিশ আনুকূল্যপুষ্ট মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ যখন তুঙ্গে, তখন বাধল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। ভারতের জনসাধারণ কিংবা তাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোনোরকম পরামর্শ না ক'রেই ব্রিটিশ সরকার ভারতকে 'যুদ্ধরত' দেশ বলে ঘোষণা করে এবং মালয় ও দূর-প্রাচ্যে ভারতীয় সেনা প্রেরণ করতে থাকে। পাঞ্জাব, বাংলা ও সিন্ধুপ্রদেশের অ-কংগ্রেসী সরকারগুলি ব্রিটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশে প্রাদেশিক গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য সরকার নির্দেশ দিলে মুসলিম লীগ ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলে ঘোষণা করে। কিন্তু কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যুদ্ধে সরকারকে শর্তাধীনে সহযোগিতা করতে কংগ্রেস সম্মত ছিল। প্রধানত যে-দু'টি শর্ত কংগ্রেস আরোপ করেছিল, তা হোল — (১) অবিলম্বে কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং (২) ভারতের ভবিষ্যৎ-সংবিধান রচনার জন্য গণ-পরিষদ গঠন করতে হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে মুসলিম লীগকে তোষণ করার নীতি গ্রহণ করে। **ড. আয়েষা জালাল** মন্তব্য করেছেন যে, এমতাবস্থায় বড়লাট লিনলিথগো (Linlithgow) উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে জিন্না ও লীগের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি একথা স্পষ্টভাবে স্বীকারও করেছিলেন যে, কংগ্রেসের দাবির বিরোধিতা ক'রে জিন্না (তথা মুসলিম লীগ) তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। সেজন্য বড়লাট তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। জিন্না যদি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে দাবি উত্থাপন করতেন, তাহলে 'মহামান্য সম্রাটের সরকারে'-র ওপর নিঃসন্দেহে মারাত্মক চাপ পড়ত। যাইহোক্, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রে ১৯৩৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটি (The Working Committee) দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যত 'ভিটো ক্ষমতা' দাবি করল। কমিটি ঘোষণা করেছিল যে, মুসলিম লীগের অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া ভারতে সাংবিধানিক পদক্ষেপের ব্যাপারে কোনো ঘোষণা করা চলবে না। সেইসঙ্গে কমিটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অবসানও দাবি করে। কমিটি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেয় যে, মুসলিম লীগই একমাত্র সংগঠন, যা মুসলিম-ভারতের হয়ে কথা বলার অধিকারী। **বিপান চন্দ্রের মতে**, "ব্রিটিশরা লীগকে খুশি করতে রাজী ছিল, কেননা ব্রিটিশ ক্যাবিনেট কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফারাককে তাদের তুরুপের তাস হিসেবে দেখেছিল।" ঐ বছরের ১১ই সেপ্টেম্বর বড়লাট যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন। ২রা নভেম্বর সেক্রেটারী অব্ স্টেট জিন্নার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী দল মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হবে। কংগ্রেসের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় এবং লীগের প্রতি সরকারের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে ১৯৩৯ সালের ৯-১০ই অক্টোবর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস-মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগ করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পর ২২শে ডিসেম্বর তারিখটিকে 'বিগত আড়াই বছরের অত্যাচার, শোষণ ও অন্যায়ের হাত থেকে পরিত্রাণ' পাওয়ার জন্য জিন্না 'মুক্তি দিবস' হিসেবে পালন করতে মুসলমানদের নির্দেশ দেন। লীগের সভায়ও তা প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়। **স্ট্যানলী ওলপার্ট** (Stanley Wolpert)-এর মতে, সংগ্রামের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের যে-স্বপ্ন এতদিন কংগ্রেস দেখেছিল, লীগের এই প্রস্তাব তা ধূলিসাৎ ক'রে দেয়। এর পর জিন্না তথা মুসলিম লীগ 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র ভিত্তিতে ভারত-বিভাজনের কাজে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন।

❑ ৯.৩.১ : জিন্না ও তাঁর 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব'

মহম্মদ আলি জিন্নার নাম 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' (the Two-nation Theory)-এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, জিন্নার এই তত্ত্ব শেষপর্যন্ত অখণ্ড ভারতকে দ্বি-খণ্ডিত করার পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিল। যে-জিন্নাকে গোখেল এক সময় 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের রাজদূত' (Ambassador of Hindu-Muslim Unity) হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং যে-জিন্না বিশের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত

একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিরিশের দশকের শেষ দিক থেকে সেই জিন্না হয়ে উঠেছিলেন কট্টর মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র মুখ্য প্রবক্তা। ১৯৪০ সালের ২২শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত 'সারা ভারত মুসলিম লীগ' (All India Muslim League)-এর ২৭-তম অধিবেশনে তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে আনুষ্ঠানিকভাবে 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব'টি পেশ করেন। অবশ্য লাহোরে কংগ্রেসের প্রায় দেড় বছর পূর্বে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে এই তত্ত্বের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৩৮ সালের ৮ই অক্টোবর করাচীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সম্মেলনে ভাষণদানের সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, মুসলমানরা যদি 'তাদের জাতীয় লক্ষ্য এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা' (the national goal and aspirations) পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহলে এই ব্যর্থতা আসবে অতীতের মতো মুসলমানদের মধ্যে একটি অংশের 'বিশ্বাসঘাতকতা'র জন্য। এই বক্তব্যের মধ্যে 'জাতীয় লক্ষ্য' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এর মধ্যেই জিন্নার' দ্বি-জাতি তত্ত্ব'-এর বীজ নিহিত ছিল। ১৯৪০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তিনি 'টাইম অ্যাণ্ড টাইড' (Time and Tide)-এ 'পশ্চিমী গণতন্ত্র ভারতের পক্ষে অনুপযোগী' (Western Democracy Unsuited for India) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটি '**জিন্নার থিসিস**' নামে সাধারণভাবে পরিচিত। এতে জিন্না লেখেন যে, পশ্চিমী গণতন্ত্র ভারতের পক্ষে আদৌ উপযোগী নয় এবং জোর ক'রে এরূপ গণতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়ার ফলে ভারতে সাংবিধানিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এমন একটি সংবিধান প্রণয়নের দাবি জানান, যার মধ্যে পৃথক দু'টি জাতিসত্তার স্বীকৃতি থাকবে। 'সাধারণ মাতৃভূমির পরিচালনায়' (the governance of the common motherland) ঐ জাতি দু'টি অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে। লক্ষণীয় বিষয় হোল — পূর্বোক্ত প্রবন্ধে জিন্না সোজাসুজি হিন্দু ও মুসলমানকে দু'টি পৃথক জাতি হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবি জানালেও মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের কোনো কথা বলেননি। বরং, তিনি ভারতকে হিন্দু-মুসলমানের 'সাধারণ মাতৃভূমি' বলে বর্ণনা করেছিলেন। ১৯৪০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি লীগ পরিষদ (the Council of the League)-এর সভায় তিনি কংগ্রেসকে এই সত্যটি উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়েছিলেন যে, মুসলমানরা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, তারা হোল 'একটি জাতি' (a nation)। মুসলমানদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, ব্রিটিশরা ভারত শাসন করতে চায়। মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস ভারত এবং মুসলমানদের শাসন করতে আগ্রহী। কিন্তু "আমরা ব্রিটিশ কিংবা গান্ধীকে শাসন করার সেই সুযোগ কোনোমতেই দেব না। আমরা 'স্বাধীন' (free) হতে চাই।" সুতরাং বলা যায়, লাহোর অধিবেশনের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই জিন্না তাঁর 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' প্রচারের মাধ্যমে মুসলিম জনমত গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

❑ ৯.৩.২ : লীগের লাহোর অধিবেশন ও 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব'

মুসলিম লীগের অধিবেশনে (মার্চ, ১৯৪০) জিন্না তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই গান্ধী এবং কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, গণ-পরিষদের দ্বারা ভারতের ভাবী সংবিধান রচনার কংগ্রেসী দাবি হোল একটি নতুন 'টোপ'। মুসলিম লীগ কোনোমতেই সেই টোপে গলাধঃকরণ করবে না। কারণ, যে-গান্ধী তাঁকে 'ভাই' বলেন, তাঁর তিন ভোটের বদলে তাঁর নিজের (অর্থাৎ জিন্না তথা মুসলমানদের) মাত্র

একটি ভোট রয়েছে। তিনি ভারতের সমস্যাকে আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলে নিতে রাজী নন বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মতে, যেহেতু ভারতের সমস্যা আন্তর্জাতিক প্রকৃতিসম্পন্ন, সেহেতু তার সমাধানও সেইভাবে করতে হবে। এই মৌলিক বিষয়টিকে উপেক্ষা ক'রে যে-সংবিধানই রচনা করা হোক্ না কেন, তা এক দুর্বিপাকের সৃষ্টি করবে। তাই তাঁর পরামর্শ হোল — ভারতকে স্বয়ংশাসিত জাতীয় রাষ্ট্রে ভাগ ক'রে সব জাতিকে পৃথক বাসভূমি প্রদান করতে হবে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে **জিন্না** বলেছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক প্রথা ও সাহিত্য রয়েছে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। তারা একসঙ্গে আহারও করে না। তারা এমন দু'টি পৃথক পৃথক সভ্যতার অঙ্গ, যার ভিত্তি হোল প্রধানত পরস্পর সংঘর্ষরত ভাবধারা ও মতবাদ। জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভীও সম্পূর্ণ পৃথক। একথাও স্পষ্ট যে, হিন্দু ও মুসলমানরা ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে। তাদের মহাকাব্য ও তার নায়ক এবং কাহিনির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। প্রায়শই দেখা গেছে, একের নায়ক অপরের শত্রু হিসেবে পরিগণিত হন। এই রকম দু'টি পৃথক জাতিকে একটি রাষ্ট্রের জোয়ালে জুড়ে দিলে এর একটি হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অপরটি হবে সংখ্যালঘিষ্ঠ। ফলে তাদের মধ্যে যে-অসন্তোষের সৃষ্টি হবে, তা একদিন সমগ্র রাষ্ট্র-কাঠামোকেই ধবংস ক'রে দেবে। **জিন্নার** মতে, ভারত একটি জাতি নয়। বিগত বারো শ' বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এখানে কোনোদিনই এই ধরনের ঐক্য গড়ে ওঠেনি। বরং, ভারত সবসময় 'হিন্দু-ভারত' এবং 'মুসলিম-ভারত' — এই দু'ভাগে বিভক্ত থেকেছে। জয়ী হবার পর ইংরেজরা অস্ত্রবলে ভারতের কৃত্রিম ঐক্য বজায় রেখেছে। তিনি দৃঢ়ভাবে একথা ঘোষণা করেন যে, 'মুসলিম-ভারত' এমন কোনো সংবিধানকে মেনে নেবে না, যার ফলে হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠার অর্থ হবে 'হিন্দু-রাজত্ব' কায়েম করা। তিনি আশা করেন যে, ব্রিটিশ সরকার এই ধরনের কোনো সংবিধান মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেবে না। তাঁর দাবি হোল— 'জাতি' শব্দের যে-কোনো পরিভাষা অনুযায়ী মুসলমানেরা যেহেতু একটি জাতি, সেহেতু তাদের নিজস্ব বাসভূমি (homeland), ভৌগোলিক এলাকা (territory) এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজন।

❑ ৯.৩.৩ : 'লাহোর প্রস্তাব'

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ২৪শে মার্চ জিন্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে যে-প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, তার উত্থাপক ছিলেন ফজলুল হক। প্রকাশ্য অধিবেশনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়কে তিনটি অনুচ্ছেদ (Paragraph)-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে, সারা ভারত মুসলিম লীগ পরিষদ ও কার্যকরী কমিটি (the Council and the Working Committee of the All-India Muslim League) কর্তৃক ১৯৩৯ সালের ২৭শে আগস্ট, ১৭-১৮ই সেপ্টেম্বর ও ২২শে অক্টোবর এবং ১৯৪০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি সংবিধান-সংক্রান্ত যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, এই সভা তা অনুমোদন করছে। সেইসঙ্গে এই সভা দৃঢ়তার সঙ্গে একথা ঘোষণা করছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে-ধরনের যুক্তরাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তা এই দেশের বিশেষ অবস্থায় (the peculiar conditions) একেবারে অনুপযোগী ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং "মুসলিম ভারতের পক্ষে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় (altogether unacceptable to 'Muslim India')।"

প্রস্তাবের ২ নং অনুচ্ছেদে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি জানানো হয় যে, যেসব নীতি ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়েছিল, ভারতের বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সেগুলিকে পুনর্বিবেচনার যে প্রতিশ্রুতি ১৯৩৯ সালের ১৮ই অক্টোবর বড়লাট প্রদান করেছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা ছাড়া অন্য কিছুতেই মুসলিম-ভারত সন্তুষ্ট হবে না। তাছাড়া, মুসলমানদের 'অনুমোদন ও সম্মতি' (approval and consent) ছাড়া সংবিধান সংশোধনের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে তারা তা মেনে নেবে না।

লাহোর প্রস্তাবের ৩ নং অনুচ্ছেদটি ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বলা হয়েছিল যে, নিম্নোক্ত মৌলিক নীতি (basic principal) অনুযায়ী রচিত নয় এমন কোনো সাংবিধানিক পরিকল্পনা এই দেশে কার্যকর অথবা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। এই মৌলিক নীতিটি হোল — ভৌগোলিক দিক থেকে সন্নিহিত ইউনিটগুলিকে নিয়ে এবং প্রয়োজন হলে 'আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস' (territorial readjustments) ঘটিয়ে ভারতকে এমন কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করতে হবে, যাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মতো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলিতে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (independent states) প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এইসব রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলি হবে 'স্বয়ংশাসিত ও সার্বভৌম' (autonomous and sovereign)। ঐ ইউনিট ও অঞ্চলগুলিতে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার এবং স্বার্থরক্ষার 'যথেষ্ট কার্যকর ও বাধ্যতামূলক' (adequate, effective and mandatory) ব্যবস্থা তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হবে। আবার, 'ভারতের অন্যান্য অংশ' (in other parts of India) যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও 'তাদের এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য' (for them and other minorities) অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা প্রস্তাবে বলা হয়েছিল। ৩ নং অনুচ্ছেদের শেষে প্রস্তাবের মৌলিক নীতিসমূহ অনুযায়ী এবং প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ, শুল্ক (customs) ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে অঞ্চলগুলির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখে একটি সংবিধান রচনার দায়িত্ব কার্যকরী কমিটির হাতে অর্পণ করা হয়।

প্রস্তাবটি উত্থাপন করার পর **ফজলুল হক** তাঁর ভাষণে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, মুসলমানরা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁদের বিনা সম্মতিতে কোনোও সংবিধান প্রণয়ন করা হলে তাঁরা তা অকেজো ক'রে দেবেন। কারণ, যেহেতু কেবল পাঞ্জাব এবং বাংলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেহেতু যে-কোনো ধরনের সংবিধান গ্রহণ করা হলে তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। তাই যতদিন জনসমষ্টির অসমান অবস্থানের একটি সন্তোষজনক সমাধান না হবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতের সংবিধান রচনার যে-কোনো আলোচনা অর্থহীন হতে বাধ্য বলে তিনি মনে করেন। তিনি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার, ধীরস্থিরভাবে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করার এবং স্বনির্ভর হওয়ার জন্য আবেদন জানান। সবশেষে তাঁর দ্বারা উত্থাপিত প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

লক্ষণীয় বিষয় হোল— লাহোর প্রস্তাবের কোথাও কিন্তু 'পাকিস্তান' নামক পৃথক কোনো রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়নি। প্রস্তাবের মধ্যে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ', 'স্বয়ংশাসিত ও সার্বভৌম ইউনিট' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার ফলে প্রস্তাবে প্রকৃতপক্ষে কী বলতে চাওয়া হয়েছিল, তা তখন পরিষ্কারভাবে কেউ বুঝতে পারেননি। তাই **ড. বি. আর. আম্বেদকর** ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত তাঁর 'পাকিস্তান অথবা ভারত বিভাজন' (*Pakistan or Partition of India*) নামক প্রকাশিত পুস্তকে এই মন্তব্য করেছিলেন, যেসব অঞ্চলে মুসলমানদের প্রাধান্য রয়েছে, সেগুলিকে নিয়ে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠন করা হবে। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে, বেলুচিস্তান ও সিন্ধুপ্রদেশ এবং বাংলাকে নিয়ে ব্রিটিশ ভারতের বাইরে ঐসব স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। কিন্তু ঐসব মুসলমান ইউনিটগুলি স্বাধীন সার্বভৌম হবে অথবা একটি সংবিধানের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র কিমবা এককেন্দ্রিক সরকার হিসেবে থাকবে, তা প্রস্তাবের ৩নং অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় না। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ঐসব অঞ্চল একত্র হয়ে এমন 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠন করবে, যাদের ইউনিটগুলি হবে 'স্বয়ংশাসিত ও সার্বভৌম'। ইউনিটগুলিকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হলে তা হয় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিটগুলি কখনই 'সার্বভৌম' হতে পারে না। ইউনিটগুলি 'সার্বভৌম' হলে তা হবে 'রাষ্ট্র-সমবায়' বা 'কনফেডারেশন' (confederation), যুক্তরাষ্ট্র নয়। সুতরাং, 'লাহোর প্রস্তাব' ছিল অস্পষ্টতাদোষে দুষ্ট এবং স্ব-বিরোধী। তাই প্রস্তাবের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে না পেরে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরের দিন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিতে বড় বড় অক্ষরে 'লাহোর প্রস্তাব'কে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলে বর্ণনা ক'রে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এইভাবে জাতীয় সংবাদপত্রগুলির ভ্রান্ত প্রচারের ফলে 'লাহোর-প্রস্তাব' রূপান্তরিত হয় 'পাকিস্তান-প্রস্তাবে'। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বয়ং **জিন্না** বলেছিলেন, 'পাকিস্তান' কথাটি আমরা চালু করিনি। হিন্দুরাই আমাদের এই শব্দটি উপহার দিয়েছেন। লাহোর-প্রস্তাবকে কঠোরভাবে সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁরা এটিকে 'পাকিস্তান-প্রস্তাব' বলে উল্লেখ করেন। তার ফলেই এই শব্দটির প্রচলন হয়।" অবশ্য সেজন্য **জিন্না** হিন্দুদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে ভুল করেননি বলে **পীরজাদার** লেখা 'পাকিস্তান-প্রস্তাব ও ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশন' (*The Pakistan Resolution and the Historic Lahore Session*) নামক পুস্তক থেকে জানা যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে তথাকথিত 'পাকিস্তান-প্রস্তাব'-এর স্ব-বিরোধিতা সম্পর্কে আম্বেদকর আলোচনা করা সত্ত্বেও জিন্না তথা মুসলিম লীগ তা সংশোধনের জন্য কোনোরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে 'পাকিস্তান-প্রস্তাব'-এর অভিধা লাভ করে ১৯৪১ সালের ১৫ই এপ্রিল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে। এখানে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাই লীগের মূল নীতি হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হোল— মাদ্রাজ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাবের মতোই 'রাষ্ট্রসমূহ' বা 'স্টেটস্' (States) শব্দটি রেখে দেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালে গান্ধী-জিন্না পত্রালাপের সময়ও জিন্না 'রাষ্ট্রসমূহ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এমনকী, ভুল বা মুদ্রণ প্রমাদহেতু 'সমূহ' (এস-S) অক্ষরটি সংযোজিত হয়েছে— একথাও কিন্তু তিনি একবারও বলেননি। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আইনসভার মুসলিম লীগ-সদস্যদের সম্মেলনে সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্রসমূহ' (স্টেটস্) শব্দটি নিয়ে বিতর্ক ওঠে। সম্ভবত ঐ সময় জিন্না 'স্টেটস্' শব্দটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং দিল্লী সম্মেলনের

প্রস্তাবে 'রাষ্ট্রসমূহ' বা 'স্টেটস্' শব্দের পরিবর্তে রাষ্ট্র (স্টেট্) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তার পরেও বিতর্কের অবসান ঘটেনি। বাংলার মুসলিম লীগের একটি অংশ 'লাহোর প্রস্তাব'কেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন। কিন্তু বাংলায় জিন্নার অনুগামী মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন বলে শেষপর্যন্ত তাঁর বক্তব্যই চূড়ান্ত বলে স্বীকৃত হয়।

❑ ৯.৩.৪ : 'লাহোর প্রস্তাব'-এর পরিণাম

এইভাবে চল্লিশের দশকের শুরুতে 'লাহোর-প্রস্তাব' তথা 'পাকিস্তান-প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ার পর হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের একটি উক্তির মধ্যে। তিনি বলেছিলেন, "আমরা পাকিস্তান, রাজন্যবর্গ-শাসিত ভারত ও হিন্দুদের দিয়ে তৈরী করা একটি তিনপেয়ে কুর্সীতে বসে থাকতে পারি।" ১৯৪২ সালে ভারতে ক্রিপস্ মিশন প্রেরণের সময় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, যুদ্ধের পর ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদানের জন্য ভারতীয়দের ঐক্যের ভিত্তিতে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। ক্রিপস্ প্রস্তাবেও অনুরূপ কথা বলা হয়। সেই সঙ্গে প্রস্তাবে একথাও বলা হয় যে, কোনোও প্রদেশ সর্বভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করতে না চাইলে তাঁর পৃথক থাকার এবং নিজ সংবিধান প্রণয়ন করার অধিকার থাকবে। কিন্তু নানা কারণে ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হয়। এরপর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' শুরু করলে মুসলিম লীগ সেই আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধী-জিন্নার যে-বৈঠক হয়, তাতে গান্ধী গণভোট কিংবা গণতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু জিন্না পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব থেকে একচুলও নড়তে সম্মত না হওয়ায় এই বৈঠক ব্যর্থ হয়। ১৯৪৫ সালে ওয়াভেল প্রস্তাবে বলা হয় যে, বড়লাটের শাসন পরিষদে ১০ জন ভারতীয় সদস্য থাকবেন। তাঁর মধ্যে হিন্দু-প্রতিনিধির সংখ্যা মুসলমান-প্রতিনিধি সংখ্যার সমান হবে অর্থাৎ, উভয় সম্প্রদায়ই ৫ জন ক'রে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবে। কিন্তু জিন্না তথা মুসলিম লীগ দাবি করেন, পরিষদের ৫ জন মুসলমান প্রতিনিধিকে মনোনয়ন করার অধিকার কংগ্রেসের থাকবে না। অপরদিকে, কংগ্রেস প্রস্তাব দেয় যে, হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত ৫টি আসনের মধ্যে ১টিতে কংগ্রেস একজন মুসলমান প্রতিনিধিকে মনোনয়ন করবে। কিন্তু জিন্না তথা মুসলিম লীগ এতে আপত্তি করেন। জিন্না ঘোষণা করেন যে, কোনোও মুসলমান প্রতিনিধিকে কংগ্রেস মনোনয়ন করলে সেই সরকারে অংশগ্রহণ করবে না। উভয় সম্প্রদায়ের এই অনৈক্যের সুযোগে ব্রিটিশ সরকার প্রস্তাবিত সাংবিধানিক পরিবর্তন অসম্ভব বলে ঘোষণা করে।

ইতোমধ্যে মুসলিম লীগের শক্তি পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ লীগের প্রতি তাদের যে-সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভাগুলির নির্বাচনী ফলাফল থেকেই তা প্রমাণিত হয়। ঐ নির্বাচনে মুসলিম-প্রধান প্রদেশগুলির মধ্যে কেবল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ছাড়া অন্যত্র অর্থাৎ, বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস যেখানে ৫৬টি আসন অধিকার করে, সেখানে লীগকে মাত্র ৩০টি আসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই নির্বাচন থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে

ওঠে যে, নির্বাচকমন্ডলী কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা-প্রস্তাবকে যেমন সমর্থন করেছিল, তেমনি মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ লীগের পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবির প্রতি তাদের সমর্থনের কথা জানিয়ে দিয়েছিল।

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক স্বাধীনতাস্পৃহা লক্ষ্য ক'রে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী **এট্‌লী** (C. R. Attlee) ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাদির সমাধান করার উদ্দেশ্যে ভারত সচিব প্যাথিক লরেন্স (Pethick Lawrence)-সহ কয়েকজন ক্যাবিনেট-সদস্যকে ভারতে প্রেরণ করা হবে। এই মিশন 'ক্যাবিনেট মিশন' (Cabinet Mission) নামে পরিচিত। 'ক্যাবিনেট মিশন'-এর প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলিকে হিন্দু-প্রধান ও মুসলমান প্রধান— এই দু'ভাগে ভাগ করা হবে। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গণ-পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করবে। পূর্বোক্ত দু'টি বিভাগের প্রতিনিধিরা পৃথক পৃথকভাবে মিলিত হয়ে নিজ নিজ সংবিধান রচনা করতে পারবে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যে-কোনো প্রদেশ নিজ ইচ্ছা অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে। এছাড়া, বিভিন্ন দলের সম্মতি অনুযায়ী অবিলম্বে দলীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কথাও প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব-সহ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে অংশগ্রহণ করতে অসম্মতি জানায়। কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণার জন্য লীগ ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকে। কিন্তু বড়লাট লীগের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে অস্বীকার করলে জিন্না ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে চাইলে বড়লাট লীগের প্রতিনিধি ছাড়াই সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট দিনটিকে লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' (Direct Action) দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ দিন লীগের নেতৃত্বে বাংলায়, বিশেষত কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন, লুঠতরাজ প্রভৃতি ব্যাপক আকার ধারণ করে। **শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** তাঁর *জিন্না-পাকিস্তান-নতুন* ভাবনা নামক পুস্তকে লিখেছেন :

> প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন কলকাতায় লীগ-নেতৃত্বে ও বঙ্গের লীগ-সরকারের কর্ণধার এবং প্রধানমন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দীর প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ও প্রশ্রয়ে হিন্দু উৎপীড়ন ও নিধন-যজ্ঞের সূত্রপাত। প্রথম তিন দিন একরকম একতরফা নিগৃহীত হবার পর হিন্দুরাও সংগঠিত হয়ে প্রতি আক্রমণ শুরু করার পর কলকাতার বুকে দীর্ঘকালব্যাপী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা চলল। এর জের বোম্বাই, করাচী, সীমান্তপ্রদেশ, নোয়াখালি ও বিহার হয়ে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ল এবং এই ঘটনার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেল। পরিণামে ভারত বিভাজন অনিবার্য হয়ে পড়ল।

এমতাবস্থায় **জিন্না** ঘোষণা করলেন, 'কংগ্রেসী সরকারগুলি যদি মুসলমানদের অবদমিত ও পীড়ন করা আরম্ভ করে, তাহলে গোলযোগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত দুরূহ হবে।... আমার মতে, সোজাসুজি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।" লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে **বিপান চন্দ্র** বলেছেন,

...১৯৪৬-৪৭-এর সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের সময় হাজার হাজার জীবনের মাশুল গুণতে হয়েছিল। বাংলা ও পাঞ্জাব দু'জায়গাতেই উপরতলা থেকে নীচুতলা পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্মীরা গণহত্যা ও একতরফা আক্রমণের মুখে নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, অথর্ব ও মেরুদন্ডহীন হয়ে পড়েছিল, যেখানে সামান্য প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও সক্রিয়তা হাজার হাজার প্রাণ বাঁচাতে পারত। ...দাঙ্গার সময় প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার আর একটি মারাত্মক ফল হয়েছিল। সেই সময় পুলিশের কাছ থেকে নিরাপত্তা না পেয়ে লোকে বাধ্য হয়েছিল হিন্দু বা মুসলিম হিসেবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং নিজের সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির ওপর নির্ভর করতে। এটা অনিবার্যভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে জোরদার করেছিল এবং সাম্প্রদায়িক সন্দেহ ও বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়ে তুলেছিল।

যাইহোক্, ভারতের দু'টি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন বিরোধ তুঙ্গে, ঠিক তখনই (১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে) ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করল যে, ভারতীয়দের একটি বিরাট অসহযোগী অংশকে বাদ দিয়ে গণ-পরিষদ যে-সংবিধান গ্রহণ করবে, তা জোর ক'রে এই অংশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এই ঘোষণা মুসলমানদের পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯৪৭ সালের ২৬শে জুলাই বড়লাট মাউন্টব্যাটেন (Mountbatten) কর্তৃক পাকিস্তানের জন্য পৃথক গণ-পরিষদ গঠনের কথা ঘোষিত হওয়ার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। ১৯৪৭ সালে 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' (The Indian Independence Act, 1947) অনুসারে ঐ বছরের ১৪ই আগস্ট ভারতকে দ্বি-খণ্ডিত করা হয়; সৃষ্টির হয় ভারত এবং পাকিস্তান নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের। এইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য 'বিভক্ত ক'রে শাসন করা'র যে-প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করেছিল, তার ফলে ভারতরা বিভাজনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছিল।

অনুশীলনী - ১

❑ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

২। জিন্নার 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র বিশেষ উল্লেখ-সহ চল্লিশের দশকে ভারতবের্ষের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিশ্লেষণ কর।

৩। 'লাহোর প্রস্তাব' (১৯৪০)-এর বিশেষ উল্লেখ-সহ চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। জিন্নার 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র ওপর একটি টীকা লেখ।

২। মুসলিম লীগের 'লাহোর প্রস্তাব'-এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৩। 'লাহোর প্রস্তাব' (১৯৪০)-এর বিষয়বস্তু কী ছিল?

৪। 'লাহোর প্রস্তাব' (১৯৪০)-এর পরিণাম কী হয়েছিল?

৯.৪ : 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' : ফিরে দেখা

প্রশ্ন হোল — সর্বপ্রথম কে বা কারা পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র তথা পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন? লাহোর অধিবেশনের সভাপতি জিন্না কিংবা 'লাহোর-প্রস্তাব'-এর উত্থাপক ফজলুল হক স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্পর্কে তত্ত্বগত কোনো আলোচনাই করেননি। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সারা ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে কবি **মহম্মদ ইকবাল** বলেছিলেন যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অর্থাৎ, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে একটি সংবিধানের অধীনে এনে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হলে তা একইসঙ্গে ভারত এবং ইসলামের স্বার্থ রক্ষা করবে। কারণ, তা একদিকে যেমন ভারতের আভ্যন্তরীণ বিরোধ দূর করবে, অন্যদিকে তেমনি ভারতের মুসলমানদের ইসলামের মূল আদর্শ ও আধুনিক যুগের মূল ধারার সংস্পর্শে আসতে সাহায্য করবে। পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের এই দাবি উত্থাপন করার পর জিন্নার সঙ্গে ইকবালের অন্তরঙ্গতা গভীরতর হতে থাকে। ১৯৩৭ সালের ২১শে জুন **ইকবাল জিন্নাকে** এক চিঠিতে লেখেন যে, ভারতে মুসলমানরা এক গৃহযুদ্ধের মধ্যে রয়েছে। এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মীয় একতা অনুযায়ী ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করা উচিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হবে না বলে তিনি জিন্নাকে জানান। তাঁর মতে, মুসলিম প্রদেশগুলিকে নিয়ে একটি পৃথক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হলে ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অমুসলমানদের আধিপত্যের হাত থেকে মুসলমানরা রক্ষা পাবে। স্বয়ং **জিন্নাও** স্বীকার করেছিলেন যে, ইকবালের মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই মুসলিম লীগ পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি তোলে এবং লাহোর অধিবেশনে তা প্রস্তাবাকারে গৃহীতও হয়। **জিন্নার** ভাষায়, "হজরৎ আল্‌মা ইকবালের মাথায় পাকিস্তানের যে-ধারণাটি জন্মলাভ করেছিল, তা অনেকেই জানেন। নিজ জনগণের (অর্থাৎ, মুসলমানদের) শ্রেষ্ঠতম অভীপ্সার তিনিই ছিলেন মুখপাত্র।" এইসব কারণে 'ইকবালকে 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক' বলে অভিহিত করা হয়।

এর পর ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলিকে সভাপতি ক'রে কেমব্রীজে অধ্যয়নরত মুসলিম ছাত্ররা 'পাকিস্তান জাতীয় আন্দোলন' (Pakistan National Movement) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ঐ বছরের ২৮শে জানুয়ারি 'এখন অথবা কখনই নয়' (*Now or Never*) নামে একটি ইংরেজী পুস্তিকা কেমব্রীজ থেকে প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তিকাতেই সর্বপ্রথম 'পাকিস্তান' (Pakistan) শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। পুস্তিকাটিতে স্বাক্ষর করেন চৌধুরী রহমত আলি, মহম্মদ আসলাম খান, শেখ মহম্মদ সাদিক

ও ইনাতউল্লা খান। 'পাকিস্তান' কথাটির অর্থ হোল 'পবিত্র মানুষের দেশ' (The Land of the Pure)। ঐ পুস্তিকাটিতে ঘোষণা করা হয় যে, পাঞ্জাব, আফগানপ্রদেশ (অর্থাৎ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ), কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে নিয়ে 'পাকিস্তান' নামে পৃথক একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা হবে। প্রথম ৮টি প্রদেশের ইংরেজী আদ্যক্ষর (অর্থাৎ, Punjab-এর P, Afghan Province-এর A, Kashmir-এর K ও Sind-এর S) এবং 'বেলুচিস্তান' (Beluchistan)-এর 'ইস্তান' (istan) নিয়ে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র গঠিত হবে বলে পুস্তিকায় স্বাক্ষরকারীরা ঘোষণা করেছিলেন। ঐ পুস্তিকার প্রকাশ ছাড়াও কেমব্রীজ গোষ্ঠী 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে জনমত গঠনের জন্য নানারকম প্রবন্ধ, ইস্তেহার (handbills) প্রভৃতির সঙ্গে 'পাকিস্তান' নামক একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঐ গোষ্ঠীর বক্তব্য যে সমকালীন ভারতের মুসলিম জনমনে কোনো প্রভার বিস্তার করতে পারেনি, একটি ঘটনা থেকেই তা প্রমাণিত হয়। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক (Third Round Table Conference)-এ যোগদানকারী মুসলমান নেতৃবৃন্দ এমনকী স্বয়ং জিন্নাও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাবকে কোনোরকম গুরুত্বই দেননি। **ইউসুফ আলি** এরূপ প্রস্তাবকে 'ছাত্রদের নিছক পরিকল্পনা' এবং **স্যার জাফরুল্লা খান** সেটিকে 'বিকৃত মস্তিষ্কের অবান্তর কল্পনা' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেমব্রীজ গোষ্ঠী তাঁদের আন্দোলন বন্ধ ক'রে দেননি। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে রহমত আলি একই বিষয় নিয়ে আরও একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। ১৯৪০ সালে করাচীতে 'পাকিস্তান জাতীয় আন্দোলনে'-র সর্বোচ্চ পরিষদ' (Supreme Council)-এর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রহমত আলি বিস্তারিতভাবে কেমব্রীজ গোষ্ঠীর বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৯৪১ সালে সেই বক্তব্য পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ পুস্তিকাটির নাম 'ইসলামের মিল্লাত এবং ভারতবাদের বিপদ' (*The Millat of Islam and the Menace of Indianism*)। অমলেন্দু দে তাঁর *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক* নামক পুস্তকে ঐসব পুস্তিকার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন :

এইসব পুস্তিকায় যে-মতবাদ প্রচার হয়, তা হোল —

(১) মুসলমানেরা ভারতীয় নন, তাঁরা পাকিস্তানী। তাঁরা নিজেদের এশিয়ান (Asians) মনে করেন।

(২) মুসলমান সম্প্রদায় বা মিল্লাত এশিয়া ও ভারত পুনর্গঠিত করার সমস্যার সম্মুখীন। অতীতে 'ভারতবাদ' (Indianism) আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে মূলনীতিসমূহ বিনষ্ট করেছে এবং রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের সাম্রাজ্যিক কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে এবং পরিশেষে তাঁদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করেছে। সুতরাং ভবিষ্যতে 'ভারতবাদ' তাঁদের সম্পূর্ণভাবে ধবংস করবে।

(৩) ভারতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন না করলে মিল্লাতকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। এই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তিনটি স্বাধীন পাকিস্তান-জাতির কথা বলতে শুরু করেন, যথা — উত্তর-পশ্চিম ভারত (১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দেই উল্লেখিত,

বঙ্গ-ই-ইসলাম (বাংলাদেশে ইসলাম, সঙ্গে আসামও থাকবে) এবং উসমানিস্তান (হায়দ্রাবাদ রাজ্য। নিজামের পারিবারিক নাম হোল উসমান)। কেমব্রীজ গ্রুপের মতে, মুসলিম জাতীয়তাবাদ কেবলমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি দাবি করবে না, এমনকি হিন্দু-অধ্যুষিত দেশীয় রাজ্যসমূহে যেখানে মুসলিম নৃপতিবৃন্দ আছেন, সেখানে এবং আজমীড়ের মতো মুসলিম তীর্থস্থান ইত্যাদি স্থানেও মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। আর এইসব বিভিন্ন 'মুসলিম জাতি' নিয়ে Pak Commonwealth of Nations গঠন করতে হবে এবং ভারতকে Dinia বা Fatherland-এ রূপান্তরিত করতে হবে এবং অবশেষে Pakasia নামক একটি Pan-Islam যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অনেকের ধারণা, রহমত আলি তথা কেমব্রীজ গোষ্ঠী ইকবালের ১৯৩০ সালে প্রদত্ত পূর্বোক্ত ভাষণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'পাকিস্তান' গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ, কেমব্রীজ গোষ্ঠী একথা পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে, ১৯৩০ সালে **ইকবাল** কর্তৃক প্রচারিত পরিকল্পনার সঙ্গে তাদের পরিকল্পনার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। **ইকবাল** পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্রকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইউনিট হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেমব্রীজ গোষ্ঠী এই চারটি প্রদেশের সঙ্গে কাশ্মীরকে যুক্ত ক'রে ভারতের বাইরে হিন্দু-প্রাধান্যহীন একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

কেমব্রীজ গোষ্ঠী ছাড়াও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল লতিফ মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি তোলেন। তিনি ভারতকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি বলে মনে করতেন না। তিনি হিন্দুধর্ম ও ইসলামের পার্থক্যের কথা স্মরণ রেখে ভারতকে ১১টি হিন্দু এবং ৪টি মুসলিম অঞ্চলে ভাগ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ড. লতিফের পরিকল্পনা মুসলিম লীগ-নেতৃবৃন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সারা ভারত মুসলিম লীগ কার্যকরী কমিটি (All India Muslim League Working Committee)-র সদস্য স্যার আবদুল্লা হারুন মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসস্থানের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করার জন্য ড. লতিফকে ধন্যবাদ জানান। ড. লতিফের পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর আরও কয়েকটি পরিকল্পনা উত্থাপিত হয়। ঐসব পরিকল্পনার উত্থাপক ছিলেন পাঞ্জাবের স্যার মহম্মদ শাহনওয়াজ খান, পাঞ্জাবের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী স্যার সিকন্দর হায়াৎ খান প্রমুখ। এঁদের পরিকল্পনাগুলি 'পাকিস্তান-পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। আবার, সৈয়দ জাফর আল-হাসান ও আফজল হুসায়িন কাদিরী যে-পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, তা 'আলিগড়-পরিকল্পনা' (Aligarh Scheme) নামে পরিচিতি লাভ করে।

৯.৫ : সাম্প্রদায়িকতা প্রসারে জাতীয় নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব

ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও জাতীয় নেতৃবৃন্দের একাংশের দায়দায়িত্বও কম ছিল না। কারণ, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতে যে-জাতীয় জাগরণ দেখা দিয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রাই, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ 'চরমপন্থী' (extremists) বলে পরিচিত নেতৃবৃন্দ। এঁরা জাতীয়

জাগরণকে হিন্দু-ধর্মের পুনর্জাগরণ (revival of Hinduism) হিসেবে দেখতেন। ফলে মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা থেকে সরে যায়। তাছাড়া, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে-সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলন শুরু হয়, তা-ও ছিল হিন্দুধর্মের অনুগামী। পরবর্তী সময়ে গান্ধীর আন্দোলন ও প্রচারের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯২০-২২ সালে তাঁর নেতৃত্বে যে-অসহযোগ আন্দোলন হয়, তাতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করলেও তিনি খোলাখুলিভাবে নিজেকে 'একজন সনাতনী হিন্দু' (a Sanatani Hindu) বলে বর্ণনা করেন। এমনকী, বর্ণাশ্রম প্রথায় ও গো-সংরক্ষণের নীতিতে তিনি বিশ্বাসী বলেও ঘোষণা করেছিলেন। তাছাড়া, 'মূর্তিপূজা' (idol-worship)-য় তাঁর গভীর আস্থার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। গান্ধী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য যে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন, সে বিষয়ে দ্বি-মত পোষণ করার কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য যখনই আবেদন জানাতেন, তখনই তিনি হিন্দুদের উদ্দেশে 'আমরা' (we) এবং মুসলমানদের উদ্দেশ্যে 'তাঁরা' (they) শব্দ ব্যবহার করতেন। **রজনী পাম দত্তের** মতে, তিনি একজন জাতীয় নেতা হিসেবে আবেদন না ক'রে একজন হিন্দু-নেতা হিসেবে উভয় সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন করতেন। এমনকী, মুসলমানদের হৃদয় জয় করার জন্য তিনি হিন্দুদের 'তপস্যা' ও 'আত্মশুদ্ধি' (self-purification)-র পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হিন্দু মহাসভার নিবিড় সম্পর্কের কথা কারও অজানা নয়। এমনকি, হিন্দু মহাসভা, আর. এস. এস.-এর মতো হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাবাদী দল ও সংগঠনের উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচার যখন মুসলমানদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছিল, তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল (Congress Socialist Party) বা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করার জন্য কোনোরকম ইতিবাচক ও বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণ করেননি। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **বিপান চন্দ্র** সঙ্গতভাবেই বলেছেন, সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয়তা, জাতপাত, সামাজিক বৈষম্য, জাতীয়তাবাদী চিন্তায় হিন্দুয়ানী, ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা, অন্ধ সংস্কার প্রভৃতির মতো তার পরিপোষকগুলির বিরুদ্ধে তখন জোরদার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়নি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, কংগ্রেস ও তার নেতারা সাম্প্রদায়িক ছিলেন। গান্ধী ও নেহরুর মতো নেতারা ছিলেন যথার্থভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। কংগ্রেসের মতাদর্শ, সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মসূচী ও নীতিসমূহ মূলত ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। একটি জায়গায় তাঁদের দুর্বলতা ছিল। তা হোল — সাম্প্রদায়িকতার জোয়ারকে রুখতে অথবা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের প্রভাব থেকে তাঁদের দলীয় কর্মীদের মুক্ত রাখতে কোনোও ফলপ্রসূ ও জোরদার কর্মসূচী তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা যেখানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, সেখানে তাঁদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একথা যথেষ্ট ভালভাবে বুঝতে পারেননি যে, একদিক থেকে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শও সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই তার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালানো প্রয়োজন। এমনকি, রাজনৈতিক স্তরেও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোনো গণ-প্রচার চালানো হয়নি। কংগ্রেস

কোনো পর্যায়েই সাম্প্রদায়িকতাবাদীর সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারেনি। 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই' — এই শ্লোগানের ওপর জোর দেওয়া হলেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রকৃতি কিংবা ঔপনিবেশিক সমাজে শোষণের চরিত্রকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা খুব কমই হয়েছিল। তাছাড়া, সাম্প্রদায়িক নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার নীতি গ্রহণ ক'রে কংগ্রেস কার্যত সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির পৃথক অস্তিত্বকে স্বীকৃত দিয়েছিল। ১৯৩৩-৩৭ সালে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটি মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রচার-আন্দোলন সংগঠন করার যে-প্রচেষ্টা জওহরলাল নেহরু ও বামপন্থীরা শুরু করেছিলেন, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশের চাপে তা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হয়েছিল। তাছাড়া, সাধারণভাবে কংগ্রেস-নেতারা এবং বিশেষভাবে নেহরু ও বামপন্থীরা সাম্প্রদায়িক সমস্যাটিকে একটি যান্ত্রিক ও সরল দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতেন বলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সচেতন মতাদর্শগত সংগ্রামকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দিতেন। তবে সেইসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র সাম্প্রদায়িকতাকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন জানানোর ফলে ঔপনিবেশিক শাসনকে বজায় রেখে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করা নিশ্চিতভাবেই একটি কঠিন কাজ ছিল।

৯.৬ : সারসংক্ষেপ

সাধারণভাবে ভারতের ইতিহাসকে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এবং 'বিবিধের মাঝে মিলনে'র ইতিহাস বলে চিহ্নিত করা হলেও এখানকার বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও ভাষাভুক্ত মানুষের মধ্যে আত্মিক বন্ধন কোনোদিনই গড়ে ওঠেনি বলে কেউ কেউ মনে করেন। ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য ভারতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় দু'টির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতারূপী বিষবৃক্ষকে সযত্নে সংরক্ষণ করেছিল। তারই ফলে বিগত শতকের চল্লিশের দশকে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেই ভারত বিভাজিত হয়। ভারত বিভাজনের সঙ্গে মহম্মদ আলি জিন্নার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, জিন্না ১৯৩৮ সাল থেকে পরোক্ষভাবে তাঁর 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র কথা প্রচার করলেও ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে খোলাখুলিভাবে এই তত্ত্বটিকে তুলে ধরেন। এই তত্ত্বের মূল কথা হোল — হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক প্রথা ও সাহিত্য রয়েছে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক যেমন স্থাপিত হয় না, তেমনি তাদের আচার-আচরণ, সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি, এমনকি তাদের মহাকাব্য ও তার নায়কদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই ধরনের দু'টি পৃথক জাতিকে একটি রাষ্ট্রের জোয়ালে জুড়ে দিলে এর একটি হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অন্যটি হবে সংখ্যালঘিষ্ঠ। এর ফলে তাদের মধ্যে যে-অসন্তোষের সৃষ্টি হবে, তা একদিন সমগ্র রাষ্ট্র-কাঠামোকেই ধ্বংস ক'রে দেবে। তাই জিন্না মুসলমানদের জন্য তাদের নিজস্ব বাসভূমি, ভৌগোলিক এলাকা এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে লাহোর অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করেন।

'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেছিলেন ফজলুল হক। ঐ প্রস্তাবে একথা ঘোষণা করা হয় যে, মুসলমানদের 'অনুমোদন ও সম্মতি' ছাড়া সংবিধান সংশোধনের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে

মুসলমানরা কোনোমতেই তা মেনে নেবে না। প্রস্তাবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ৩নং অনুচ্ছেদটি। ঐ অনুচ্ছেদে একথা বলা হয় যে, ভৌগোলিক দিক থেকে সন্নিহিত ইউনিটগুলিকে নিয়ে এবং প্রয়োজন হলে 'আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস' ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে এমন কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করতে হবে, যাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মতো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলিতে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এইসব রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলি হবে 'স্বয়ংশাসিত ও সার্বভৌম'। প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' নামে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা না বলা হলেও প্রস্তাবটি সাধারণভাবে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত লাভ করে। এই অনুচ্ছেদটির বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা থাকলেও জিন্না কিংবা অন্যান্য মুসলিম নেতা সেগুলি দূর করার কোনো চেষ্টাই করেননি। যাই হোক, 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ার পর মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেসের ওপর 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের দাবিটিকে মেনে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ইতোমধ্যে মুসলিম লীগের শক্তি যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনী ফলাফল থেকে। নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট দিনটিকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ দিন থেকে দু'টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ২৬শে জুলাই বড়লাট মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানের জন্য পৃথক গণপরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করেন। এরপর ১৯৪৭ সালে প্রণীত 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' অনুসারে ভারতকে দ্বি-খণ্ডিত করা হয়। তার ফলে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র জন্মলাভ করে।

৯.৭ : অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

❑ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১ নং প্রশ্ন — ৯.৩.১-৯.৩.৪ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন — ৯.৩.১-৯.৩.৪ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন — ৯.৩.১-৯.৩.৪ দ্রষ্টব্য।

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১ নং প্রশ্ন — ৯.৩.১-৯.৩.২ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন — ৯.৩.৩ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন — ৯.৩.৩ দ্রষ্টব্য।

৪ নং প্রশ্ন — ৯.৩.৪ দ্রষ্টব্য।

Essay-Type Questions

1. Examine the nature of communal politics in India during the last decade of the twentieth century. Answer with special reference to Jinnah's 'Two-nation Theory'.
2. Examime the nature of communal politics in India during the last decade of the twentieth century. Answer with special reference to the Lahore Resolution of 1940.
3. Analyse the nature and trends of communal politics during the 1940s of the last the century.

Short Answer-Type Questions

1. Write a note on the "Lahore Resolution" of 1940.
2. What was the content of Jinnah's Two-nation Theory ?
3. What was the result of the 'Lahore Resolution' of 1940 ?

৯.৮ : নমুনা প্রশ্নাবলী

Ahmed, Manzooruddin, 'Iqbal and Jinnah on the "Two-Nations" Theory, C M Naim, *Iqbal, Jinnah and Pakistan*.

Aziz, K. K., *History of Partition of India : Origin and Development of the Idea of Pakistan*, vol. I.

Chandra, Bipan, Communalism in Modern India.

Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. XXI.

Coupland R., *The Constitutional Problems in India*, Part - II.

Das, Durga, *India from Curzon to Nehru and After*.

Dey, Amalendu, *Islam in Modern India*.

Dutt, R. P., *India Today*.

Indian Annual Register, vol. I, 1940.

Jalal, Ayesha, *The Sole Spokesman — Jinnah, The Muslim League and the Demand for Pakistan*.

Menon, V. P., *The Transfer of Power*.

Moon, Penderel, *Divide and Quit*.

Mosley, Leonard, *The Last Days of the British Raj*.

Muller, Max, *Heritage of India*.

Namboodiripad, E. M.S., *A History of Indian Freedom Struggle*.

Prasad, Rajendra, *India Divided*.

Sayeed, Khalid B., *Pakistan : The Formative Phase*.

Sen, S., *The Birth of Pakistan*.

Speeches of Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah as Governor General of Pakistan.

Wolpert, Stanley, *Jinnah of Pakistan*.

চন্দ্র, বিপান, *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ*।

দত্ত, রজনী পাম, *আজিকার ভারত*।

দে, অমলেন্দু, *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক*।

নাম্বুদিরিপাদ, ই. এম. এস., *ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশকুমার, *জিন্না-পাকিস্তান : নতুন ভাবনা*।

সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*।

একক - ১০
(Unit - 10)

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভূমিকা

(Role of the Indian National Army in India's Freedom Struggle)

একেকের গঠন-বিন্যাস

১০.০ উদ্দেশ্য

১০.১ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

১০.১.১ সুভাষচন্দ্রের ভারতত্যাগ এবং বার্লিনে ভারতীয় সৈন্যদল গঠন

১০.১.২ আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন

১০.১.৩ সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

১০.১.৪ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লড়াই

১০.১.৫ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসারদের বিচার ও তার প্রতিক্রিয়া

১০.১.৬ উপসংহার

১০.২ সারসংক্ষেপ

১০.৩ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

১০.৪ নমুনা প্রশ্নাবলী

১০.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১০.০ : উদ্দেশ্য

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করাই হোল বর্তমান এককের উদ্দেশ্য। ১৯৪১ সালে দেশ ত্যাগ ক'রে সুভাষচন্দ্র সশস্ত্রভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উদ্দেশে প্রথমে জার্মানীতে এবং পরবর্তী সময়ে রাসবিহারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাপানে উপস্থিত হন। সেখানে প্রখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তাঁর প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রের হাতে অর্পণ করেন। অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেও সুভাষচন্দ্র কোনদিন জার্মানী কিংবা জাপানের হাতের পুতুল হয়ে কাজ করতে চাননি। তাই শেষ পর্যন্ত ১৯৪৩ সালে তিনি যখন জাপানে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করেন, তখন সেই সরকারকে জাপান, জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয়। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও রণাঙ্গনে, বিশেষত কোহিমা ও ইম্ফল রণাঙ্গনে এই ফৌজ অসম সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে। এমনকি, একের পর এক জাপান পশ্চাদপসরণ কিংবা হিটলার আত্মসমর্পণ করলেও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ শেষ লড়াই লড়তে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সহকর্মীদের অনুরোধ ও পরামর্শে সুভাষচন্দ্র ব্যাঙ্কক থেকে সায়গনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে টোকিও থেকে ঘোষণা করা হয়। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ভারতবাসীর মনে কতখানি স্থান ক'রে নিতে পেরেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের পদস্থ অফিসার ও বীর সেনানীদের বিচার চলাকালে তাঁদের মুক্তির দাবীতে গণ-বিস্ফোরণের মধ্যে। এইসব বিষয় সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করাই হোল বর্তমান এককের উদ্দেশ্য।

১০.১ : ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

❐ ১০.১.১ : সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগ এবং বার্লিনে ভারতীয় সৈন্যদল গঠন

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল সুসংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা। ভারতবর্ষের মধ্যে থেকে গান্ধীবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা অসম্ভব বুঝতে পেরে সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালে স্বদেশ ত্যাগ ক'রে বিদেশে পাড়ি দেন। গোপন পথে তাঁকে ভারতের বাইরে যেতে সহায়তা করেছিলেন আকবর শাহ, অচ্ছার সিং ছিমা, উত্তম চাঁদ মালহোত্রা ও ভগতরাম তলোয়ার প্রমুখ। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে সুভাষচন্দ্র কাবুলে উপস্থিত হন এবং সেখানে প্রায় দু'মাস অবস্থান করার পর মস্কো শহরের মধ্য দিয়ে বার্লিনে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মাত্র জনা কুড়ি জন ভারতীয়কে নিয়ে 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার' গড়ে তোলেন। এইসব ভারতীয়দের মধ্যে পূর্বতন রাষ্ট্রদূত এস.সি.এন. নাম্বিয়ার,

ডঃ গিরিজা মুখার্জী ও ডঃ এম.আর.ব্যাস ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ডঃ ব্যাস আজাদ হিন্দ রেডিও, আজাদ মুসলিম রেডিও এবং ন্যাশনাল কংগ্রেস রেডিও থেকে নিয়মিতভাবে বেতার ঘোষণার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। যাই হোক্, এর পর সুভাষচন্দ্র ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'ইন্ডিয়ান লিজিয়ন'। ইংরেজরা জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্য এইসব সৈনিকদের ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন রণক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিল। বার্লিনে সুভাষচন্দ্রের 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার' আধা-কূটনৈতিক মর্যাদা লাভ করেছিল। বার্লিনে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র জার্মান নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা ক'রে কিছুটা সাফল্যলাভ করেন। তিনি জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, জার্মানীর কর্তাব্যক্তিরা সুভাষচন্দ্রের কাজে নাক গলাবেন না এবং তাঁকে যেসব আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে, যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে স্বাধীন ভারতের সরকারকে সেই অর্থ পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়া, জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর সুভাষচন্দ্রকে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দান করে। ১৯৪১ সালের ২রা নভেম্বর সরকারীভাবে 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার'-এর উদ্বোধনের পর থেকে নাম্বিয়ারের সহযোগী হিসেবে এন.জি. গানপুলে 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার'-এ যোগ দেন। 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার' বেতার প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস থেকে আজাদ হিন্দ্ বেতার ট্রান্সমিশন শুরু হয়। এইভাবে সুভাষচন্দ্রের জার্মানীতে আসার উদ্দেশ্য প্রাথমিকভাবে সফল হয়।

জার্মানীতে দু'বছর (১৯৪১-৪৩) অবস্থানকালে ফ্যাসিবাদীদের কার্যকলাপ তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তথাপি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে হিটলার তথা জার্মানীর সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছিলেন। কিন্তু হিটলার ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠনে বিশেষভাবে অনাগ্রহী ছিলেন। কারণ, তিনি মনে করতেন, "Indians cannot kill a mouse (and) won't kill an Englishman either," যাই হোক্, ১৯৪২ সালের মে মাসের শেষ দিকে বহু প্রতীক্ষার পর হিটলারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। ঐ সাক্ষাৎকালে সুভাষচন্দ্র কেবল ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিই চাননি, সেই সঙ্গে জার্মানীতে বসে অবাধে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাবার স্বাধীনতাও চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে হিটলার যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন বলেই মনে হয়। কারণ, সাক্ষাৎকারের সময় তিনি সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অবহিত হতে চেয়েছিলেন। এতে অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে **সুভাষচন্দ্র** দোভাষী ভন ট্রট্‌কে বলেছিলেন, "চ্যান্সেলরকে বলুন, সারা জীবন আমি রাজনীতি করে এসেছি এবং কারো কাছ থেকে কোন উপদেশ নেবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।" হিটলার ইংরেজী জানতেন না এবং বুঝতেনও না। তাই ট্রট অপেক্ষাকৃত মোলায়েম ভাষায় সুভাষের বক্তব্য হিটলারকে শোনালেন। তা সত্ত্বেও আলোচনা ভেস্তে গেল। এমতাবস্থায় সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, জার্মানীর কানাগলিতে ঘুরে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সফল ক'রে তুলতে পারবেন না। তাই তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র ইউরোপ থেকে এশিয়ায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বস্তুত, অক্ষশক্তিবর্গ ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রকে কোনরকম সুস্পষ্ট আশ্বাস প্রদান করেননি। তবে জার্মান ফ্যাসিবাদীরা নিজেদের স্বার্থে সুভাষচন্দ্রকে বার্লিন বেতার মারফৎ প্রচারকার্য চালাবার

অনুমতি প্রদান করেছিল। তিনি 'আজাদ হিন্দুস্থান' বেতারের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে প্রচারকার্য শুরু করেন। আজাদ হিন্দ্ বেতারে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, "সারা জীবন আমি ভারতের সেবক, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা-ই থাকব। ভারতের প্রতি, কেবল ভারতেরই প্রতি আমার আনুগত্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা অটল থাকবে।" আজাদ হিন্দ্ বেতার মারফৎ তিনি ভারতবাসীকে 'জয় হিন্দ্' সম্বোধনে উৎসাহিত করতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু হিটলার তথা জার্মান ফ্যাসিবাদীদের আচার-আচরণ ও নিয়ন্ত্রণের আধিক্য তাঁকে কার্যত বিরক্ত করেছিল। তাছাড়া, ১৯৪১ সালে বার্লিনে যে-ভারতীয় সেনাদল তিনি গঠন করেছিলেন, জার্মানরা তাকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলে তাঁর সঙ্গে জার্মান সরকারের চরম মতবিরোধ শুরু হয়। এমতাবস্থায় তিনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জার্মানি ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি ঐ ভারতীয় ফৌজকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন কখনই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে। তাদের কাজ হবে কেবল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ভারতীয় ফৌজের সৈনিকরা সুভাষচন্দ্রের সেই নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ব সীমান্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হলে ১০ জন সৈনিককে নাৎসীবাহিনী হত্যা করে।

❐ ১০.১.২ : আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন

১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাপান ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী জাপানের শত্রুতে পরিণত হয়। জাপানে অবস্থানকারী প্রখ্যাত রাসবিহারী বসুর ব্রিটিশ-বিরোধিতা এবং স্বদেশমুক্তির ভাবনার কথা জাপ-সরকার ভালভাবেই জানত। তাই তাঁর ওপর আরোপিত সর্বপ্রকার বাধানিষেধ সরকার প্রত্যাহার ক'রে নেয়। ফলে তিনি মাতৃভূমির মুক্তির জন্য সর্বাত্মকভাবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পান। ১৯৪২ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ ব্যাঙ্কক শহরে একটি সম্মেলনে সমবেত হন। ঐ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। ঐ সময় তিনি ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি। জাপানীরা এই সঙ্ঘ গঠনের কাজে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছিল। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে ফেডারেটেড মালয় স্টেটের রাজধানী কুয়ালালমপুর ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের একটি শাখা স্থাপিত হয়। সেখানে **জ্ঞানী প্রীতম সিং** এবং **মেজর ফুজিওয়ারা** জমায়েতে ভাষণদানের সময় শ্রোতাদের এই বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, দেশের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায় জাপান-সরকার ভারতীয়দের সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্য প্রদান করবে। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুর জাপানের দখলে আসার পর ৫ হাজার ভারতীয়কে যুদ্ধবন্দী করা হয়। এইসব যুদ্ধবন্দীকে জাপানীরা ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে তুলে দেয়। **ক্যাপ্টেন মোহন সিং** তাঁদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

> প্রাচ্যে ব্রিটিশ অত্যাচারের দিন শেষ হয়ে এসেছে। তাদের ঘৃণ্য শাসনব্যবস্থার অবসান অবশ্যই ঘটাতে হবে। জাপানী সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যে মালয় ও সিঙ্গাপুর থেকে তাদের বিতাড়িত করেছে। ব্রহ্মদেশেও তারা প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাড়াহুড়ো ক'রে পিছু হটে যাচ্ছে। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। যেসব পিশাচ দশকের পর

দশক জুড়ে ভারতীয়দের জীবনীশক্তি শুষে চলেছে, তাদের বিতাড়িত করার কর্তব্য রয়েছে প্রতিটি ভারতবাসীর। আমাদের বাঞ্ছিত শব্দের সার্থক রূপায়ণে জাপানীরা সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ভারতের ৪০ কোটি নরনারীকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই-এ নামতে হবে এবং নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। এই উদ্দেশে দূর-প্রাচ্যে যেসব ভারতীয় সেনা ও অসামরিক রয়েছেন, তাঁদের নিয়ে আমরা একটি ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গড়ে তুলেছি। আপনাদের সকলের কাছে আবেদন, আপনারাও এই বাহিনীতে যোগদান করুন।

সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধবন্দীরা 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ', 'আজাদ হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনি দিয়ে তাদের আজাদ হিন্দ্ বাহিনীতে যোগদানের অভিপ্রায় ঘোষণা করে। ৫ হাজার যুদ্ধবন্দী আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগদান করে। এই ফৌজ কেবল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় জনগণের আমন্ত্রণে লড়াই-এর ময়দানে নামবে বলে ঘোষণা করা হয়। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত ১৯৪২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ১৬,৩০০ সৈন্য ও অফিসার নিয়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রথম ডিভিশনটি গঠিত হয়। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে মোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় সেনা-অফিসারদের সঙ্গে জাপানীদের গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দেয়। এর ফলে জাপানীরা মোহন সিং ও নিরঞ্জন সিং গিলকে গ্রেপ্তার করে। এমতাবস্থায় অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধ রাসবিহারী বসুর পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

❐ ১০.১.৩ : সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র জার্মানি থেকে সাবমেরিনযোগে জাপান অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর সহযাত্রী হিসেবে ছিলেন আবিদ হাসান। দীর্ঘ সাড়ে চার মাস সাবমেরিন যাত্রার পর তিনি উত্তর সুমাত্রায় উপস্থিত হন। তখন থেকে শুরু হয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ঐতিহাসিক সংগ্রামের অধ্যায়। এর পর সুভাষচন্দ্র টোকিওতে যান এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর কাছ থেকে এই আশ্বাস লাভ করেন যে, জাপান ভারতীয়দের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। তিনি একথাও ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারত দখলের কোন মতলব জাপানের নেই। টোকিও থেকে পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের উদ্দেশে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে **সুভাষচন্দ্র** বলেন :

স্বদেশে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে নেমে আসা বা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দখলদার ব্রিটিশ সেনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। এই কাজের ভার নিতে হবে প্রবাসী ভারতীয়দের, বিশেষ করে যাঁরা রয়েছেন পূর্ব-এশিয়ায়। চরম মুহূর্ত উপস্থিত। প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়কে এবার রণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। স্বাধীনতা-প্রেমী ভারতীয়দের রক্ত যখন স্রোতের মত বয়ে যেতে শুরু করবে, তখনই ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে।

এর কিছুদিন পর টোকিও থেকে প্রদত্ত অন্য একটি বেতার ভাষণে তিনি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে আবেদন জানিয়েছেন :

> আপনারা আমার ওপর আস্থা রাখুন, এটাই আমি চাই। কেননা শক্তিশালী ব্রিটিশ সরকার আমার ওপর সারা জীবন ধরে অত্যাচার চালিয়েছে। আমাকে ১১বার কারারুদ্ধ করেছে, (কিন্তু) আমার মনবল ভেঙে দিতে পারেনি। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রশক্তিই তা পারবে না। ধূর্ত মতলববাজ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্রিটিশ রাজনীতিকরা যদি মিষ্টি কথায় আমাকে প্রলুব্ধ করতে বা আমাকে দুর্নীতির পথে নামিয়ে আনতে না পেরে থাকে, তবে কেউ-ই তা পারবে না। ... আমি ভারত সীমান্ত থেকে খুব দূরে নেই। ১৯৪১-এর জানুয়ারী থেকে পৃথিবীর কোন শক্তিই আমার গতিবিধি ঠেকাতে পারেনি — জাতির শেষ সংগ্রামে যোগদানের জন্য আমি সীমান্ত অতিক্রম করব। এবারও কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সঙেঘর সভাপতি ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সভাপতি হন। তিনি সমগ্র বিশ্বকে একথা জানিয়ে দেন যে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হোল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকেল্লা দখলের উদ্দেশে তিনি 'চলো দিল্লী' রণধ্বনি দেন।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত করার উদ্দেশে সুভাষচন্দ্র ব্যাঙ্কক, রেঙ্গুন, সায়গন প্রভৃতি দেশে অর্থসংগ্রহ ও জনসমর্থনের জন্য ভ্রমণ করেন। ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে তিনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়কের গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। কিন্তু ফৌজের কার্যক্রম নিয়ে জাপানীদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কেবল প্রচার ও নাশকতামূলক কাজে ফৌজকে ব্যবহার করার প্রস্তাব দিলে সুভাষচন্দ্র তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ প্রর্যন্ত একরকম বাধ্য হয়েই জাপান পরীক্ষামূলকভাবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিকদের ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সম্মতি প্রদান করে। ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তিনি স্বাধীন ভারতে অস্থায়ী সরকার গঠন করেন এবং ঘোষণা করেন :

> ব্রিটিশ ও তার মিত্রদের ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করার জন্য লড়াই শুরু করা এবং সেই লড়াইকে নেতৃত্ব দেওয়াই হবে অস্থায়ী সরকারের কাজ। অস্থায়ী সরকারের কাজ হবে ভারতীয়দের আস্থা অর্জন করে তাদের আশা-আকাঙক্ষার অনুকূলে আজাদ হিন্দের মতো একটি স্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করা।

পরিশেষে **সুভাষচন্দ্র** তাঁর সাড়া-জাগানো আবেদনে ঘোষণা করেন :

> ঈশ্বরের নামে, আমাদের যেসব পূর্বপুরুষ ভারতের জনগণকে একটি অখন্ড জাতিতে গ্রথিত করে গিয়েছেন, তাঁদের নামে, যেসব প্রয়াত বীর আমাদের জন্য বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের ঐতিহ্য রেখে গিয়েছেন, তাঁদের নামে আমরা ভারতের জনগণকে আহ্বান জানাই : আমাদের পতাকাতলে সমবেত হোন, ভারতের স্বাধীনতার জন্য আঘাত হানুন।

আজাদ হিন্দ্ সরকারের তরফে ঘোষণাপত্রে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁরা হলেন :

সুভাষচন্দ্র বসু (রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, শ্রম ও পররাষ্ট্র);

ক্যাপ্টেন শ্রীমতী লক্ষ্মী সায়গল (মহিলা সংস্থা);

এস.এ. আয়ার (প্রকাশন ও প্রচার);

লেপ্টেন্যান্ট কর্নেল এ.সি. চ্যাটার্জী (অর্থ);

লেপ্টেন্যান্ট কর্নেল আজিজ আমেদ, লেপ্টেন্যান্ট কর্নেল এস.এস.ভগত, লেপ্টেন্যান্ট কর্নেল জে. কে. ভোঁসলে, লেপ্টেন্যান্ট কর্নেল গুলজারা সিং, লেপ্টেন্যান্ট কর্নেল এম. জেড. কিয়ানি, লেপ্টেন্যান্ট কর্নেল এ.ডি. লোগনাদন, লেপ্টেন্যান্ট কর্নেল এহসান কাদির, লেপ্টেন্যান্ট কর্নেল শাহ নওয়াজ(সেনাবাহিনীরপ্রতিনিধিবর্গ);

এ.এস.সহায়, সচিব (মন্ত্রীর পদমর্যাদা-সহ);

রাসবিহারী বসু (সর্বোচ্চ উপদেষ্টা);

করিম গণি, দেবনাথ দাস, ডি. এম. খান, এ. ইয়েল্লাপ্পা, জে. তিবি, সর্দার ইশার সিং (উপদেষ্টাবৃন্দ ; এবং এ.এন. সরকার (আইন উপদেষ্টা)।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর শপথবাক্যে একথা বলেছিলেন :

> ঈশ্বরের নামে আমি ভারত এবং ভারতে আমার ৩৮ কোটি দেশবাসীর বন্ধনমুক্তির পবিত্র শপথ নিচ্ছি। আমি, সুভাষচন্দ্র, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্বাধীনতার পবিত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আমি সর্বদা থাকব ভারতের সেবক। ভারতের ৩৮ কোটি ভাইবোনের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখাই হবে আমার মহত্তম কর্তব্য। এমনকি, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরেও সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমার শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিতে আমি প্রস্তুত থাকব।

অস্থায়ী সরকার ২৩শে অক্টোবর ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাপান ও জাপান-অধিকৃত চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, ফিলিপিনস্ প্রভৃতি দেশ সুভাষচন্দ্রের অস্থায়ী সরকারকে যেমন স্বীকৃতি প্রদান করে, তেমনি হিটলারের জার্মানিও তাকে স্বীকৃতি দেয়। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে জাপানী প্রধানমন্ত্রী তোজো ব্রিটিশ-অধিকারমুক্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জগুলির পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রের অস্থায়ী সরকারের হাতে প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এইসব দ্বীপের দায়িত্ব অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রকে ছেড়ে দিতে জাপান বাধ্য হয়েছিল। যাই হোক্, সুভাষচন্দ্র আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নতুন নাম রাখলেন যথাক্রমে 'শহীদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপপুঞ্জ। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও আন্দামানকে আজাদ হিন্দ্ ভূখন্ডে পরিণত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বরং, তাঁকে গোপন ক'রে জাপানী সামরিক অফিসাররা ঐসব দ্বীপপুঞ্জে ভয়াবহ হত্যাকান্ড ও তান্ডবলীলা চালিয়েছিল।

পূর্ব-এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে ভাষা, পোষাক, খাদ্য, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে-পার্থক্য বর্তমান ছিল, তার অবসান ঘটিয়ে সুভাষচন্দ্র তাদের মধ্যে ঐক্যের মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশে সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি ফৌজকে কয়েকটি ব্রিগেডে ভাগ করেন। এইসব ব্রিগেডের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল শাহ নওয়াজের নেতৃত্বাধীন 'সুভাষ ব্রিগেড', কিয়ানীর নেতৃত্বাধীন 'গান্ধী ব্রিগেড' এবং গুলজারা সিং-এর নেতৃত্বাধীন 'আজাদ ব্রিগেড'। সর্বোপরি, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সামরিক অভিযানে মহিলাদের সমবেত করার উদ্দেশে তিনি সিঙ্গাপুরে গঠন করেছিলেন 'ঝাঁসীর রাণী' বাহিনী নামে একটি মহিলাদের নিয়ে গঠিত বাহিনী। এই বাহিনীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শত শত মহিলা স্বেচ্ছায় যোগদান করেছিলেন এবং তাঁরা পুরুষ সৈনিকদের পাশাপাশি রণাঙ্গনে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুনে অস্থায়ী সরকার আজাদ হিন্দ্ ও ভারতীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর ফৌজের দু'টি সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। বেসামরিক নাগরিকদের মধ্য থেকে সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ ক'রে ফৌজকে শক্তিশালী করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। সিঙ্গাপুরে বেতার মারফৎ তিনি ভারতবাসীর উদ্দেশে 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' সামরিক সঙ্গীতটির প্রচার শুরু করেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ইতিহাসে ১৮ই মার্চ তারিখটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ, ঐ দিনটিতে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম ক'রে ভারতের পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করেছিল। এর পর কর্ণেল এস. এ. মালিকের পরিচালনাধীনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের একটি সেনাবাহিনী ভারতীয় এলাকার গভীরে প্রবেশ করে এবং ব্রিটিশ শাসকদের হাত থেকে ভারতবর্ষের একটি অংশ অধিকার করতে সক্ষম হয়। এর প্রমাণ হিসেবে ১৪ই এপ্রিল মণিপুরের মৈরাং-এ ভারতবর্ষের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়।

বিস্ময়ের ব্যাপার হোল — মাতৃভূমি থেকে শত শত মাইল দূরে বিদেশের মাটিতে সুভাষচন্দ্র কর্তৃক আজাদ হিন্দ্ বাহিনীকে পুনর্গঠিত ক'রে যুদ্ধ পরিচালনার ঘটনা সমগ্র বিশ্বকে হতবাক ক'রে দেয়। বিমান, ট্যাঙ্ক, কামান, রাইফেল গোলাবারুদ, এমনকি রণক্ষেত্রে সৈন্যদের নিয়ে যাওয়ার লরির জন্যও বিদেশী শক্তির ওপর তাঁকে সম্পূর্ণভাবেই নির্ভরশীল থাকতে হয়েছিল। জনবল, অর্থবল, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে ব্রহ্মদেশ থেকে জাপান পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চলের দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের ওপর। রণক্ষেত্রাভিমুখী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সামনে নেতাজী-প্রদত্ত বক্তৃতাদি ছিল অনন্যসাধারণ। ঐ বক্তৃতায় **সুভাষচন্দ্র** বলেছিলেন :

> তোমরা রণক্ষেত্রে যাচ্ছ। কিন্তু তার আগে এই শেষ মুহূর্তেও তোমরা সত্যিই আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত রয়েছে কিনা, তা আবার ভেবে দেখার অবাধ স্বাধীনতা আমি তোমাদের দিচ্ছি। যে-উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এগোচ্ছি, তার পবিত্রতা সম্পর্কে তোমাদের মনে সামান্যতম সংশয় থাকলেও, আমি বলছি, আক্রমণো-উদ্যোগী সেনার সারি থেকে তোমরা বেরিয়ে এস, পিছনে চলে যাও। দ্বিধা করো না। পিছনে আমি তোমাদের অন্য কাজে লাগাবো। কতজন এই অভিযানে অংশ নিচ্ছেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাবো না। যে আদর্শের জন্য এই সংগ্রাম, তার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল নিবেদিতপ্রাণ

সৈন্যসংখ্যা কম হ'লেও আত্মপ্রত্যয়হীন ও অস্পষ্ট ধারণার বশবর্তী বিপুলসংখ্যক সৈন্যের চেয়ে তারা অনেক ভাল কাজ দেখতে পারবে। যথাসম্ভব অকপটেই আমি বলছি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখদুর্গতি ও মৃত্যু ছাড়া আর কিছুরই কোন প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারছি না। এবার তোমরা স্বাধীনভাবে তোমাদের পথ বেছে নাও। রণক্ষেত্রগামী সৈন্যশ্রেণী থেকে বেরিয়ে যেতে লজ্জার কিছু নেই। এখনই, এ মুহূর্তেই বেরিয়ে এস। তোমাদের ওপর কোন দোষারোপ করব না। বরং তোমাদের সততার প্রশংসা করব এবং তোমাদের জন্য অন্য কোন প্রয়োজনীয় কাজ খুঁজে দেব।

বিস্ময়ের ব্যাপার হোল — নেতাজীর সৈন্যবাহিনী থেকে একজনও সরে দাঁড়ালো না। একজনও বলল না যে, সে পেছনে পড়ে থাকতে চায়। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দু'টি ডিভিশনে যে-২০ হাজার সৈন্য তখন ব্রহ্মদেশে ছিল, তারা সকলেই নেতাজীর ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানি এবং কর্ণেল শাহ নওয়াজ খান।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা আগস্ট **নেতাজী** তাঁর এক বেতার ভাষণে গান্ধীর উদ্দেশে এক আবেগপূর্ণ আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন :

ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেনারা এখন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। সবরকম অসুবিধা ও দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও তারা ধীরে, অথচ নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। ভারত থেকে শেষ ইংরাজটি বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত এবং নয়াদিল্লীর বড়লাট ভবনশীর্ষে যতদিন না ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়ছে, ততদিন এই সশস্ত্র সংগ্রাম চলতেই থাকবে।

ঐ ভাষণে তিনি একথাও বলেছিলেন, "ভারতের স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ শুরু হয়েছে।... জাতির জনক, ভারত-মুক্তির এই পবিত্র সংগ্রামে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা কামনা করি। জয় হিন্দ্।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুভাষচন্দ্র কেবল আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়েই মাথা ঘামাননি, তিনি ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ব্যাপারেও যে সমভাবে সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওয়াভেল পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের স্বাধীনতার জন্য যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, তখন ভারতের অভ্যন্তরে কংগ্রেস সংগ্রাম পরিহার ক'রে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপসরফায় পৌঁছানোর জন্য প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৪৪ সালের ২৭শে জুলাই **গান্ধী** বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে লেখেন যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করবে — এই প্রতিশ্রুতি পেলে কংগ্রেস সর্বান্তঃকরণে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী আছে। পরের দিন **ভারত সচিব** ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে, গান্ধীর প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে কোন আলাপ-আলোচনা শুরু করার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। ইংরেজদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে গান্ধী মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতা ক'রে ব্রিটিশ সরকারের ওপর যৌথভাবে চাপ সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করেন। ৯ই সেপ্টেম্বর

থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গান্ধীর সঙ্গে জিন্নার বৈঠক চলে। এই বৈঠকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গান্ধীকে ভারত-বিভাগের প্রশ্নে সম্মতি দিতে হয়েছিল। এর পর বড়লাট লর্ড ওয়াভেল অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন অন্তর্বর্তীকালীন ভারতীয় সরকার গঠনের কথা চিন্তা করেন। ইতোমধ্যে কংগ্রেস-নেতা ভুলাভাই দেশাই মুসলিম লীগ-নেতা লিয়াকত আলির সঙ্গে একটি চুক্তির মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন একটি সরকার গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। গান্ধী ও জিন্না তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করলে সমগ্র পরিকল্পনাটি লর্ড ওয়াভেলের অনুমোদন লাভ করে। **ওয়াভেল** ১৯৪৫ সালের ১৪ই জুন ঘোষণা করেন যে, শ্রীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তর ও সংবিধান রচনার কাজ শুরু করা হবে। বড়লাটের কর্ম-পরিষদকেও এমনভাবে পুনর্গঠিত করা হবে, যাতে ক'রে বড়লাট ও জঙ্গীলাট ছাড়া পরিষদের সব সদস্যই হবেন ভারতীয়। এই কাজ শেষ হওয়ার পর প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। সব বিষয় আলোচনার জন্য ওয়াভেল ২৫ শে জুন সিমলাতে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু ব্যাঙ্ককে বসে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সিমলা সম্মেলনকে ইংরেজদের অন্যতম চালাকি বলে ঘোষণা করেন। তিনি ওয়াভেল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বলেন যে, বড়লাটের কর্ম-পরিষদে কয়েকটি চাকুরীর বিনিময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে চুলোয় দেওয়া হচ্ছে। এতে শুধু বড়লাট ছাড়া আর কারও স্বরাজ হবে না। ব্রিটিশ সরকার সব রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেয়নি এবং যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় কোন আইন তৈরী করতেও সম্মত হয়নি। এর থেকেই ইংরেজদের কপটতা প্রমাণিত হয়। মিত্র-পক্ষ জার্মানিকে যুদ্ধে পরাজিত করলেও অবস্থার তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। এখনও ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং বাইরে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই হোল স্বাধীনতা অর্জনের নির্ভুল পদ্ধতি। ইংরেজদের ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্র সবাইকে অনুরোধ জানান। কিন্তু কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ তাঁর সেই অনুরোধ কর্ণপাত করেননি।

❐ ১০.১.৪ : আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লড়াই

শুরু থেকেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শাহ নওয়াজের নেতৃত্বাধীন 'সুভাষ ব্রিগেড'কে জাপানী ফৌজের সঙ্গে ভারত-ব্রহ্মদেশ সীমান্তে যাওয়ার এবং ইম্ফল অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ ব্রিগেডের সৈন্যদের সঙ্গে জাপানীরা বৈষম্যমূলক ও বিমাতৃসুলভ আচরণ করতে শুরু করে। একদিকে যেমন তাদের রেশন, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি দেওয়া হয়নি, অন্যদিকে তেমনি তাদের জাপানী সৈন্যদের ভৃত্য হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ফলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্যদের মনোবল ক্রমশ ভেঙে যেতে থাকে। এতদসত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অগ্রগতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে জাপানীরা আরাকান ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু ক'রে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর উদ্দেশ্যে ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ-বিরোধী সামরিক অভিযানে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের পূর্ণ অংশগ্রহণ দাবী করলে জাপানীরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। তারা ফৌজকে জাপানী সামরিক বাহিনীর লেজুড় হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাদের এই মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করায় শেষ পর্যন্ত কার্যত বাধ্য হয়েই জাপানীরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে স্বাধীনভাবে অভিযান চালাবার অধিকার প্রদান করে। তারা **সুভাষচন্দ্রের**

এই দাবীও মেনে নেয় যে, ভারতের যেসব অঞ্চলকে মুক্ত করা হবে, সেইসব অঞ্চলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নিজস্ব বিমান বাহিনী এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক বাহিনীও ছিল না। এমনকি, আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রের অভাব, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা প্রভৃতিও ফৌজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। এতদসত্ত্বেও আরাকান ফ্রন্টে ফৌজ অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ব্রহ্মদেশের সীমা অতিক্রম ক'রে সর্বপ্রথম ভারত-ভূমিতে পদার্পণ করে। সিঙ্গাপুরে পৌঁছানোর ৯ মাসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র এই সামরিক সাফল্য অর্জন করেন।

কোহিমা ও ইম্ফল রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে যুদ্ধ চালাতে হয়। এই দু'টি রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে জাপানীরা পশ্চাদপসরণ করলেও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ অসীম সাহসিকতার সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তীব্র লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু ব্রিটিশদের তীব্র বিমান আক্রমণের মুখে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ অসহায় হয়ে পড়ে। তাদের সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পরামর্শ অগ্রাহ্য ক'রে জাপানী জেনারেল মুতাগুচি ইম্ফল-কোহিমা সড়ককে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেন। কারণ, তাদের মনে হয়েছিল যে, ইম্ফল ও কোহিমা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু তাদের সেই সামরিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় জাপানীরা পশ্চাদপসরণ করলেও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ফৌজের সেনাবাহিনী ভয়ঙ্করভাবে রোগাক্রান্ত হওয়ার ফলে তাদের পিছু হটতে হয়। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে সামরিক তৎপরতা, ইম্ফল ও কোহিমা রণাঙ্গনে যুদ্ধ এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে শাহনওয়াজ খানের লেখা 'আই এন.এ. অ্যান্ড ইট্স্ নেতাজী' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে। **এস. এ. আয়ার** তাঁর 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' নামক পুস্তকে লিখেছেন, "আজাদ হিন্দ্ ফৌজের একদল সেনা কিভাবে ব্রহ্ম রণাঙ্গনে জঙ্গলের ঘাস খেয়ে বেঁচে থেকেও যুদ্ধ চালিয়ে গেল, সে তো আজ পুরাকাহিনীর রূপ পেয়েছে। আরও এমন বহু বীরত্বের ঘটনা রয়েছে যেগুলি পুরাকাহিনীর মর্যাদা পেয়ে বেঁচে থাকবে, ভাবীকালের মানুষ গর্ব ও প্রশংসার সঙ্গে এসকল অনামা বীরদের কথা পুঁথিপত্রে পড়বে।"

কোহিমা ও ইম্ফল রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ব্যর্থতা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র ভেঙে পড়েননি। তিনি ইম্ফলের ওপর নতুন ক'রে আক্রমণ হানার জন্য অর্থ, সমরোপকরণ এবং সেনা সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "আমরা আবার ইম্ফল আক্রমণ করব, একবার নয়, দু'বার নয়, দশবার। সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে ফকির হয়ে যাও।" নেতাজীর আহ্বানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ এগিয়ে আসেন তাদের শেষ সম্বল নেতাজীর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। আবার, "তোমরা রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" — **নেতাজীর** এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুবকরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দেওয়ার জন্য দলে দলে এগিয়ে এল। কিন্তু দেশপ্রেমের সব আবেগ ব্যর্থ ক'রে দিল অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শত্রুপক্ষের বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ। রেঙ্গুনের পতন যখন অনিবার্য, তখন

নেতাজীর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে। ক্যাবিনেট পর্যায়ের যেসব মন্ত্রী ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কোন অবস্থাতেই নেতাজীকে শত্রুর হাতে ধরা পড়তে দেওয়া হবে না। কিন্তু তিনি জেদ ধরে বসলেন যে, তাঁর নেতৃত্বাধীন সৈন্যদের সঙ্গে তিনি রেঙ্গুনেই থেকে যাবেন এবং আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর ভাগ্যে যা ঘটবে, তাঁর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না। কিন্তু ক্যাবিনেট-সদস্যদের একান্ত অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে রেঙ্গুন ছেড়ে যেতে হয়। রেঙ্গুন ত্যাগ করার পূর্বে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নির্ভীক অফিসার ও সেনাদের' উদ্দেশে এক বিশেষ ঘোষণায় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন :

> সহযোদ্ধাগণ। এই সংকটময় মূহূর্তে আমি তোমাদের একটি মাত্র নির্দেশই দিতে পারি। তা হোল — "যদি সাময়িকভাবে পরাজয় মেনে নিতেই হয়, তবে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে সংগ্রাম করতে করতেই পরাস্ত হও। পরাস্ত হবে বীরের মতো — নিজে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে মর্যাদা ও শৃঙ্খলার মহত্তম বিধানগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে যাবে।"

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ইম্ফলের পতন ঘটার পর জাপানী প্রধানমন্ত্রী তোজো পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ঐ সময় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রায় ৪ হাজারেরও বেশী সেন্য যুদ্ধে প্রাণ হারায় এবং অনেকেই আহত ও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রাণভয়ে ফৌজের অনেক সৈন্য সামরিক শৃঙ্খলা উপেক্ষা ক'রে পালিয়ে যেতে শুরু করে। এমতাবস্থায় সুভাষচন্দ্র জাপানী সাহায্যের আশায় না থেকে স্বতন্ত্রভাবে সামরিক সম্ভার ও অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি বিভাগ খোলেন। অবশ্য জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী কোইসো জাপানের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের অস্থায়ী সরকারের কূটনৈতিক সংযোগ রক্ষা করার আশ্বাস দেন।

জাপানের সামরিক বিপর্যয় সত্ত্বেও ১৯৪৫ সালের ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ইম্ফল ও চট্টগ্রাম দখল ক'রে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে দিল্লী অভিমুখে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। কারণ, মার্চের শেষ দিকে ব্রিটিশ বাহিনী ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কার্জত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ১৩ই মে শাহ নওয়াজ, ধীলন প্রমুখ ব্রিটিশদের হাতে গ্রেপ্তার হন। ঐ সময় সুভাষচন্দ্র যুদ্ধ-পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছিলেন যে, যুদ্ধে জাপান সম্পূর্ণ পরাজিত হলেও তিনি চীন অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি অত্যন্ত দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে শেষ পর্যন্ত রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্ককে উপস্থিত হন। কিন্তু ১৯৪৫ সালের মে মাসে হিটলার বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে। আগস্ট মাসে জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছায়। কিন্তু এরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আত্মসমর্পণ করেনি। তবে ঐ সময় থেকে তিনি নিজে আর যুদ্ধ পরিচালনা করার সুযোগ পাননি। কারণ, সহকর্মীদের অনুরোধ ও পরামর্শমতো তিনি ব্যাঙ্কক থেকে সায়গনের পথে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ লড়াই চালিয়ে যাওয়া। ১৯৪৫ সালে সিঙ্গাপুর থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে ১৫ই আগস্ট সুভাষচন্দ্র তাঁর শেষ দু'টি বিশেষ নির্দেশনামা জারী করেন। জাপানের পরাজয় সম্পর্কে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, "দিল্লী যাওয়ার পথ অনেক, দিল্লী এখনও আমাদের লক্ষ্যস্থল।" অন্য একটি নির্দেশনামায় পূর্ব-এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন :

আমাদের ইতিহাসের এই অভূতপূর্ব সংকটের মধ্যে আমার মাত্র একটি কথা বলার আছে। আমাদের এই সাময়িক ব্যর্থতায় হতোদ্যম হবেন না। সাহস সঞ্চয় করুন, মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখুন। সর্বোপরি, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনাদের আস্থা এক মুহূর্তের জন্যও হারাবেন না। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যা ভারতকে পদানত রাখতে পারে। ভারত স্বাধীন হবে এবং তা অনতিকালের মধ্যেই। জয় হিন্দ্।

কিন্তু নেতাজীর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। কারণ, সায়গন থেকে তাঁর একান্ত সহযোগী হবিবুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটি জাপানী বিমানের আরোহী হন। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তাঁর বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং ২২শে আগস্ট টোকিও থেকে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করা হয়।

❐ ১০.১.৫ : আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসারদের বিচার ও তার প্রতিক্রিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি, ইতালী, জাপান প্রভৃতি অক্ষশক্তির পরাজয় ঘটে। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ কার্যত আত্মসমর্পণ করতে করতে বাধ্য হয়। শাহ নওয়াজ, কিয়ানী, রসিদ আলি প্রমুখ আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের পদস্থ অফিসারদের বিচারকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র ভারতে প্রচণ্ড গণ-অসন্তোষ ও বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৫ সালে দিল্লীর লালকেল্লায় আদালতের কাঠগোড়ায় প্রথম দাঁড় করানো হয় একজন হিন্দু (পি. কে. সেহগাল), একজন মুসলমান (শাহ নওয়াজ) এবং একজন শিখ (গুরবক্শ্ সিং ধীলন) আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের অফিসারকে। এটি ছিল ব্রিটিশদের বড় ধরনের মূর্খামি। কারণ, এর ফলে হিন্দু, মুসমান, শিখ প্রভৃতি নির্বিশেষে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতের অধিবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ঐসব বীর সেনানীর মুক্তির দাবীতে আন্দোলনে সামিল হোল। ঐসব দেশপ্রেমিক আসামীদের পক্ষে দাঁড়ালেন ভুলাভাই দেশাই, তেজ বাহদুর সাপ্রু ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতো প্রখ্যাত ব্যারিস্টাররা। কংগ্রেসের মতো মুসলিম লীগও দেশব্যাপী প্রতিবাদ আন্দেলানে যোগদান করে। ২০শে নভেম্বর **গোয়েন্দা দপ্তরের একটি গোপন প্রতিবেদনে** স্বীকার করা হয়েছে, "এরকমভাবে ভারতীয় জনগণের আগ্রহ, বা বরং বলা নিরাপদ, সহানুভূতি আকর্ষণ করার মতো ব্যাপার কদাচিৎ ঘটেছে। এই বিশেষ ধরনের সহানুভূতি সমস্ত সাম্প্রদায়িক গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে।" **বি. শিব রাও** নামে জনৈক সাংবাদিক ঐ দিন লালকেল্লায় বন্দীদের দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন, "তাঁদের মধ্যে বিন্দুমাত্র হিন্দু-মুসলমান বোধ নেই। ... এখন যাঁরা লালকেল্লায় বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের একটি বড় অংশই মুসলমান। জিন্না সাহেব যে-পাকিস্তান নিয়ে বিবাদ জিইয়ে রেখেছেন, তাতে এঁদের অনেকেই ক্ষুব্ধ।" আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র ক'রে ভারতবাসীর যে-বিক্ষোভ, তা ক্রমশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় ব্রিটিশরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। জানুয়ারী মাসে **পাঞ্জাবের গভর্ণর** জানান যে, লাহোরে মুক্ত আজাদ হিন্দ্-বন্দীদের সম্বর্ধনা সভায় উর্দি-পরা সৈন্যরা হাজির ছিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২১-২৩শে নভেম্বর কোলকাতায় কার্যত গণ-বিস্ফোরণ ঘটে গেল। আজাদ হিন্দ্-বন্দীদের মুক্তির দাবীতে কংগ্রেস যে-ছাত্র মিছিল করার আয়োজন করেছিল, তাতে কমিউনিস্টদের ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা এবং ইসলামীয় কলেজের মুসলিম ছাত্ররা বিপুল সংখ্যায় যোগদান করে। ওই ছাত্র-আন্দোলন শেষ পর্যন্ত হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসার রসিদ আলিকে ৭ বছর কারাদন্ড দেওয়ার প্রতিবাদে কোলকাতা কার্যত উত্তাল হয়ে উঠেছিল। এমনকি, ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী নৌ-সেনাদের অন্যতম দাবী ছিল, বিনা শর্তে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সব

অফিসারকে মুক্তি দিতে হবে। বস্তুত, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিকদের প্রতি দলমত-নির্বিশেষে ভারতীয়রা যে-সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক **বিপান চন্দ্র, কে. এন. পাক্কির** প্রমুখ তাঁদের 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিকদের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন হিসেবে পাঞ্জাবের কিছু কিছু এলাকায় দেওয়ালী উৎসব পালন করা হয়নি। মুসলিম লীগ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ইউনিয়নিস্ট পার্টি, অকালী দল, জাস্টিস পার্টি, রাওয়ালপিণ্ডির আহরাররা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা ও শিখ লীগ কম-বেশী আজাদ হিন্দ্কে ফৌজকে সমর্থন করেছিল।" তবে তদানীন্তন **ভাইসরয়ের** মতে, "সব পার্টিই অভিন্ন লাইন গ্রহণ করলেও কংগ্রেস ছিল অন্যদের থেকে বেশী সোচ্চার।"

❐ ১০.১.৬ : উপসংহার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ঐতিহাসিক সংগ্রাম নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন ঐ ফৌজ তার ইপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেনি — একথা সত্য। কিন্তু তাঁদের দেশপ্রেমের মধ্যে কোন ভেজাল ছিল না। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য বানিয়ে ভাবনাহীন চিত্তে দেশমাতৃকার বেদীমূলে তাঁরা যে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃত্বের দ্বি-মুখী মনোভাব বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে সরকার পক্ষ থেকে ঘোষণা করার কথা ছিল যে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের যেসব সৈন্য ও অফিসার নৃশংসতা কিংবা দুষ্কর্মে সহযোগিতার অপরাধে অপরাধী, কেবল তাঁদেরই বিচার করা হবে। কিন্তু এই বিবৃতি দেওয়ার আগেই ১৬ই আগস্ট শ্রীনগরে এক জনসভায় **নেহরু** সরকারকে ক্ষমাশীল হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্য ও অফিসারদের দেশপ্রেমিক বলে অভিনন্দন জানালেও তাঁরা যে বিপথগামী, তা জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি। আবার, ঐ নেহরুই ২৫ বছর পরে ব্যারিস্টারী শামলা গায়ে চাপিয়েছিলেন ফৌজের হয়ে আদালতে সওয়াল করার জন্য। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র ক'রে যে-জাতীয়তাবাদী মনোভাব তুঙ্গে উঠেছিল, তা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিতকে যে নাড়িয়ে দিয়েছিল, সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই।

অনুশীলনী - ১

❐ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

২। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অবদান সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

❐ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে কীভাবে পুনর্গঠিত করেছিলেন?

২। কোহিমা ও ইম্ফল রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লড়াই-এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৩। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কী ভূমিকা ছিল?

১০.২ : সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষে থেকে গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের এবং ব্রিটিশ সরকাররের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী সংগ্রাম চালানো অসম্ভব — একথা বুঝতে পেরে সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। ১৯৪৩ সালে জাপানে উপস্থিত হয়ে তিনি জাপ-প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলে জাপ-সরকারের সর্বতোমুখী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। ৪ঠা জুলাই ভারতের অন্যতম প্রবীণ বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ফৌজকে পুনর্গঠিত ক'রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালনা করার কথা ঘোষণা করেন। জুলাই মাসের প্রথম দিকে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সঙঘ এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সভাপতি হন। তিনি একথা ঘোষণা করেন যে, এই ফৌজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হোল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকেল্লা দখলের উদ্দেশে তিনি 'দিল্লী চলো' — এই রণধ্বনি দেন। ঐ বছরের আগস্ট মাসে তিনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়কের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। ২১শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারতবর্ষের অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। কয়েকদিনের মধ্যে জাপান, জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি ৯টি রাষ্ট্র ঐ সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে জাপানী প্রধানমন্ত্রী তোজো ব্রিটিশ অধিকার-মুক্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জগুলির পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রের অস্থায়ী সরকারের হাতে প্রদান করেন।

সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে কয়েকটি ব্রিগেড ভাগ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল শাহ নওয়াজের নেতৃত্বাধীন 'সুভাষ ব্রিগেড', কিয়ানীর নেতৃত্বাধীন 'গান্ধী ব্রিগেড' এবং গুলজারা সিং-এর নেতৃত্বাধীন 'আজাদ ব্রিগেড'। তাছাড়া, সিঙ্গাপুরে তিনি মহিলাদের নিয়ে গঠন করেছিলেন 'ঝাঁসীর রানী বাহিনী'। ১৯৪৪ সালে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুরে ফৌজের দু'টি সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ঐ বছর আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ আরাকান ফ্রন্টে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে ঐ ফৌজ ব্রহ্মদেশের সীমানা অতিক্রম ক'রে সর্বপ্রথম ভারতের মাটিতে পদার্পণ করে।

কোহিমা ও ইম্ফল রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে যুদ্ধ চালাতে হয়। এই দু'টি রণাঙ্গণে ব্রিটিশ বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে জাপ-সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করলেও নেতাজীর ফৌজ অসীম সাহসিকতার সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তীব্র লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু ব্রিটিশদের ভয়ঙ্কর বিমান আক্রমণের মুখে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ অসহায় হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ঐ বছর জুলাই মাসে ফৌজের সৈন্যবাহিনী ভয়ঙ্করভাবে রোগাক্রান্ত হওয়ার ফলে তাদের পিছু হটতে হয়। ইতোমধ্যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রায় ৪ হাজারেরও বেশী সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ হারায় এবং অনেকেই আহত ও রোগগ্রস্ত

হয়ে পড়ে। প্রাণভয়ে ফৌজের অনেক সৈন্য সামরিক শৃঙ্খলা উপেক্ষা ক'রে পালিয়ে যেতে শুরু করে। এমতাবস্থায় ইম্ফলের পতনের পর সুভাষচন্দ্র জাপানী সাহায্যের আশায় না থেকে স্বতন্ত্রভাবে সামরিক সম্ভার ও অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি বিভাগ খোলেন। জাপানের বিপর্যয় সত্ত্বেও ১৯৪৫ সালের ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ইম্ফল ও চট্টগ্রাম দখল ক'রে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে দিল্লী অভিমুখে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। কারণ, মার্চের শেষ দিকে ব্রিটিশ বাহিনী ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কার্যত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। শাহনওয়াজ, ধীলন প্রমুখ ব্রিটিশদের হাতে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৫ সালের মে মাসে হিটলার বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেন। আগস্ট মাসে জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদ সুভাষচন্দ্রের কাছে পৌঁছায়। এতদসত্ত্বেও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আত্মসমর্পণ করেনি। তবে ঐ সময় থেকে সুভাষচন্দ্র নিজে আর যুদ্ধ পরিচালনা করার সুযোগ পাননি। কারণ, সহকর্মীদের অনুরোধ ও পরামর্শে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সায়গনের পথে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ লড়াই চালানো। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছাও অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ, ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে টোকিও থেকে ঘোষণা করা হয়। এইভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে-ঐতিহাসিক সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল, তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

১০.৩ : অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

❐ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১ নং প্রশ্ন — ১০.১.২ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন — ১০.১.২ দ্রষ্টব্য।

❐ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১ নং প্রশ্ন — ১০.১.৩ দ্রষ্টব্য।

২ নং প্রশ্ন — ১০.১.৪ দ্রষ্টব্য।

৩ নং প্রশ্ন — ১০.১.৪ দ্রষ্টব্য।

১০.৪ : নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay-Type Questions

1. Analyse the role of the INA in India's Freedom Struggle.
2. Write a note on the contribution of the INA in India's Freedon Struggle.

Short-Type Questions

1. Write a note on the role of the *Azad Hind Fouz* in India's Freedom Struggle.
2. How did Subhas Chandra reorganised the INA ?
3. How did the INA fight against the British imperialists in Kohima and Imphal battlefields ?

১০.৫ : গ্রন্থপঞ্জী

Azad, Abdul Kalam, *India Wins Freedom.*

Chandra, Bipan, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K.N. Panikkar and Sucheta Mahajan, *India's Struggle for Independence : 1857-1947.*

Dutt, R.P., *India Today.*

Ghosh, K.K., *The Indian National Army.*

Majumdar, R.C., *History of the Freedom Movement in India,* vol. III.

Menon, V.P., *The Transfer of Power.*

Mosley, Leonard, *The Last Days of the British Raj.*

Namboodiripad, E.M.S., *A History of Indian Freedom Struggle.*

Sarkar, Sumit, *Modern India, 1885-1947.*

আয়ার, এস.এ., *আজাদ হিন্দ্ ফৌজ*।

চক্রবর্তী, তারিণী শঙ্কর, *আজাদ হিন্দ্ ফৌজ*।

চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*।

চন্দ্র, বিপান, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী, কে. এন. পানিক্কর ও সুচেতা মহাজন, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭-১৯৪৭*।

সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭*।

সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*।

———————

একক - ১১
(Unit - 11)
নৌ-বিদ্রোহ, ১৯৪৬
(Naval Mutiny, 1946)

এককের গঠন-বিন্যাস

১১.০ উদ্দেশ্য

১১.১ ভূমিকা

১১.২ নৌ-বিদ্রোহ সম্পর্কে গবেষণা ও তার সমস্যা

১১.৩ কারণ

১১.৪ সূত্রপাত এবং পরিব্যাপ্তি

১১.৫ ব্যর্থতার কারণ

১১.৬ উপসংহার

১১.৭ সারসংক্ষেপ

১১.৮ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

১১.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

১১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১১.০ উদ্দেশ্য

১৯৪৬ সালের ১৮-২৩শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই, করাচী, কলকাতা প্রভৃতি বন্দরের নৌ-সেনারা-যে-বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, বর্তমান এককে তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাছাড়া, কীভাবে সর্বপ্রথম বোম্বাই পোতাশ্রয়ের এইচ.এম.আই.এস. তলোয়ার নামক জাহাজের নাবিকরা তাঁদের প্রতি অন্যায়-অবিচার, বর্ণ-বৈষম্য ও নিম্নমানের খাদ্য সরবরাহের বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন, তা-ও বর্তমান এককের আলোচ্য বিষয়। কীভাবে ওই আন্দোলন দাবানলের মতো ভারতবর্ষের বিভিন্ন পোতাশ্রয়ের নৌ-সেনাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য ধর্মঘটী নৌ-সেনারা, বিশেষত তলোয়ার জাহাজের আন্দোলনকারীরা 'ন্যাভাল সেন্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটি' গঠন করে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, সে বিষয় বর্তমান এককে আলোকপাত করা হয়েছে। আবার, নৌ-বিদ্রোহীরা যে কেবল অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতেই সংগ্রাম করেছিলেন তা নয়, সেই সঙ্গে তাঁরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীতেও সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। অর্থাৎ, নৌ-বিদ্রোহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাঁরা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সমর্থনের জন্য আবেদন জানালেও কেবল কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন পার্টি তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। বরং, কংগ্রেস নেতা **সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল** প্রমুখ কংগ্রেস নেতা এবং মুসলিম লীগ-নেতা **মহম্মদ আলি জিন্না** অভিযোগ করেছিলেন যে, কমিউনিস্টরা দেশকে ভুল পথে চালিত করছে। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সমর্থনের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে নৌ-বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য যে-নৌ-বিদ্রোহ ঘটেছিল, তার তাৎপর্য অসীম। বর্তমান এককে এইসব বিষয়ে পাঠকদের অবহিত করানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

১১.১ ভূমিকা

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেনানায়কদের বিচারকে কেন্দ্র ক'রে দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-সংগ্রামের যে-ঢেউ ওঠে, তা সশস্ত্র বাহিনীর লোকদেরও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হোল ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ (১৮-২৩শে ফেব্রুয়ারী)। ভারতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের মূল স্তম্ভ ছিল সামরিক বাহিনী। কিন্তু এই বাহিনীর মধ্যে আনুগত্যের অভাব ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে নিশ্চিতভাবেই দুর্বল করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর সর্বপ্রথম দমদম বিমান ঘাঁটির রাজকীয় বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকরা ইংরেজ অফিসারদের কাছ থেকে হুকুম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এর পর সঙঘটিত হয় ১৯৪৬ সালের ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

১১.২ নৌ-বিদ্রোহ সম্পর্কে গবেষণা ও তার সমস্যা

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সঙ্ঘটিত নৌ-বিদ্রোহকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভারতের ইতিহাস রচয়িতারা আলোচনা করেননি। উদাহরণ হিসেবে **রমেশচন্দ্র মজুমদারের** কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর কয়েক খন্ডে লিখিত *হিস্ট্রি অব্ দ্য ফ্রীডম্ মুভমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া* নামক গ্রন্থে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করেননি। **ভি.পি. মেননের** *ট্রান্সফার অব্ পাওয়ার ইন্ ইন্ডিয়া* নামক গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই তিনি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ করেছেন। ইতিহাসবিদ দত্তের চোখে নৌ-বিদ্রোহের সমগ্র ঘটনাটিই ছিল আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা মাত্র। এই বিদ্রোহের সমর্থনে যে-উত্তাল গণ-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তিনি তার মধ্যে সদর্থক বা ইতিবাচক কোনকিছুই খুঁজে পাননি। বরং, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা ভারতীয় সমস্যার সংবিধানিক সমাধানের জন্য যে-প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল, নৌ-বিদ্রোহ তার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল বলে **রমেশচন্দ্র** মন্তব্য করেছেন। এমনকি, **অমলেশ ত্রিপাঠী, বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী, কে. এন. পানিক্কর** প্রমুখ সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসবিদরা নৌ-বিদ্রোহ সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে বেশী আলোচনা করলেও তাঁদের চোখে নৌ-বিদ্রোহের স্বতন্ত্র এবং ইতিবাচক ভূমিকা তেমন কিছু গুরুত্ব পায়নি। তাঁরা নৌ-বিদ্রোহীদের দেশাত্মবোধের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের ভূমিকারও প্রশংসা করেছেন। এ প্রসঙ্গে **অধ্যাপক দীপক কুমার দাশ** তাঁর *রিভিজিটিং তলোয়ার : এ স্টাডি ইন্ দ্য রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি আপরাইজিং অব্ ফেব্রুয়ারী নাইনটিন ফরটি-সিক্স* নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আসলে নৌ-বিদ্রোহ সম্পর্কে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও সাক্ষাৎকার দেওয়ার লোকের অভাবজনিত কারণে এই বিদ্রোহের যথার্থ মূল্যায়ন করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় 'আর.আই.এন.মিউটিনি' / 'ন্যাভাল ল' শিরোনামে মিনিস্ট্রি অব্ ডিফেন্স কিংবা এন.এইচ. কিউ. ন্যাভাল হেডকোয়ার্টারসে যেসব নথিপত্র সংরক্ষিত রয়েছে, সেগুলিকে অধ্যাপক-গবেষক দীপক কুমার দাশ ৪টি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—

(১) 'বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের দু'একদিন পর অকুস্থল থেকে কমান্ডিং অফিসারদের প্রেরিত রিপোর্ট',

(২) 'বিদ্রোহী ইউনিট জাহাজ বা উপকূলবর্তী প্রতিষ্ঠানে মার্চ-এপ্রিল মাসে যেসব বিভাগীয় তদন্ত কমিটি বসেছিল সেগুলোর কার্যবিবরণী ও রায়'

(৩) 'প্রথম শ্রেণীর বিদ্রোহীদের সামরিক আদালতে বিচারার্থে তৈরি অভিযোগপত্র' এবং

(৪) 'আর.আই.এন. তদন্ত কমিশনের কার্যবিবরণী ও রিপোর্টসমূহ (খসড়া ও চূড়ান্ত)'।

ওইসব নথিপত্রের মূল বক্তব্যের সুর প্রায় এক ও অভিন্ন। এগুলির বক্তব্য হলো—বাইরের কিছু দুষ্কৃতির প্ররোচনায় 'স্থির, অনুগত ও সুশৃঙ্খল' নৌ-সেনারা আকস্মিকভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সক্রিয়ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কোন পরিকল্পনাই নাকি তাঁদের ছিল না। আসলে যেসব রেটিং যথার্থ সাক্ষী হতে পারতেন, তাঁদের অনেককেই আর.আই.এন. কমিশনের সামনে হাজির করা হয়নি। তা সত্ত্বেও

কমিশনকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, নীচুতলার সব অভিযোগই কষ্টকল্পিত ছিল না এবং তা বাইরের থেকেও আরোপিত হয়নি। তবে কমিশন একথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, সমগ্র ঘটনাটির পেছনে ছিল নিম্নবর্গের সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও সর্বাপেক্ষা রাজনীতি-সচেতন অংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বি.সি.দত্তের লেখা *মিউটিনি অব্ দি ইনোসেন্স* নামক গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন গবেষক ও প্রবন্ধকারদের দ্বারা উদ্ধৃত হলেও 'তলোয়ার' জাহাজে বিক্ষোভের সূত্রপাতের সময় লেখক ব্যারাকে অন্তরীণ ছিলেন। তাই সেই সময় বা পরবর্তী সময়ে তিনি নৌ-বিদ্রোহে যেমন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তেমনি ঘটনার কাছাকাছিও তিনি ছিলেন না। অথচ লেখকের দাবী হলো—কয়েকজন সতীর্থকে নিয়ে তিনি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দীপক কুমার দাশের গবেষণা থেকেই এই তথ্য পাওয়া যায়।

১১.৩ কারণ

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই, করাচী, কলকাতা প্রভৃতি স্থানের নৌ-বাহিনীর নাবিকরা যেসব কারণে বিদ্রোহ করেছিল, সেগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হোল:

(১) ভারতীয় নাবিকদের নিম্নমানের খাদ্য সরবরাহ করা হোত। অথচ ব্রিটিশ নাবিকদের সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্যদির মান ছিল যথেষ্ট ভাল।

(২) ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সেনাদের প্রতি জাতি-বিদ্বেষমূলক আচরণ করত। অনেক সময় সেই আচরণ ভারতীয় সেনাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যেত।

(৩) শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় নাবিকরা অভিন্ন কাজ করলেও তাদের মধ্যে লক্ষণীয় বেতন-বৈষম্য বর্তমান ছিল। অন্যভাবে বলা যায়, একই কাজের জন্য ভারতীয় নাবিকদের অপেক্ষা শ্বেতাঙ্গ নাবিকদের অধিক বেতন প্রদান করা হোত। এরূপ বৈষম্য ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে বিক্ষোভের পথ প্রশস্ত করেছিল।

(৪) উপরি-উক্ত অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া ছাড়াও ভারতীয় নাবিকরা রাজনৈতিক উদ্দেশে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

(৫) তাছাড়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার দাবীও তাঁরা তুলেছিলেন।

বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় নাবিকরা বিশ্বের বহু বন্দরে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল। ফলে বিভিন্ন দেশের নৌ-বাহিনীর স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। এই অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব বাড়িয়ে দিয়েছিল। নৌ-সেনাদের বিদ্রোহের কারণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **বি.সি.দত্ত** তাঁর *মিউটিনি অব্ দি ইনোসেন্টস্* নামক গ্রন্থে লিখেছেন:

> জাহাজের সংবাদ আদান-প্রদান বিভাগের অনেকেই কলেজে লেখাপড়া করেছে। তারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ত। যুদ্ধের সময় তারা বাইরের জগৎকে চিনেছে। তারা এও জানত যে, যুদ্ধের শেষে তাদের জীবন ও জীবিকা অনিশ্চিত। অল্প বয়স এবং নৌ-বিভাগের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার দৌলতে তারা মহাত্মাজীর চেয়ে সুভাষ বোসকেই বেশী পছন্দ করত। শেষ পর্যন্ত

বাইরের জাতীয়তা প্লাবনের ঢেউ সেনা ব্যারাকের উঁচু দেওয়াল আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেনানায়কদের বিচারের খবরে স্বাভাবিকভাবেই নৌ-সেনারা চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা দেখেছে, রাস্তার লোকজন সামরিক উর্দি-পরা লোকদের কী ঘৃণার চোখেই না দেখে। তাদের চোখে ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সংগ্রামীরা বীর। অথচ আমরা যুদ্ধ জয় করে ফিরেছি। যুদ্ধের পর যখন ঝড়ো কাকের চেহারা নিয়ে বোম্বাইতে ফিরলাম, তখনই নৌ-সেনার উর্দি নিয়ে আমার যাবতীয় অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

কার সাম্রাজ্য আমরা রক্ষা করতে গিয়েছিলাম? আমি যে আসলে আমার দেশের বুকে বিদেশী শাসন অব্যাহত রাখার যন্ত্রাংশ মাত্র। আমার সমস্ত সত্তাকে নিয়ে আমার প্রশ্ন—কার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম আমি? সেটা কি আমার দেশের জন্য যুদ্ধ?

স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীও যে সম্ভব এবং বাস্তব, সে খবরও আমরা পেলাম। মালয়-ফেরত সলিল শ্যামের কাছে শুনলাম আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অভিনব কাহিনী। সলিল সে-সংক্রান্ত ছবি ও পত্র-পত্রিকা আমাদের দেখালো।

২০শে ফেব্রুয়ারী 'তলোয়ার' জাহাজের নাবিকরা যে-প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিলেন, তাতে ধর্মঘটের কারণ হিসেবে যেসব দাবীকে তাঁরা সামনে রেখেছিলেন, সেগুলি হোল : "নৌ-বাহিনীর ভারতীয় সদস্যদের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দীদের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে সমস্ত ভারতীয় সৈন্যের অপসারণ।" সুতরাং বলা যায়, অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার ভিত্তি নৌ-বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটলেও পরবর্তী সময়ে ধর্মঘটী নাবিকরা রাজনৈতিক কারণে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

১১.৪ সূত্রপাত এবং পরিব্যাপ্তি

১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই পোতাশ্রয়ে 'এইচ.এম.আই. এস. তলোয়ার' নাম জাহাজের ১১০০ নাবিক তাঁদের প্রতি অন্যায়-অবিচার, বর্ণবৈষম্য ও নিম্নমানের খাদ্য সরবরাহের বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ওই জাহাজের গায়ে 'ভারত ছাড়ো' লেখার জন্য বি.সি.দত্ত নামে একজন নাবিককে গ্রেপ্তার করা হলে নাবিকদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং তাঁরা ধর্মঘট শুরু করেন। পরের দিন ওই ধর্মঘট বোম্বাই বন্দরে নোঙর-করা ২২টি জাহাজে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মঘটী নাবিকরা জাহাজের মাস্তুল থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে নিয়ে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত কংগ্রেসের পতাকা, চাঁদ ও তারা চিহ্নিত মুসলিম লীগের পতাকা এবং কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত কমিউনিস্ট পার্টির লাল ঝাণ্ডা একসঙ্গে মাস্তুলে উড়িয়ে দেন। তাঁরা আন্দোলন পরিচালনার জন্য এম.এস.খানের নেতৃত্বে একটি ন্যাভাল সেন্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটি গঠন। কিন্তু নাবিকরা কোন্ পথে তাঁদের আন্দোলন পরিচালনা করবেন, সে ব্যাপারে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত

হতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেছেন:

> শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিদ্রোহের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে তাঁরা মারাত্মক দোলাচলে পড়লেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে আদেশ মেনে তাঁরা ফিরে গেলেন নিজেদের জাহাজ অথবা ব্যারাকে এবং গিয়ে দেখলেন সেনারক্ষীরা তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। পরদিন ক্যাস্‌ল ব্যরাকস্‌-এ শুরু হোল লড়াই। রেটিংরা গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করলেন। জাহাজগুলো সাহায্য করল গোলা দেগে। ওদিকে অ্যাডমিরাল গডফ্রে বোমারু বিমানে উড়ে এসে নৌ-বাহিনী ধ্বংস ক'রে দেওয়ার হুমকি দিলেন। ঐ দিন বিকেলে দেখা গেল ভ্রাতৃত্বের চমকপ্রদ নজির। গেটওয়ে অব্‌ ইন্ডিয়ার জনতা রেটিংদের জন্য খাবার নিয়ে এলেন। আর দোকানদাররা তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন যা দরকার তা-ই নিয়ে যাওয়ার জন্য। আসলে, ঘটনার ধাঁচ অচেতনভাবেই হয়ে উঠল কৃষ্ণসাগর নৌ-বিদ্রোহ ধারার প্রতিধ্বনি, ১৯০৫-এ প্রথম রুশ বিপ্লবের সময়ে এই বিদ্রোহ হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারী সেই ধর্মঘট কার্যত সমগ্র দেশের নৌ-ঘাঁটিগুলিতে এবং কয়েকটি সমুদ্রের জাহাজে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ধর্মঘটে ৭৮টি জাহাজ, ২০টি তীরবর্তী দপ্তর এবং ২০০০ নাবিক জড়িত ছিলেন। করাচী বন্দরে গোলাযুদ্ধের পর 'হিন্দুস্তান' জাহাজটির নাবিকরা শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। বিদ্রোহী নাবিকদের সমর্থনে হিন্দু-মুসলমান এবং ছাত্র ও শ্রমিকরা পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তাছাড়া, ধর্মঘটী নাবিকদের সমর্থনে ২০০০ ভারতীয় বৈমানিকের এক বিরাট ও সুশৃঙ্খল মিছিল বোম্বাই-এর রাস্তা পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ সত্ত্বেও শোভাযাত্রীরা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। ধর্মঘটী নাবিকদের কেন্দ্রীয় কমিটি সব রাজনৈতিক দল এবং দেশের জনসাধারণের কাছে তাঁদের সমর্থন জানানোর জন্য আকুল আহ্বান জানান। ২২শে ফেব্রুয়ারী জানানো সেই আহ্বানে বলা হয়:

> ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যান্ডিং আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন যে, আমাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিপুল শক্তি প্রয়োগ ক'রে আমাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষের অপমানকর শর্ত আমরা মেনে নিই—এটা নিশ্চয়ই কোন দেশপ্রেমিক ভারতবাসী চান না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় আমরা বুক পেতে দিই—এটা নিশ্চয়ই কোন দেশপ্রেমিক ভারতবাসী চান না। আমরা আলাপ-আলোচনা চালাতে অরাজী নয়। আমরা এটাও জানি যে, ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যান্ডিং মুখে যে-ভয় দেখিয়েছেন, কাজেও তা করতে ছাড়বেন না। একমাত্র আমাদের দেশবাসী ও আমাদের রাজনৈতিক নেতারাই এখন আমাদের ভরসা।
>
> ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ, আমরা বিশেষ ক'রে আপনাদের কাছেই আবেদন জানাচ্ছি। বোম্বাই-এর রক্তস্নান বন্ধ করার জন্য আপনারা আপনাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করুন। নৌ-বাহিনীর কর্তৃপক্ষের গোলাগুলি চালানো রোধ করুন। আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে তাদের বাধ্য করুন।

কিন্তু নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যক্ষ করা যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে বোম্বাই-এ সাধারণ ধর্মঘট পালনের জন্য জনসাধারণকে, বিশেষত শ্রমিকদের আহ্বান জানালে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের অরুণা আসফ আলি, অচ্যুত পট্টবর্ধন প্রমুখ নেতা তাকে সমর্থন জানান। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে ধর্মঘট করার তীব্র বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। কংগ্রেস-নেতা **সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল** জনসাধারণকে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। এমনকি, কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতা **এস. কে. পাতিল** এবং মুসলিম লীগ-নেতা **চুন্দ্রিগড়** শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক পাঠাবার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও ২২শে ফেব্রুয়ারী ৩ লক্ষ লোক কাজকর্ম বন্ধ ক'রে দেন। বোম্বাই-এর প্রায় সব কলকারখানাই বন্ধ থাকে। এ প্রসঙ্গে অমলেন্দু সেনগুপ্ত তাঁর *উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব* নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

> সকালে দেখা গেল মিল-গেটের সামনে ভিড় ক'রে শ্রমিকরা দাঁড়িয়ে আছে। আজ ভিতরে ঢুকবার কোন প্রশ্নই ওঠে না; কারণ, পার্টি ও কয়েকটি গণসংগঠন মিলিতভাবে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। অপরদিকে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং সর্দার প্যাটেল ধর্মঘট না করার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানিয়েছেন। তবুও একটি মিলেও আজ একটিও চাকা ঘোরেনি। তিনটি রেলওয়ে ওয়ার্কসপ, ৬০টি কাপড়ের কল এবং ছোট বড় সব কারখানার তিন লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। সকাল থেকেই শহরের যানবাহন বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তায় শোভাযাত্রার পর শোভাযাত্রা দোকান বন্ধ করতে বলছে। সমস্ত স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট ক'রে শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। বেলা বারোটায় লোহার শিরস্ত্রাণ পরে বেয়নেট উঁচিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা রাস্তায় টহল দিতে থাকে। ধ্বনি দিতে দিতে শ্রমিকরা শোভাযাত্রা ক'রে কামগড় ময়দানে কমরেড ডাঙ্গের সভায় দলে দলে যোগ দেন। প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ডাঙ্গে ও নাগরকার বক্তৃতা করেন।
>
> শ্রমিক-এলাকায় রাস্তার দেওয়ালে দেওয়ালে কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নের নীচে 'জয়হিন্দ্' লেখা। সকালে প্যারেল রেলওয়ে ওয়ার্কসপের শ্রমিকরা কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট পতাকাসহ এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা বার করে।
>
> ভেণ্ডিবাজার অঞ্চলের সমস্ত মুসলমান দোকানদার পূর্ণ হরতাল পালন করে। সর্বত্র এক ধ্বনি: হিন্দু মুসলমান এক হও। মুসলিম স্টুডেন্ট ফেডারেশন পূর্ণ হরতাল পালনে আহ্বান জানিয়েছে। নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে সওদাগরী জাহাজের নাবিকরাও ধর্মঘট করে। ছাত্র কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও সমস্ত ছাত্র ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে।
>
> কিন্তু দিনের শুরুটা শান্তিপূর্ণ হলেও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্যে তার অবসান। সারাদিন ধরে বোম্বায়ের পথে পথে রক্তস্রোত বইতে থাকে। সকাল থেকেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ নয়টি স্থানে টমিগান ও রাইফেলধারী ফৌজ মোতায়েন এবং তারা যথেষ্ট গুলি বৃষ্টি করেছে। তাই শহরের

বিভিন্ন অঞ্চলে মিলিটারি লরির উপর আক্রমণ চলতে থাকে এবং কয়েকটি লরিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। জনতার উপর পুলিশ বেলা এগারোটা থেকে দুপুর পর্যন্ত অনবরত গুলি চালিয়েছে।

সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ওই দিন ২৮০ জন সাধারণ নাগরিক পুলিশের গুলিতে নিহত এবং ১০৪৬ জন আহত হন। জনতার আক্রমণে নিহত ও আহত পুলিশের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩ জন ও ৯১ জন।

১১.৫ ব্যর্থতার কারণ

১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ **নানা কারণে ব্যর্থতায়** পর্যবসিত হয়। এইসব কারণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো :

(১) যে-কোন বিদ্রোহের সাফল্যের জন্য সুষ্ঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন। কিন্তু নৌ-বিদ্রোহীরা সুপরিকল্পিতভাবে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটাননি। ফলে বিদ্রোহ কীভাবে, কাদের নিয়ে এবং কোন্ পথে পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা তাঁদের মধ্যে ছিল বলে মনে হয় না।

(২) যে-কোন বিদ্রোহের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক জনসমর্থন এবং যথার্থ নেতৃত্বের। কিন্তু নৌ-সেনারা তাঁদের বিদ্রোহকে ভারতব্যাপী সম্প্রসারিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাছাড়া, তাঁদের মধ্যে ইতিবাচক নেতৃত্বদানের উপযুক্ত নেতার বড়ই অভাব ছিল।

(৩) বোম্বাই পোতাশ্রয়ের 'তলোয়ার' নামক জাহাজটির রেটিংরা যে-বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন, তা ভারতের বিভিন্ন পোতাশ্রয়ে ছড়িয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের মুখে পড়ে অতি সহজেই তাঁরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

(৪) সর্বোপরি, নৌ-বিদ্রোহীরা আশা করেছিলেন যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ইতিবাচক ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। কংগ্রেস ও লীগ-নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকেই তা প্রমাণিত হয়। ১৯৪৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী **সর্দার প্যাটেল** এবং **মহম্মদ আলি জিন্না** বিদ্রোহী নাবিকদের অবিলম্বে আত্মসমর্পণের জন্য পরামর্শ দেন। তাঁরা এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, আত্মসমর্পণকারী নাবিকদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক কোনরূপ ব্যবস্থা যাতে গ্রহণ করা না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই তাঁরা করবেন। কিন্তু ওই প্রতিশ্রুতি অচিরেই তাঁরা ভুলে যান। ১৯৪৬ সালের ১লা মার্চ অন্ধ্রের কংগ্রেস-নেতা বিশ্বনাথনকে দেওয়া এক পত্রে সর্দার প্যাটেল লেখেন, "সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলায় কোনরকম নড়চড় করা যায় না।....(কারণ) স্বাধীন ভারতেও আমাদের সেনা দরকার হবে।" **অরুণা আসফ আলি** বোম্বাই আসার জন্য **পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে** অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধ মেনে নিয়েও তিনি অবিলম্বে "হিংসার উন্মত্ত বহিঃপ্রকাশ রোধ করার প্রয়োজন অনুভব করেন।" পরে অবশ্য তিনি সৈন্যবাহিনী এবং জনসাধারণের মধ্যেকার 'লৌহপ্রাচীর' ভেঙে ফেলার

জন্য নৌ-ধর্মঘটকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্যাটেলের মতো মহাত্মা গান্ধীও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নৌ-বিদ্রোহের নিন্দা করেছিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী প্রদত্ত এক বিবৃতিতে নৌ-বিদ্রোহকে তিনি **ভারতের পক্ষে একটি অশুভ ও অশোভন দৃষ্টান্ত** বলে চিহ্নিত করেন। তাছাড়া, তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, চাকুরী নিয়ে যদি কারও কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে স্বেচ্ছায় তাদের পদত্যাগ করা উচিত। তিনি 'হিংসাত্মক কাজকর্মের জন্য হিন্দু, মুসলমান ও অন্যদের মিলনকে অপবিত্র' বলে চিহ্নিত করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। এর জবাবে **অরুণা আসফ আলি** বলেছিলেন, "সাংবিধানিক ফ্রন্টের চেয়ে ব্যারিকেডে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা অনেক বেশী সহজ।" তিনি বলেছিলেন, "কংগ্রেসীরা নিজেরাই আইনসভায় যাচ্ছেন। রেটিংদের কাজ ছেড়ে দিতে বলার কথা তাঁদের মুখে একদমই সাজে না।" এর পর ২৫শে ফেব্রুয়ারী এক বিবৃতিতে **প্যাটেল** একথা ঘোষণা করেন যে, নৌ-বিদ্রোহকে সমর্থন করছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। তারা দেশকে ভুল পথে পরিচালিত করতে চাইছে। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের সঙ্গে আমি একমত যে, সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা করতেই হবে। মুসলিম লীগ-নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাও একই সুরে বলেন, "নৌ-বিদ্রোহ একটি অসময়োচিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ড।" বস্তুত, নৌ-বিদ্রোহের সময় কমিউনিস্টরা ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের পাশে গিয়ে যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, অন্যরা সেভাবে দাঁড়াননি। বরং, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই বিদ্রোহকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ তাঁর লেখা **ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস** (চতুর্থ খণ্ড)-এ লিখেছেন :

> ...এটাও মনে করলে ভুল হবে যে, বাম ঘরানার কংগ্রেসিরা, কিংবা সোস্যালিস্টরা কিংবা কমিউনিস্টরা—এরা সবাই নৌবিদ্রোহের প্রতি নিস্পৃহ উদাসীন ছিলেন। বোম্বাই-এ শ্রমিকদের ধর্মঘট আপ্‌সে হয়নি। এর পেছনে সংগঠিতভাবে কাজ করেছিলেন বামঘেঁষা কংগ্রেসিরা, সোস্যালিস্টরা এবং কমিউনিস্টরা। ওঁদের অনেকেই প্রাণাহুতি দিয়েছিলেন ধর্মঘটী শ্রমিকদের আর সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের অগ্নিশিখায়। এটা অবশ্য সত্যি যে, ওঁরা পারেননি ওই সংগ্রামটাকে একটি সর্বভারতীয় ক্রান্তিকারী আন্দোলনের স্তরে উন্নীত করতে কিংবা সশস্ত্রবাহিনীর অন্যান্য শাখাতেও ওই বিদ্রোহটাকে প্রসারিত করতে।

যাই হোক্, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের বিরোধিতার জন্য নৌ-সেনারা তাঁদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারেননি। তাঁরা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আত্মসমর্পণের সময় বিপ্লবী কমিটির সভাপতি ঘোষণা করেন, "ব্রিটেনের কাছে নয়, ভারতের কাছেই আমরা আত্মসমর্পণ করছি।" অবশ্য আত্মসর্পণের পূর্বে ইন্ডিয়া গেটে সমবেত ছাত্র ও জনসাধারণের উদ্দেশে মাইক্রোফোনে বিদ্রোহীদের শেষ ইস্তেহার ঘোষিত হয়। তাতে বলা হোল :

> এই ধর্মঘট আমাদের জাতির জীবনে ইতিহাস রচনা করেছে। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম সৈনিক ভারতবাসী ও অসামরিক ভারতবাসীর রক্ত একই আদর্শের প্রেরণায় প্রবাহিত হোল। আমরা সৈনিকরা এই ঘটনা কখনই ভুলব না এবং আমরা জানি যে, আপনারা, আমাদের ভাই-বোনেরাও কখনও ভুলবেন না। আমাদের মহান্ জনগণ দীর্ঘজীবী হোক্। জয়হিন্দ্!

১১.৬ উপসংহার : ঐতিহাসিক তাৎপর্য

১৮৫৭ সালে অনুষ্ঠিত মহাবিদ্রোহের পর ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানোর উদ্দেশে অস্ত্রধারণ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের প্রধান ভিত্তিভূমি হোল সামরিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর দ্বিধাহীন আনুগত্য। ভারতের নৌ-বিদ্রোহ সেই আনুগত্যের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হোল—১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের নায়কদের কিংবা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সদস্য ও সেনানায়কদের জাতীয় বীরের মর্যাদা প্রদান করা হয়। কিন্তু ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের কোনদিনই সেই মর্যাদা প্রদান করা হয়নি। এমনকি, পণ্ডিত নেহরু নৌ-বিদ্রোহকে '৭ ঘন্টার বন্দুকের লড়াই' বলে ব্যঙ্গ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। বোম্বাই-এ তিনি দেড় ঘন্টা ধরে সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের কাছে যে-বিবৃতি দেন, তাতে সামরিক বাহিনীর ওপর নৃশংস গুলি চালানোর বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। কিন্তু প্রশ্ন হোল— কমিউনিস্টদের সমর্থন সত্ত্বেও কেন নৌ-বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করলেন? এ প্রসঙ্গে বি.টি. রণদিভে তাঁর **কমিউনিস্ট্স্ অ্যান্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল্** নামক পুস্তিকায় মন্তব্য করেছেন:

সীমাবদ্ধ শক্তির অধিকারী হয়েও কমিউনিস্টরা ক্রমবর্ধমান অভ্যুত্থানগুলিতে সাধ্যমতো অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু যথেষ্ট শক্তি না থাকায় তাকে সংগঠিত ক'রে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারেনি।.... কংগ্রেস-নেতৃত্বের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার মতো শক্তি তখন তাদের ছিল না।

তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং নৌ-বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভিত্তিকে নড়িয়ে দিয়েছিল। কয়েকটি গোপন চিঠি ও তারবার্তা থেকে এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। ১৯৪৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী বড়লাট ওয়াভেল গোপনে তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীকে লিখেছিলেন, "এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে রয়েছেন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ। বোম্বাই ও কলকাতার গণ-বিদ্রোহের পেছনে রয়েছে বামপন্থী কংগ্রেসীরা ও কমিউনিস্টরা।" এই বিদ্রোহ যে কতখানি ব্যাপকতা লাভ করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যায় এটলীকে পাঠানো সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক অকিনলেকের একটি গোপন বার্তা থেকে। ওই বার্তায় বলা হয়েছিল, "সমগ্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট একটি দেশব্যাপী গণ-বিদ্রোহ শীঘ্রই ভারতে ঘটে যেতে পারে।" সুতরাং বলা যায়, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং নৌ-বিদ্রোহ ভারতবর্ষের মাটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিল। তাই নৌ-বিদ্রোহের পরিসর স্বল্পকালীন হলেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কোনমতেই উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না।

অনুশীলনী

■ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

(১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নৌ-বিদ্রোহের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

(২) ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সঙঘটিত নৌ-বিদ্রোহের ওপর একটি বিশ্লেষণমূলক টীকা লেখ।

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

(১) ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহের কারণগুলি কী?

(২) ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহের সূত্রপাত কীভাবে ঘটেছিল?

(৩) ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলি কী?

(৪) ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহের প্রকৃতি কী?

(৫) ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী?

১১.৭ সারসংক্ষেপ

ভারতের ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের মূল স্তম্ভ ছিল সামরিক বাহিনী। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথমে বোম্বাই-এ নৌ-বিদ্রোহ শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে করাচী, কলকাতা প্রভৃতি পোতাশ্রয়ে, এমনকি দেশের বিভিন্ন নৌ-ঘাঁটিতে ও সমুদ্রের কয়েকটি জাহাজে তা ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় নাবিকদের নিম্নমানের খাদ্য সরবরাহ, তাদের প্রতি জাতি-বিদ্বেষমূলক আচরণ, বেতন-বৈষম্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া ছাড়াও ব্রিটিশ শাসনের অবসান, ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের দাবী প্রভৃতি কারণে এই বিদ্রোহ সঙঘটিত হয়েছিল। কেবল বোম্বাই-এ নোঙর-করা ২২টি জাহাজের নৌ-সেনারা ওই বিদ্রোহে সামিল হয়েছিলেন। বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য গঠিত হয়েছিল এম.এস.খানের নেতৃত্বে একটি ন্যাভাল সেন্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটি। বোম্বাই-এর নৌ-বিদ্রোহীরা জাহাজের মাস্তুল থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে দিয়ে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা উড়িয়ে দেয়। তাঁরা ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং ভারতীয় জনগণের কাছে সাহায্য ও সমর্থনের জন্য আকুলভাবে আহ্বান জানান। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-নেতৃবৃন্দ তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তাঁদের আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দেন। কেবল কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের সমর্থনে ঐকান্তিকভাবে এগিয়ে আসে এবং নৌ-সেনাদের সাহায্যের জন্য বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের কাছে আবেদন জানায়। ব্রিটিশদের প্রতিআক্রমণ এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতা এবং অন্যান্য কারণে শেষ পর্যন্ত নৌ-বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ওই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে কোনমতেই অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুত, আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং নৌ-বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভিত্তিকে যে নড়িয়ে দিয়েছিল, সে বিষয় দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই।

১১.৮ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী-১

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১নং প্রশ্ন—১১.১, ১১.৩-১১.৬ দ্রষ্টব্য।

২নং প্রশ্ন—১১.১,১১.৩-১১.৬ দ্রষ্টব্য।

■ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১নং প্রশ্ন—১১.৩ দ্রষ্টব্য।

২নং প্রশ্ন—১১.৪ দ্রষ্টব্য।

৩নং প্রশ্ন—১১.৫ দ্রষ্টব্য।

৪নং প্রশ্ন—১১.৪ দ্রষ্টব্য।

৫নং প্রশ্ন—১১.৬ দ্রষ্টব্য।

১১.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

ESSAY-TYPE QUESTIONS

1. Write an analytical note on the Naval Mutiny of 1946.
2. What were the reasons for the Naval Mutiny of 1946? What was its nature? Why did it fail?
3. Analyse the role of the Naval Mutiny of 1946 in India's freedom struggle.

SHORT-TYPE QUESTIONS

1. What were the reasons for the Naval Mutiny of 1946?
2. What was the nature of Naval Mutiny of 1946?

3). Why did the Naval Mutiny of 1946 fail?

4. What was the importance of the Naval Mutiny of 1946?

১১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

A Mutiny in 1946' (An Article in *The Statesman* on 05/03/1986).

Banerjee, Subrata, *The RIN Strike.*

'The Almost Revolution : A Case Study of India in February, 1946', *Essays on Professor S.C. Sarkar.*

Chandra, Bipan, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K.N. Panikkar and Sucheta Mahajan, *India's Struggle for Independence: 1857-1947.*

Das, Dipak Kumar, *Revisiting Talwar* : *A Study in the Royal Indian Navy Uprising of February 1946.*

Dutt, B.C., *Mutiny of the Innocents.*

Dutt, R.Palm, *India Today.*

Majumdar, R.C., *History of the Freedom Movement in India,* Vol.III

Mansergh, N. (ed.), *Transfer of Power, 1942-47.*

Menon, V.P., *The Transfer of Power.*

Mosley, Leonard, *The Last Days of the British Raj.*

Namboodiripad, E.M.S., *History of Indian Freedom struggle*.

Sarkar, Sumit, *Modern India, 1885-1947.*

চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ।*

চন্দ্র বিপান, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী, কে.এন.পানিক্কর ও সুচেতা মহাজন, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭-১৯৪৭।*

লাহিড়ী, সোমনাথ, *'ভুলিব না'* (স্বাধীনতা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ)।

সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭।*

সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব।*

একক - ১২
(Unit - 12)
চল্লিশের দশকে ছাত্র-আন্দোলন
(Students' Movement in the forties)

একেকের গঠন-বিন্যাস

১২.০ উদ্দেশ্য

১২.১ ভূমিকা : এ. বি. এস. এ.-এর প্রতিষ্ঠা (১৯২৮)

১২.২ সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন (এ.আই.এস.এফ.)-এর প্রতিষ্ঠা

১২.৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ছাত্র-আন্দোলনে মতাদর্শগত বিতর্ক

১২.৪ স্বাধীনতার চূড়ান্ত পর্যায়ে ছাত্র-সমাজের সংগ্রাম

১২.৫ উপসংহার

১২.৬ সারসংক্ষেপ

১২.৭ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

১২.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

১২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১২.০ উদ্দেশ্য

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী এবং শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর মতোই ছাত্র-সমাজের একটি ইতিবাচক ভূমিকা ছিল। সেই ভূমিকার সঙ্গে পাঠকদের পরিচিতি ঘটানোই হলো বর্তমান এককের উদ্দেশ্য। ১৯৩৬ সালে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই এই সংগঠনের মধ্যে মতাদর্শগত বিতর্ক ছিল। ১৯৪০ সালের শেষ দিকে এ.আই.এস.এফ.-এর নাগপুর সম্মেলনে বামপন্থা ও দক্ষিণপন্থার মধ্যে বিতর্কের ফলে ছাত্র-আন্দোলনে কীভাবে ফাটল ধরল, সে বিষয়ে বর্তমান এককে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ.আই.এস.এফ.-এর নেতৃত্বে সারা ভারতের, বিশেষত বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ কীভাবে একের পর এক রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, সে বিষয়েও এই ইউনিটে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কেবল আন্দোলন বা সংগ্রাম পরিচালনাই নয়, সেই সঙ্গে সমাজসেবামূলক কাজেও যে এ.আই.এস.এফ.-কর্মীরা অনন্যসাধারণ নজির গড়েছিল, তা দেখানোই হলো বর্তমান এককের উদ্দেশ্য। স্বাধীনতার চূড়ান্ত পর্যায়ে ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে সব রাজবন্দী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীর সেনানীদের মুক্তির দাবীতে এবং ডক-শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে এ.আই.এস.এফ.-এর ভূমিকা পালন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, ১৯৪৬ সালে ডাক ও তার ধর্মঘটকে সমর্থন ছাড়াও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রতিরোধ এবং ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক বামপন্থী ছাত্র-নেতা ও কর্মী আহত ও নিহত হয়েছিলেন। ছাত্র-সমাজের ওইসব ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করাই হলো এই এককের উদ্দেশ্য।

১২.১ ভূমিকা : এ.বি.এস.এ.-এর প্রতিষ্ঠা (১৯২৮)

১৯২২ সালে অনুষ্ঠিত চৌরিচৌরা ঘটনার পর গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিলে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাঁটার পর্ব চলতে থাকে। কিন্তু ১৯২৫-২৬ সালের পর থেকে আবার নতুন ক'রে গণ-সংগ্রাম শুরু হয়। এই সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ছাত্রদের সংগ্রাম ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯২৬ সালে কোলকাতার বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীতে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি বা এ.বি.এস.এ. নামে একটি ছাত্র-সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর দু'বছর পরে অর্থাৎ, ১৯২৮ সালে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত ছাত্র-সম্মেলনে (২২-২৫শে সেপ্টেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংগঠনের জন্ম হয়। সংগঠনের প্রাদেশিক সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন যথাক্রমে প্রমোদ ঘোষাল ও ধীরেন দাশগুপ্ত। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে **জওহরলাল নেহরু** বলেছিলেন :

তোমরা বাংলার তরুণ-তরুণীরা সাহসের সঙ্গে চিন্তা ও কাজ করতে রাজী আছ কি? তোমরা কি সারা পৃথিবীর তরুণ-তরুণীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে রাজী আছ? শুধু তোমাদের স্বদেশ থেকে উদ্ধত বিদেশীরাজকে উচ্ছেদ করার জন্যই নয়, এই দুর্ভাগা জগৎকে বদলে দিয়ে উন্নততর ও সুখী সমাজ গড়বার জন্যও কি তোমরা লড়তে রাজী?...যে-কোন প্রগতির জন্য চাই জাতীয় স্বাধীনতা এবং ইচ্ছামতো

এগিয়ে যাওয়ার পরিপূর্ণ অধিকার। তা বাদ দিয়ে কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতা আসতে পারে না।....আমাদের স্বাধীনতা যেন সেই বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের পথে এমন একটি পদক্ষেপ হয়, যা পৃথিবীতে শান্তি এবং মৈত্রী আনতে সাহায্য করবে।....

....তোমাদের আদর্শ যদি সামাজিক সমানাধিকার ও বিশ্বমৈত্রী হয়, তাহলে তোমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য লড়তে হবে। দেশের বহু লোক সমাজতন্ত্র কথাটি শুনলেই ঘাবড়ে যায়। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।... যেসব নতুন চিন্তা ও আদর্শ আজ সারা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে তুলেছে, তোমরা, দেশের তরুণরাই তো তাদের বোঝবার চেষ্টা করবে, তোমাদের স্বদেশে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে। আজকের দীর্ণ-বিদীর্ণ বিশ্বের একমাত্র আশা-ভরসা হোল সমাজতন্ত্র।...

...আর রাশিয়া? তার সম্পর্কে কী ভাবছ? আমাদের মতো সেই দেশ অন্ত্যজ। অনেকেই তার কুৎসায় মুখর এবং তারাও ভুল-ভ্রান্তি করছে। কিন্তু তার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও রাশিয়াই হোল আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদের প্রধান শত্রু এবং পূর্ব জগতের প্রতি তার ব্যবহার উদারতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।...

পণ্ডিত নেহরুর এই বক্তব্য এ.বি.এস.এ.-এর একটি অংশের মনে রেখাপাত করলেও ওই সংগঠনের মধ্যে প্রাধান্য ছিল অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর নামে দু'টি সুপরিচিত বিপ্লবী গোষ্ঠীর। ১৯২৯ সালে মতপার্থক্যের দরুণ এ.বি.এস.এ. দু'টুকরো হয়ে যায়। ফলে জন্ম লাভ করে বি.টি.এস.এ. নামে অন্য একটি ছাত্র-সংগঠন। কিন্তু মতপার্থক্য সত্ত্বেও গান্ধীজীর আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্র যোগদান করেছিল।

১২.২ সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন (এ.আই.এস.এফ.)-এর প্রতিষ্ঠা

১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি ছাত্র-সমাজের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তরুণ মার্কসবাদী **অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়ের** সভাপতিত্বে কোলকাতার অ্যালবার্ট হলে একটি সারা বাংলা ছাত্র-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে গঠিত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র লীগ। **বিশ্বনাথ মুখার্জী** এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে **সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু** প্রমুখ কংগ্রেস বামপন্থীদের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাছাড়া, ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল। গান্ধীবাদের পরিবর্তে মার্কসবাদের প্রতি এই দল অনেক বেশী আসক্ত ছিল। এরূপ পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র-প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৩৬ সালের ১২-১৩ই আগস্ট লক্ষ্ণৌ শহরে অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত ছাত্র-সম্মেলন। ওই সম্মেলন মঞ্চ থেকেই **সারা ভারত ছাত্র-ফেডারেশন (এ.আই.এস.এফ.)** গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওই সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে প্রধানত বামপন্থীরা উদ্যোগ গ্রহণ করলেও সব মতের ছাত্র-ছাত্রীরাই এর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। এমনকি, ঐ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মুসলিম লীগ-নেতা মহম্মদ আলি জিন্না এবং এর উদ্বোধক ছিলেন **জওহরলাল নেহরু**।

এ.আই.এস.এফ. প্রতিষ্ঠার পেছনে যেসব উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, সেগুলি হোল:

(১) ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ এবং রাজ্যগুলির ছাত্রদের মধ্যে সমানাধিকারের ভিত্তিতে চিন্তা ও সাংস্কৃতিক ভাব আদান-প্রদানে উৎসাহ দান করা;

(২) তদানীন্তন শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য মতামত প্রদান করা;

(৩) ছাত্র-সমাজের অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করা এবং

(৪) ভবিষ্যতের নাগরিক হিসেবে ছাত্র-সমাজকে এমনভাবে প্রস্তুত করা, যাতে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে স্বীয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় এবং সেই উদ্দেশে তাদের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করা।

এই সম্মেলনে যেসব দাবী-সনদ গৃহীত হয়, সেগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল :

(ক) সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;

(খ) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষার বিপুল পরিমাণ ব্যয়ভারের বোঝা থেকে অভিভাবকদের মুক্তিদান;

(গ) প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে অন্তত ২৫ শতাংশ ব্যয়-হ্রাস ও সেই সঙ্গে সকলের জন্য সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থার নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) এমন পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা, যাতে জাতীয়তা-বিরোধী ও গণতন্ত্র-বিরোধী চিন্তা-ভাবনা থাকবে না এবং

(ঙ) বিদ্যালয় স্তরে অন্তত ৫০ শতাংশ শিক্ষা-বেতন ও পরীক্ষার ফি হ্রাস।

সংগঠনের যেসব গণতান্ত্রিক দাবী ছিল, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোল :

(১) ছাত্র-সংসদের স্বীকৃতি;

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ জনগণের হাতে অর্পণ;

(৩) বেত্রাঘাতের মতো অপমানজনক শাস্তির বিলোপ সাধন;

(৪) রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য কোন ছাত্রকে শাস্তি প্রদান না করা এবং

(৫) ছাত্রদের পত্রিকা নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে ছাত্রদের হাতে প্রদান।

ওই সম্মেলন থেকে ফিরে এসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্রকর্মীদের নিয়ে একটি **সারা বাংলা ছাত্র-সম্মেলনের** আয়োজন করেন। ১৯৩৬ সালের ১২ই অক্টোবর কোলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে ভাষণ দেন কংগ্রেস-নেতা **শরৎচন্দ্র বসু**। এ.আই.এস.এফ.-এর লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে তারই একটি শাখা হিসেবে বাংলাদেশে গড়ে ওঠে **বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন (বি. পি. এস. এফ.)**। নবগঠিত বি.পি.এস.এফ.-এর সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল যথাক্রমে **কে. এম. আহমেদ** এবং **কালীপদ মুখোপাধ্যায়**। ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র লীগ তখন মিলেমিশে কাজ করতে শুরু করে।

১২.৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ছাত্র-আন্দোলনে মতাদর্শগত বিতর্ক

নানা মত ও পথের অনুসারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুগামী ছাত্ররা ছাত্র-ফেডারেশনের মধ্যে থাকার ফলে জন্মলগ্ন থেকেই এ.আই.এস.এফ.-এর মধ্যে মতাদর্শগত বিতর্ক ছিল। এই বিতর্ক চরম আকার ধারণ করে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বে অনুষ্ঠিত এ.আই.এস.এফ.-এর মাদ্রাজ সম্মেলনে (১-৩ জানুয়ারী)। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের **মিনু মাসানী**। প্রতিনিধি **পি. কৃষ্ণমূর্তি** সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধানকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কারণ, ওই সংবিধানে শিক্ষা ও কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু **মাসানী** ওই প্রস্তাব উত্থাপন করার অনুমতি না দিলে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদের একাংশ সম্মেলন মঞ্চ ছেড়ে চলে যান। এমতাবস্থায় নতুন সভাপতি নির্বাচন ক'রে সম্মেলন সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা হয়। এ.আই.এস.এফ.-এর মধ্যে তখন কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের প্রভাব যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

এর পর ১৯৩৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার পর এ.আই.এস.এফ.-এর মধ্যে নতুন ক'রে মতাদর্শগত বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। ওই বিশ্বযুদ্ধের দু'টি পর্যায় ছিল। বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে ১৯৪১ সালের ২১শে জুন পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালকে প্রথম পর্যায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে বিশ্বযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত সময়কালকে দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যে-জওহরলাল একদিন বামপন্থী হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে গান্ধী তথা দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের বিরোধের সময় দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করতে হয়। ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে এ.আই.এস.এফ.-এর দিল্লী সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চাপিয়ে-দেওয়া দমন নীতি ও নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ২৫-২৬শে জানুয়ারী হাজার হাজার ছাত্র সাম্রাজ্যবাদী নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে মিছিলে সামিল হয় এবং ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালন করে। ওই সময়ে এ.আই.এস.এফ.-এর নেতৃত্ব বামপন্থী ছাত্রদের হাতে থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ১৯৪০ সালে গঠিত হয় **সারা ভারত মুসলিম ছাত্র লীগ**। ছাত্র লীগের দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা নেতিবাচক হলেও উভয় ছাত্র-সংগঠনই সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবীতে ঐতিহাসিক আন্দোলনে সামিল হয় এবং বাংলাদেশের তৎকালীন মন্ত্রিসভা ছাত্র-আন্দোলনের চাপে ওই মনুমেন্ট অপসারণের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

১৯৪০ সালের শেষ দিকে এ.আই.এস.এফ.-এর নাগপুর-সম্মেলনে বামপন্থা ও দক্ষিণপন্থার মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয় এবং তার ফলে সর্বভারতীয় ছাত্র-আন্দোলনের ক্ষেত্রে ফাটল ধরে। কিন্তু বাংলাদেশে দক্ষিণপন্থীরা আদৌ সুবিধে করতে পারেননি। যাই হোক্, ১৯৪১ সালে এ.আই.এস.এফ.-এর নেতৃত্বে যেসব সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলি মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোল দেউলির রাজনৈতিক বন্দীদের-অনশন-ধর্মঘটের সমর্থনে ও তাদের মুক্তির দাবীতে কলকাতার ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট; কানপুর ও

গৌহাটিতে ছাত্রদের ওপর লাঠি চালানোর প্রতিবাদে কোলকাতায় সাধারণ ধর্মঘট এবং নিখিল বঙ্গ ছাত্র-ফেডারেশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক **এম.ফারুকীকে** গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে কোলকাতার ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট।

১৯৪১ সালে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্রগত ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করার শ্লোগান দিয়েছিল। তা নিয়ে সমগ্র ভারতে যে-বিতর্কের ঝড় ওঠে, তা এ.আই.এস.এফ.-এর মধ্যেও দেখা যায়। ১৯৪১ সালের শেষ দিকে এ.আই.এস.এফ.-এর পাটনা-সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির শ্লোগানকে গ্রহণ করা হয়। ফলে এ.আই.এস.এফ. থেকে অ-কমিউনিস্ট ছাত্ররা বেরিয়ে যায়। এইভাবে ভাঙনের পর ছাত্র- ফেডারেশন ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে কুৎসা প্রচার চলতে থাকে। কিন্তু এ.আই.এস.এফ. ওই সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্য এবং সব অংশের ছাত্রদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার শ্লোগান দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চল্লিশের দশকে এ.আই.এস.এফ. মূলত রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ-শিবির গড়ে তুলে সমাজসেবামূলক কাজের এক অনন্যসাধারণ নজির গড়েছিল। বস্তুত, ওই সময় ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম-করতে হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে অনেক কর্মীকে তখন প্রাণ দিতে হয়। উদাহরণ হিসেবে ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ছাত্র-ফেডারেশনের পুরোনো কর্মী ও তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দের হত্যার উল্লেখ করা যায়। এর বিরুদ্ধে সারা বাংলার সাহিত্যিক ও শিল্পীরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। জন্মলাভ করে **ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পী সঙ্ঘ**। এর পতাকার নীচে যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোমেন চন্দের হত্যার ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে **সুভাষ মুখোপাধ্যায়** লিখেছিলেন :

বজ্র কণ্ঠে তোলো আওয়াজ
রুখবো দস্যুদলকে আজ
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।

ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে খুলনাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্র-সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন সর্বভারতীয় ছাত্র-নেতা **যোগ্যদত্ত শর্মা**। প্রখ্যাত ছাত্র-নেতা **বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের** ওপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট থেকে শুরু হয় গান্ধীজীর ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'। ১০ই আগস্ট কোলকাতায় সর্বাত্মক ছাত্র-ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। বি. পি. এস. এফ.-এর নেতৃত্বে বিশাল

ছাত্র-মিছিল সমগ্র কোলকাতা পরিভ্রমণ করে। ওই মিছিলে শ্লোগান তোলা হয় : জাতীয় নেতাদের বিনা শর্তে অবিলম্বে মুক্তি চাই। ১৩ই আগস্ট পুলিশ ছাত্র-মিছিলের ওপর নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করলে ১৫ই আগস্ট শুরু সাধারণ ছাত্র-ধর্মঘট। ধর্মঘটী ছাত্রদের ওপর গুলি চালিয়ে পুলিশ ৫ জন ছাত্রকে হত্যা করলে তার প্রতিবাদে পরের দিন সমগ্র বাংলাদেশের সব স্কুল-কলেজে সার্বিক ধর্মঘট পালিত হয়। এর পর বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষে কিংবা রেলপথ ও সেতু উড়িয়ে দেওয়ার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল জাতীয়তাবাদী জঙ্গী ছাত্ররাই। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসন ব্যবস্থাকেও তারা অচল ক'রে দিয়েছিল। শুধু বাংলায় নয়, ছাত্র-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল আসাম ও মাদ্রাজেও। এমনকি, তিলকের দেশ মহারাষ্ট্রেও শুরু হয়েছিল উত্তাল ছাত্র-আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রদান করেছিলেন **ধর্ম পোখারকার**। বোম্বাই-এ আগস্ট বিপ্লবের প্রথম দিনে পুলিশের গুলিতে যিনি প্রথম শহীদ হয়েছিলেন, তিনি হলেন ভারতের ছাত্র-ফেডারেশনের কর্মী **উমাভাই কাদিয়া**। পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছিলেন সর্বভারতীয় ছাত্র-নেত্রী **নার্গিস বাটলিওয়ালা**। লক্ষ্ণৌতে পুলিশের বর্বর লাঠি চালনার প্রথম শিকার হন উত্তরপ্রদেশের ছাত্র-নেতা **হরিশ তেওয়ারী;** গ্রেপ্তার হন কার্যকরী সমিতির সদস্য **রবি সিন্‌হা**। নিখিল ভারত ছাত্র-ফেডারেশনের বিহার প্রাদেশিক শাখাকে বেআইনী ঘোষণা করেছিল বিহারের তদনীন্তন রাজ্য-সরকার। ১৯৪৩-৪৪ সালে বাংলায় যে-মন্বন্তর দেখা দেয়, তাতে শুধু বাংলার নয়, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ছাত্র-ফেডারেশনের কর্মীরা অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য ও ঔষধ সংগ্রহ ক'রে প্রেরণ করেছিল।

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কোলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র-ফেডারেশনের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে ছাত্র-ফেডারেশনের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে সরোজিনী নাইডু বিভেদ ভুলে গিয়ে ছাত্রদের জোটবদ্ধ হওয়ার এবং চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য আহ্বান জানান। ওই সময় ছাত্র-ফেডারেশনের যাঁরা সামনের সারির কর্মী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন সুচিত্রা মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস, সলিল চৌধুরী, সোমনাথ হোড়, তৃপ্তি মিত্র, মৃণাল সেন প্রমুখ আজকের খ্যাতনামা শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দ। ওই বছর আগস্ট মাসের শেষ দিকে কোচবিহারে ছাত্রদের ওপর বর্বর লাঠি চালানো হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র-ফেডারেশন ২৯শে আগস্ট বন্দী-মুক্তির দাবীতে ও কোচবিহারে নৃশংস দমননীতির প্রতিবাদে ধর্মঘটের ডাক দেয়। কোলকাতায় ট্রাম ধর্মঘট শুরু হলে ছাত্র-ফেডারেশনের নেতৃত্বে ধর্মঘটী ট্রাম-শ্রমিকদের সমর্থনে ছাত্র-সমাজ এগিয়ে আসে।

১২.৪ স্বাধীনতার চূড়ান্ত পর্যায়ে ছাত্র-সমাজের সংগ্রাম

১৯৪৫ সালে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। এই যুদ্ধে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা এবং বীরত্ব সারা বিশ্বে, বিশেষত উপনিবেশগুলির মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিপুল আকর্ষণ সৃষ্টি করে। ভারতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে ছাত্র-ফেডারেশনের নেতৃত্বে

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৪৫ সালের ২০শে আগস্ট সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে কোলকাতার ১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী মিছিলে সামিল হয়। কিন্তু ওই বছরের শেষ দিকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীর সেনানীদের মুক্তির দাবীতে ভারতের ছাত্র-ফেডারেশন ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু করে। কমিউনিস্ট-বিরোধী ছাত্র-সংগঠনগুলি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির দাবীতে ২১শে নভেম্বর বাংলাদেশ জুড়ে ধর্মঘট ও সমাবেশের যে-ডাক দিয়েছিল, তাতে সাড়া দিয়ে ছাত্র-ফেডারেশন কর্মীরা ওই ছাত্র-সংগ্রামকে সফল ক'রে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। কিন্তু ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের এক জনসভায় জাতীয়তাবাদী ছাত্র-নেতারা ছাত্র-ফেডারেশনের নেতাদের বক্তৃতা করতে দিলেন না। এতদসত্ত্বেও তারা ছাত্র-মিছিলের পুরোভাগেই ছিলেন। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ওই ছাত্র-মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালালে **রামেশ্বর ব্যানার্জী** জনৈক ছাত্র এবং **আব্দুস সালাম** নামে একজন শ্রমিক শহীদ হন। এর পর শুরু হয় ১৯৪৬ সালের ধর্মঘট। ছাত্র-সমাজ ওই ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে আসে। কিন্তু সেই সময় বাংলার ছাত্র-সমাজ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ক্যাপ্টেন **রশিদ আলির মুক্তির দাবীতে** ছাত্র-ফেডারশেনের নেতৃত্বে যে-সংগ্রামে সামিল হয়েছিল; তা ছিল প্রকৃত অর্থেই ঐতিহাসিক। ছাত্র-ফেডারেশন ও মুসলিম লীগের যৌথ আহ্বানে ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রায় ২০০০ ছাত্রের এক সমাবেশের ওপর ব্রিটিশ সৈন্যের নির্মম আক্রমণ নেমে এসেছিল। ওই সময় ভারত-সফর শেষ ক'রে ব্রিটিশ সংসদীয় দলের নেতা অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক রিচার্ডস লন্ডনে ফিরে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এটলীকে বলেছিলেন, "আমরা অবিলম্বে ভারত ছেড়ে চলে না এলে ভারতীয়রা আমাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে।" কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হোল— ছাত্র ও শ্রমিকদের আন্দোলনকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। তাই ১২ই ফেব্রুয়ারী কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি **মৌলানা আবুল কালাম আজাদ** এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, "কলকাতার রাজপথে এখন গুন্ডারাজ চলছে। আমরা তার নিন্দা করছি।" এমনকি, বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত **শরৎচন্দ্র বসুও** মন্তব্য করেছিলেন, "গত দু'দিনের ঘটনা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, গুন্ডারা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকেরা এখন শহরে নেতৃত্ব করছে। এ আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।" ওই সময় কেবল কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাহীনভাবে সংগ্রামী ছাত্র ও জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত গণ-বিপ্লবের জন্য কমিউনিস্টরা দেশবাসীকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট কবি সুকান্ত কংগ্রেস-নেতাদের পূর্বোক্ত অপবাদের জবাবে লিখেছিলেন :

আকাশে বাতাসে জিজ্ঞাসা উদ্দাম—
গুণ্ডার দলে আজও লেখাওনি নাম!

রশিদ আলি দিবসের বিদ্রোহী কোলকাতা শান্ত হতে না হতে মুম্বাই ও করাচীতে শুরু হোল ভারতীয় নৌ-সেনাদের বিদ্রোহ। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-নেতাদের বিরোধিতার জন্য শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী নৌ-সেনারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। মূলত কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের প্রভাবিত শ্রমিকশ্রেণী এবং ছাত্র-ফেডারেশনের কর্মীরা সেদিন বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। মুম্বাই-এর এ.আই.এস.এফ.-নেত্রী **কমল দোন্দে** সেদিন ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ ক'রে শহীদ হয়েছিলেন। এর পর সেই সংগ্রাম ক্রমশ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার ছাত্র-সমাজ হরতাল, ধর্মঘট ও মিছিলে সামিল

হয়। বস্তুত, 'হিন্দু-মুসলমান এক হও' এবং 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়ো'—এই দু'টি রণধ্বণী দিয়ে ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী মুম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, করাচী, লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা, নাগপুর, পুনা ও ব্যাঙ্গালোরে লক্ষ লক্ষ ছাত্র ও শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে মিছিলে সামিল হয় এবং ধর্মঘট করে। ছাত্র-ফেডারেশনের ডাকে সাড়া দিয়ে ছাত্র-সমাজের একটি বড় অংশ সংগ্রামী শ্রমিকদের সঙ্গে রক্তের রাখী-বন্ধন করেছিল। ওই সময় তরুণ কমিউনিস্ট কবি **সুভাষ মুখোপাধ্যায়** বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকদের ওপর পুলিশী আক্রমণের প্রতিবাদে কবিতা লিখেছিলেন:

রক্তের ধার রক্তে শুধব
কসম ভাই।
ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের
জবাব চাই।

ওই সময়ে বিড়লার কেশোরাম সূতাকলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে ছাত্র-ফেডারেশনের কায়েক শ' ছাত্র-ছাত্রী কয়েকদিন ধরে মিছিল ও অবস্থান ধর্মঘট করেছিল।

১৯৪৬ সালের ২৪শে জুলাই প্রায় ১৫০০০ ছাত্র বন্দী-মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কোলকাতা ও শহরতলীর প্রায় প্রতিটি কলেজ ও স্কুলে বন্দী-মুক্তির দাবীতে ছাত্র-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ছাত্র-আন্দোলনের চাপে বাংলাদেশের সুরাবর্দি-সরকার ৩১শে আগস্টের মধ্যে সমস্ত বিপ্লবী বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হোল। মুক্ত বন্দীদের স্বাগত জানিয়ে রোগশয্যায় শায়িত কিশোর কবি **সুকান্ত** তাঁর কবিতায় লিখলেন:

তোমরা এসেছো বিপ্লবী বীর, অবাক অভ্যুদয়।
যদিও রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে সারা কলকাতাময়।
তবু দ্যাখো আজ রক্তে রক্তে সাড়া—
আমরা এসেছি উদ্দাম ভয়হারা!

বন্দী-মুক্তি আন্দোলনের সময় সারা ভারত জুড়ে চলছিল ডাক ও তার ধর্মঘট। তার সমর্থনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ২৯শে জুলাই যে-সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়, তার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল ছাত্র-ফেডারেশনের কর্মীরা। জি.পি.ও. এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে তাদের ধর্মঘট ভাঙার চক্রান্তকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল ছাত্র-ফেডারেশনের কর্মীরা। এই ধরনের অসংখ্য সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল সেদিনের ছাত্র-সমাজ। আবার, ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কোলকাতার বুকে শুরু হয় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সমর্থক শ্রমিক ইউনিয়নগুলি এবং ছাত্র-ফেডারেশনের কর্মীরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে এসেছিল।

১৯৪৭ সালের ২১শে জানুয়ারী ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আন্দোলন করতে গিয়ে কোলকাতার রাস্তায় প্রাণ দিতে হয়েছিল **ভীররঞ্জন** ও **সুখেন্দুবিকাশ** নামে দু'জন ছাত্রকে। পরের দিন

ময়মনসিংহে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে প্রাণ দিতে হয় কিশোর ছাত্র **অমলেন্দুকে**। শেষ পর্যন্ত ছাত্র-আন্দোলনের ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু-বেশ কয়েক মাসের জন্য দমদম বিমান বন্দরে ফরাসী জঙ্গী বিমানের আসা-যাওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। এইভাবে জয় হয় ছাত্র-আন্দোলনেরই।

১২.৫ উপসংহার

প্রাক্-স্বাধীন ভারতে ছাত্র-ফেডারেশনের নেতৃত্বে ছাত্র-সমাজ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম করেছে, তেমনি বিশ্ব-জোড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতাও স্থাপন করেছে। একটি গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন, ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবনকে নিরাপদ ক'রে তোলা প্রভৃতির দাবীতে সংগ্রামী ছাত্র-সমাজ যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে, তা ঐতিহাসিক হলেও ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সেই সংগ্রামের কথা কার্যত অনুল্লেখ্যই থেকে গেছে। তাই বর্তমানে বিগত দিনের ছাত্র-আন্দোলন নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার প্রয়োজন। কারণ, প্রাক্-স্বাধীন ভারতে ছাত্র-ফেডারেশন নিছক দৈনন্দিন সমস্যা বা যুক্তিহীন আবেগ-সর্বস্ব স্বাধীনতার ফাঁকা আওয়াজের কানাগলিতে নিজেদের নিঃশেষ হয়ে যেতে দেয়নি।

অনুশীলনী-১

■ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র-সমাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

২. বিশ শতকের চল্লিশের দশকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র-সমাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

■ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১. সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ও দাবীসমূহ কী ছিল?

২. স্বাধীনতার চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতের ছাত্র-সমাজের কী ভূমিকা ছিল?

১২.৬ সারসংক্ষেপ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ছাত্র-সমাজ যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও সে সম্পর্কে বিশেষ কোন গবেষণা অদ্যাবধি হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামে, বিশেষত বিশ শতকের চল্লিশের দশকে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন (এ.আই.এস.এফ.)-এর নেতৃত্বে যে-ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯২৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি (এ.বি.এস.এ.) গঠিত হয়। ১৯২৯ সালে মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য ওই সংগঠনটি দ্বিখণ্ডিত হয়। গড়ে

ওঠে বি.টি.এস.এ. নামে অন্য একটি ছাত্র সংগঠন। ১৯৩৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র লীগ গঠিত হয় এবং ১৯৩৬ সালে মূলত বামপন্থীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন (এ.আই.এস.এফ.)। জন্মলগ্ন থেকেই এ.আই.এস.এফ.-এর মধ্যে যে-মতাদর্শগত বিতর্ক ছিল, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার পর তা নতুন খাতে বইতে শুরু করে, বিশেষত ১৯৪১ সালের ২১শে জুন পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর। ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত এ.আই.এস.এফ.-এর দিল্লী-সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়ন নীতি ও নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে যে-আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয়, তাতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। তারা ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। কিন্তু ১৯৪০ সালের শেষ দিকে এ.আই.এস.এফ.-এর নাগপুর সম্মেলনে বামপন্থা ও দক্ষিণপন্থার মধ্যে বিতর্কের পরিণামে সর্বভারতীয় ছাত্র-আন্দোলনে ফাটল ধরে। তা সত্ত্বেও ১৯৪১ সালে এ.আই.এস.এফ.-এর নেতৃত্বে যেসব সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো দেউলির রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন-ধর্মঘটের সমর্থনে ও তাদের মুক্তির দাবীতে কলকাতার ছাত্র-সমাজের সাধারণ ধর্মঘট; কানপুর ও গৌহাটিতে ছাত্রদের ওপর লাঠি চালানোর প্রতিবাদে কলকাতার সাধারণ ধর্মঘট ইত্যাদি।

১৯৪১ সালে হিটলার পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্রগত ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করার শ্লোগান দেয়। এ.আই.এস.এফ.-এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির দেওয়া ওই শ্লোগানকে কেন্দ্র ক'রে বিতর্কের ঝড় ওঠে। ১৯৪১ সালের শেষ দিকে এ.আই.এস.এফ.-এর পাটনা সম্মেলনে ওই শ্লোগান গৃহীত হলে অ-কমিউনিস্ট ছাত্ররা এ.আই.এস.এফ. থেকে বেরিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও চল্লিশের দশকে এস. এফ. আই বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৩ সালের বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্য চালিয়ে সমাজসেবার অনন্যসাধারণ নজির গড়েছিল। ওই সময় প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে অনেক ছাত্র ফেডারেশন-কর্মীকে প্রাণ দিতে হয়। ১৯৪২ সালে গান্ধীর ঐতিহাসিক ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে ১০ই আগস্ট কলকাতার ছাত্র-সমাজ সর্বাত্মক ধর্মঘটে সামিল হয়। বি.পি.এস.এফ.-এর নেতৃত্বে বিশাল ছাত্র-মিছিল সমগ্র কলকাতা পরিভ্রমণ করে। শুধু বাংলায় নয়, এই ছাত্র-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল আসাম, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে। এর পর ১৯৪৪ সালের ২৯শে আগস্ট বন্দী-মুক্তির দাবীতে ও কোচবিহারে নৃশংস দমন-নীতির প্রতিবাদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং ৯ই সেপ্টেম্বর ট্রাম ধর্মঘটের প্রতি তাদের ঐকান্তিক সমর্থন জ্ঞাপন করে। ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীর সেনানী-সহ সব রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু করে। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে ছাত্ররা ধর্মঘট ও সমাবেশে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাদের মনোভাব প্রকাশ করে। ১৯৪৬ সালে ডক-শ্রমিকদের ধর্মঘট, রশিদ আলির মুক্তি প্রভৃতির দাবীতে ছাত্র-সমাজের যে-ঐতিহাসিক সংগ্রাম, তাকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-নেতৃত্ব আদৌ মেনে নিতে পারেননি। ছাত্র-সমাজ হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায় দু'টির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ়করণ, সূতাকল এবং ডাক ও তার কর্মীদের ধর্মঘটের

প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন প্রভৃতি চল্লিশের দশকের ছাত্র-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। সুতরাং বলা যায়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র-সমাজ নিশ্চিতভাবেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

১২.৭ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী-১

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১নং প্রশ্ন — ১২.১-১২.৫ দ্রষ্টব্য।

২নং প্রশ্ন — ১২.৩-১২.৫ দ্রষ্টব্য।

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১নং প্রশ্ন — ১২.২ দ্রষ্টব্য।

২নং প্রশ্ন — ১২.৪ দ্রষ্টব্য।

১২.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

ESSAY-TYPE QUESTIONS

1. Analyse the role of the students in India's freedom struggle during the last decade of the British Rule in India.
2. Analyse the role of the students in India's freedom struggle during the forties of the last century.

SHORT-TYPE QUESTIONS

1. Write a short note on the objectives and charter of demands of the A.I.S.Fs. during the British Rule in India.
2. What was the role of the students in the final phase of the British Rule in India?
3. What was the role of the students in India's freedom struggle since the end of the Second World War?

১২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১. Chandra Bipan, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K.N. Panikkar and Sucheta Mahajan, *India's Struggle for Independence : 1857-1947.*

২. Dutt R. Palm, *India Today.*

৩. চট্টোপাধ্যায় গৌতম, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্রসমাজ*।

৪. চট্টোপাধ্যায় সরল, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*।

৫. চন্দ্র বিপান, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী, কে. এন. পানিকর ও সুচেতা মহাজন, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭-১৯৪৭*।

৬. *সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার* (ভারতের ছাত্র-ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত)।

৭. সেনগুপ্ত অমলেন্দু, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*।

———————

একক - ১৩
(Unit - 13)
ক্রিপ্‌স মিশন ও ওয়াভেল পরিকল্পনা
(The Crips Mission and the Wavell Plan)

একেকের গঠন-বিন্যাস

১৩.০ উদ্দেশ্য

১৩.১ ক্রিপ্‌স মিশন

১৩.১.১ ক্রিপ্‌স মিশনের পটভূমি

১৩.১.২ ক্রিপ্‌স মিশনের প্রস্তাবসমূহ

১৩.১.৩ ক্রিপ্‌স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণ

১৩.১.৪ ক্রিপ্‌স প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত

১৩.১.৫ উপসংহার

১৩.২ সারসংক্ষেপ

১৩.৩ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

১৩.৪ ওয়াভেল পরিকল্পনা

১৩.৪.১ ওয়াভেল পরিকল্পনার পটভূমি

১৩.৪.২ ভারত বিভাজনের প্রশ্নে কংগ্রেসের ভূমিকা

১৩.৪.৩ ওয়াভেল পরিকল্পনার বিষয়বস্তু

১৩.৪.৪ সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতা

১৩.৪.৫ উপসংহার

১৩.৫ সারসংক্ষেপ

১৩.৬ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

১৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

১৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১৩.০ উদ্দেশ্য

ক্রিপ্‌স মিশন এবং ওয়াভেল পরিকল্পনা সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করাই হলো বর্তমান এককের উদ্দেশ্য। ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতি যখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে অক্ষশক্তির অনুকূলে চলে যায়, তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারত-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে **স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে** ভারতে প্রেরণ করেন। ১৯৪২ সালে ওই মিশন ভারতে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সামনে কতকগুলি প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, সর্বদলীয় শিখ সম্মেলন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সেই প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। অবশ্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসেবে সব রাজনৈতিক দল অভিন্ন কারণ প্রদর্শন করেনি। কোন্ রাজনৈতিক দল কী কারণে ক্রিপ্‌স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল, সে সম্পর্কে বর্তমান এককে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ক্রিপ্‌স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরই ১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই ওয়ার্ধাতে অনুষ্ঠিত কার্যকরী সমিতির সভায় কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর পর শুরু হয় 'ভারত ছাড়ো' বা আগষ্ট আন্দোলন।

ক্রিপ্‌স মিশনের ব্যর্থতার পর ব্রিটেন এবং ভারতের স্বার্থ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনেই ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ করা উচিত বলে **গান্ধী** জানিয়ে দেন। কিন্তু **জওহরলাল নেহরু** ভিন্নমত পোষণ করেন। বর্তমান এককে গান্ধী ও নেহেরুর মধ্যে যে-মতবিরোধ, সেটিকে যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি গান্ধীর সঙ্গে জিন্নার দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর গান্ধী ভারত-বিভাগের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার ফলে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন কংগ্রেস-নেতা **ভুলাভাই দেশাই** ও মুসলিম লীগ-নেতা **লিয়াকত আলি**। গান্ধী ও জিন্না উভয়েই এই পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করেছেন— একথা জানার পর তদানীন্তন বড়লাট **ওয়াভেল** সমগ্র পরিকল্পনাটিকে অনুমোদনের জন্য ভারত সচিবের কাছে প্রেরণ করেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কোন্ পরিস্থিতিতে ওয়াভেলকে লণ্ডনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং শীঘ্রই ক্ষমতার হস্তান্তর ও সংবিধান রচনার কাজ শুরু হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন, সে বিষয়ে বর্তমান এককে আলোচনা করা হয়েছে। ওই বছরের ২৫শে জুন বড়লাট সিমলায় একটি রাজনৈতিক বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু সিমলা বৈঠকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে শেষ পর্যন্ত সিমলা বৈঠক তথা ওয়াভেল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৩.১ ক্রিপ্‌স মিশন

১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট তদানীন্তন বড়লাট কংগ্রেসের কাছে এই প্রস্তাব দেয় যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জাতীয় জীবনের প্রধান অংশগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করা হবে এবং ওই সংস্থাই নতুন সংবিধানের কাঠামো রচনা করবে। **'আগষ্ট প্রস্তাব' (১৯৪০)** নামে পরিচিত এই

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শুরু হয় গান্ধীর নেতৃত্বে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ভারত-সমস্যা সমাধানের জন্য স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সকে ভারতে প্রেরণ করে। এই মিশন **ক্রিপ্স মিশন** নামে পরিচিত।

❑ ১৩.১.১ ক্রিপ্স মিশনের পটভূমি

১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে অক্ষয়শক্তির অনুকূলে চলে যায়। ন্যাৎসী জার্মানী একের পর এক পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে ও ফ্রান্স অধিকার ক'রে নেয়। জুন মাসে অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ ক'রে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেন। ডিসেম্বর মাসে জাপান হঠাৎ পার্ল হারবার আক্রমণ ক'রে বসে। জাপান অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, মালয় ও ব্রহ্মদেশ অধিকার ক'রে নেয়। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ও ৮ই মার্চ যথাক্রমে সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের পতন ঘটলে ব্রিটেন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী রাষ্ট্রসচিব (Assistant Secretary of State) তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি **রুজভেল্টকে** একথা জানান যে, জাপানী আক্রমণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ভারতের শক্তি ও সম্পদের একান্ত প্রয়োজন। আর তা পাওয়ার জন্য ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারকে অবশ্যই বোঝাপড়ায় আসতে হবে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী **চিয়াং কাইশেক**-ও রুজভেল্টকে জানান যে, ভারতের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন না ঘটলে ভারতবাসীর পক্ষে জাপানকে স্বাগত জানানো ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না। ওই দিনই মার্কিন সেনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি (Foreign Relations Committee)-র সভায় ভারত-প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। এর পর রুজভেল্ট ইংল্যাণ্ডে অবস্থানরত তাঁর ব্যক্তিগত দূত **হ্যারিম্যানকে** এক তারবার্তায় ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য চার্চিলকে অনুরোধ জানাবার নির্দেশ দেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী চার্চিল-হ্যারিম্যান সাক্ষাৎকারের পর **চার্চিল** এক তারবার্তায় ভারতের সমস্যা 'অত্যন্ত জটিল' এবং 'সমাধানের অতীত' বলে রাষ্ট্রপতিকে জানান। ৭ই মার্চ অর্থাৎ, রেঙ্গুনের পতন ঘটার ৩ দিন পরে রুজভেল্ট চার্চিলকে অপর একটি তারবার্তায় ভারত-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানকে 'যুদ্ধ জয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ' (part and parcel of the successful fight) বলে বর্ণনা করে ওই সমস্যার আশু সমাধানের প্রয়োজনীয়তার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ওই তারবার্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ৮ই মার্চ **চার্চিল** ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, ভারত-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপায় অন্বেষণের জন্য **স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সকে** ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হবে।

❑ ১৩.১.২ ক্রিপ্স মিশনের প্রস্তাবসমূহ

১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ ক্রিপ্স দিল্লীতে এসে পৌঁছান। তীক্ষ্ণধী আইনজীবী ও সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত ক্রিপ্স ভারতবাসীর জন্য ঘোষণাপত্রের যে-খসড়াটি সঙ্গে করে এনেছিলেন, তাতে অভিনব কোনকিছুই ছিল না। তিনি যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

(১) যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পূর্ণ ডোমিনিয়নের মর্যাদাসম্পন্ন একটি নতুন ভারত-ইউনিয়ন গঠন করা হবে ;

(২) ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি গণ-পরিষদ করা হবে এবং এ ব্যাপারে প্রধান প্রধান দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে নির্বাচনের মাধ্যমে সেই পরিষদ গঠিত হবে ;

(৩) ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারত এবং দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হবে ;

(৪) যদি কোন একটি বা একাধিক প্রদেশ নতুন সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হতে না চায়, তাহলে সেই প্রদেশ বা প্রদেশগুলি ওই একই নিয়ম অনুযায়ী গঠিত নিজেদের গণ-পরিষদের মাধ্যমে সংবিধান রচনা করতে পারবে ;

(৫) দেশীয় রাজ্যগুলিও অনুরূপ সুযোগ লাভ করবে ;

(৬) ব্রিটিশ সরকার ও গণ-পরিষদের মধ্যে সন্ধির মাধ্যমে ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তরের কাজ সম্পাদিত হবে ;

(৭) নতুন সংবিধান তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ যুদ্ধনীতির অঙ্গ হিসেবে সৈন্যবাহিনীর ওপর সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় থাকবে এবং ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতীয় সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে ;

(৮) ভারতের যে-কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকতে এবং ব্রিটেনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা চালাতে পারবে এবং

(৯) উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

❑ ১৩.১.৩ ক্রিপ্‌স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণ

কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, সর্বদলীয় শিখ সম্মেলন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ ক্রিপ্‌স-প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করার প্রস্তাব থাকায় হিন্দু মহাসভা ক্রিপ্‌স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ওই প্রস্তাবে মুসলিম লীগের পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী কার্যত মেনে নেওয়া সত্ত্বেও প্রস্তাবে ভারত বিভাগ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোন কথা হয়নি বলে লীগ তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। আবার, প্রস্তাবের মধ্যে তাদের স্বার্থরক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার জন্য অনুন্নত সম্প্রদায়, শিখ সম্প্রদায়, ইঙ্গ-ভারতীয় ও ভারতীয় খ্রীস্টান সম্প্রদায়ও ক্রিপ্‌স প্রস্তাব মেনে নেবে না বলে ঘোষণা করে। ক্রিপ্‌স প্রস্তাব বর্জনের ব্যাপারে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রথমদিকে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দেয়। ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবগুলি গান্ধীকে আদৌ আকর্ষণ করতে পারেনি। যখন রাজাগোপালাচারী, জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবসমূহ নিয়ে ক্রিপ্‌সের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত, সেই সময় **গান্ধী** দিল্লী ছেড়ে চলে যান। তাঁর মতে, ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবগুলি হলো 'একটি পতনশীল ব্যাঙ্কের ওপর দূর-ভবিষ্যতের তারিখ দেওয়া একটি মূল্যহীন চেক' ('a post-

dated cheque on a crashing bank') ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি, গান্ধী ক্রিপ্‌সের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণও করেননি। অপরদিকে, রাজাগোপালাচারী, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্রিপ্‌স প্রস্তাব মেনে নিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যে-অধিকার প্রস্তাবে প্রদান করা হয়েছে, তা তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। বস্তুত, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যদি অবিলম্বে কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত থাকতো, তাহলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন-সহ অন্য সব প্রস্তাবই গান্ধী ছাড়া কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা হয়তো মেনে নিতে পারতেন বলে **ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ** মন্তব্য করেছেন।

কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ক্রিপ্‌সের কিংবা ক্রিপ্‌স, ভাইসরয় ও কমাণ্ডার-ইন-চিফ অথবা রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হ্যারি হপকিনস্, ভারতীয় ও ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা থেকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের মতপার্থক্যের কারণ অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কংগ্রেসের দাবী ছিল বড়লাটের শাসন পরিষদ (Executive Council) তখন থেকেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন-সহ জাতীয় সরকার হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু বড়লাট ও কমাণ্ডার-ইন-চিফ অন্যদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি ক'রে নেওয়ার চরম বিরোধী ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের পেছনে ছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের অকুণ্ঠ সমর্থন। তাই শেষ পর্যন্ত ক্রিপ্‌স ও মার্কিন প্রতিনিধির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে বড়লাট ও কমাণ্ডার-ইন-চিফকে একচুল নড়ানো সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত **প্রধানত চারটি কারণে** কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কারণগুলি হলো :

(ক) ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবাবলীতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে;

(খ) দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে রাজন্যবর্গের হাতে গণ-পরিষদের সদস্য মনোনয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে;

(গ) প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান না করার স্বাধীনতা নিয়ে ক্রিপ্‌স কার্যত ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের পরিবর্তে তাকে খণ্ডবিখণ্ড করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং

(ঘ) প্রতিরক্ষাকে ভারতীয়দের হাতে না রাখার ফলে ভারতবাসীর স্বদেশ রক্ষার অধিকার খর্ব করা হয়েছিল।

❑ ১৩.১.৪ ক্রিপ্‌স প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত

১১ই এপ্রিল ক্রিপ্‌সের ভারত ত্যাগের পর ১৯শে এপ্রিল তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধী লেখেন যে, যথা সময়ে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশরা চলে গেলে তার দ্বারা ব্রিটেন ও ভারত উভয়েরই স্বার্থ রক্ষিত হবে। এর পর সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ২৭শে এপ্রিল থেকে এলাহাবাদে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠক বসে। ১লা মে ক্রিপ্‌স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং কোনও বিদেশী সৈন্যবাহিনী ভারতে প্রবেশ করলে অহিংস অসহযোগের আশ্রয় করার সংকল্প জ্ঞাপন করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধী ওই বৈঠকে যোগদান না করলেও আলোচনার জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব প্রেরণ করেছিলেন। ওই প্রস্তাবের

একটি অংশ ছিল :

> জাপানের বিরোধ ভারতবর্ষের সঙ্গে নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেই সে যুদ্ধরত। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে খুব সম্ভব জাপানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করাই হবে তার প্রথম কাজ। কংগ্রেস মনে করে যে, ব্রিটিশ-শক্তি যদি ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেয়, তাহলে জাপানী বা অন্য কোন অভিযানকারী দ্বারা আক্রান্ত হলেও ভারতবর্ষ নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

ওই খসড়া প্রস্তাবে জাপ-সরকার ও জাপানের জনসাধারণকে আশ্বাস প্রদান করে বলা হয় যে, জাপানের প্রতি ভারতবর্ষ আদৌ শত্রুভাবাপন্ন নয়। কিন্তু আজাদ, নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ গান্ধী-প্রেরিত খসড়া প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করেন। নেহরু বলেছিলেন, ওই খসড়টি গ্রহণ করলে সমগ্র বিশ্ব মনে করবে যে, "পরোক্ষভাবে আমরা অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি"। এর পর তিনি নিজেই একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং আজাদের প্রচেষ্টায় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীতও হয়। কিন্তু মে মাসে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি (AICC)-র সভায় যে-প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়, তা ছিল কার্যত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সম্মুখে উত্থাপিত গান্ধী ও নেহরুর প্রস্তাব দু'টির সমন্বয় সাধন। ওই প্রস্তাবে (১) ভারতের স্বার্থ, (২) ব্রিটেনের নিরাপত্তা এবং (৩) বিশ্বশান্তি ও স্বাধীনতার স্বার্থে ব্রিটেনকে ভারত ত্যাগের জন্য বলা হয়। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, কেবল স্বাধীনতার ভিত্তিতেই ভারত ব্রিটেন-সহ অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। লক্ষণীয় বিষয় হোল — ওই প্রস্তাবে জাপানী আক্রমণ কিংবা তার প্রতিরোধের বিষয়ে কোন কথা বলা হয়নি। শুধু একথাই বলা হয়েছিল যে, ভারত আক্রান্ত হলে কেবল অহিংস অসহযোগিতার মাধ্যমে তার মোকাবিলা করা হবে। এইভাবে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধী কংগ্রেসের যে-নেতৃপদ হারিয়েছিলেন, ১৯৪২ সালের মে মাসে তিনি তা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। তিনি তাঁর অভিমত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মে-জুন মাসে **'হরিজন'** পত্রিকায় একের পর এক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। ৩রা মে ও ১০ই মে তারিখে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে, ভারতে ব্রিটেনের উপস্থিতিই জাপানকে ভারত আক্রমণে প্ররোচিত করেছে। তাই ব্রিটেন ভারত ত্যাগ করলে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা বিদূরিত হবে ("The presence of the British in India is an invitation to Japan to invade India. Their withdrawl removes the bait.")। আর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, কংগ্রেস অথবা হিন্দুদের হাতে ভারতকে অর্পণ করার জন্য তিনি ব্রিটিশকে বলবেন না। তারা ভারতকে ঈশ্বরের হাতে কিংবা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেও ফেলে দিয়ে চলে গেলে তাঁর আপত্তি থাকবে না। কারণ, তখন সব দল কুকুরের মতো নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা একটি যুক্তিসঙ্গত বোঝাপড়ায় উপনীত হতে পারবে। তাঁর ভাষায় :

> I have not asked the British to hand over India to the Congress or to the Hindus. Let them entrust India to God or in modern parlance to anarchy. Then all the parties will fight one another like dogs, or will, when real responsibility faces them, come to reasonable agreement. I shall expect non-violence to arise out of that chaos.

এইভাবে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে গান্ধীর পরিবর্তিত যে-মনোভাব পরিলক্ষিত হয়, তা কিন্তু নেহরু, আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সমর্থিত হয়নি। তাঁরা মনে করতেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন অক্ষশক্তির অগ্রগতি অব্যাহতভাবে চলছে, যখন জাপান ভারতের অভ্যন্তরে বোমা বর্ষণ করতে শুরু করেছে, তখন গান্ধীর দাবী জাপানকে ভারত-অধিকারে অধিকতর উৎসাহিত করবে। আর জাপান ভারতবর্ষ অধিকার করে নিলে জনসাধারণ তাদের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। তাছাড়া, ফ্যাসিবাদীদের হাতে মিত্রশক্তির পরাজয় ঘটতে পারে — একথা ভেবে নেহরু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সর্বোপরি, ওই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন শুরু করার অর্থ সংগ্রামী রাশিয়া ও চীন-সহ সমগ্র মিত্রশক্তির পক্ষ ত্যাগ করা। এইসব কারণে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ গান্ধীর আন্দোলনমুখী মনোভাবের সঙ্গে একমত হতে পারছিলেন না। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে** মন্তব্য করেছেন, ''দীর্ঘদিন এ নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনা, অনেক তিক্ততারও সৃষ্টি হয়। গান্ধীজী কিন্তু অনমনীয়ই থাকেন। শুধু তাই নয়, নিজের মতকে গ্রাহ্য করে তোলার ব্যাপারে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা দেখান। তিনি অবশ্য মেনে নিলেন যে, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ভারতে যেতে পারে। তবে তা একমাত্র শর্তে : অবিলম্বে ভারতের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। কংগ্রেস যদি এই মতটুকু মেনে না নেয়, তাহলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করবেন এবং ভারতের মাটি থেকেই কংগ্রেসের চেয়ে বৃহত্তর এক আন্দোলন গড়ে তুলবেন'' বলে ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধীর কাছে নেহরু, আজাদ, প্যাটেল-সহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

❑ ১৩.১.৫ উপসংহার

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, ক্রিপ্‌স, রুজভেল্ট প্রমুখের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও নানা কারণে ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়নি। ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবসমূহকে কেন্দ্র করে চরম মতবিরোধ দেখা দেওয়ার ফলে ক্রিপ্‌স মিশন ব্যর্থ হয়েছিল। ক্রিপ্‌স মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই ওয়ার্ধাতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভায় 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গান্ধীর নেতৃত্বে সর্বশেষ গণ-আন্দোলন অর্থাৎ, 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন বা আগস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

অনুশীলনী - ১

■ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। ক্রিপ্‌স মিশনের ওপর একটি বিশ্লেষণমূলক টীকা লেখ।

২। ক্রিপ্‌স মিশনের পটভূমি আলোচনা কর। ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবগুলি কী ছিল ? বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কেন ওইসব প্রস্তাব গ্রহণ করেনি ?

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। ক্রিপ্‌স মিশনের প্রস্তাবগুলি কী ছিল ?

২। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্রিপ্‌স মিশনের প্রস্তাবগুলি কেন গ্রহণ করেনি ?

৩। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবগুলি কী কী কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিল ?

১৩.২ সারসংক্ষেপ

১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতি কার্যত অক্ষশক্তির অনুকূলে এবং মিত্রশক্তির প্রতিকূলে চলে গেলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং চীনের রাষ্ট্রপ্রধান চিয়াং কাইশেক চার্চিলকে ভারত-সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবে চাপ দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই চার্চিল ভারত-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপায় অন্বেষণের জন্য ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ **স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে** ভারতে প্রেরণ করেন। ক্রিপ্‌স কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, সর্বদলীয় শিখ সম্মেলন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ ক্রিপ্‌সের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হননি। অবশ্য ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবসমূহ মেনে নেওয়ার ব্যাপারে প্রথমদিকে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা গান্ধীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। কংগ্রেস প্রধানত ৪টি কারণে ক্রিপ্‌সের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। এগুলি হলো :

(ক) ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবাবলীতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে;

(খ) দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে রাজন্যবর্গের হাতে গণ-পরিষদের সদস্য মনোনয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে;

(গ) প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান না করার স্বাধীনতা দিয়ে ক্রিপ্‌স কার্যত ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের পরিবর্তে তাকে খণ্ডবিখণ্ড করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং

(ঘ) প্রতিরক্ষাকে ভারতীয়দের হাতে না রাখার ফলে ভারতবাসীর স্বদেশ রক্ষার অধিকার খর্ব করা হয়েছিল।

তবে একথা ঠিক যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, বিশেষত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং কম্যাণ্ডার-ইন্-চিফ যদি ভারতবর্ষের প্রতি একটু নরম মনোভাব প্রদর্শন করতেন, তাহলে হয়তো গান্ধীর বিপক্ষে গিয়েই কংগ্রেসের অন্য শীর্ষস্থানীয় নেতারা ক্রিপ্‌স প্রস্তাবকে মেনে নিতেন। যাই হোক্, ক্রিপ্‌স মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৪২ সালে তৃতীয় তথা শেষ গণ-আন্দোলন (ভারত-ছাড়ো আন্দোলন বা আগস্ট আন্দোলন) শুরু হয়েছিল।

১৩.৩ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন — ১৩.১.১-১৩.১.৫ দ্রষ্টব্য

২ নং প্রশ্ন — ১৩.১.১-১৩.১.৩ ও ১৩.১.৫ দ্রষ্টব্য

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন — ১৩.১.২ দ্রষ্টব্য

২ নং প্রশ্ন — ১৩.১.৩ দ্রষ্টব্য

৩ নং প্রশ্ন — ১৩.১.৩ দ্রষ্টব্য

১৩.৪ ওয়াভেল পরিকল্পনা (১৯৪৫)

❑ ১৩.৪.১ ওয়াভেল পরিকল্পনার পটভূমি

ক্রিপ্‌স মিশনের ব্যর্থতার পর ১৯৪২ সালের ১৯শে এপ্রিল **গান্ধী** তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় লেখেন, ব্রিটেন এবং ভারতের স্বার্থ ও নিরাপত্তা ব্রিটিশদের ভারত-ত্যাগের ওপরেই একমাত্র করছে। সমকালীন পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতার আর কোন প্রশ্ন ওঠে না বলেও তিনি ঘোষণা করেন। কিন্তু **জওহরলাল** ভিন্ন মত পোষণ করলেন। ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের যে-সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তাকে জয়যুক্ত করার জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শেষ পর্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (এ. আই. সি. সি.) গান্ধীর প্রস্তাবকেই গ্রহণ করে। কিন্তু গান্ধী নেতৃত্বের এক অদ্ভুত চরিত্র ওই সময় প্রকাশিত হয়। আগস্ট আন্দোলন শুরু করার কয়েকদিন পূর্বে ১৯৪২ সালের ২রা আগস্ট তিনি এক বিবৃতিতে একথা ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সরকার, মুসলিম লীগ বা অন্য কোন দলের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইলে তিনি কোনরকম আপত্তি করবেন না। তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। এই ঘোষণা ভারতীয় হিন্দুদের আবেগানুভূতিতে গভীরভাবে আঘাত হানে। কারণ, এর মাধ্যমে **গান্ধী** পরোক্ষভাবে মুসলিম লীগের **পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীকে স্বীকার** করে নিয়েছিলেন।

❑ ১৩.৪.২ ভারত বিভাজনের প্রশ্নে কংগ্রেসের ভূমিকা

এরপর রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের একটি অংশ মুসলিম লীগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভারত-বিভাজনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে "গান্ধীর অনশনের সময়ই রাজাগোপালাচারী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং পাকিস্তান মেনে

নেওয়ার ভিত্তিতে জিন্নার সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি অনুমতি চেয়েছিলেন। এতে গান্ধী কোন আপত্তি করেননি, এবং তার পর থেকে রাজাগোপালাচারী নিয়মিত জিন্নার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন।" এর পর ১৯৪৪ সালের ২৭শে জুলাই বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে এক পত্রে **গান্ধী** জানান যে, যুদ্ধাবসানের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করবে — এরূপ প্রতিশ্রুতি পেলে কংগ্রেস ঐকান্তিকভাবে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী আছে। কিন্তু ২৮শে জুলাই **ভারত সচিব** ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একথা ঘোষণা করেন যে, গান্ধীর প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে কোন আলোচনার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। ওই ঘোষণা গান্ধীকে হতাশ করে। এর পর তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে একটি সমঝোতায় উপনীত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের ওপর যৌথভাবে চাপ সৃষ্টি করার নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতির ফলশ্রুতি হলো গান্ধী-জিন্নার সুদীর্ঘ বৈঠক। ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওই বৈঠক চলে। বৈঠকে গান্ধী ভারত বিভাগ মেনে নেন। এর ফলে জিন্নার পায়ের তলার মাটি শক্ত হয়েছিল বলে ভি. পি. মেনন মন্তব্য করেছেন।

❑ ১৩.৪.৩ ওয়াভেল পরিকল্পনার বিষয়বস্তু

গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে গান্ধী ভারত বিভাজনের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পর কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের সম্পর্কগত ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ইতোমধ্যে কংগ্রেস-নেতা **ভুলাভাই দেশাই** ও মুসলিম লীগ-নেতা **লিয়াকত আলি** পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পরিকল্পনা করেন। গান্ধী এবং জিন্না উভয়েই এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছেন— **ভুলাভাই দেশাই**-এর মারফত একথা জানার পর **বড়লাট ওয়াভেল** সমগ্র পরিকল্পনাটিকে অনুমোদনের জন্য ভারত সচিবের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে ঘটনা বিপরীত মুখে চলতে শুরু করে। জিন্না ঘোষণা করেন যে, দেশাই-লিয়াকত পরিকল্পনা তাঁর অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, পরিকল্পনাটির পেছনে তাঁর আশীর্বাদ ছিল — গান্ধী একথা ঘোষণা করার পরেও কংগ্রেস সমগ্র পরিকল্পনাটিকে প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের অভ্যন্তরে যখন এরূপ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে, তখন ব্রিটেনেও ভারত-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না-করার জন্য চার্চিলের নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল দলকে শ্রমিক দলের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ভারত-সমস্যার অন্তত সাময়িক সমাধান করে বিরোধী পক্ষের সমালোচনার পথ বন্ধ করতে এবং ব্রিটিশ জনমতকে নিজ দলের অনুকূলে আনার উদ্দেশ্যে চার্চিল বড়লাট ওয়াভেলকে লণ্ডনে ডেকে পাঠান। ২৩শে মার্চ **ওয়াভেল** লণ্ডন যাত্রা করেন এবং সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ১৪ই জুন একটি বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে, শীঘ্রই ক্ষমতার হস্তান্তর এবং সংবিধান রচনার কাজ শুরু করা হবে। তিনি একথাও জানান যে, গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদে গভর্নর জেনারেল এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ছাড়া অন্য সব সদস্যই হবেন ভারতীয়। এই কাজ সম্পন্ন করার পর প্রদেশগুলিতে পুনরায় দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে। সব বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার জন্য তিনি ২৫শে জুন সিমলায় একটি রাজনৈতিক বৈঠক আহ্বান করেন। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ যাতে এই বৈঠকে যোগদান করতে পারেন, সেজন্য ১৫ই জুন তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়।

❑ ১৩.৪.৪ সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতা

সিমলা বৈঠকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয়। গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় দুটির প্রত্যেকে ৫ জন করে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবে বলে ঘোষণার পর **জিন্না** দাবী করেন যে, পরিষদের ৫ জন মুসলমান প্রতিনিধি কেবল মুসলিম লীগ কর্তৃক মনোনীত হবে ; কংগ্রেস কেবল বর্ণ-হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান হওয়ায় তা কোনও মুসলমান প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবে না। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে জিন্নার এই অন্যায় আবদার মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, ওই সময় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। কংগ্রেস দাবী জানায় যে, হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত ৫টি আসনের মধ্যে ১টিতে একজন মুসলমান প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষমতা কংগ্রেসকে দিতে হবে। কিন্তু জিন্না এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাছাড়া, গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুসলমান সদস্যদের বক্তব্য যাতে বজায় থাকে, সেজন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করার জন্যও **জিন্না** দাবী তোলেন। এইভাবে জিন্নার অন্যায় আবদার ও দাবীর জন্য সিমলা তথা ওয়াভেল পরিকল্পনা কার্যত ব্যর্থ হয়ে যায়।

❑ ১৩.৪.৫ উপসংহার

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ওয়াভেল পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পেছনে জিন্না তথা মুসলিম লীগের অযৌক্তিক দাবী যেমন দায়ী ছিল, তেমনি সমগ্র পরিকল্পনার পেছনে গান্ধীর আশীর্বাদ ছিল — একথা স্বয়ং গান্ধী ঘোষণা করার পরেও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ সেটিকে প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধাবোধ করেননি। আবার, তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল নির্বাচকমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করার জন্য ওয়াভেল পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেও তা যে জনমনে আদৌ রেখাপাত করেনি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রিটেনে ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের হাতে রক্ষণশীল দলের শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যে। এর পর ক্ষমতাসীন শ্রমিক দল ভারত-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ওই বছরেই ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করেছিল।

অনুশীলনী - ১

■ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। ওয়াভেল পরিকল্পনার (১৯৪৫) ওপর একটি বিশ্লেষণমূলক টীকা লেখ।

২। ওয়াভেল পরিকল্পনার পটভূমি আলোচনা কর। ওই পরিকল্পনার বিষয়বস্তু কী ছিল ? ওয়াভেল পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণ কী ?

■ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। ওয়াভেল পরিকল্পনার বিষয়বস্তু কী ছিল ?

২। ওয়াভেল পরিকল্পনা বা সিমলা বৈঠক কেন ব্যর্থ হয়েছিল ?

১৩.৫ সারসংক্ষেপ

ক্রিপ্‌স মিশনের ব্যর্থতার পর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের, বিশেষত গান্ধীর সঙ্গে নেহরুর মতবিরোধ দেখা দেয়। আগস্ট আন্দোলন শুরু করার কয়েকদিন পূর্বে প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে গান্ধী কার্যত মুসলিম লীগের পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী স্বীকার করে নেন। ফলে গান্ধীর অনুমতিক্রমে রাজাগোপালাচারী জিন্নার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। গান্ধী মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতা করে ব্রিটিশ সরকারের ওপর যৌথভাবে চাপ সৃষ্টি করার নীতি গ্রহণ করলে উভয় নেতার মধ্যে সুদীর্ঘ বৈঠক চলে। ওই সময় কংগ্রেস-নেতা ভুলাভাই দেশাই ও মুসলিম লীগ-নেতা লিয়াকত আলির মধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সংবাদ পাওয়ার পর ওয়াভেল লণ্ডন যাত্রা করেন এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর ১৪ই জুন তিনি ঘোষণা করেন যে, ক্ষমতার হস্তান্তর ও সংবিধান রচনার কাজ অনতিবিলম্বেই শুরু করা হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি সিমলা বৈঠকের আয়োজন করেন এবং তাতে যোগদানের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানান। কিন্তু সিমলা বৈঠকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেওয়ার ফলে সেই বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বস্তুত, জিন্নার অন্যায় দাবীর জন্যই সিমলা বৈঠক তথা ওয়াভেল পরিকল্পনা সফল হতে পারেনি।

১৩.৬ ঃ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

■ **রচনাত্মক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন — ১৩.৪.১-১৩.৪.৫ দ্রষ্টব্য

২ নং প্রশ্ন — ১৩.৪.১-১৩.৪.৫ দ্রষ্টব্য

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন — ১৩.৪.৩ দ্রষ্টব্য

২ নং প্রশ্ন — ১৩.৪.৪ দ্রষ্টব্য

১৩.৭ ঃ নমুনা প্রশ্নাবলী

ESSAY-TYPE QUESTIONS

1. Write a critical note on the Cripps Mission.
2. What was the background of the Cripps Mission (1942) ? What were

the proposals of the Mission ? What were the reasons for the failure of the Mission ?

3. Write a critical note on the Wavell Plan.

SHORT-TYPE QUESTIONS

1. What were the proposals of the Cripps Mission ?
2. What were the reasons for the failure of the Cripps Mission ?
3. Why did the Congress reject the Cripps' Proposals ?
4. What was the content of the Wavell Plan of 1945 ?
5. What were the reasons for the failure of Wavell Plan ?

১৩.৮ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

Aggarwal, R. N., *National Movement and Constitutional Development in India.*

Banerjee, A. C. (ed), *Indian Constitutional Documents.*

Banerjee, A. C. and Dakshina Ranjan Bose, *Cabinet Mission in India.*

Bose, Subhas Chandra, *The Indian Struggle, 1920-1934.*

Chandra, Bipan, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K. N. Panikkar and Sucheta Mahajan, *India's Struggle for Independence : 1857-1947.*

Coupland, Regiland, *The Constitutional Problem in India.*

Dutt, R. Palm, *India Today.*

Mehrotra, S. R., *Towards India's Freedom and Partition.*

Menon, V. P., *The Transfer of Power.*

Namboodiripad, E. M. S., *A History of Indian Freedom Struggle.*

Prasad, Rajendra, *India Divided.*

Pylee, M. V., *Constitutional History of India, 1600-1950*.

Sen, Dhirendranath, *From Raj To Swaraj.*

The Indian Annual Register, 1946, vol. I.

চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*।

চন্দ্র, বিপান, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী, কে. এন. পানিক্কর ও সুচেতা মহাজন, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭-১৯৪৭*।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস*।

একক - ১৪

(Unit - 14)

ক্যাবিনেট মিশন, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭

(The Cabinet Mission, Mountbatten Plan and the Indian Independence Act, 1947)

এককের গঠন-বিন্যাস

১৪.০ উদ্দেশ্য

১৪.১ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা

১৪.১.১ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার পটভূমি

১৪.১.২ কংগ্রেস ও লীগ এবং ক্যাবিনেট মিশন

১৪.১.৩ ভারত বিভাজনের বিরুদ্ধে ক্যাবিনেট মিশনের রায়

১৪.১.৪ ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশসমূহ

১৪.১.৫ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ

১৪.১.৬ ত্রুটি বিচ্যুতি

১৪.১.৭ উপসংহার

১৪.২ সারসংক্ষেপ

১৪.৩ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

১৪.৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও গণপরিষদ : কংগ্রেস-লীগ বিরোধ

১৪.৫ মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা

১৪.৬ ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

১৪.৭ সারসংক্ষেপ

১৪.৮ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

১৪.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

১৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১৪.০ উদ্দেশ্য

কোন্ পটভূমিতে শ্রমিক দল ১৯৪৫ সালে ভারতবর্ষে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করেছিল এবং ওই মিশনের সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-নেতৃবৃন্দ পরস্পর-বিরোধী যেসব দাবী উত্থাপন করেছিলেন, পাঠকদের সঙ্গে তার পরিচিতি ঘটানোই হলো বর্তমান এককের উদ্দেশ্য। তাছাড়া, মুসলিম লীগের পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবী সম্পর্কে মিশনের দৃষ্টিভঙ্গী কী ছিল এবং ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার তিনটি প্রধান অংশ যথা — (১) ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ, (২) গণপরিষদ-সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ এবং (৩) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার-সংক্রান্ত ঘোষণার মূল বিষয়গুলিকে বিস্তারিতভাবে বর্তমান এককে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও গণপরিষদ গঠনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিরোধ এবং তার ফলে গণপরিষদে যোগদানের প্রশ্নে অচলাবস্থার সৃষ্টি সম্পর্কেও বর্তমান এককে আলোকপাত করা হয়েছে। মাউন্টব্যাটেন ওয়াভেলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর তাঁর প্রচেষ্টায় প্যাটেল, নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভারত-বিভাজনে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এর পর ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন এক ঘোষণায় মাউন্টব্যাটেন দেশ বিভাগের পরিকল্পনা পেশ করেন। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য ১৯৪৭ সালে প্রণীত হয় ভারতীয় স্বাধীনতা আইন। বর্তমান এককে এই আইনের প্রধান প্রধান বিষয় সম্পর্কে পাঠকদের যেমন অবহিত করা হয়েছে, তেমনি কেন কংগ্রেস দেশ-বিভাগ মেনে নিয়েছিল, সে সম্পর্কেও বর্তমান এককে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৪.১ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা

❑ ১৪.১.১ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার পটভূমি

চার্চিলের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় অতুলনীয় নেতৃত্ব প্রদান সত্ত্বেও ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের হাতে রক্ষণশীল দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ব্রিটেনে শ্রমিক দলের সরকার গঠিত হলে 'ভারত-বন্ধু' বলে পরিচিত **ক্লেমেন্ট এটলী** এবং **স্যার পেথিক লরেন্স** যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সচিব পদে নিযুক্ত হন। শ্রমিক দলের নেতৃত্বাধীন সরকার তাদের প্রাক্-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু কীভাবে এই ক্ষমতার হস্তান্তর করা হবে, সেটাই ছিল চিন্তার বিষয়। এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য লর্ড ওয়াভেলকে লণ্ডনে ডেকে পাঠানো হয় এবং ২৪শে আগস্ট তিনি লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন। সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর ১৯ তারিখে তিনি ঘোষণা করেন যে, প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সাধারণ নির্বাচনের পর সরকার একটি গণপরিষদ আহ্বান এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। প্রধানমন্ত্রী **এটলীও** প্রায় একই সঙ্গে এক ঘোষণায় একথা জানান যে, ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ব্যাপারে ভারতবাসীরা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেন এবং প্রস্তাবিত সংবিধান যেন মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়। এর পরেই ভারতবর্ষে নির্বাচনের রণদামামা বেজে ওঠে। ১৯৪৬ সালের

প্রথমদিকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ওই নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে কংগ্রেস ৫৬টি আসন এবং মুসলিম লীগ ৩০টি আসন অধিকার করে। সাধারণ আসনগুলির নির্বাচনে শতকরা প্রায় ৯১ ভাগ ভোটদাতা কংগ্রেসের পক্ষে ভোটদান করে এবং মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকাগুলিতে লীগ মুসলমান ভোটদাতাদের শতকরা ৮৬ ভাগের সমর্থন লাভ করে। প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে কংগ্রেস মোট ৯৩০টি আসন এবং মুসলিম লীগ ৫০৭টি মুসলমান আসনের ৪২৭টি অধিকার করে। উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৮টি আসন অধিকার করতে সমর্থ হয়। ওই নির্বাচন থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুসলিম লীগের পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবির প্রতি যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমর্থন জানায়, তেমনি কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর প্রতি ব্যাপক গণসমর্থন ছিল বলে প্রমাণিত হয়।

❑ ১৪.১.২ কংগ্রেস ও লীগ এবং ক্যাবিনেট মিশন

এর পর ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী লর্ড সভায় ভারত সচিব পেথিক লরেন্স এবং কমন্স সভায় প্রধানমন্ত্রী এটলী ভারতের ভবিষৎ সংবিধান তৈরীর ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা জন্য ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিনজন মন্ত্রীকে ভারতবর্ষে প্রেরণের কথা ঘোষণা করেন। এই তিনজন মন্ত্রী হলেন ভারত সচিব **লর্ড পেথিক লরেন্স**, বোর্ড অব্ ট্রেডের সভাপতি **স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স** এবং ফার্স্ট লর্ড অব্ অ্যাডমিরালটি **এ. ভি. আলেকজাণ্ডার**। ২৪শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন দিল্লীতে পৌঁছায়। ৩রা এপ্রিল কংগ্রেসের পক্ষে সভাপতি **আবুল কালাম আজাদ** মিশনের সম্মুখে বক্তব্য রাখেন। স্বাধীনতা প্রদানের পূর্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বশীল সরকার গঠন এবং ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি সংস্থা তৈরীর ওপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এই অভিমত পোষণ করেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভায় প্রদেশগুলির এবং সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা উচিত। ভবিষ্যৎ সংবিধানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আজাদ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গঠনের ওপর জোর দেন। **গান্ধী** ক্যাবিনেট মিশনেরসামনে বক্তব্য রাখ্যত গিয়ে দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেছিলেন, "Pakistan which connotes the division of India will be a sin and the two-nation theory propounded by Mr. Jinnah is absurd." (*দ্য ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার*, ১৯৪৬, খণ্ড ১, পৃ. ৩৮)। কিন্তু **জিন্না** দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রে দাবি জানান। **আম্বেদকর** সংবিধান রচনাকারী সংস্থা গঠনের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, যে-কোন সংবিধান রচনাকারী সংস্থাই গঠিত হোক্ না কেন, তাতে বর্ণহিন্দুদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর ফলে সংখ্যালঘু শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। আবার, শিখ নেতা **গিয়ানি কর্তার সিং** পৃথক সার্বভৌম শিখিস্থানের দাবি তোলেন।

❑ ১৪.১.৩ ভারত বিভাজনের বিরুদ্ধে ক্যাবিনেট মিশনের রায়

১৯৪৬ সালের ১৬ই মে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যরা এবং ভারতের বড়লাট ঘোষণা করেন যে, স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী

সমাধান করা সম্ভব নয়। কারণ, তাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে হিন্দু এবং ভারতবর্ষে মুসলমানরা সংখ্যালঘু শ্রেণী হিসেবে থেকেই যাবে। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৬২.০৭ ভাগ হলো মুসলমান ও বাকীরা অ-মুসলমান। অনুরূপভাবে, বাংলা ও আসামের জনসংখ্যার শতকরা ৫৮.৬৯ ভাগ মুসলমান হলেও ৪১.৩১ ভাগ হলো অ-মুসলমান। তাছাড়া, পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের হিন্দুপ্রধান জেলাগুলি এবং শিখপ্রধান অঞ্চলগুলিকে স্বাভাবিক কারণেই প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় না। সর্বোপরি, পাঞ্জাব ও বাংলার নিজস্ব অখণ্ড সংস্কৃতি বর্তমান। ওইসব প্রদেশে ভাষা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অভিন্নতা ধর্মীয় ভিন্নতা অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী। সুতরাং, ঐ প্রদেশগুলির বিভক্তিকরণকে ক্যাবিনেট মিশন অবাস্তব চিন্তা বলে মনে করে। তাই মিশন এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, প্রদেশগুলিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হলে এবং তাদের পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা হলে সব সম্প্রদায়ের লোকই নিজ নিজ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুষ্ঠুভাবে ভোগ করতে পারবে।

❑ ১৪.১.৪ ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশসমূহ

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার **তিনটি প্রধান অংশ** ছিল, যথা — (১) ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ, (২) সংবিধান পরিষদ-সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ এবং (৩) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পর্কিত ঘোষণা।

(১) ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ : ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কিত সুপারিশসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

(ক) ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি ভারত ইউনিয়ন (a Union of India) গঠন করা হবে। ওই ইউনিয়নের হাতে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ (communications) সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় অর্পিত হবে। তাছাড়া, এই তিনটি বিষয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাও ইউনিয়নকে প্রদান করা হবে।

(খ) ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারত ইউনিয়নের একটি শাসন বিভাগ ও একটি আইনসভা গঠিত হবে। যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আইনসভার দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটির উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সামগ্রিকভাবে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন হবে।

(গ) ইউনিয়নের হাতে প্রদত্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য সব বিষয় প্রদেশগুলির হাতে প্রদান করা হবে।

(ঘ) প্রদেশগুলির অনুরূপ ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যগুলিও ভোগ করতে পারবে।

(ঙ) প্রদেশগুলি নিজেদের সংবিধান নিজেরাই তৈরী করতে পারবে। তবে তারা ইচ্ছা করলে সমস্বার্থবিশিষ্ট একাধিক প্রদেশ নিয়ে 'গোষ্ঠী' বা 'জোট' (Groups) গঠন

করতে পারবে। জোটবদ্ধ প্রদেশগুলি নিজেদের জন্য এমন একটি সংবিধান রচনা করবে, যা জোটভুক্ত সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কোন্ প্রদেশ কার সঙ্গে জোট বাঁধতে পারবে তার ইঙ্গিতও ক্যাবিনেট মিশন প্রদান করেছিল। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, প্রদেশগুলিকে 'ক','খ' এবং 'গ' — এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হবে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যাকে নিয়ে 'ক' শ্রেণীর জোট ; পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুকে নিয়ে 'খ' শ্রেণীর জোট এবং বাংলা ও আসামকে নিয়ে 'গ' শ্রেণীর জোট গঠন করা যেতে পারে।

(চ) ইউনিয়ন এবং জোটগুলির সংবিধানে এই ব্যবস্থা থাকবে যে, প্রাথমিকভাবে ১০ বছর পর এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১০ বছর অন্তর যে-কোন প্রদেশ তার বিধানসভা (Legislative Assembly) সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংবিধানের শর্তগুলি (the terms of the constitution) পুনর্বিবেচনা করতে পারবে।

(২) গণপরিষদ-সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ :

(ক) সংবিধান রচনার জন্য একটি সংবিধান পরিষদ বা গণপরিষদ (A Constituent Assembly) গঠিত হবে। গণপরিষদের মোট ৩৮৫ জন সদস্যের মধ্যে ২৯২ জন আসবেন বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে এবং বাকী ৯৩ জন হবেন দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি থেকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতিনিধি গ্রহণের কথাও প্রস্তাবে বলা হয়।

(খ) প্রদেশগুলিকে প্রধানত হিন্দু-প্রধান এবং মুসলমান-প্রধান— এই দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। 'ক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলি (মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা) থেকে মোট ১৮৭ জন প্রতিনিধি গণপরিষদে আসবেন। এর মধ্যে ২০ জন আসবেন মুসলমান। আবার, মুসলমান-প্রধান 'খ' শ্রেণীর প্রদেশগুলি (পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু) থেকে গণপরিষদে যে ৩৫ জন সদস্যকে গ্রহণ করা হবে, তার মধ্যে ২২ জন মুসলমান, ৪ জন শিখ এবং বাকীরা অ-মুসলমান হবেন। 'গ' শ্রেণীর অন্তর্গত বাংলা ও আসাম থেকে যে ৭০ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে গ্রহণ করা হবে, তার মধ্যে ৩৬ জন হবেন মুসলমান এবং ৩৪ জন হবেন অ-মুসলমান।

(গ) এইভাবে গণপরিষদ গঠিত হওয়ার পর পরিষদের একজন সভাপতি (Chairman) এবং অপরাপর পদাধিকারীদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) অনুন্নত অঞ্চল ও জাতিসমূহের জন্য একটি উপদেষ্টা পর্ষদ (Advisory Board) গঠন করা হবে।

(ঙ) প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশের জন্য সংবিধান রচনা করবেন।

(৩) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার : উপরি-উক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও ক্যাবিনেট মিশন যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সহায়তায় যত শীঘ্র সম্ভব একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সুপারিশ করে।

❑ ১৪.১.৫ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ

প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রকৃতি, ক্ষমতার পরিধি ইত্যাদি কেমন হবে, তা জানতে চেয়ে ১৯৪৬ সালের ২৫শে মে লর্ড ওয়াভেলের কাছে আজাদ একটি পত্র লেখেন। এই পত্রের উত্তরে ৩০শে মে **ওয়াভেল** জানান যে, প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যকলাপে সর্বাধিক পরিমাণ স্বাধীনতা থাকবে। ৬ই জুন মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করে এবং প্রস্তাবিত সরকার গঠনের ব্যাপারে বড়লাটের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার দায়িত্ব জিন্নার ওপর অর্পণ করে। শাসন পরিষদের ১২ জন সদস্যের মধ্যে মুসলিম লীগের ৫ জন, কংগ্রেসের ৫ জন, শিখদের ১ জন, ১ জন ভারতীয় খ্রীস্টান অথবা ইঙ্গ-ভারতীয়দের প্রতিনিধি গ্রহণের যে-প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, তা কার্যকর করা হবে কিনা তা জানতে চেয়ে ৮ই জুন **জিন্না** বড়লাটকে একটি পত্র দেন। এই পত্রের উত্তরে **ওয়াভেল** জানান যে, তিনি এরকম কোন প্রতিশ্রুতি কাউকে দেননি। তিনি অবশ্য জিন্নার এই বক্তব্য নেহরুর কাছে পৌঁছে দেন। কিন্তু কংগ্রেস জিন্নার এই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। এর পর ওয়াভেল কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা আর একজন বাড়িয়ে দেন এবং ওই সদস্যকে তফসিলীদের মধ্য থেকে নিতে হবে বলে জানান। কংগ্রেস ওই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রশ্নে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৬ই জুন ওয়াভেল একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন যে, মোট ১৪ জনের মধ্যে একজন তফসিলী সদস্য-সহ কংগ্রেসের ৬ জন, লীগের ৫ জন, শিখ, খ্রীস্টান ও পার্শীদের প্রত্যেকে ১ জন করে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় যে, কোন পক্ষ প্রস্তাবিত সরকারে যোগদান করতে অস্বীকার করলে তাকে বাদ দিয়েই সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চালানো হবে। ২২শে জুন **বড়লাট** আজাদকে এক পত্রে জানান যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কংগ্রেস কোন মুসলমান সদস্যকে মনোনীত করতে পারবে না। এর ফলে ২৫শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদে কংগ্রেসের যোগদানের ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর পর ক্যাবিনেট মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জানান যে, তাঁদের ১৬ই জুন তারিখের আবেদন কংগ্রেস না মানলেও ১৬ই মে প্রচারিত ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যে-গণপরিষদ গঠিত হবে, তাতে কংগ্রেস যোগদান করতে সম্মত আছে। যেহেতু মুসলিম লীগও ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, সেহেতু সেই মুহূর্তে একটি **কংগ্রেস-লীগ সম্মিলিত সরকার গঠনের সম্ভাবনাকে** একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর পর ২৯শে জুন ক্যাবিনেট মিশন স্বদেশের পথে পাড়ি দেয়।

❑ ১৪.১.৬ ক্যাবিনেট মিশনের ত্রুটি বিচ্যুতি

১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে 'ভারতীয় স্বাধীনতা প্রদানের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা' (A plan for Indian freedom) বলে বিশ্বের সম্মুখে ইংল্যাণ্ড প্রচার করে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে দেখলে এটিকে ১৯৪২ সালের ক্রিপ্‌স মিশন পরিকল্পনারই পুনরাবৃত্তি বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই পরিকল্পনার মধ্যে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেগুলি হলো :

সংবিধানের অগণতান্ত্রিক প্রকৃতি : ক্যাবিনেট মিশন-পরিকল্পিত ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রকৃতিগতভাবে অগণতান্ত্রিক ছিল। কারণ, যে-গণপরিষদের হাতে এই সংবিধান রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তা সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়নি। ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১১ ভাগ কর্তৃক নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভাগুলির প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে গণপরিষদের সদস্যদের গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, গণপরিষদে মোট সদস্যের মধ্যে ৯৩ জন প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি হওয়ায় পরিষদের গণতান্ত্রিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার অবকাশ থেকেই যায়।

সামন্ততন্ত্রের পরিপোষণের ব্যবস্থা : ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। বরং, ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে তাদের ওপর ব্রিটিশ সর্বময় কর্তৃত্ব (British Paramountcy)-এর অবসান ঘটানোর কথা ঘোষণা করা হয়। এইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থে আঘাত হানতে দ্বিধাবোধ করে।

জটিল ও অবাস্তব বিভাজন নীতির অনুসরণ : ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় ভারতকে চারটি অঞ্চল (zone)-এ বিভক্ত করার কথা বলা হয়, যথা— দুটি প্রধান মুসলমান-প্রধান অঞ্চল, একটি হিন্দু-প্রধান অঞ্চল এবং দেশীয় রাজ্যসমূহকে নিয়ে গঠিত একটি অঞ্চল। কিন্তু এরূপ বিভাজনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহের জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয়নি। তাই **রজনী পাম দত্ত** মন্তব্য করেছেন, এই বিভাজনের সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির কোন সম্পর্ক নেই। ওই বিভাজন ব্যবস্থাকে তিনি **'অসম্ভব রকমের জটিল'** (extremely cumbrous) এবং **'সম্ভবত বাস্তবে অকার্যকর'** (possibly even unworkable in practice) বলে সমালোচনা করেন।

দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্ট : ক্যাবিনেট মিশন কেন্দ্রের হাতে সীমিত ক্ষমতা প্রদান করে কার্যত অত্যন্ত দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। অনেকের মতে, ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক জটিলতার অবসান ঘটানোর জন্য প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী সরকারের। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা এই সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থাহীনতা : অন্তর্বর্তীকালীন সময় (interim period) ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন ব্যবস্থা ক্যাবিনেট মিশন করেনি ; এবং ১৯৩৫ সালের পুরাতন সংবিধান চালু রেখেছিল। তাছাড়া, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে **বড়লাটের পুনর্গঠিত পরিষদ** (reconstituted Viceroy's Council) বলেই বর্ণনা করা সমীচীন। কারণ, প্রয়োজন মনে করলে তখনও বড়লাট তাঁর **'ভেটো'** ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন।

অ-সার্বভৌম গণপরিষদের সৃষ্টি : ক্যাবিনেট মিশন-পরিকল্পিত গণপরিষদকে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল যে, গণপরিষদ কর্তৃক রচিত ভারতের সংবিধান যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রিটিশরাজ কর্তৃক অনুমোদিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা কার্যকর করা যাবে না।

❑ ১৪.১.৭ উপসংহার

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর নেতৃত্বের সঙ্গে ব্রিটিশ উচ্চশ্রেণীর একটি আঁতাত (alliance with the upper-class leadership in India) করার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শাসনতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনার পাশাপাশি ব্রিটিশ ও ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা দৃঢ়ভাবেই চালানো হয়েছিল। এ বিষয়ে বিড়লা-ন্যুফিল্ড চুক্তি (the Birla-Nuffield Agreement) কিংবা টাটা-আই. সি. আই. চুক্তি (the Tata-I.C.I. - Imperial Chemical Industries Agreement)-র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এইভাবে উভয় দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে কেবল ভারতবর্ষের জাগ্রত গণশক্তিকে দমন করার ব্যবস্থাই করা হয়নি, সেই সঙ্গে ভারতবর্ষে যাতে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষিত থাকতে পারে সেজন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। তাছাড়া, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী অনুসৃত সাধারণ নীতির সপক্ষে অন্যতম মিত্র হিসেবে যাতে ভারতবর্ষ কাজ করে, সেজন্য পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ক্যাবিনেট মিশন ক্ষমতা হস্তান্তরের সুপারিশ করেছিল।

অনুশীলনী - ১

■ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। ক্যাবিনেট মিশনের (১৯৪৬) সুপারিশগুলির ওপর একটি সমালোচনামূলক টীকা লেখ।

২। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার পটভূমি আলোচনা কর। ওই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি কী ছিল ? ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি কী ?

■ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ কী ছিল ?

২। গণপরিষদ-সংক্রান্ত ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশগুলি কী ছিল ?

৩। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পর্কে ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশগুলি কী ছিল ?

৪। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি কী ছিল ?

১৪.২ সারসংক্ষেপ

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটে। ফলে 'ভারত-বন্ধু' বলে পরিচিত শ্রমিক দলের নেতা ক্লেমেন্ট এটলী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। এটলীর পরামর্শক্রমে লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করেন যে, অবিলম্বে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সাধারণ নির্বাচনের পর সরকার একটি গণপরিষদ আহ্বান এবং ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এর পর ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে কংগ্রেস ৫৬টি এবং মুসলিম লীগ ৩০টি আসন অধিকার করে। এমতাবস্থায় ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান তৈরীর ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য ভারতবর্ষে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের কথা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন। প্যাথিক লরেন্সের নেতৃত্বে ক্যাবিনেট মিশন ২৪শে মার্চ (১৯৪৬) দিল্লীতে এসে পৌঁছায়। ভারতের বিভিন্ন দল ও সংগঠন মিশনের সামনে তাদের পরস্পর-বিরোধী মতামত ব্যক্ত করে। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার তিনটি প্রধান অংশ ছিল, যথা — **(১)** ভবিষ্যৎ সংবিধান-সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ, **(২)** গণপরিষদ-সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ এবং **(৩)** অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন-সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার নানা প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়, যথা — **(ক)** প্রস্তাবিত সংবিধানের অগণতান্ত্রিক প্রকৃতি, **(খ)** সামন্ততন্ত্রের পরিপোষণ করার ব্যবস্থা, **(গ)** জটিল ও অবাস্তব বিভাজন নীতি অনুসরণ, **(ঘ)** দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি, **(ঙ)** অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থাহীনতা এবং **(চ)** অ-সার্বভৌম গণপরিষদের সৃষ্টি। আসলে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্রিটিশ উচ্চশ্রেণীর একটি আঁতাত করার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী অনুসৃত সাধারণ নীতির সপক্ষে অন্যতম মিত্র হিসেবে ভারতবর্ষ যাতে কাজ করে, সেজন্য পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ক্যাবিনেট ক্ষমতা হস্তান্তরের সুপারিশ করেছিল বলে **রজনী পাম দত্ত** মন্তব্য করেছিলেন।

১৪.৩ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

■ রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১ নং প্রশ্ন — ১৪.১.১ ও ১৪.১.৪ দ্রষ্টব্য

২ নং প্রশ্ন — ১৪.১.১ - ১৪.১.৭ দ্রষ্টব্য

■ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১ নং প্রশ্ন — ১৪.১.৪ (১) দ্রষ্টব্য

২ নং প্রশ্ন — ১৪.১.৪ (২) দ্রষ্টব্য

৩ নং প্রশ্ন — ১৪.১.৪ (৩) দ্রষ্টব্য

৪ নং প্রশ্ন — ১৪.১.৬ দ্রষ্টব্য

১৪.৪ ঃ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও গণপরিষদ ঃ কংগ্রেস লীগ বিরোধ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও গণপরিষদের বিষয়ে কংগ্রেস ও লীগের দৃষ্টিভঙ্গী : ক্যাবিনেট মিশনের ভারত ত্যাগের পর ১৯৪৬ সালের ৬-৭ জুলাই বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে-সভা হয়, তাতে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। ইতোমধ্যে আবুল কালাম আজাদের স্থলে **জওহরলাল নেহরু** কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। পূর্বোক্ত বোম্বাই অধিবেশনে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণে **নেহরু** ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস কেবল গণপরিষদে যোগদানের অর্থেই ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা মেনে নিতে সম্মত হয়েছে; অন্য কোন শর্ত মেনে নিতে কংগ্রেস বাধ্য নয়। ১০ই জুলাই তিনি তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ক্যাবিনেট মিশন প্রদর্শিত পথেই তাঁরা গণপরিষদে প্রবেশ করবেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা কী করবেন, সেটা একান্তভাবেই তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার। ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে সংখ্যালঘু উপজাতি ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে গণপরিষদকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য **একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন** এবং **ক্ষমতা হস্তান্তরের** খুঁটিনাটি বিষয়ের জন্য ব্রিটেনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় গণপরিষদের যে-চুক্তি সম্পাদনের কথা বলা হয়েছিল, নেহরু তার গুরুত্ব অস্বীকার করলেন। সংখ্যালঘুদের বিষয়কে ভারতের একান্ত অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে বর্ণনা ক'রে এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আরোপিত কোন বাধ্যবাধকতা কংগ্রেস মানবে না বলে তিনি ঘোষণা করেন। নেহরুর এই বিবৃতিকে **আজাদ** একটি **মারাত্মক 'ভুল'** বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ, তা ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছে। **মোসলের** মতে, নেহরুর বক্তব্যের সহজ অর্থ হলো — ক্ষমতা পাওয়ার পর কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে 'সাবোটাজ' করবে। যাই হোক্, নেহরুর এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে জিন্না জানালেন যে, ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার উদ্দেশে কংগ্রেস এবং লীগ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, গণপরিষদে সংখ্যাধিক্যের জোরে কংগ্রেস ওই পরিকল্পনা বানচাল করে দেবে এবং তা করা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের দয়ার ওপর নির্ভর করা ছাড়া সংখ্যালঘুদের আর কিছুই করার থাকবে না।

মুসলিম লীগের সমর্থন প্রত্যাহার : এর পর ২২শে জুলাই বড়লাট ওয়াভেল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করার জন্য নেহরু ও জিন্নাকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু নেহরুর পূর্বোক্ত বক্তৃতার ফলশ্রুতি হিসেবে ২৯শে জুলাই মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার প্রতি তাদের পূর্ব-অনুমোদন প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করে এবং **পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পুরাতন দাবিতে** ফিরে যায়। ৩১শে জুলাই **জিন্না** বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন যে, মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা থেকে অনুমোদন প্রত্যাহার করায় এখন আর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তাদের যোগদান করার কোন প্রশ্নই আসে না। এর পর **লর্ড ওয়াভেল** ৬ই আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য নেহরুকে আহ্বান জানালেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ৮ই আগস্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেহরু সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালন : অন্যদিকে মুসলিম লীগ **১৬ই আগস্ট** দিনটিকে **'প্রত্যক্ষ**

সংগ্রাম দিবস' হিসেবে পালন করার কথা ঘোষণা করে। বাংলাদেশে সুরাবর্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ-সরকার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে ব্যাপক হারে হিন্দু হত্যাকে বুঝেছিল। ফলে ওই দিন কলকাতায় লীগ-সরকারের অনুপ্রেরণায় ও সহযোগিতায় ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন, হত্যা, রাহাজানি ইত্যাদি চলে। ওই দিন অন্তত ৬,০০০ ব্যক্তি নিহত এবং ১৫,০০০ ব্যক্তি আহত হয়। প্রায় ১,০০,০০০ লোক গৃহহারা হয়। পরবর্তী দিনগুলিতে হত্যালীলা অব্যাহতভাবে চলতে থাকলেও তা আর ১৬ই আগস্টের মতো একতরফা ছিল না।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন : এদিকে ২৪শে আগস্ট বড়লাট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রীসভার তালিকা ঘোষণা করেন। বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, এম. আসফ আলী, রাজাগোপালাচারী, শরৎচন্দ্র বসু, জন মাথাই, বলদেব সিং, সাফৎ আহমেদ খাঁ, জগজীবন রাম, সৈয়দ আলি জাহির এবং কভেসজি হরমুসজিকে নিয়ে ২রা সেপ্টেম্বর **অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা** গঠিত হয়। এর পর **জিন্না** বাধ্য হয়েই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন এবং ১৪ই অক্টোবর তিনি মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করেন। এঁরা হলেন লিয়াকত আলি খান, চন্দ্রিগড়, আব্দুর রব নিস্তার, গজনফর আলি খান এবং তফসিলী সম্প্রদায় থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লীগ যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলায় ব্যাপক হিন্দু-নিধন যজ্ঞ শুরু হয়। **গজনফর আলি খান** প্রমুখ লীগ-নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলার ঘটনাবলীকে **পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বভারতীয় যুদ্ধের অংশ** বলে বর্ণনা করেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিহারে হিন্দুরা মুসলমানদের হত্যা করতে শুরু করে। তবে সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলে এই নিধনযজ্ঞ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

গণপরিষদে যোগদানের বিষয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি : ২০শে নভেম্বর **ভারত সচিব** সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকেই চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসবে। কিন্তু **জিন্না** গণপরিষদের বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখতে অনুরোধ জানিয়ে গণপরিষদে লীগের যোগদানের বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখলেন। এমতাবস্থায় কংগ্রেস দাবি জানাল যে, হয় মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগদান করুক, নয়তো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থেকে পদত্যাগ করুক। অচলাবস্থার অবসানের জন্য বড়লাট-সহ নেহরু, বলদেব সিং, জিন্না, লিয়াকত আলিকে লণ্ডনে উপস্থিত হওয়ার জন্য ভারত সচিব অনুরোধ জানান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এঁরা ২রা ডিসেম্বর লণ্ডনে উপস্থিত হলেন। সমস্যা দেখা দিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ১৯ নং অনুচ্ছেদটি নিয়ে। প্রদেশগুলি ক্যাবিনেট মিশন-পরিকল্পিত জোটভুক্ত অবস্থায় থাকবে অথবা তারা ইচ্ছামতো জোটবদ্ধ হতে পারবে — এ বিষয়ে ১৯ নং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের বিরোধ বাধে। কংগ্রেস প্রথম এবং লীগ শেষোক্ত অংশটি গ্রহণ করার সপক্ষে মত দেয়। শেষ পর্যন্ত ৬ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, বিতর্কিত বিষয়গুলির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court)-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। গণপরিষদ এবং সংবিধান সম্বন্ধে ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, গণপরিষদ যদি এমন কোন সংবিধান রচনা করে, যার মধ্যে জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের বক্তব্যের প্রতিফলন নেই, তাহলে সেই সংবিধান দেশের অনিচ্ছুক অংশের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এই ঘোষণা কার্যত লীগ-নেতা জিন্নার হাত শক্ত করলো।

গণপরিষদের অধিবেশন : যাই হোক্, পূর্ব-ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ওই অধিবেশনে মুসলিম লীগের কোন সদস্য যোগদান করেননি। **রাজেন্দ্র প্রসাদ গণপরিষদের সভাপতি** নির্বাচিত হলেন। নেহরু গণপরিষদের ওই অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ওই গণপরিষদ ভারতবর্ষকে **সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** (Sovereign Democratic Republic) হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। ওই সাধারণতন্ত্র স্ব-শাসিত ইউনিটসমূহকে নিয়ে গঠিত হবে এবং জনগণের সব অংশকেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সাধারণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু অনুন্নত জাতি ও অঞ্চলসমূহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকবে। মুসলিম লীগের সদস্যরা যাতে গণপরিষদে যোগদান করতে পারেন, সেজন্য ১৯৪৭ সালের ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়। এর পর যথারীতি ওই তারিখে গণপরিষদের অধিবেশন বসে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ও উপ-কমিটি গঠিত হয়।

কংগ্রেস কর্তৃক দেশবিভাগ স্বীকার : এদিকে ১৯৪৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী করাচীতে মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক বসে। ওই বৈঠকে গণপরিষদের গঠন ও কার্যক্রমকে আইনসঙ্গত নয় বলে বর্ণনা করে তাকে বর্জন করার এবং সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে পুনরায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার প্রস্তাব লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থেকে পদত্যাগ করার নির্দেশদানের দাবি জানায়। কংগ্রেসের সেই দাবি মানতে বড়লাট অস্বীকার করলে কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থেকে বেরিয়ে আসবে বলে হুমকি দেয়। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী **এটলী** সেই চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে ২০শে ফেব্রুয়ারী কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে অচলাবস্থা দূর করার জন্য তিনি ১৯৪৭ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করবেন এবং এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য মাউন্টব্যাটেনকে ওয়াভেলের স্থলাভিষিক্ত করা হলো। এটলীর এই ঘোষণার পর মুসলিম লীগ আসাম, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে ব্যাপক হত্যালীলা চালায়। পাঞ্জাবে মালিক খিজির হায়াৎ খানের নেতৃত্বাধীন হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্মিলিত সরকারের পতন ঘটে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যখন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, ঠিক সেই সময়ে ২৪শে মার্চ **মাউন্টব্যাটেন** ভারতের গভর্নর জেনারেল বা বড়লাট হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় প্যাটেল, নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভারত বিভাগে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এমনকি, যে-**গান্ধী** এক সময় আজাদকে বলেছিলেন যে, তিনি জীবিত থাকতে কখনই ভারত বিভাগ মেনে নেবেন না, ১৯শে মার্চ মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর সেই গান্ধী তা মেনে নিলেন। অবশ্য এছাড়া তখন তাঁর অন্য কোন উপায় ছিল না। কারণ, ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধী-নেতৃত্বের পরিবর্তে তখন **প্যাটেল ও নেহেরু গোষ্ঠীর সর্বময় প্রাধান্য** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যাই হোক্, ভারত বিভাগের ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সম্মতি আদায় করার পর মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন এক ঘোষণায় দেশ-বিভাগের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।

১৪.৫ মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার প্রধান বিষয়সমূহ :

(১) বাংলাদেশ এবং পাঞ্জাবের হিন্দু-প্রধান ও মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলির আইনসভার

সদস্যরা পৃথক পৃথকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে স্থির করবেন তাঁরা দেশ বিভাগে রাজী কিনা। যদি রাজী হন, তাহলে তাঁরা কোন্ অংশের সঙ্গে অর্থাৎ, ভারত কিংবা পাকিস্তানের পক্ষে যুক্ত হবেন, তা স্থির করতে হবে।

(২) সিন্ধু প্রদেশের আইনসভা একটি বিশেষ অধিবেশনে স্থির করবে তার সংবিধান তদানীন্তন গণপরিষদ অথবা নতুন কোন গণপরিষদ কর্তৃক রচিত হবে।

(৩) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বালুচিস্তানের ক্ষেত্রে ওই একই বিষয়ে গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(৪) আসামের মুসলমান-প্রধান সিলেট জেলা আসামের সঙ্গে থাকবে, না, প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ব বাংলার সঙ্গে যুক্ত হবে, তা সিলেটের জনগণ গণভোটের মাধ্যমে স্থির করবে।

(৫) পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি সীমানা কমিশন গঠিত হবে।

(৬) উপরি-উক্ত বিষয়গুলিকে কার্যকর করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অবিলম্বে আইন প্রণয়ন করবে বলে ঘোষণা করা হয়।

মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য ১৮ই মে লণ্ডন যান এবং ৩১শে মে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পর কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি জানাবার পর ৪ঠা জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা তিনি ঘোষণা করেন। কংগ্রেস ও লীগ-নেতৃবৃন্দ তাঁর সেই ঘোষণাকে স্বাগত জানান।

১৪.৬ ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে বিধিবদ্ধ আইনের রূপ দেওয়ার জন্যবিধিবদ্ধ আইনের রূপ দেওয়ার জন্য একটি বিলের আকারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট পেশ করা হয় এবং ১৮ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হওয়ার পর তা ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ (The Indian Independence Act, 1947) নামে পরিচিত হয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের প্রধান প্রধান বিষয় :

(১) এই আইনের দ্বারা ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে **ভারত** ও **পাকিস্তান** নামে দুটি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়।

(২) উভয় ডোমিনিয়নের আইনসভার হাতে আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

(৩) ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে আরও বলা হয় যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর ডোমিনিয়ন কিংবা এর অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ বা অন্য কোন অংশের ওপর ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটবে।

(৪) যত প্রতিটি ডোমিনিয়নের জন্য নতুন সংবিধান রচিত না হচ্ছে, তত উভয় দেশের গণপরিষদ আইনসভা হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ, একই সঙ্গে গণপরিষদ দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে পারবে। গণপরিষদ যখন আইনসভা হিসেবে কাজ করবে, তখন পূর্বতন কেন্দ্রীয় আইনসভা যেসব ক্ষমতা ভোগ করতো, অনুরূপ ক্ষমতা গণপরিষদ ভোগ করবে। আবার, সংবিধান রচনাকারী সংস্থা হিসেবেও গণপরিষদ দেশের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার কাজ সম্পাদন করতে পারবে।

(৫) নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত দুটি ডোমিনিয়নের প্রত্যেকটি এবং তাদের অন্তর্গত প্রদেশগুলি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে শাসিত হবে। তবে প্রতিটি ডোমিনিয়ন প্রয়োজন মনে করলে ভারত শাসন আইন সংশোধন ক'রে নিতে পারবে।

(৬) ভারত সচিবের দপ্তরের বিলোপ সাধন করা হয়। প্রতিটি ডোমিনিয়নের জন্য একজন করে গভর্নর জেনারেল নিয়োগের কথা বলা হয়। ব্রিটিশ-রাজ সংশ্লিষ্ট ডোমিনিয়নের সঙ্গে পরামর্শক্রমে গভর্নর জেনারেলকে নিয়োগ করবে। গভর্নর জেনারেল নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবে কাজ করবেন। অর্থাৎ, পূর্বতন গভর্নর জেনারেলের মতো তাঁর স্বেচ্ছাধীন বা স্ব-বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা থাকবে না।

(৭) ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল প্রয়োজন মনে করলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পরিবর্তন সাধন করতে বা অপরিবর্তিত অবস্থায় সেই আইনকে কার্যকর করতে পারবেন। উপরি-উক্ত সময়সীমার পর প্রতিটি ডোমিনিয়নের গণপরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারবে।

(৮) ভারতীয় স্বাধীনতা আইন দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর ব্রিটিশ রাজশক্তির সর্বময় কর্তৃত্বের অবসান ঘটায়। বলা হয় যে, দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীনতা লাভ করার পর চুক্তির মাধ্যমে দুটি ডোমিনিয়নের যে-কোন একটির সঙ্গে সংযুক্ত হতে কিংবা স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে।

(৯) আইনটির সাহায্যে ভারত সচিব কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রকৃত্যক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও হাইকোর্টের বিচারপতির বেতন, পেনশন, ছুটি ইত্যাদি সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

(১০) উভয় ডোমিনিয়নকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথে যোগদান করা বা না-করার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা : ১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই কমন্স সভায় এবং ১৫ই জুলাই লর্ড সভায় গৃহীত হওয়ার পর স্বাধীনতা আইনটি ১৮ই জুলাই রাজকীয় সম্মতি লাভ করে। পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশের সীমানা বিভাজনের জন্য **সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে একটি সীমানা কমিশন** গঠিত হয়। এই কমিটিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ২ জন করে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়। এইভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সব ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে করা হলো। কিন্তু ঘটনাচক্রের ভীড় ও ক্ষমতা লাভের আতিশয্যে কংগ্রেস ও

মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ হতভাগ্য সংখ্যালঘুদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এদের রক্ষা করার জন্য উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। **লিওনার্ড মোসলের** পরিসংখ্যান অনুযায়ী স্বাধীনতার মূল্য হিসেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মোট ৬,০০,০০০ লোককে প্রাণ হারাতে হয়েছিল, ১,৪০,০০,০০০ লোককে গৃহহীন হতে হয়েছিল এবং ১,০০,০০০ রমণী অপহৃতা হয়েছিল। ওই অপহৃতাদের মধ্যে অনেককে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, অনেককে আবার নীলামে বিক্রী করা হয়েছিল।

কংগ্রেসের দেশবিভাগ মেনে নেওয়ার কারণ : কিন্তু প্রশ্ন হলো — যে-কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রথম থেকে দেশ বিভাজনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তা মেনে নিলেন কেন ? **প্রথমত,** স্বাধীন ভারত গঠনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের ওপর ঐক্যবদ্ধভাবে চাপ সৃষ্টি করার প্রশ্নে মুসলিম লীগের নেতিবাচক ভূমিকা কংগ্রেসকে বিশেষভাবে নিরাশ করেছিল। তাই বাধ্য হয়েই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশ বিভাজনের প্রশ্নটি মেনে নিয়েছিলেন বলে অনেকের ধারণা। **দ্বিতীয়ত,** কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতবিরোধ দেশের মধ্যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ডেকে আনে। এর অবসানের জন্য কংগ্রেস দেশবিভাগ মেনে নেয়। **তৃতীয়ত,** কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ এতই সংগ্রামবিমুখ হয়ে পড়েছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নতুন করে সংগ্রাম শুরু করা অপেক্ষা আপসরফার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করাকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে **নেহরুর** উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা নিজেরা বৃদ্ধ ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমতাবস্থায় নতুন করে আন্দোলন শুরু করার কিংবা জেলে যাওয়ার কথা তাঁরা ভাবতেই পারছিলেন না। যে-কোন মূল্যেই হোক্, তাঁরা স্বস্তি খুঁজছিলেন। ১৯৬০ সালে নেহরু বলেছিলেন :

> The truth is that we were tired men. ...Few of us could stand the prospect of going to prison again and it we had stood out for a united India as we wished if, prison obviously awaited us. We saw the fires burning in the Punjab and heard every day of the killings. The plan for partition offered a way out and we took it (Quoted in Leonard Mosley, op cit, p.285).

চতুর্থত, ভারতের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের প্রতি তাঁদের ভীতিই কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের দেশবিভাগ মেনে নেওয়ার সর্বাপেক্ষা বড় কারণ। কংগ্রেস-নেতৃবন্দ ইংরেজদের সঙ্গে আপসরফার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়েছিলেন। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কার ভারতের ক্রমবর্ধমান বামপন্থী জঙ্গী শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন তাঁদের শঙ্কিত ক'রে তুলেছিল। সেই সঙ্গে ১৯৪৬ সালের সশস্ত্র নৌ-বিদ্রোহ তাঁদের শঙ্কা অধিক পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এমতাবস্থায় ক্ষমতা যাতে ওইসব বিপ্লবী শ্রেণীর হাতে যেতে না পারে, সেজন্য তাঁরা দেশবিভাগ মেনে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেদের হাতে শাসনভার তুলে নিতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **এ. আর. দেশাই** বলেছেন :

> The Congress leaders were hoping to secure freedom through

negotiation with Britain. They did not approve of popular movements, especially when they were assuming revolutionary and violent forms.

তিনি আরও বলেছেন :

...they viewed with apprehension, especially after the R.I.N. strike, the extending mass movement which were assuming violent revolutionary forms.

অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন **ডি. এন. সেন**। তিনি বলেছেন :

...the executives of both the organisations (Congress and Muslim League) wanted power lest the progressive forces should combine and mobilise themselves in such a manner that the ambitions of the upper strata of society were frustrated and their aims completely defeated.

অনুশীলনী - ২

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার প্রধান প্রধান দিক কী ?

২। ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের (১৯৪৭) প্রধান প্রধান বিষয় কী ?

১৪.৭ সারসংক্ষেপ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও গণপরিষদ গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একে অপরের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। বড়লাট ওয়াভেল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করার জন্য নেহরু ও জিন্নাকে আহ্বান জানালেও মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট পরিকল্পনার প্রতি তাদের পূর্ব অনুমোদন প্রত্যাহার করে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীতেই ফিরে যায়। এর পর বড়লাট নেহরুকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালে তিনি সেই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট দিনটিকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' হিসেবে পালন করার কথা মুসলিম লীগ ঘোষণা করে। শুরু হয় ব্যাপকভাবে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। এর মধ্যেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হলে জিন্না বাধ্য হয়েই সেই সরকারে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। এর পর গণপরিষদে যোগদানের বিষয়েও কংগ্রেস ও মুসলিম

লীগ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এদিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ফলে কংগ্রেস দেশ-বিভাগ স্বীকার করে নেয়। ক্ষমতার হস্তান্তর কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাট করে পাঠানো হলো। মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন এক ঘোষণায় দেশ-বিভাগের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার ভিত্তিতেই ভারত বিভাজিত হয়। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাটিকে বিধিবদ্ধ আইনের রূপ দেওয়ার জন্য প্রণীত হয় ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন। এই আইনের মাধ্যমেই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়।

১৪.৮ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ২

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী**

১ নং প্রশ্ন — ১৪.৫ দ্রষ্টব্য

২ নং প্রশ্ন — ১৪.৬ দ্রষ্টব্য

১৪.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

ESSAY-TYPE QUESTIONS

1. Write a critical note on the Cabinet Mission.
2. What was the background of the Cabinet Mission (1946) ? What were the proposals of the Mission ? How would you criticise the proposals of the Mission ?

SHORT-TYPE QUESTIONS

1. What was the background of the Cabinet Mission (1946) ?
2. What were the proposals of the Cabinet Mission ?
3. How would you criticise the proposals of the Cabinet Mission ?
4. What were the different aspects of the Mountbatten Plan ?
5. What were the important aspects of the Indian Independence Act, 1947 ?

১৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

Aggarwal, R. N., *National Movement and Constitutional Development in India.*

Azad, Abul Kalam, *India Wins Freedom*.

Banerjee, A. C. (ed.), *Indian Constitutional Documents.*

Banerjee, A. C. & Dakshina Ranjan Bose, *Cabinet Mission in India*

Bose, Subhas Chandra, *The Indian Struggle, 1920-1934.*

Chandra, Bipan, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K. N. Panikkar and Sucheta Mahajan, *India's Struggle for Independence : 1857-1947.*

Coupland, Regiland, *The Constitutional Problem in India.*

Desai, A. R., *Recent Trends in Indian Nationalism.*

Dutt, R. Palm, *India Today.*

Mehrotra, S. R., *Towards India's Freedom and Partition.*

Menon, V. P., *The Transfer of Power.*

Mosley, Leonard, *The Last Days of the British Raj*.

Namboodiripad, E. M. S., *A History of Indian Freedom Struggle.*

Prasad, Rajendra, *India Divided.*

Pylee, M. V., *Constitutional History of India, 1600-1950*.

Sen, Dhirendranath, *From Raj To Swaraj.*

The Indian Annual Register, 1946, vol. I.

চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*।

চন্দ্র, বিপান, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী, কে. এন. পানিক্কর ও সুচেতা মহাজন, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭-১৯৪৭*।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস*।

ভারতীয় রাজনীতির সক্রিয় শক্তিসমূহ

চতুর্থ পত্র ঃ দ্বিতীয় অর্ধ

পর্যায় - ১

এম.এ. পার্ট-ওয়ান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

চতুর্থ পত্র

দ্বিতীয় অর্ধ

পর্যায় - ১

ভারতীয় রাজনীতি সক্রিয় শক্তিসমূহ
(Dynamic of Indian Politics)

স্বাধীনোত্তর ভারতে যে সব আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্রিয়াশীলতাকে প্রভাবিত করে থাকে তাদের মধ্যে কয়েকটি এই পর্যায়ের পাঁচটি এককের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। যে কোন দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে এক মিথষ্ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। রাজনীতি ও সমাজের মধ্যে দ্বিমুখী সম্পর্ক গড়ে ওঠে-একে অপরকে প্রভাবিত করে। রাজনীতি প্রতিফলনকারী ভূমিকা ও আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অনেক সময় সমাজ ও রাজনীতি মধ্যে দ্বন্দ্ব গড়ে তোলে। ভারতের মতো বহুত্ববাদী ও উত্তরণমূলক সমাজে, যেখানে সামাজিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, সম্পর্ক ও পরিচিত পরিবর্তনশীল অবস্থায় রয়েছে এবং সাবেকি সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর সহাবস্থান ঘটেছে, সেখানে সমাজ ও রাজনীতির সম্পর্ক আরো জটিল ও বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। ভারতে সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে এই অসংলগ্নতা অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের সৃষ্টি করেছে। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে শক্তিগুলি সাম্প্রতিককালে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং সমস্যার সৃষ্টি করেছে, তাদের কয়েকটি এই পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

প্রথম এককটিতে সমকালীন ভারতের সমকালীন ভারতের রাজনীতির সঙ্গে আঞ্চলিকতাবাদের মিথষ্ক্রিয়া পর্যলোচনা করা হয়েছে। আঞ্চলিকতাবাদের বিভিন্ন ধরণ ও কারণ বিশ্লেষণ করে এই সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় এককটিতে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রকারভেদ, উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করে এর কারণসমূহ ও সমস্যা সমাধানের পথ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় এককটিতে ভারতের জাতীয় সংহতির প্রতিবন্ধকতারূপে সংখ্যালঘু সমস্যার প্রকৃতি ও প্রবণতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের সংখ্যালঘুর দাবি বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে মন্তব্য করা হয়েছে।

চতুর্থ এককটিতে ভারতের বর্তমান রাজনীতিতে যেভাবে জাত ও শ্রেণির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া ঘটেছে তার বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে, ভারতীয় সমজের নানা পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও জাতপাতের প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। জাত ও শ্রেণির পারস্পরিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

পঞ্চম এককটিতে দেখানো হয়েছে যে, ভারতের মতো বহু বিচিত্র সংস্কৃতির দেশে জাতীয় সংহতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে যে সব সংহতিনাশক শক্তির উদ্ভব ও বিকাশ জাতীয় সংহতির পথে নানারূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ এই এককটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

একক - ১ ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism inm Indian Politics)

গঠন —

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ আঞ্চলিকতাবাদের অর্থ ও তাৎপর্য

১.৩ আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ

১.৪ ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের বিভিন্ন কারণ

- ১.৪.১ আর্থনৈতিক কারণ
- ১.৪.২ রাজনৈতিক কারণ
- ১.৪.৩ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ
- ১.৪.৪ মনস্তাত্ত্বিক কারণ

১.৫ আঞ্চলিকতাবাদের প্রকারভেদ

- ১.৫.১ ভৌগলিক সীমার ভিত্তিতে আঞ্চলিকতাবাদ
  - ১.৫.১.১ রাজ্য সীমাতিক্রান্ত আঞ্চলিকতাবাদ
  - ১.৫.১.২ আন্তঃ রাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ
  - ১.৫.১.৩ আন্তঃ রাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ
- ১.৫.২ চূড়ান্ত লক্ষ্য ভিত্তিক আঞ্চলিকতাবাদ
  - ১.৫.২.১ সাংবিধানিক আঞ্চলিকতাবাদ
  - অ১.৫.২.২ বিচ্ছিন্নতাকামী আঞ্চলিকতাবাদ

১.৬ সারসংক্ষেপ

১.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

১.৮ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

১.৯ নমুনা-প্রশ্নাবলী

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

ভারত হল একটি বিরাট ও বহুচিত্র সাংস্কৃতির জনবহুল দেশ। ভৌগলিক গঠন, ভাষা, ধর্ম, জাতিসত্তা, আর্থনীতিক উন্নয়নের স্তর প্রভৃতির ভিত্তিতে ভারতের জনমণ্ডলী বহু ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তবুও একটা জাতীয় চেতনা এই গোষ্ঠীগুলিকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে। কিন্তু ভারতীয় জনজীবনের বিভিন্ন দিকে বৈচিত্র্যের সমাহার অনেকক্ষেত্রেই সমস্যা ও সংঘাতের সৃষ্টি করেছে। এই সমস্ত সমস্যা ও সংঘাত ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। সমকালীন ভারতে আঞ্চলিকতাবাদও

একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে। এই এককটিতে ভারতের রাজনীতির সঙ্গে আঞ্চলিকতাবাদের মিথষ্ক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ শেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যাবে :

- আঞ্চলিকতাবাদ কী?
- ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ।
- আঞ্চলিকতাবাদের কারণসমূহ।
- আঞ্চলিকতাবাদের প্রকারভেদ।
- সমস্যা সমাধানের পথ।

১.১ প্রস্তাবনা

কোন দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থা ঐ দেশের সামাজিক-আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। রাজনীতিক ব্যবস্থা কখনো বিচ্ছন্নভাবে গড়ে ওঠে না। রাজনীতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক লক্ষ করা যায়-– একে অপরকে প্রভাবিত দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারতের মতো উপনিবেশিকতা উত্তর সমাজে আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা এবং প্রাক-ধনতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের সহাবস্থান রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থাকে এক বিশিষ্টতা প্রদান করেছে।[১] কিন্তু সামাজিক অনিশ্চয়তা (social indeterminacy)-কে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অতিবিকশিত বা অতিমাত্রায় বর্ধিত (overdeveloped state)। ভারতের রাজনীতি বিশ্লেষণ রাষ্ট্রব্যবস্থার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত সনাতনী সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে আধুনিক রাজনীতি ব্যবস্থার বিশিষ্টতা এবং সাযুজ্য ও অখণ্ডতার সঙ্কট এই অসংলগ্নতারই ফল।

ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্তার এই বিশিষ্টতার প্রেক্ষিতেই রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা আজ আঞ্চলিকতাবাদের কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থার বিকাশে যেমন আঞ্চলিকতাবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তেমনি আঞ্চলিকতাবাদের সমস্যা বিশ্লেষণে ভারতের রাজনীতি ও আঞ্চলিকতাবাদকে স্বতন্ত্র ও সাপেক্ষ চল উভয় হিসাবেই গণ্য করা যেতে পারে।

১.২ আঞ্চলিকতাবাদের অর্থ ও তাৎপর্য

সাধারণ বলা যেতে পারে যে, 'আঞ্চলিকতাবাদ' কথাটি এসেছে 'অঞ্চল' শব্দ থেকে। সমাজবিজ্ঞানে 'অঞ্চল' শব্দটিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা থাকে। 'ইন্টারন্যাশানাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ দ্য সোশ্যাল সায়েন্সস্' (International Encycolopedia of the Social Science) এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রতিবেশী অন্যান্য এলাকা থেকে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পৃথক একটি সমরূপ ক্ষেত্র (homogeneous area)-কে অঞ্চল বলা হয়।[২] সমগ্র জাতীয় এলাকার অঙ্গ হিসাবে একটি অঞ্চল তার

১. অনেকে এই ব্যবস্থাকে 'Specifity of the Political' বা 'রাজনীতিক ব্যবস্থার বিশিষ্টতা' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

২. Sills, David L. (ed), International Encyclopaedia of the Social Sciences, Vol. 13. The Macmillan Compay of the Free Press, 1968, PP. 377-379.

নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও রীতিনীতি দ্বারা সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ঐ অঞ্চলটি দেশের অবশিষ্টাংশ থেকে পৃথক একটি পরিচিতি অর্জন করে। 'আঞ্চলিকতাবাদ' শব্দটি আদর্শ হিসেবে অথবা আঞ্চলিক পরিকল্পনার তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে আঞ্চলিক ধারণা কার্যগত রূপকে প্রকাশ করে। কোন অঞ্চলের একনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি যখন তার সাংস্কৃতিক পরিচিতির স্বীকৃতি দাবি করে, তখন তাকে আঞ্চলিকতাবাদ আন্দেলন বলে অভিহিত করা হয়।

ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আঞ্চলিকতাবাদ একটি অস্বচ্ছ ধারণারূপে দেখা দিয়েছে। এটি হোল একটা বহুমাত্রিক ব্যাপার, যা ভূখণ্ড, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতিক বিকাশ প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটা মনোভাবরূপে প্রকাশ পায়। আর.এন.মিশ্র তাঁর 'রিজিওন্যলিজ্‌ম এ্যাণ্ড স্টেট পলিটিক্স ইন ইণ্ডিয়া' (Regionalism and State Politics in India) গ্রন্থে বলেছেন যে, কোন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ভূখণ্ডকেন্দ্রিক সামাজিক স্বার্থ যেমন গড়ে ওঠে তেমনই একই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যেও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, স্বভূমির আরাধনা এবং স্থানীয় দেশাত্মকবোধকে কেন্দ্র করে এক আঞ্চলিক চেতনা গড়ে ওঠে যা অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের বিরোধিতা করে। এই চেতনাই আঞ্চলিকতাবাদ।[১] ভোলানাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, আঞ্চলিকতাবাদ হল রক্তের সম্পর্ক, ধর্ম, জাতিকুল বা ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর সেই বিশেষ ধরণের চেতনা যা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা ভূখণ্ডকে একান্তভাবে নিজস্ব কর্মক্ষেত্র বলে বিবেচনা করে।[২]

আঞ্চলিকতাবাদের এই ধারণাগত বিশ্লেষণ থেকে এর তিনটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমত, আঞ্চলিকতাবাদ হল এক সামাজিক বাস্তবতা, যা একটি ভৌগলিক প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। এটি হোল এক ধরণের উপ-ভূখণ্ডগত আনুগত্য যেখানে ভূখণ্ডগত পরিচিতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিকতাবাদ হোল এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাপার, যার মধ্যে ভাষাগত, নৃকুলগত, ধর্মীয় এবং আর্থনীতিক স্বার্থ বিভিন্নভাবে বিশিষ্টতা প্রদান করে। তৃতীয়ত, আঞ্চলিকতাবাদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। নিজ গোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে যেমন গভীর নৈকট্য (We-feeling) জন্মায়, তেমনি পাশাপাশি অন্য গোষ্ঠীর প্রতি স্বাতন্ত্র্যবোধ (they feeling) ও গড়ে ওঠে। আঞ্চলিকতাবাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই আছে। ইতিবাচক দিক থেকে আঞ্চলিকতাবাদ হল কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আত্মপরিপূর্ণতার অনুসন্ধান। এদিক থেকে আঞ্চলিকতাবাদকে সামাজিক মঙ্গল সাধনের পরিপূরক রূপে দেখা যেতে পারে। নেতিবাচক দিক থেকে, আঞ্চলিকতাবাদের মধ্যে এক আপেক্ষিক বঞ্চনার মনোভাব গড়ে ওঠে। কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই বোধ জন্মায় যে, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বঞ্চিত করেছে। আঞ্চলিকতাবাদের এই নেতিবাচক দিক থেকে উগ্র, বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলন গড়ে ওঠে।

আঞ্চলিকতাবাদের ইতিবাচক অর্থের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের কোন বিরোধ নেই। জাতীয় পরিচিতি ও আঞ্চলিক পরিচিতি একত্রে সহাবস্থান করতে পারে, যদি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দ তাদের মধ্যে

---

১. R.NMishra, Regionalism and State Politics in India, Ashia Publishing House, New delhi, 1984

২. bholanath Banerjee, Politics of Regionalism in India, in Socialist Perspective, Vol.-15. No.-1-2, June-Sept.-1987

সমন্বয় ঘটাতে সচেষ্ট হন। বস্তুত, আঞ্চলিকতাবাদ হোল আঞ্চলিক স্তরে জাতীয়তাবাদের বর্ধিত রূপ এবং জাতীয়তাবাদ হল জাতীয় স্তরে আঞ্চলিকতাবাদের বর্ধিত রূপ। আন্তঃআঞ্চলিক সম্পর্ক গঠনের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিচিতি জাতীয় পরিচিতিতে উন্নীত হতে পারে। কিন্তু নেতিবাচক আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয়তাবাদের পরিপন্থীরূপে দেখা দিতে পারে। এই ধরণের আঞ্চলিকতাবাদ সংকীর্ণ স্বজাতিকেন্দিকতাকে অবলম্বন করে পুষ্ট হয়। তাই এই ধরণের আঞ্চলিকতাবাদ আধিপত্যশীল জাতির বন্ধন থেকে বিশেষ নৃকুলগত গোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা দাবী করে। আঞ্চলিকতাবাদকে ছেদবাদিতা থেকে পৃথক করে দেখা উচিৎ। যখন কোন অঞ্চল বিচ্ছিন্নতা দাবী করে তখন তার থেকে ছেদবাদিতার উৎপত্তি ঘটে। তাছাড়া, ছেদবাদিতার মধ্যে কেবল আর্থনীতিক স্বার্থই প্রাধান্য পায়; কিন্তু আঞ্চলিকতাবাদ হল এক ধরণের 'উপজাতীয়তা' যার মধ্যে নৃকুলগত ও সাংস্কৃতিক উপাদানও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এইভাবে বলা যায় যে, একটি রাষ্ট্রের বিশেষ একটি অঞ্চলে বসবাসকারী কোন ভাষা বা ধর্মীয় গোষ্ঠী অথবা নৃকুলগতগোষ্ঠী যখন একটি অঞ্চল-কেন্দ্রিক ভাবাদর্শের আবেগ গড়ে তোলে, তখন সেই আবেগ অনেক সময় তীব্র হতে হতে আঞ্চলিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। সুতারাং আঞ্চলিকতাবাদ হল একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ও তার অঙ্গীভূত অঞ্চলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি বিমূর্ত ধারণা।[১]

১.৩ আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ

আঞ্চলিকতাবাদ শুধুমাত্র ভারতের সমস্যা নয়। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশেই আঞ্চলিকতাবাদের কমবেশী প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। যুক্তরাজ্যের স্কটল্যণ্ড, উত্তর আয়ারল্যণ্ড এবং ওয়েলসে, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি দেখা দিয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উত্তর ও দক্ষিনাঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা দীর্ঘকাল ধরে পরিচিতি। ফ্রান্সে কম উন্নত অঞ্চলগুলির মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে উঠেছে। কানাডার কুইবেকে আঞ্চলিকতাবাদের সমস্যা তীব্র রূপ ধারণ করেছে। জাতিসত্তার ভিত্তিতে সাবেক পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীলঙ্কার আদি অধিবাসী ও তামিল গোষ্ঠীর আঞ্চলিকতাবোধ দীর্ঘদিন ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালাচ্ছে। বস্তুত, এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, নৃকুলগত ও উপজাতিভিত্তিক গোষ্ঠীগুলি ঐতিহ্যগতভাবে পরস্পর বিরোধী হওয়ার ঐ সব দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থার আঞ্চলিকতাবাদ এক সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা। আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে আঞ্চলিকতাবাদ উপজাতিভিত্তিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

যদিও আঞ্চলিকতাবাদ সাম্প্রতিকালে এক সর্বজনীন ব্যপারে পরিণত হয়েছে, এর প্রকৃতি ও প্রভাব সর্ব দেশে সমান নয়। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, যে রাষ্ট্র ভৌগলিক দিক থেকে যত বৃহৎ এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে যত বৈচিত্র্যপূর্ণ, আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সেখানে তত বেশী। এই কারণেই ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ অবশ্যম্ভাবী হিসাবে দেখা দিয়েছে। ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের আধুনিকরূপের উদ্ভব ব্রিটিশ

১. ভারতীয় মুখার্জী, 'ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের সমস্যা প্রসঙ্গে', গণশক্তি, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৯৬

ঔপনিবেশিক নীতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজরা বরাবরই ভাগ করে শাসন করার নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তারা প্রশাসনগত দিক থেকে বিভাগকে সমর্থন করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল ভারতীয় স্বার্থকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অধীনে রাখার প্রচেষ্টা। ১৯০৫ সালের আগে ও পরে ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতের প্রশাসনিক বিভাজন মূলতঃ সামরিক ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক স্বার্থে ইংরেজরা বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সাংস্কৃতিক আঞ্চলিক গোষ্ঠী সমূহের স্বাভাবিক সীমানীগুলি অমান্য করেছিল।[২] রাজনীতিক কারণে ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড () সংস্কারে ভাষাভিত্তিক রাজ্যে পুনগঠন নীতি প্রত্যাখাত হয়েছিল, কারণ কোন শাসকই উপনিবেশের ভাষায় শাসন করতে চায় না।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের নীতির প্রতি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় এক ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের এই দাবিকে সমর্থন করেছিল, কারণ ইংরেজ সরকার কর্তৃক ভারতের প্রশাসনিক বিভাজন ভাষাগত জাতীয়তাকে খর্ব করে ঔপনিবেশিক স্বার্থই চরিতার্থ করেছিল বলে মনে করা হয়েছিল। গান্ধীজিও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে ভাষার ভিত্তিতে গঠন করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে জাতীয় কংগ্রেস এই নীতির ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছিল। ১৯৮৪ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান্য বিস্তারকারী গণপরিষদ রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি খতিয়ে দেখার জন্য প্রথমে দার কমিশন ও পরে জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল ও পট্টভি সীতারামাইয়াকে নিয়ে জে. ভি. পি. কমিটিই জাতীয় সংহতির স্বার্থে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যে পুনগঠনের বিপদ সম্পর্কে সচেতন করেছিল। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদেশিক স্তরে কংগ্রেসীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে পৃথক অঙ্গরাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলন চলছিল। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পরে এই দাবিতে শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীরামুলু উপবাসে আত্মাহুতি দিলে এই আন্দোলন এমন এক হিংস্র আকার ধারণ করে যে, কেন্দ্রীয় সরকার অন্ধ্ররাজ গঠন করতে বাধ্য হয়েছিল। অন্ধ্ররাজ্য গঠনে উৎসাহ হয়ে অন্যান্য বহুবাহী অঞ্চলযুক্ত রাজ্যগুলি একই দাবি করতে থাকে। তাছাড়া রাজ্যগুলি সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসার জন্যও দাবি উঠেছিল।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভাষাগত আবেগকে আর থামিয়ে রাখা যাবে না। এর ফলে, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয়েছিল এবং ১৯৫৫ সালে প্রদত্ত কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভরতের অনেক রাজ্য ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হয়ে ভারতের রাজনীতিক মানচিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিল। কিন্তু ভাষাত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনই রোগ নিরাময়ের সঠিক ওষুধ ছিল না। রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে, অন্যান্য উপাদানগুলি-প্রশাসনিক যোগ্যতা, আর্থনীতিক সামর্থ্য, সামাজিক সমরূপতা –- অবহেলিত হয়েছিল। এর ফলে ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠিত হওয়ার পরও ভারতের মানচিত্র চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। বিভিন্ন পর্যয়ে ভাষাগত উপাদান ছাড়াও অন্যান্য শক্তি আরও সমস্যা ও বিরোধের সৃষ্টি করেছিল। সমভূমির মানুষ কর্তৃক শোষনের অভিযোগে পার্বত্য অঞ্চলে নতুন নতুন রাজ্য গড়ে উঠতে থাকে, অধিকতর আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রের দাবি উঠতে থাকে। বিভক্ত পাঞ্জাবকে পুনরায় বিভক্ত করে পাঞ্জাবী ভাষী পাঞ্জাব এবং হিন্দীভাষী হরিয়ানা গঠিত হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। আসাম টুকরো টুকরো হবার পরও আবার টুকরো করার প্রচেষ্টা চলেছে। এই ট্রাডিশন এখনও সামনে চলেছে।

২. R.N. Mishra, P - 14

অনুশীলনী — ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। আঞ্চলিকতাবাদের অর্থ কী?

২। ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের আধুনিকরূপের উদ্ভব কখন হয়েছিল?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আঞ্চলিকতাবাদের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

১.৪ ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ বিকাশের বিভিন্ন কারণ

ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ উদ্ভবের প্রেক্ষিত পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যে আঞ্চলিকতাবাদের বীজ ভারতের মাটিতে বপন করেছিল, ভারতবাসী নিজেই সেই বীজে জল সঞ্চার করেছে। জওহরলালের মতো কিছু রাজনীতিক নেতা আঞ্চলিকতাবাদের বিপদকে সঠিকভবে বুঝলেও সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস দল রাজনীতিক প্রয়োজনে তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। উত্তরোত্তর ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের প্রভাব বেড়েই চলেছে। এখন আর শুধু ভাষা নয়, ধর্ম, জাতি ইত্যাদিকে ভিত্তি করেও আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি শোনা যাচ্ছে ছোট ছোট রাজ্য গঠনের দাবি। নানা কারণে ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখযোগ্য। তবে এই কারণগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

১.৪.১ আর্থনীতিক কারণ

ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশে প্রতক্ষ্য কারণ যাই হোক না কেন, মূল কারণ হল আর্থনীতিক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইকবাল নারায়ন এর মতে, আঞ্চলিকতাবাদের মূল উপাদান হল আর্থনীতিক উপাদান।[১] তিনি সম্পত্তি সম্পর্ক, ভূমিসংস্কার কর্মসূচির রূপায়ন প্রভৃতি আর্থনীতিক উপাদান আঞ্চলিকতাবাদের মূল কারণ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও আকাশ ছোঁয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভরতের মতো উন্নয়নশীল দেশ সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার যোগান অপ্রতুলতর হওয়ার সমাজের ব্যাপক অংশের মধ্যে চাকরি বা ব্যবসার লাইসেন্স না পাওয়ার ফলে বঞ্চিত ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও অঞ্চলের মধ্যে হতাশার মনোভাব সৃষ্টি হয়। এর থেকে সৃষ্টি হয় তীব্র প্রতিযোগিতা, বন্টনমূলক ন্যায়বিচারের দাবি, ভূমিপুত্রের দাবি ইত্যাদি, যার অনিবার্য পরিণতি হল আঞ্চলিকতাবাদ। এই ভাবে দেখা যায় যে, আসামের চা বাগানের অসমীয়া ও বাঙ্গালী বেকারদের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, যার ফলে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থাও

১. Iqbal Narain, 'Regional Politics in India', in P.C. Mathur(ed), Government and Politics in South Asia, Printwell Pub-Jaipur, 1985.

এই নতুন উৎপাদন ব্যবস্থাকে গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে। কিন্তু ভারতে পুজিঁবাদের বিকাশ এই পদ্ধতিতে হয়নি। ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতা কোন সমাজ বিপ্লবের পল হিসাবে আসেনি। প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল ক্ষমতা হস্তান্তর, ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের হাত থেকে ভারতীয় পুঁজিপতিদের হাতে। ব্রিটিশ উপনিবেশিকারীদের হাত ধরে পুঁজির এই হস্তান্তর উৎপাদন ব্যবস্থার কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারেনি। এর ফলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। পুঁজিবাদী কাঠামোর পাশাপাশি তাই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ও শক্তিগুলির, যেমন, গ্রামীন কৃষক শ্রেণী, জোতদার, মহাজন, উচ্চবর্ণের ধর্মীয় নেতা ইত্যাদির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ভারতের পুঁজিবাদকে তাই সামন্ততন্ত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। টিকে থাকার জন্য ও ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে সামন্ততান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির সঙ্গে আপসরফার জন্য পুঁজিবাদকে অনেক ক্ষেত্রে ঐ শক্তিগুলির পরিপোষক ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাতিগত কুসংস্কারাচ্ছন্ন নীতিগুলিকে মেনে নিতে হয়েছে। এইভাবে দেখা যায় যে, ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণী পুরসমাজে তার একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারে ব্যর্থ হয়েছে; নৃকুলগত আনুগত্য দুর করা সম্ভব হয় নি। এর ফলে, ভারতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

স্বাধীনতা অব্যবহিত পর থেকে ১৯৬০ এর দশকে মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সর্বভারতীয় বাজারকে দখলে রাখার জন্য রাজনীতিক ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রাভিমুখী প্রবণতাকে শক্তিশালী করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ভেঙে পড়েছিল। বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রবিরোধী শক্তি ক্ষমতায় এসেছে। এর ফলে এতদিন যে সমস্ত ছোট স্থানীয় পুঁজিপতি বৃহৎ পুঁজিপতিদের আগ্রাসনে স্থানীয় বাজার দখল করতে পারছিল না, তারা এবার বাজার দখলের সুযোগ পেতে থাকে। বাজার অর্থনীতির নিয়মেই গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণী, ব্যবসায় সম্প্রদায়, ছোট ছোট শিল্পপতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী নতুন নতুন পুঁজিবাদী শিল্পোদ্যগে অর্থবিনিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছে। তাদের লক্ষ্য স্থানীয় বা আঞ্চলিক বাজার দখল করা। স্বভবতই সর্বভারতীয় বাজারের নিয়ন্ত্রক বৃহৎ পণুজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে উদীয়মান আঞ্চলিক পুঁজিপতি শ্রেণী সমূহের বিরোধ অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছে। ভারতীয়পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। সর্বভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের সঙ্গে এই বিরোধ ক্ষুদ্র স্থানীয় পুঁজিপতিরা তাদের স্বার্থ সহায়ক নীতি প্রণয়নের দাবি করে এবং এজন্য তাদের প্রয়োজন হয় স্থানীয় শাসকশ্রেণী, স্থানীয় ক্ষমতাশালী ও চাপ সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহের সাহায্যে, যেগুলি আবার সনাতনী সমাজব্যবস্থায় বহুলাংশে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলি ওপর প্রতিষ্ঠিত। এদের আনুকুল্য লাভের জন্য তাই তাদের অনেক আঞ্চলিক দাবি যা আবার সঙ্কীর্ণ ভাষা, সম্প্রদায়, জাতিগত ইত্যাদি ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলিকে স্থানীয় পুঁজিপতিদের মেনে নিতে হয় ও সমর্থন করতে হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, ভারতের বহুমাত্রিক সামাজিক পটভূমিকায় পুঁজিবাদের অসমবিকাশ এবং দুর্বল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দিয়েছে।

ভারতে পুঁজিবাদের অসম বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই আঞ্চলিকভাবেই আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। ঔপনিবেশিক প্রভুরাই এই আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল; কিন্তু স্বাধীন ভারতের নীতিও এই বৈষম্য দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৬৭ সালে 'হাজারি রিপোর্ট' এ বলা হয়েছে যে, বেশীর ভাগ মারোয়াড়ি, গুজরাটী এবং পার্সিদের বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবাংলা ও মাদ্রাজে (তামিলনাড়ুতে)। ১৯৯৭-৯৮ সালের মাথাপিছু গড় উৎপাদনে হিসাবে অনুযায়ী দেখা গেছে যে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র এবং

হরিয়ানা ক্রমশ এগিয়ে গেছে; অপরদিকে বিহার মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে।[১] দেখা গেছে যে, বিহারের মাথা পিছু আয় পাঞ্জাবের মাথাপিছু আয়ের ২৩.৯ শতাংশ। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অসমবিকাশের ফলশ্রুতি হিসাবেই শিল্পের একপেশে বিকাশ ঘটেছে এবং তা আঞ্চলিক বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছে। সবুজ বিপ্লবের ফলেও এই বৈষম্যের প্রক্রিয়া তীব্রতর হয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশেই এর ফল আরো উন্নত হয়েছে। সারাদেশে এই অসম আর্থনীতিক বিকাশের এক অন্যতম কারণ। অবহেলিত রাজ্যগুলির অধিবাসীদের মনে এই ধারণা শক্তিশালী হয়েছে যে, দেশের লভ্য সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বঞ্চিত করেছে। এর প্রতিবাদে তারা বন্টনমূলক ন্যায়ের প্রত্যাশায় আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির রাজনীতিক নেতারা এই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, আসামে অসম গণপরিষদের নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলন, বোড়ো আন্দোলন এই ধরণের আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনের উদাহরণ।

অসম আর্থনীতিক বিকাশ উপ-আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনেরও অন্যতম কারণ রূপে দেখা দিয়েছে। অবহেলিত অঙ্গরাজ্যগুলির অনগ্রসর অঞ্চলের অধিবাসীরা অসম আর্থনীতিক বিকাশের শিকার হয়েছে। ভারতের রাজ্য-রাজনীতির প্রবণতা থেকে বোঝা যায় যে, আর্থনীতিক দিক থেকে উন্নত অঞ্চলগুলি রাজ্যের রাজনীতিক কাঠামোতেও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুযোগ সুবিধা উন্নত অঞ্চলগুলিই ভোগ করে থাকে, অনগ্রসর অঞ্চলগুলি তার থেকে বঞ্চিত থাকে। এর ফলে বন্টনমূলক ন্যায়নীতির পক্ষে আঞ্চলিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ নতুন রাজ্য গঠনের দাবি মূলত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে। তেলেঙ্গানা আন্দোলন এই ধরণের আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনের অন্যতম দৃষ্টান্ত। জম্মু ও কাশ্মীরে জম্মু ও লাদাখ অঞ্চলের অধিবাসীরা, পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং এর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীর ও মনে করে যে সংশ্লিষ্ট রাজ্য তাদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করেছে। তাই তারা স্বাতন্ত্র্যের দাবী তুলে আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী ব্যর্থতা আর্থনীতিক অসম বিকাশকে বাড়িয়ে তুলেছে। যদিও আর্থনীতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা, পরিকল্পনার নীতি নির্ধারকগণ আঞ্চলিক বৈষম্য দূকীকরণ অপেক্ষা আর্থনীতিক বিকাশের উচ্চ হারকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বেশী। স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক দুযোর্গে বিপন্ন কিছু অঞ্চল ছাড়া আঞ্চলিক বৈষম্যের সমস্যা বিশেষ কোন গুরুত্ব পায়নি। ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজ্যগুলির আর্থনীতিক উন্নয়নে অনেকাংশে নির্ভর করে কেন্দ্রের অনুদানের ওপর। সাধারণত দু'ধরণের অনুদানের ব্যবস্থা আছে- স্বেচ্ছাধীন ও বিধিবদ্ধ। বিধিবদ্ধ অনুদান অর্থকমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দেওয়া হয়। অপরদিকে স্বোচ্ছাধীন অনুদান পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ প্রদান করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন অর্থ কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থা নয়। এটি সংবিধান বহির্ভূত প্রশাসনিক সংস্থা, যার প্রধান প্রধানমন্ত্রী নিজে অথবা তাঁর খুব বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। স্বাভাবিকভাবেই এই সংস্থার রাজনীতিক প্রবণতা থাকে। অথচ বর্তমান অর্থ কমিশনের তুলনায় পরিকল্পনা কমিশন এই যুক্তরাষ্ট্রীয় অনুদান বন্টনের ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ইচ্ছাধীন অনুদান আবার শর্তসাপেক্ষ। এর প্রায় ৩০ শতাংশ অপরিশোধযোগ্য এবং প্রায় ৭০ শতাংশ পরিশোধযোগ্য ঋণ। কম অর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন

---

১. S.K. Misra and V.K. Puri, India Economy, Himalaya Publishing House, Delhi, 2000, PP. 335-336.

রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে হার ঠিক বিপরীত হওয়া উচিত ছিল। তা না হওয়ার বড় ও সম্পন্ন রাজ্যগুলির তুলনায় ছোট রাজ্যগুলির ঋণ পরিশোধক বাবদ আর্থিক অনুপাত অনেক বেশী হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য আরও বাড়ে। ভারতের মতো বহুমাত্রিক সমাজে এই ধরণের বৈষম্য নতুন করে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সৃষ্টি করেছে, যার ফলে ভারতের জাতীয় ঐক্য এক চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন হয়ে পড়েছে।

১.৪.২ রাজনীতিক কারণ

অনেক সময় রাজনীতিক প্রধান্য, রাজনীতিক অস্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে আঞ্চলিকতাবাদী মনোভাব গড়ে ওঠে। রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ আঞ্চলিক বঞ্চনার মনোভাবকে তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের ভিত্তিতে আন্দোলনে রূপান্তরিত করে। এটা সকলেরই জানা যে, কংগ্রেস দলের মধ্যে অন্তর্বিরোধ তেলেঙ্গনা আন্দোলনকে সজীব করে তুলেছে। ১৯৬০ এর দশকে মাঝামাঝি সময় থেকে কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য বিনষ্ট হোল, সে সময় থেকেই ভারতে আঞ্চলিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই আঞ্চলিক দলগুলির অধিকাংশ হোল অঞ্চলের ভাষা ধর্ম, জাতিসত্তাভিত্তিক। যেমন তেলেগু দেশম ভাষাভিত্তিক, আকালি দল ধর্মভিত্তিক, জি.এন.এল.এফ জাতিসত্তাভিত্তিক ইত্যাদি। এই সমস্ত দলগুলি নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অঞ্চলের স্বার্থের ওপর জোর দেয়, যা তীব্র আঞ্চলিকতাবাদে পরিণত হতে পারে।

ভাষাভিত্তিক রাজ্যপুনর্গঠন ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। বরং এর দ্বারা স্থানীয় এলিটদের হাত শক্ত করা হয়েছে। এই ধরনের স্থানীয় এলিটদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় জোতদার, ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি, উচ্চবর্ণের মানুষ, বুদ্ধিজীবী, পেশাদার মানুষ ইত্যাদি। এদের স্থানীয় মানুষ সম্ভ্রমের চোখে দেখে। এই এলিট শ্রেণী মিশ্র সংস্কৃতির ব্যবস্থায় জাতিসত্তার বিভিন্নতাকে হাতিয়ার করে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। তারা স্থানীয় মানুষকে তাদের জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য এবং অপর গোষ্ঠী থেকে তাদের স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে সচেতন করাতে থাকে। এইভাবে তারা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে একটি আঞ্চলিক ভাবাদর্শ তৈরী করে; ঐ জাতিগোষ্টীর মানুষকে বোঝায় তারা বঞ্চিত, অবহেলিত শুধুমাত্র ভিন্ন জাতিসত্তার জন্য। এইভাবে ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে পরিচয়ের সঙ্কট তৈরী হয়, যা পরবর্তীকালে আঞ্চলিক আন্দোলনের রূপ নেয়। স্থানীয় এলিট শ্রেণীর এই ভূমিকার পিছনে থাকে তাদের নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখা ও কর্তৃত্বের বৈধতালাভের লিপ্সা। নিজেদের রাজনীতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য জাতিগোষ্ঠীর সামনে কোনও না কোন সমস্যা তারা খাড়া করিয়ে রাখে। যেমন দার্জিলিঙে সুভাষ ঘিসিং-এর ভূমিকা উল্লেখ করা যেতে পারে। দার্জিলিঙ গোর্খা হিল কাউন্সিল গঠিত হোলেও, গোর্খালী ভাষার স্বীকৃতির দাবি তোলা হচ্ছে। এইভাবে দেখা যায় যে, দেশের রাজনীতিক জীবন সর্বভারতীয় স্তর থেকে আঞ্চলিক স্তরে স্থানপরিবর্তন করেছে।[১]

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। কেন্দ্রীকরণের পক্ষে যে-সব যুক্তিই খাড়া করা হোক না কেন, ঘটনা হোল এই যে, আয়ের অভাবে রাজ্যগুলি তাদের জনগণের ক্রমবর্ধমান সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নতি বিধানের দাবি পুরণে ব্যর্থ হচ্ছে।

১. A.K. Majumdar and Bhanwar Singh(ed.), Regionalism in India Politics, Radha Publications, New Delhi, 1997, P.36

স্বাধীনতার পর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দল একটানা ছাব্বিশ বছর কেন্দ্রে ও প্রায় সকল অঙ্গরাজ্যে ক্ষমতাসীন ছিল। কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে একই রাজনীতিক দল দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাসীন থাকার ফলে সেই দলের নীতি ও নির্দেশ অনুসারে সমগ্র দেশের শাসনকার্য পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। দলীয় হাইকমাণ্ডের নির্দেশে যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়েছে। রাজ্যস্তরের নেতারা ক্ষমতার লোভে বা ভয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করেনি। কিন্তু ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে রাজনীতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী মনোভাব মাথাচড়া দিয়ে উঠেছে। দীর্ঘকালীন এককেন্দ্রিকতার প্রবণতার বিরুদ্ধে অঙ্গরাজ্যগুলি অধিক ক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে নিয়ে সোচ্চার হয়েছে। কেন্দ্রিয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনের অভিব্যক্তি ঘটেছে। কেন্দ্রপ্রবণতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত গোষ্ঠী আঞ্চলিকতাবাদী বিভিন্ন আন্দোলন ও বিক্ষোভকে সমর্থন জানানোর ফলে আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতিক শক্তিগুলি মাথাচড়া দিয়ে উঠেছে।

ভারতের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠার পিছনে বিদেশী শক্তিগুলির ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়।[১] নয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কাছে ভারতের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছে। সেইজন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ভারতে অনুপ্রবেশ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। গত দুই দশক ধরে বিভিন্ন পুঁজিবাদী সংস্থা, বিভিন্ন কৌশলে ভরতের রাজনীতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। যেমন, গ্রামীণ ও উপজাতি অঞ্চলে আন্তজার্তিক লগ্নীপুঁজির ব্যাপারী কর্তৃক সাহায্যপুষ্ট বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করে গোষ্ঠীচেতনা ও আঞ্চলিক মনোভাবকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন জাতীয়-গোষ্ঠীর মধ্যে যে হতাশা ও বঞ্চনার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলিকে কাজে লাগাচ্ছে পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদী দেশগুলি। এইভাবে দেখা যায় যে, এই সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলি উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে আঞ্চলিকতাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে ঘটাতে সাহায্য করছে। পৃথক শিখ রাষ্ট্র গঠনের জন্য মতাদর্শগত ও আর্থিক সমর্থন প্রদান করছিল আন্তজার্তিক শিখ সমাজের পুঁজিপতি সদস্যগণ।

১.৪.৩ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ

জাত, ধর্ম, ভাষা, নৃকুলত্ব (ethnicity) প্রভৃতি সামাজিক-সংস্কৃতিক উপাদান ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ভারতের বিভিন্ন অংশে এই উপাদানগুলি হয় এককভাবে, না হয় সম্মিলিতভাবে আঞ্চলিক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে।

জাতব্যবস্থা ভারতীয় রাজনীতির এক অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। যদিও আঞ্চলিকতাবাদের প্রেক্ষিতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতের ভূমিকা প্রান্তীয়, কিন্তু উপ-আঞ্চলিকতাবাদের প্রেক্ষিতে এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। আঞ্চলিক জাত-কাঠামোর ভিত্তিতে 'আঞ্চলিক পরিচিতি' গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে আঞ্চলিক জাত-সংঘগুলি ভরতের অনেক অংশে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই সংঘগুলি সনাতনী ভাবধারা-পুষ্ট অসংগঠিত জাতগোষ্ঠীগুলিকে রাজনীতিক দিক থেকে সক্রিয় করে তুলেছে। এদের

১. Ibid. pp. 45-46

সাহায্য নিয়ে আঞ্চলিক এলিটরা কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়ে পড়েছে। প্রধান্য বিস্তরকারী জাত গোষ্ঠীগুলি তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে জাতভিত্তিক ঐক্যকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়েছে। প্রাধান্য বিস্তারকারী জাতের বিরুদ্ধে অপর জাতের মধ্যে শোষণ ও বঞ্চণার অনুভূতি জেগে ওঠে। এইভাবে জাতব্যবস্থা একটা অঞ্চলের জনগণের মনে জাতোন্মত্ততার সৃষ্টি করে; জাতপাতের প্রশ্নকে সামনে রেখে তাদের বঞ্চনার ভাববেগকে উদ্দীপ্ত করে তোলে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আঞ্চলিকতাবাদ এবং উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ বহুজাত ভিত্তিক আঞ্চলিকতাবাদ লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মাণ্য গোষ্ঠীর আর্থ-সামজিক শোষণের বিরুদ্ধে অ-ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর প্রতিবাদ আন্দোলন জাতব্যবস্থা জনিত আঞ্চলিকতাবাদে পরিণত হয়েছে। বস্তুত, এই ধরণের আন্দোলন থেকে 'দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম' (DMK) এর মতো আঞ্চলিক দলের উদ্ভব হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক ধর্মীয় গোষ্ঠী অবস্থান করেছে। তাই এখানে রাষ্ট্র ও পুরসমাজের সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মিত হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরপ্রণালীর সমন্বয়ে। গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য এবং সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে অধিকারবোধের সৃষ্টি হয়েছে। এই অধিকার অর্জনের লড়াইতে ধর্মীয় পরিচিতির ব্যবহার অনেক সময় আঞ্চলিকতাবাদের সৃষ্টি করছে। নিছক ধর্মীয় আচরণ আঞ্চলিকতাবাদের সৃষ্টি করে না। এই ধর্মীয় আচরণ যখন গোঁড়ামির পর্যায়ে চলে যায় এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগনের মনে অঞ্চলপ্রীতির জন্ম হয়, তখন তা আঞ্চলিকতাবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যখন কোন সংখ্যাগুরু ধর্মীয় গোষ্ঠী কোন অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন রাজনীতিতে প্রধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্য এই গোষ্ঠী স্বীয় এলাকায়, ধর্মীয় চেতনা গড়ে তোলে। পাঞ্জাবের 'আকালি রাজনীতি' হোল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অপরদিকে, সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপত্তার অভাবজনিত মনোভাব ঐ গোষ্ঠীকে সংখ্যাগুরু-প্রাধান্যের আশঙ্কায় সচেতন আঞ্চলিক সম্প্রদায়ে পরিণত করে।

আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পরিচিতি গঠনে সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাদান হিসাবে ভাষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন হওয়ার পর থেকে অন্তঃরাজ্য সংহতি ও সমরূপতা বৃদ্ধি পেতে থকে; তবে সংখ্যালুঘু সমস্যা সব রাজ্যেই যন্ত্রণা দিতে থাকে। ভাষাগত ঐক্যবোধ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকেই আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দেয়। ইতিবাচক দিক থেকে ভাষাগত সমরূপতা একই ভাষাভাষী জনগনের মধ্যে একতা সূচিত করে। এই ধরণের ঐক্যের ফলে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আর্থ-রাজনীতিক দিক থেকে উন্নত হওয়ার আকাঙ্খা লক্ষ করা যায়। সম্ভবতঃ এই যুক্তিতেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম দশকের মধ্যেই ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নেতিবাচক দিক থেকে ভাষাগত ঐক্যবোধ আবেগের উন্মাদনা সৃষ্টি করে। সমভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে অন্য বৃহৎ ভাষা গোষ্ঠীর দ্বারা শোষিত হওয়ার আশাঙ্কা থকে। একই রাজ্যের অধিবাসী হলেও ভাষাগত দ্বন্দ্বের জন্য বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর প্রতি তাদের দ্বেষ ও বৈরিতার মনোভাব প্রকাশ পায়, যা পরবর্তীকালে আঞ্চলিকতাবাদকে পুষ্ট করে তোলে। রাজ্যপুর্নগঠন কমিশনের কার্যকালে পুরুলিয়ার বাঙালীদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে মানভূম জেলার ১৯টি থানাকে কমিশন বিহার থেকে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাব মেনে নেয়। বহু রাজ্যেই ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ওপর বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর অধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিংসার

আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। আসামে বিভিন্ন সময়ে বাঙালী বিরোধী আন্দোলন তীব্র রূপ নিয়েছিল। সংখ্যালঘু ভাষা গোষ্ঠীগুলিও নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি সংরক্ষণের জন্য এবং আত্তিকরণের বিরুদ্ধে নিজেদের মর্যাদা রক্ষার জন্য সচেতন হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিকালে ভারতীয় রাজনীতিতে নৃকুলগত (ethnic) দিকের প্রাধান্য এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণ ব্যাখ্যা করতে নৃকুলগত জাতীয়তাবাদ, নৃকুলগত আঞ্চলিকতাবাদ, নৃকুলত্বের রাজনীতিকরণ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নৃকুলত্ব হোল একটি সমাজতাত্ত্বিক ধরণা যার মাধ্যমে বিশেষ নৃকুলগত গোষ্ঠী-অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অনেকসময় কোন নৃকুলগত গোষ্ঠী তার আদিকলীন পরিচিতিকে ব্যবহার করে আর্থসামাজিক ও সংস্কৃতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। সংকীর্ণ স্বজাতিকেন্দ্রীকতাকে অবলম্বন করে আঞ্চলিকতাবাদ পুষ্ট হয়। উত্তরবঙ্গে কামতাপুরী আন্দোলন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একটি বিশেষ অঞ্চলের লভ্য সম্পদের ওপর ঐ অঞ্চলের নৃকুলগত গোষ্ঠী যখন অগ্রাধিকারের জাবি জানায় এবং ঐ দাবিকে কেন্দ্র করে ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়, তখনই তারা আঞ্চলিকতার পথে পা বাড়ায়। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষার প্রসার, বাজারের ক্ষেত্রবিস্তার ইত্যাদির ফলে এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে। এর ফলে আর্থনীতিক ভারসাম্যের পরিবর্তনের আশঙ্কায় ঐ অঞ্চলের ভূমিপুত্রেরা নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতি ও নৃকুলগত সংসক্তি টিকিয়ে রাখার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়। তারা মনে করে যে, বহিরাগতদের জন্য তাদের নিজস্ব সীমিত সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ করে আর্থনীতিক সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আবার বহিরাগত জন্য তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিও বিনষ্ট হচ্ছে বলে তারা ভীত হয়। এই মানসিকতা বহুক্ষেত্রে ভারতে আঞ্চলিক আন্দোলনে তাব্রতর করছে। আসামে সেই ষাটের দশক থেকে বারে বারে 'বাঙাল খেদাও' আন্দোলন, মহারাষ্ট্রের শিবসেনার অমারাঠি এবং অহিন্দুদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, হিন্দীভাষাকেসরকারী ভাষার স্বীকৃতির বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভরতের দ্রাবিড় আন্দোলন দ্রাবিড় আন্দোলন হোল জ্বলন্ত প্রমাণ। তবে এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় এলিট শ্রেণীর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ কায়েম করার জন্য আদিকালীন সামাজিক কাঠামো এবং অপেক্ষাকৃত অগ্রবর্তী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করছিল। শিক্ষার প্রসার, প্রশাসনিক পরিকাঠামো, এককথায় আর্থনীতিক আধুনিকীকরণের সকল ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল অগ্রবর্তী গোষ্ঠীগুলির অঞ্চলগুলিতে। একটু পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলিতে, বিশেষ করে দুর্গম সঙ্কুল অঞ্চলগুলিতে, আধুনিক উন্নয়নের আলো পৌঁছায়নি। ফলে উন্নত ও অনুন্নত অঞ্চলগুলির যে বৈষম্য আগে থেকে থাকলেও স্পষ্ট ছিল না, এবার তা স্পষ্ট মাত্রা লাভ করল। ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিল এগিয়ে থাকা অঞ্চলগুলির নেতৃত্বের কাছে, যারা গড়ে তুলেছিল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তি। উন্নত ও অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীরা বুঝতে পারছে তাদের দীর্ঘকালীন বঞ্চনার কথা। তাই তারা নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার জন্য রুখে দাঁড়াচ্ছে। ভারতের রাজনীতিও হয়ে পড়েছে সংখ্যার খেলার মাধ্যমে ক্ষমতার টিকে থাকার লড়াই।[১] এই লড়াইতে রাজনীতির নৃকুলত্বকরণ (ethnicization of politics) ঘটেছে নৃকুলগত অথবা আঞ্চলিক ভিত্তিতে সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টার মধ্যে।

---

১. Rajni Kothari, State Against Democracy : In Seach of Humane Governance, 1988, Ajanta, Delhi.

২. A. K. Majumdar and Bhanwar Singh (ed), 1997, Regionalism in Indian Politics, Radha Publications, New Delhi, PP 135-136

১.৪.৪ মনস্তাত্ত্বিক কারণ

আঞ্চলিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার জন্য অনেক সময় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের মানসিক অবস্থা কাজ করে থাকে। কোন অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রতীক সমূহ কিছু মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের জন্ম দেয়, যা আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভবের কারণ হয়। প্রকৃতিগত দিক থেকে মানুষ দূরের বড় সমস্যা থেকে কাছের সমস্যা সমাধানের বেশী আগ্রহী হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডাল (Dahl) মার্কিন রাজ্য-রাজনীতির প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নাগরিকদের এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে একজন নাগরিকদের কাছে জাতীয় স্তরের রাজনীতি অপেক্ষা স্থানীয় বা রাজ্য রাজনীতির প্রতি আগ্রহ অনেক বেশী। নিজ অঞ্চলের দাবি-দাওয়া পূরণের ব্যাপারকে সে অগ্রাধিকার দেয়। এর। ফলে আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তামিলনাড়ুর ডি.এম.কে. (DMK) দলের উদ্ভব এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উত্তর-দক্ষিণ বিবাদ, আসাম, পাঞ্জাব প্রমুখ রাজ্যে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ - এসবেরই উৎস হোল মনস্তাত্ত্বিক। ভূমিপুত্রের নীতির ভিত্তিতে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকেও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারে গণ্য করা যেতে পারে।

মন্তব্য ঃ ভারতের আঞ্চলিকতাবাদের কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে আঞ্চলিকতাবাদ আর্থনীতিক, রাজনীতিক-প্রশাসনিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের জটিল সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে কার প্রাধান্য বেশী - সে সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যদিও প্রাথমিকভাবে আর্থনীতিক কারণকে প্রধান কারণ বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে আঞ্চলিকতাবাদের বিভিন্ন কারণের মধ্যে অধিক্রমণ (overlapping) লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে গড়ে ওঠা আঞ্চলিকতাবাদ অপেক্ষা আর্থনীতিক সমস্যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আঞ্চলিকতাবাদ কম উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছে।[২] তাছাড়া, আর্থনীতিক উন্নয়নের অভাবকেই সব সময় আঞ্চলিকতাবাদের অন্যতম উৎসরূপে গণ্য করা যেতে পারে না। পাঞ্জাবে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আর্থনীতিক উন্নয়ন সব থেকে বেশী ঘটেছে। অথচ পাঞ্জাবে আঞ্চলিক রাজনীতির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের কারণগুলি আন্তঃসম্পর্ক যুক্ত; আর্থনীতিক উপাদান অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন ধরণের আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভব ঘটিয়েছে।

অনুশীলনী — ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। পুঁজিবাদের অসম বিকাশ কীভাবে ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন?

২। ভরতে আঞ্চলিকতাবাদ বিকাশের আর্থনীতিক কারণগুলি কী?

৩। আঞ্চলিক দলগুলি কীভাবে ভারতে আঞ্চলিকতাবাদকে শক্তিশালী করেছে?

৪। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কি ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৫। ভূমিপুত্রের ধারণা কী?

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। তুমি কি মনে কর যে, ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের প্রবণতা শক্তিশালী হয়ে ওঠার পিঠনে আর্থনীতিক। করণই প্রধান করণ? তোমার উত্তরে সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

১.৫ আঞ্চলিকতাবাদের প্রকারভেদ

ভারত একটি বিরাট ও বহু বিচিত্র সাংস্কৃতিক দেশ। এই বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থার ফল হিসাবেই এখানে আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে উঠেছে। তাই ভারতীয় আঞ্চলিকতাবাদ হল একটি বহুমাত্রিক ঘটনা। এই বহুবিধ অভিব্যাক্তি লক্ষ করা যায়। দেশের বিভিন্ন অংশে অঞ্চলিকতাবাদ বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। এদের মোটামুটি দুটি বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা ঃ ভৌগোলিক পরিধি সম্পৃক্ত আঞ্চলিকতাবাদ এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য ভিত্তিক আঞ্চলিকতাবাদ। এই দুটি ধরণকে আবার কয়েকটি ছোট ছোট শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যদিও আঞ্চলিকতাবাদকে কয়েকটি সাধারন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়, এর ধরণগুলির মধ্যে অধিক্রমণকারী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় এবং প্রতি ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে অসম উন্নয়নের লক্ষণ দেখা যায়।[১]

১.৫.১ ভৌগলিক সীমার ভিত্তিতে আঞ্চলিকতাবাদ

যেহেতু আঞ্চলিকতাবাদ এতটি নির্দ্দিষ্ট ভূখন্ড বা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তাই সংশ্লিষ্ট ভূখন্ড বা অঞ্চলের সীমানার ওপর ভিত্তি করে আঞ্চলিকতাবাদকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অধ্যাপক ইকবাল নারায়ণ এই দিক থেকে তিন প্রকার আঞ্চলিকতাবাদের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল - রাজ্য সীমাতিক্রান্ত আঞ্চলিকতাবাদ (Supra-State regionalism), আন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ (Inter-State regioalism) এবং অন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ (Inter-State regioalism)।[২]

১.৫.১.১ রাজ্য সীমাতিক্রান্ত আঞ্চলিকতাবাদ

এই ধরণের আঞ্চলিকতাবাদ নির্দ্দিষ্ট কোন রাজ্যের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না; এর প্রভাব রাজনীতিক ভূখন্ডের বাইরে ছড়িয়ে যায়। রাজ্য সীমাতিক্রান্ত আঞ্চলিকতাবাদ প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি রাজ্যের গোষ্ঠীগত অভিন্নতার মনোভাবের প্রকাশ। রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় এক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজ্য-গোষ্ঠীর অথবা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই গোষ্ঠীগত অভিন্নতা সাধারণত নেতিবাচক প্রকৃতির হয়, অন্য গোষ্ঠীর বিরোধিতা করে। কোন নির্দ্দিষ্ট সমস্যাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীভুক্ত রাজ্যগুলি অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে; কিন্তু কখনোই রাজ্যের পরিচিতি গোষ্ঠী পরিচিতির সঙ্গে সামগ্রিকভাবে এক হয়ে যায় না। এইভাবে তাদের মধ্যে একধরণের আঞ্চলিকতাবাদী মনোভাব জন্ম নেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক - এই চারটি রাজ্যের মধ্যে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং সীমানা ও নদীর জলবন্টন সংক্রান্ত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার যখন হিন্দীভাষাকে সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হয় তখন উক্ত রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপকে দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির ও সভ্যতার ওপর 'হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ' এর আক্রমণ বলে মনে করেছিল। এর ফলে ঐ রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং দক্ষিণভারত বনাম উত্তরভারত দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

১. A.K. Majumdar of Bhanwar Singh (ed), P. 148

২. Iqbal Narain, "A conceptual Analysis in the Indian Context", in Akhtar Majeed (ed) 1984, Regionalism : Development Trends in India, COSMO Publications, New Delhi, p. 32.

১.৫.১.২ আন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ

আন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ একটি বিশেষ রাজ্যের ভৌগলিক সীমানার সঙ্গে সমব্যাপ্ত থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে নিজ স্বার্থের অগ্রাধিকারের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বিরোধিতা থাকে। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে আন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকতাবাদ জন্ম হয়। এই ধরণের আঞ্চলিকতাবাদ কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলন রূপেও দেখা দেয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের মধ্যে সুলতেজ নদীর জলবন্টন, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের মধ্যে কাবেরী নদীর জলবন্টন এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিরোধগুলি এই ধরণের আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনের উদাহরণ।

১.৫.১.৩ অন্তঃরাজ্য আঞ্চলিকবাদ

অন্তঃরাজ্য আঞ্চিলকতাবাদের অপর নাম হল উপ-আঞ্চলিকতাবাদের (Sub-regionalism)। একই রাজ্যের মধ্যে কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা যখন মনে করে যে, তাদের ইতিহাস এক ও অভিন্ন এবং ভৌগলিক, ভাষাগত, নৃকুলগত ও সামাজিক দিক থেকে ঐ রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে তাদের পৃথক পরিচিতি আছে, তখন এই ধরণের আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম হয়। একই সঙ্গে তাদের এও মনে হয় যে, ঐ রাজ্যের অন্যান্য অধিবাসীদের তুলনায় তারা তাদের ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইতিবাচক দিক থেকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বঞ্চনার মনোভাব গড়ে ওঠে। এর ফলে, একদিকে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের পরস্পরের প্রতি গভীর নৈকট্য (we feeling), অন্যদিকে পাশাপাশি অঞ্চলের প্রতি স্বাতন্ত্রবোধ (they feeling) জন্মায়। এই ধরণের অনুভূতি ঐ বিশেষ অঞ্চলে উপ-আঞ্চলিকতাবাদের সৃষ্টি করে। অন্য দু'ধরণের আঞ্চলিকতাবাদ থেকে এই ধরণের আঞ্চলিকতাবাদের পার্থক্য হল এই যে, এতে কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিরোদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই উপআঞ্চলিকতাবাদে রাজ্যের কাছ থেকে ন্যায্য ও সমদৃষ্টিসম্পন্ন আচরণ দাবি করা হয় এবং পৃথক রাজনীতিক ও প্রশাসনিক একক গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা হয়। জম্মু ও কাশ্মীরে সমতলভূমি ও পার্বত্য এলাকার মধ্যে বিরোধ, অন্ধ্রের তেলেঙ্গানা আন্দোলন, মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গ গোর্খা আন্দোলন প্রভৃতি হোল এই ধরণের আঞ্চলিকতাবাদের প্রকাশ।

১.৫.২ চূড়ান্ত লক্ষ্য-ভিত্তিক আঞ্চলিকতাবাদ

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে আঞ্চলিকতাবাদ বিশেষ ধরণের লক্ষ্য অর্জনকে সামনে রেখে গড়ে ওঠে। এই ভিত্তিতেও আঞ্চলিকতাবাদের বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিতি হয়। তবে এদিক থেকে আঞ্চলিকতাবাদকে দুটি বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা - সাংবধানিক আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাকামী আঞ্চলিকতাবাদ। সাংবিধানিক আঞ্চলিকতাবাদ ভারতের সাংবিধানিক আঞ্চলিকতাবাদ ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে। অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাকামী আঞ্চলিকতাবাদ ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

১.৫.২.১ সাংবিধানিক আঞ্চলিকতাবাদ

ভারতের মতো বহুবিচিত্র সংস্কৃতির দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রবর্তিত করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে যে বিভিন্ন ধরণের আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান ও জাতীয় সংহতিকে অস্বীকার করেনি। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন এই যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করেই করা হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে রাজ্যগুলি আরো অন্য ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। রাজ্যগুলি আঞ্চলিক এলিট গোষ্ঠীর ক্ষমতা বিস্তারের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ভূস্বামী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, জাতপ্রধান, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদিকে নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক এলিট গোষ্ঠীগুলি স্থানীয় প্রভাবশালী জাত, সম্প্রদায় বা ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনীতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে রাজ্য রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে থাকে। অসম অর্থনীতিক বিকাশের জন্য বহু অনুন্নত অঞ্চলেই আপেক্ষিক বঞ্চনার মনোভাব গড়ে ওঠে। আঞ্চলিক এলিট গোষ্ঠী এই বঞ্চনার মনোভাবকে মূলধন করে আন্দোলন গড়ে তোলে। অসমীয়াদের আন্দোলন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ সব আন্দোলনকে সাংবিধানিক আঞ্চলিক আন্দোলন বলা যায়।

ভূমিপত্র নীতির ভিত্তিতে আন্দোলনও সাংবিধানিক আঞ্চলিকতাবাদেরই অন্তর্গত। এর বীজ নিহিত আছে সংবিধানের মধ্যেই। অনুচ্ছেদ ১৬(৩) অনুযায়ী, পার্লামেন্ট আইন পাশ করে কোন অঞ্চলে বসবাসগত যোগ্যতাকে অন্যতম শর্ত হিসেবে আরোপ করতে পারে। এর ভিত্তিতে আসাম শুধু অসমীয়াদের জন্য, মহারাষ্ট্র শুধু মারাঠীদের জন্য, তামিলনাড়ু শুধু তামিলদের জন্য প্রভৃতি জঙ্গি শ্লোগান তোলা হয়েছিল। ভাষাগত জাতীয়তাবাদ ও উপজাতীয় জাতীয়তাবাদ উত্তর-পূর্ব ভারতে আঞ্চলিকতাবাদকে নতুন রূপ দিয়েছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন (১৯৬৭) এর পর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রবিরোধী রাজনীতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যগুলির হাতে অধিক ক্ষমতা দেবার দাবি তুলেছে ও আঞ্চলিকতাবাদের নতুন দিকের উন্মোচন ঘটিয়েছে। একটি অঙ্গরাজ্যের অভ্যন্তরে বিশেষ এক অঞ্চলের বা পরস্পর সংলগ্ন একাধিক অঞ্চলের জনগণের মধ্যে পৃথক অঙ্গরাজ্যের দাবীতেও সাংবিধানিক আঞ্চলিকতাবদের জন্ম হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল –- সাংবিধানিক গন্ডীর মধ্যে থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র আর্থ-রাজনীতিক সত্তা অর্জন করা, যাতে ঐ অধিবাসীরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিখাশ ঘটাতে পারে।

১.৫.২.২ বিচ্ছিন্নকামী আঞ্চলিকতাবাদ

আঞ্চলিকতাবাদের চরমতম রূপ হল বিচ্ছিন্নতাকামী আঞ্চলিক আন্দোলন। সাংবিধানিক আঞ্চলিক আন্দোলনগুলি জাতিসত্তার আত্মবিকাশের অভিব্যক্তিরূপে দেখা দিলেও ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতাকে অস্বীকার করে নি। তারা বরং বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই আরোও বেশী স্বায়ত্তশাসনমূলক ক্ষমতা আদায় করে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আর্থনীতিক স্বার্থকে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু আঞ্চলিক আন্দোলন অনেক সময় চরম আকার ধারণ করে যখন তা একটা অঞ্চলকে মূল ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। ঐ বিশেষ অঞ্চলের জনগণ মনে করে যে, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়, তাদের ন্যায্য দাবি দাওয়ার বিরোধী এবং ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে থাকলে তারা আরও বেশী করে বঞ্চিত হবে। তাই তারা আরও বেশী করে বঞ্চিত হবে। তাই তারা স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে চায়।

পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও নাগাল্যান্ডে যে আঞ্চলিকতাবদের জন্ম হয়েছে তা ভারতের ভৌগলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এই ধরণের আঞ্চলিকতাবাদ ভারতের জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক; তাই একে বিচ্ছিন্নতাকামী আঞ্চলিকতাবাদ বলে গণ্য করা হয়। পাঞ্জাবে খালিস্তানী আন্দোলন ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে আকালি রাজনীতির চরম পরিণতি হোল জগজিৎ সিং চৌহানের নেতৃত্বে পরিচালিত খালিস্তান আন্দোলন, যা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে শিখ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে খালিস্তান নামে সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এই আন্দোলনকে প্রশমিত করতে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা দু'টি রাজ্যের সৃষ্টি হয় এবং চন্ডীগড় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা পায়। কাশ্মীরি জনগণের মধ্যে গড়ে উঠেছে আর্থনীতিক বঞ্চনার মনোভাব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভৌগলিক সাদৃশ্য, লৌকিক সংস্কৃতির বিশিষ্টতা ও কাশ্মীরি সভ্যতার সাধারণ ঐতিহ্য। তাছাড়া রয়েছে বিদেশী হস্তক্ষেপ ও অনুপ্রবেশ। এর ফলে কাশ্মীরে উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে আদিবাসী অধ্যুষিত সীমান্ত বরাবর পাহাড়ী অঞ্চলেও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বিদেশী শক্তি মদত-পুষ্ট হয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য জঙ্গী আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের বিভিন্ন ধরণ পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে, সব আঞ্চলিকতাবাদই বিচ্ছিন্নতাকামী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে স্বায়াত্তশাসনমূলক ক্ষমতা আদায় করার জন্য আন্দোলন করা হয়েছে। এই ধরণের আঞ্চলিকতাবাদ ইতিবাচক দিকের ওপর প্রধান্য দেয়। ইতিবাচক আঞ্চলিকতাবাদ অনু-জাতীয়তাবাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে। সুস্থ ও গঠনমূলক আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয়তাবাদে পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে কিছু ক্ষেত্রে জাতীয় নেতৃত্বের অভাবে ও বিদেশী মদত পুষ্ট হয়ে আঞ্চলিকতাবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। বস্তুতঃ আর্থনীতিক উপাদান অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন মাত্রায় সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দিয়েছে।

১.৬ সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণও হোল একটি প্রক্রিয়া। আঞ্চলিকতাবাদ হোল একটি প্রক্রিয়া, কোন ঘটনা নয়। এটি হোল অবিরাম অনুবৃত্তি, কোন সম্পূর্ণ ফসল নয়। তাই এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনগুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়ে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৫০-৬০ এর দশকে আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনগুলি দেসের যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্যকে খর্ব করেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আঞ্চলিক আন্দোলনগুলির মধ্যে সংকীর্ণতাবাদ প্রাধান্য পাওয়ায় জাতীয় সংহতির পক্ষে এই প্রবণতা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বিভিন্ন ধরণের আঞ্চলিক আন্দোলনগুলির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। কখনো ধর্ম ও জাত, অথবা জাত ও ভাষা অথবা ভাষা ও নৃকুলগত উপাদান, আবার কখনো সংকীর্ণ স্থানীয় ঐক্যবোধ এই আন্দোলনগুলির চালিকাশক্তি রূপে দেখা দিয়েছে। তবে এগুলি প্রায়ই অধিক্রমণকারী হিসেবে দেখা দেয়। অর্তনীতিক বঞ্চনা, শোষণ, কেন্দ্রের অবহেলা প্রভৃতি আর্থনীতিক উপাদানকে অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন, পাঞ্জাবে নৃকুলগত-ধর্মীয় দাবীগুলি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আর্থনীতিক দাবিগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

ভারতের আঞ্চলিকতাবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আঞ্চলিকতাবাদ এখন ভারতের বহুত্ববাদী রাজনীতির অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ ছিল, আছে এবং থাকবে।[১] যতদিন ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকবে এবং সামাজিক ও আর্থনীতিক বৈষম্য থাকবে, তত দিন আঞ্চলিকতবাদও থাকবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ছোট ছোট অঙ্গরাজ্য গঠন করে আঞ্চলিকতবাদের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ছোট রাজ্য আর্থিক ও পরিকাঠামোর দিক থেকে স্বয়ম্ভর হয় না। অনেক ছোট ছোট অঙ্গরাজ্য গঠিত হোলে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বাড়ে। আঞ্চলিকতাবাদ থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদে রূপান্তরের প্রবণতা রোধ করতে হলে ছোট রাজ্য গঠন নয়, প্রয়োজন আঞ্চলিকতাবাদের গঠনমূলক দিকটার উপর জোর দিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য-অঞ্চলগুলির মধ্যে এতটা সুষম সম্পর্কবিন্যাস তৈরি করা। অঞ্চলগুলিকে, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিকে উপযুক্ত আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে ও স্বশাসন দান করে সকলকে এক মূল স্রোতের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, শক্তিশালী রাষ্ট্র ও শক্তিশালী অঞ্চল মোটেই পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরস্পর সহায়ক। কারণ রুগ্ন, দুর্বল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হলে দেহ কিছুতেই সবল ও কার্যকর হতে পারে না। এই অর্থে আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বিরোধী তো নয়ই, বরং জাতীয়সংহতির প্রতিষ্ঠার সোপান. আঞ্চলিক আনুগত্যকে জাতিগটনের কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। প্রতিটি অঞ্চলের সংস্কৃতিকে বিকশিত করে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মদ্য দিয়ে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত করে তৈরী করতে হবে এক বহু বৈচিত্রময় জাতীয় সংস্কৃতি, যেখানে প্রতিটি অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে অথচ তা হবে সমগ্রে এক অভিন্ন অংশ। এই অবস্থা তৈরী করতে পারলে বিচ্ছিন্নতাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করা সম্ভব হবে। এর জন্য প্রয়োজন জনমানসে সচেতনতা সৃষ্টি।

অনুশীলনী — ৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের বিভিন্ন রূপ কী?

২। ভারতে সব ধরণের আঞ্চলিকতাবাদই কি বিচ্ছিন্নতাকামী? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৩। ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের সমস্যা সমাধানের উপায় কী?

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের বিভিন্ন ধরণ বিশ্লেষণ কর।

১.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

অতি-বিকশিত রাষ্ট্র (Overdeveloped State) ঃ- সাধারণত সামাজিক ভিত্তির ওপর সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পাশ্চাত্যকরণের প্রভাবে দেখা যায় যে, সমাজ ব্যবস্থার তুলনায় রাষ্ট্রব্যবস্থা অগিয়ে আছে। তাই কিছু ভাষ্যকার মন্তব্য করেছেন যে, পাকিস্তানী রাষ্ট্র এবং ভারতীয় রাষ্ট্র অতি বিকশিত বা অতি মাত্রায় বর্ধিত।

সামাজিক অনিশ্চয়তা (Social Indeterminacy) ঃ- নির্দ্দিষ্ট একটি সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রাজনীতি–- রাজনীতিক কাঠামো এবং ব্যবস্থা - ঠিক কী রূপ নিচ্ছে, তাকে অনেক সময় নির্দ্দিষ্টভাবে হিসাব করে বলে দেওয়া সম্ভবপর নয়। একে অনেকে আখ্যা দিয়ছেন সামাজিক অনিশ্চয়তা বলে।

১. ভাগতীয় মুখোপাধ্যায়, ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের সমস্যা প্রসঙ্গে।

ভূমিপুত্র (Sons of the Soil)ঃ- একটি জনগোষ্ঠী একটি ভৌগলিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সাধারণভাবে ঐ গোষ্ঠীর মানুষেরা মনে করে যে, ঐ অঞ্চলে 'ভূমিপত্র' বলে মনে করে। তারা মনে করে যে, বহিরাগতদের জন্য তারা তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

'**দেশজ মনোভাব**' (Nativist Attitude)ঃ- ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রতীকীবাদ প্রভৃতি অনেক সময় দেশজ মনোভাব সৃষ্টি করে, যা পরবর্তী সময় আঞ্চলিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। আসামে 'আসু' () রাজনীতি এই ধরণের আঞ্চলিকতাবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১.৮ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ১.২ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ১.৩ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। অনুচ্ছেদ ১.২ দেখুন।

অনুশীলনী - ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ১.৪.১ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ১.৪.১ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ১.৪.২ এর প্রথম অংশ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ১.৪.২ এর দ্বিতীয় অংশ দেখুন।

৫। অনুচ্ছেদ ১.৪.৩ এর শেষার্ধ এবং প্রধান শব্দগুচ্ছ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। অনুচ্ছেদ ১.৪ এর সব অংশগুলি দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ১.৩ ও ১.৪ এর সব অংশগুলি দেখুন।

অনুশীলনী -৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ১.৫ এর সব অংশগুলি দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ১.৫.২.১, ১.৫.২.২ ও ১.৬ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ১.৬ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। অনুচ্ছেদ ১.৫ এর সব অংশগুলি দেখুন।

১.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay Type

1. How will you explain the growth of regionalism in contemporary India? Argue your case.
2. 'Economic deprivation is the main cause of regionalism'. Do you agree withd this view? Give reasons for your answer with suitable illustrations from Indian politics.
3. Analyse the meaning and implications of regionalism in contemporary India.

Short type

1. What is meant by regioalism?
2. What are the different forms of regionalism?
3. Are all regional movements in India separatist in nature? Give reasons for your answer.
4. Is there any economic factor responsible for the growth of regioalism in India? Give reasons for your answer.

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. A.K Majumdar and Bhanwar Sing (ed.) 1997, Regionalism in Indian politics, Radha Publications New Delhi.
2. Bharati Mukherjee, 1992, Regionalism in Indian Perpective, K-P Bagchi and Company,Kolkata.
3. Bholanath banerjee, Politics of Regionalism in India, in Socialist Perspective, Vol. 15. No. 1-2, June-Sept 1987.
4. Sushil Ranjan Roy, Regionalism and Politics in contemporary India, in the Burdwan Journal of Political Science, Vol. I, 2003, Dept of Pol. Sc. B.U.

একক - ২ ❑ ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতা (Communalism in India Politics)

গঠন —

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২ সাম্প্রদায়িকতার অর্থ ও প্রকৃতি
২.৩ সাম্প্রদায়িকতার প্রকারভেদ
    ২.৩.১ প্রকৃতি ও তীব্রতা অনুযায়ী সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণীবিভাগ
    ৩.৩.২ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণীবিভাগ
    ২.৩.৩ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ
২.৪ ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ
২.৫ ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বিকাশের কারণ
    ২.৫.১ ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা
    ২.৫.২ রাজনৈতিক কারণ
    ২.৫.৩ অর্থনৈতিক কারণ
    ২.৫.৪ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ
    ২.৫.৫ বিশ্বায়ন ও সাম্প্রদায়িকতা
২.৬ সমস্যার সমাধানের উপায়
২.৭ সারসংক্ষেপ
২.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ
২.৯ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা
২.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী
২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ : উদ্দেশ্য

ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বর্তমানে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা অন্যতম। বস্তুত এটি হল ক্যানসারের মতো একটি দুরারোগ্য সামাজিক ব্যাধি যা জাতীয় সংহতির পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর ফলে জাতিগঠনের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে ও হচ্ছে। এর দ্বারা ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য আজ বিনষ্ট হতে চলেছে। স্বাধীনতা লাভের পর ৬০ বছর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। কিন্তু এখনও আমরা সাম্প্রদায়িকতার

সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারিনি। আজও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তৃতি অসংখ্য মানুষের মনে নিরাপত্তাজনিত ভীতির জন্ম দিয়েছে। তাই সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি ও ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের আলোচনা প্রয়োজন। এই এককটিতে ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ শেষ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যাবে :

- সাম্প্রদায়িকতা কী?
- সাম্প্রদায়িকতার প্রকারভেদ।
- ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ।
- সাম্প্রদায়িকতার কারণ।
- সমস্যা সমাধানের পথ।

২.১ : প্রস্তাবনা

সাম্প্রদায়িকতাকে রজনী কোঠারি 'ভারতীয় গণতন্ত্রের নতুন মুখ' (the new face of indian Democracy) বলে অভিহিত করেছেন।[১] বহু বিচিত্র সংস্কৃতির দেশ এই ভারতে বহুত্ববাদী নীতির প্রতি ঝোঁক বিকৃত রূপ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। এর ফলে সাম্প্রদায়িকতা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিরই প্রত্যক্ষ ফলরূপে দেখা দিয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতিকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে পুরোপুরি পৃথক রাখা সম্ভব হয় না। কারণ ভারতে কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী একই সাথে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবেও কাজ করে। রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করা হয় জনসমর্থন বৃদ্ধির আশায়। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে হয়। ধর্ম তখন রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করা হয় জনসমর্থন বৃদ্ধির আশায়। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে হয়। ধর্ম তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ থাকার লড়াই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবক্ষয়ের অনিবার্য পরিণতি হল সাম্প্রদায়িকতা। এইভাবে সাম্প্রদায়িকতা ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে ধর্মের রাজনীতিকরণের ফলে রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটেছে। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, যখন সমাজের অধিকাংশ সদস্য রাজনৈতিক বিষয়ের প্রতি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে, তখন দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ কুলষিত হয় এবং রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয়। সাম্প্রদায়িকতা যে কোনও অবস্থাতেই সুস্থ রাজনীতির পরিপন্থী। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। অর্থনৈতিক উন্নয়নও ব্যহত হয়। সর্বোপরি সাম্প্রদায়িকতা মনের দীনতাকে প্রকট করে এবং চেতনার মুক্তি বিলম্বিত করে। ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সাম্প্রতিকালে রাজনৈতিক আবহাওয়া দূষিত করে তুলেছে।

২.২ : সাম্প্রদায়িকতার অর্থ ও প্রকৃতি

আভিধানিক অর্থে [২] সাম্প্রদায়িকতা হল 'সমাজের সাম্প্রদায়িকতা সংগঠনের নীতি' (Principle of Communal Organization of Society)। সাধারণভাবে 'সম্প্রদায়' শব্দ থেকে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দের

১. Rajini kothari, Communalism : The New pahase of India Democracy, in State Against Democracy, 1989, Ajanta

২. Concise Oxford Dictionary

উৎপত্তি। 'সম্প্রদায়' বলতে কেবল ধর্মীয় সম্প্রদায়কেই বোঝায় না। কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে জীবনযাত্রা সূত্রে আবদ্ধ যে কোন জনগোষ্ঠীকেই ঐক্যবোধের নিরিখে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী কোন বিশেষ ধর্ম, ভাষা, পেশা, জাত প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত মানুষকে নিয়েও একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে। এরূপ সম্প্রদায়কে 'মানসিক সম্প্রদায়' বলে অভিহিত করা যায়। এই মানসিক মানদণ্ড প্রয়োগ করে কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীকেও 'সম্প্রদায়' হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতাদর্শকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বলা যায়। যখন বর্তমান ভারেত সাম্প্রদায়িকতার কথা বলা হয়, তখন এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাই বোঝায়।[৩]

সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে স্বকীয়তার মনোভাব। নিজ গোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে যেমন গভীর নৈকট্যবোধ (We feeling) জন্মায়, তেমনি পাশাপাশি অন্য গোষ্ঠীর প্রতি স্বাতন্ত্র্যবোধ (They feeling) ও গড়ে ওঠে। সমাজতত্ত্বে এই মনোভাবকে অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠী চেতনা বলে অভিহিত করা যায়। সম্প্রদায়িকতা কোন সামাজিক গোষ্ঠীর মতাদর্শরূপে কোন নির্দিষ্ট জাতীয় অঞ্চলের পুরসামাজের মধ্যে সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। কিন্তু মানসিক গোষ্ঠীর মতাদর্শ রূপে সাম্প্রদায়িকতা ভূখণ্ড-বহিভূত সমরূপ গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং জাতীয় সীমানা-অতিক্রান্ত ধর্মীয় আনুগত্য স্থাপন করে। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা কেবল ভূখণ্ডগত আনুগত্য রূপেই গড়ে ওঠে না, সর্ব-বাদ (Pan-ism) রূপেও প্রকাশ পায়।

সমাজতত্ত্বে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটির ইতিবাচক অর্থের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এই অর্থে সাম্প্রদায়িকতা বলতে নিজ সম্প্রদায় বা ধর্মমতের প্রতি গভীর ভালবাসা সঞ্জাত চেতনাকে বোঝায়। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতা মূলত নেতিবাচক অর্থই বহন করে। এখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বলতে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধের ওপর আরোপ করা হয়। অধ্যাপক বিপান চন্দ্র তাঁর 'কমিউন্যালিজম্ ইন মর্ডান ইণ্ডিয়া' (Communalism in Modern India) নামক গ্রন্থে সাম্প্রদায়িকতার অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, সাম্প্রদায়িকতা হ'ল এমন এক বিশ্বাস যার মূল কথা হল -- এক জনগোষ্ঠী একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সবই এক হয়।[১]বিপানচন্দ্রের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্প্রদায়িকতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এক, সাম্প্রদায়িকতা হ'ল বিশেষ এক ধরণের বিশ্বাস। দুই, এই বিশ্বাস অনুযায়ী, ভারতে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মীয় গোষ্ঠী হ'ল এক একটি স্বতন্ত্র, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বাধীন ও সুসংহত সম্প্রদায়। তিন, এই বিশ্বাস অনুসারে, একটি ধর্মের অনুরাগী মানুষেরা কেবল ধর্মীয় স্বার্থেরই অংশীদার নয়, তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থও অভিন্ন। চার, ভারতবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য হ'ল প্রধান পার্থক্য এবং ভারতের বর্তমান রাজনীতির সংগঠনের অন্যতম ভিত্তি হ'ল ধর্মীয় সম্প্রদায়। সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে যে, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলা, সরকারী প্রশাসন বা উন্নয়নের ব্যাপারে কোন বিশেষ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চিন্তাধারাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি ঘৃণার মনোভাব ছড়ানোই হ'ল সাম্প্রদায়িকতা।

---

৩. J. Bhattacharya, Conceptualising Communalism, in The Journal of Socio-Political Studies, Voll, No. 1 1992, B.U.P. 48

১. Bipan Chandra, Communalism in Modern India, Ch. I, 1987, Vikas New Delhi

ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার একটি প্রত্যক্ষ উৎস হলেও ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা কখনই সমার্থক নয়। বদরুদ্দীন উমর তাঁর 'সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক রচনায় দেখিয়েছেন যে, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিষ্ঠা এক জিনিস নয়।[২] ধর্মের আচার-বিচার ও তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে তাকে আমরা বলি ধর্মনিষ্ঠা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা হ'ল ব্যক্তির সেই মনোভাব যা অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধাচারণ ও ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে। ধর্মীয় তত্ত্ব ও আচার-বিচারের সঙ্গেই ধর্মনিষ্ঠার সম্পর্ক। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ আনুগত্যের গুরুত্ব বেশি। তাছাড়া প্রকৃত ধর্মনিষ্ঠা পরকালমুখী, পরকালেই তার সত্যকারের পুরস্কারের আশা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার মুনাফা ইহলোকে। প্রকৃত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি কখনো সাম্প্রদায়িকতাবাদী হয় না। ধর্মের নামে যখন ধর্মাতিরিক্ত লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় কাজ করে, তখন তাকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত সম্পর্ক নেই। সাম্প্রদায়িকতা ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিষ্ঠার যাত্রাপথ পৃথক।[৩]

অধ্যাপক বিপান চন্দ্র সাম্প্রদায়িকতাকে একটি আধুনিক মতাদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় থেকেই সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ঘটে। ভারতে সাম্প্রদায়িকতা উদ্ভবের পিছনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের 'বিভক্ত করে শাসন করো' নীতির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রজনী কোঠারিও মনে করেছেন যে, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ঘটেনি। সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে একটি নতুন মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক বক্তব্য সৃষ্টি করার জন্য অতীত মতাদর্শ সমূহের প্রতিষ্ঠানগুলির এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকার কিছু কিছু দিক ও উপাদানকে মেশানো হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা পুরানো ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য এবং ধ্যানধারণা ব্যবহার করলেও তাকে একটি মধ্যযুগীয় মতাদর্শ বা তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন বা অনুবৃত্তি বলা যায় না। কারণ এগুলি আধুনিক পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বিপানচন্দ্রের মতে, সাম্প্রদায়িকতা অতীতের অবশেষে নয়, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার উত্তরাধিকার নয়, ধর্মীয় পুনরভ্যুদয়বাদ নয়। সাম্প্রদায়িকতা হ'ল আধুনিক, রাজনৈতিক এবং এলিট সৃষ্ট মতাদর্শ।

প্রমোদ কুমার নামে জনৈক ভারতীয় গবেষক সাম্প্রদায়িকতাকে একটি 'মতাদর্শ' বলে বর্ণনা করলেও তিনি এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শ বা কোনও একটি বিশেষ শ্রেণীর মতাদর্শ বলে মনে করেন না। কারণ এটি এমন একটি বিকৃত মতাদর্শ, যা বিষয়গত বাস্তবতাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত না করে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করে।[১] ফ্যাসিবাদ ও জাতিবাদ (Racialism) এর মতো সাম্প্রদায়িকতাবাদও সমাজের প্রকৃত সমস্যা ও দ্বন্দ্ব সংঘাত এগুলিকে আড়াল করে রাখে। বিপাণ চন্দ্রও মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িকতা হল একটি 'ভ্রান্ত চেতনা' (false consciousness), যা সমাজে রাজনৈতিক ও দ্বন্ধ-সংঘাতের মৌলিক ভিত্তিরূপে ধর্মীয় পার্থক্য সমূহকে গুরুত্ব দেয়। এটি একটি আধুনিক মতাদর্শ হলেও তা নির্বাচনী কৌশলের

---

২. বদরুদ্দীন উমর, 'সাম্প্রদায়িকতা', ১৯৮০, বাংলাদেশ।

৩ ধর্ম → ধর্মীয় আচারবিচার → ধর্মনিষ্ঠা
↓
সম্প্রদায় → রাজনৈতিক আচার-আচরণ → সাম্প্রদায়িকতা

১. Pramod Kumar, Communal Ideology : Its Basis, Dimensions and Social Appeal. in Teaching Politics, Vol. XIII, No. 3 & 4, 1987, P. 179

অংশ হিসেবে বা জনগণের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে অতীতের প্রতিষ্ঠান, মতাদর্শ ও ঐতিহ্যকে ব্যবহার করে। ভ্রান্ত চেতনা হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা সমাজের মূল বিরোধের বিকৃতি সাধন করে। আবার কখনও মূল বিরোধের পরিবর্তে এরূপ বিকৃত বিরোধকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়। এইভাবে সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শোষক ও শোষিত মানুষের মধ্যেকার বিরোধকে দৃষ্টির অগোচর রাখে। তার ফলে ধর্মকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় এক ধরণের 'ভ্রান্ত চেতনা'। পাঞ্জাবে শিখ সাম্প্রদায়িকতা বিশ্লেষণ করলে দু'টি দ্বন্দ্বের উপস্থিতি দেখা যাবে। প্রথমটি হল শিখ ধর্মাবলম্বী ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানবগোষ্ঠীর দুটির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়টি হল শিখ ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীর অর্ন্তর্ভুক্ত শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। মার্কসীয় বিশ্লেষণে দ্বিতীয় দ্বন্দ্বই প্রধান। প্রথম ও অপ্রধান দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় প্রধান দ্বন্দ্বের স্থান দখল করে ভ্রান্ত চেতনার সৃষ্টি করছে। বাস্তব সম্পর্কে ভ্রান্ত উপলব্ধি থেকেই এরূপ ভ্রান্ত চেতনার উৎপত্তি ঘটে।

অনেক সমালোচক সাম্প্রদায়িকতার সম্বন্ধে 'ভ্রান্ত চেতনার তত্ত্ব' পুরোপুরি গ্রহণ করেন না। তাঁদের মতে, সাম্প্রদায়িকতা কেবলমাত্র রাজনৈতিক ব্যাপার নয়। যদিও আধুনিক এলিট সৃষ্ট রাজনীতি সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ অনেকাংশে গড়ে তুলেছে, সাম্প্রদায়িকতার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিকও আছে। তাঁরা মনে করেন যে, বিপানচন্দ্র প্রমুখ ঐতিহাসিক ভারতে ধর্মীয় পরিচিতির গুরুত্বকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেন নি। ভারতের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক সব সময় পরস্পর বিরোধী বা দ্বন্দ্বমূলক ছিল না। উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক অনীহা ও অজ্ঞতা তাদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ অনেক ক্ষেত্রে বাড়িয়ে তুলেছে। সাম্প্রদায়িকতার এই গণ-সাংস্কৃতিক দিকটির গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

যদিও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ পুরোপুরি এক নয়। সাম্প্রদায়িকতা তার বিকাশের একটি পর্যায়ে মৌলবাদী হয়ে ওঠে। ধর্মের রাজনীতিকরণ হল সাম্প্রদায়িকতা। অপরদিকে ধর্মের মৌল উপাদানের সংরক্ষণের নাম করে মৌলাবাদ ধর্মীয় আদিমতা ও ধর্মান্ধতার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রভাবেই সাম্প্রদায়িক দল, গোষ্ঠী ও তাদের নেতৃবৃন্দ পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতার মনোভাব দেখায় এবং নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করার কথা বলে। এর ফলেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসাত্মক ঘটনা, খুন, দাঙ্গা, অগ্নি-সংযোগ, লুঠপাট ইত্যাদি ঘটতে থাকে এবং সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হয়।

অনুশীলনী — ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। তুমি কীভাবে ভারতের প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা দেবে?

২। ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কীরূপ?

৩। ভারতে সাম্প্রদায়িকতাকে আধুনিক মতাদর্শ বলা হয় কেন?

৪। সাম্প্রদায়িকতাকে 'ভ্রান্ত চেতনা' বলা হয় কেন?

৫। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে মৌলবাদের সম্পর্ক কী?

৬। সাম্প্রদায়িকতাকে 'ভারতীয় গণতন্ত্রের নতুন মুখ' বলা হয় কেন?

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িকতার অর্থ বিশ্লেষণ কর।

২.৩ : সাম্প্রদায়িকতা প্রকারভেদ

ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা একটি জটিল ব্যাপার, যার বিভিন্ন দিক আছে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন রূপ নিয়ে থাকে। বহু বিচিত্র সংস্কৃতির দেশ এই ভারতে ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা সাম্প্রদায়িকতাকেও বিভিন্ন রূপ দিয়েছে। তবে সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণীবিভাজনকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এস. এল. ভার্মা স্তরবিন্যাস অনুযায়ী পাঁচ ধরণের সাম্প্রদায়িকতার কথা বলেছেন। বিপান চন্দ্র প্রাক-স্বাধীনতা যুগে সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তিন ধরণের সাম্প্রদায়িকতার কথা উল্লেখ করেছেন। আবার পার্থ প্রতিম বসু স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে প্রধান তিনটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিকাশকে কেন্দ্র করে তিন ধরণের সাম্প্রদায়িকতার কথা বলেছেন।

২.৩.১ : স্তর-বিন্যাস অনুযায়ী সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণীবিভাগ

সাম্প্রদায়িকতার অন্তিম লক্ষ্য হল রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করা। এই উদ্দেশ্যে পরিস্থিতি ভেদে সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এস. এল. ভার্মা (S. L. Verma) সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহৃত পদ্ধতি সমূহের প্রকৃতি ও তীব্রতা অনুযায়ী পাঁচ ধরণের সাম্প্রদায়িকতার কথা বলেছেন, যথা –- (১) গুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা (Underground Communalism), (২) বিকাশোন্মুখ সাম্প্রদায়িকতা (Formative Communalism), (৩) বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িকতা (Separatist Communalism), (৪) বিধ্বংসী সাম্প্রদায়িকতা (Subversive Communalism), ও (৫) বিভাজনকারী সাম্প্রদায়িকতা (Dismembering Communalism)।[১]

(১) **গুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা :** সাম্প্রদায়িকাতর স্তরবিন্যাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে এই ধরণের সাম্প্রদায়িকতার অবস্থান। এরূপ সাম্প্রদায়িকতা সাম্প্রদায়িক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা প্রমুখ কিছু বক্তব্য তুলে ধরলেও অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ লিপ্ত হয় না। এখানে সাম্প্রদায়িকতার স্বীকৃতি নেই বললেই চলে। এই সাম্প্রদায়িকতার সমর্থকগণ অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করে থাকেন। তাঁরা মানবিক, গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক মূল্যবোধের প্রতি সাধারণভাবে আস্থাশীল।

(২) **বিকাশোন্মুখ সাম্প্রদায়িকতা :** সাম্প্রদায়িকতা বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা দেয় বিকাশোন্মুখ সাম্প্রদায়িকতা। এটি সাম্প্রদায়িকতা প্রকৃতিগতভাবে মৌলবাদী ও বিদ্বেষপরায়ণ। তাছাড়া ওরূপ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলির মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি তোলে। তবে রাজনৈতিক দরকষাকষি বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তারা তাদের দাবি আদায়ে সচেষ্ট হয়।

(৩) **বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িকতা :** সাম্প্রদায়িকতা বিকাশের চতুর্থ পর্যায়ে গড়ে ওঠে বিধ্বংসী সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অর্থ, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র, প্রশিক্ষণ এবং স্বীকৃতির জন্য বিদেশী শক্তিগুলির সঙ্গে যেমন হাত মেলায়, তেমনি অপরাধ জগতের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই সব শক্তির সহায়তার

১. S. L. Verma, Problems Measuring Communalism in india, in The Indian Journal of Political Studies, Vol. II, Dec. 1987.

তারা একটি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা রচনা করে এবং নিজেদের অঞ্চলটি একটি জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে। পাঞ্জাবের খালিস্তানীরা এবং কাশ্মীরের মুসলিম সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি এরূপ সাম্প্রদায়িকতার অনুসরণকারী হিসেবে পরিচিত।

(৫) **বিভাজনকারী সাম্প্রদায়িকতা :** সাম্প্রদায়িকতার স্তর-বিন্যাসের চরম পর্যায়ে অবস্থান করে বিভাজনকারী সাম্প্রদায়িকতা। বিভিন্ন ধরণের সাম্প্রদায়িকতার সম্মিলনের ফলে এই সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি ঘটে। এই ধরণের সাম্প্রদায়িকতার মূল লক্ষ্য হ'ল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সাম্প্রদায়িকতার অনুসরণকারীরা হিংসা, রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধের পথে পা বাড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না।

২.৩.২ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণীবিভাগ

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক বিপান চন্দ্র ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতাকে তিনভাবে ভাগ করেছেন, যথা - ১) সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ (Communal Nationalism), ২) উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতা (Liberal Communalism) এবং ৩) উগ্র বা ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িকতা (Extreme or Fascist Communalism)।[১] এই তিন ধরণের সাম্প্রদায়িকতা ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে থেকে চলে আসছে।

(১) **সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ :** বিপান চন্দ্রের মতে, সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ হ'ল অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদের একটি রূপ। প্রাক-১৯৪৭ পর্বে জাতীয়তাবাদের কাঠামোর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা গড়ে উঠেছিল। এখানে জাতীয়তাবাদই মুখ্য উপাদান হিসাবে কাজ করেছিল; তবে একে জাতীয়তাবাদের দুর্বল দিক বলা যেতে পারে। এরূপ সাম্প্রদায়িকতার অনুশীলনকারীরা সাম্প্রদায়িকতার মৌলিক ধারণাগুলিকে গ্রহণ করলেও একথা বিশ্বাস করতেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে কোন সংঘাত নেই এবং বিকাশমান জাতীয়তার মধ্যেই কেবল বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সংরক্ষণ সম্ভব। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীদের ধারণা ছিল যে, একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্তির সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। মতাদর্শ গঠন ও রাজনৈতিক কাজকর্মের দিক থেকে অনেক হিন্দু-কংগ্রেস কর্মী ছিলেন সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ছিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান, জাতীয়তাবাদী শিখ প্রভৃতি।

(২) **উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতা :** বিপানচন্দ্র দ্বিতীয় ধরণের সাম্প্রদায়িকতাকেই উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মূলতঃ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিশ্বাস এবং এরূপ রাজনীতির অনুশীলনকারী হলেও তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ভারতে বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়গুলির পৃথক ও বিশেষ স্বার্থ কেবল একটি জাতির মধ্যেই রক্ষা করা সম্ভব। তাই তাঁরা একটি বিকাশমান ভারতীয় জাতির বৃহত্তর ধারণার মধ্যেই পৃথক সাম্প্রদায়িক অধিকার, চাকুরি ও আইনসভায় আসন সংরক্ষণ, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রভৃতি দাবি করতেন। বিপান চন্দ্র দেখিয়েছেন যে, কংগ্রেসের মাঝারি স্তরের হিন্দু নেতাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন গভীরভাবে সাম্প্রদায়িক। কিন্তু তাঁদের উদারপন্থী মনোভাব ত্যাগ করতে হয়নি। কারণ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা। তাঁরা জানতেন যে, গণতান্ত্রিক নীতি তাঁদের

১. Bipan Chandra, Communalismism in Modern India, Appendix

কর্মসূচী রূপায়ণে সাহায্য করবে। জাতীয়তাবাদের নাম করে তাঁরা সাম্প্রদায়িক লক্ষ্য অর্জনের পথে অগিয়ে যেতে পারবে। বিশ্বের দশকে শেষ দিকে পর্যন্ত মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ মূলত ছিলেন উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী।

(৩) **উগ্র বা ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িকতা :** বিপান চন্দ্রের মতে, চরম ধরণের সাম্প্রদায়িকতা হ'ল উগ্র বা ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতা হ'ল যুক্তিবাদ বর্জিত, ভয় ও ঘৃণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে হিংসা প্রয়োগকারী বা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী একটি সঙ্কীর্ণ মতাদর্শ। এই ধরণের সাম্প্রদায়িকতা ভারতের মাটিতে এমনভাবে শিকড় ছড়িয়েছে যে ভারতের ঐক্যই বিঘ্নিত হতে চলেছে। গত শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষ দিকে মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আর.এস.এস.) এই ধরণের সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী ছিল। গত দু'দশক ধরে হিন্দু পুনরভ্যুদয়বাদ, জঙ্গী শিখ সাম্প্রদায়িকতা এবং রক্ষণশীল মুসলিম মৌলবাদের বিস্ফোরণ এরূপ সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেছে। এই ধরণের সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কোন বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কর্মসূচী থাকে না তিক্ত অনুভূতি, ভয়, বিতৃষ্ণা ও তীব্র ঘৃণা নিয়ে তারা অন্য সাম্প্রদায়কে আক্রমণ করে। এরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা, দলবদ্ধভাবে আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে।

২.৩.৩ : ধর্মীয় সাম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণীবিভাগ

পার্থ প্রতিম বসু তাঁর একটি প্রবন্ধে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিকাশকে লক্ষ করে তিন ধরণের সাম্প্রদায়িকতার কথা বলেছেন, যথা –- ১) মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা, ২) জঙ্গী শিখ সাম্প্রদায়িকতা এবং ৩) হিন্দু পুনরভ্যুদয়বাদ (Hindu Revivalism)।[১] ভারতে হিন্দু মুসলমান বিরোধের বীজ বপন করা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। এর ফলে যে গাছ গজিয়েছিল তা এত দ্রুত বেড়ে উঠেছিল যে, ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের ভিত্তিতেই দেশকে ভাগ করতে হয়েছিল। নেহেরুর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে থেকে সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তা কেবল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই তিন প্রধান সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে পূর্বোক্ত তিন ধরণের সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ লক্ষ করা যায়।

(১) মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা : স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মুসলিম সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি চুপচাপ ছিল এবং ১৯৬২ সাল পর্যন্ত মুসলিমরা সাধারণভাবে কংগ্রেসকে ভোট দিত। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি তাদের কিছুটা আস্থা জন্মেছিল। কিন্তু ১৯৬০ এর দশকের প্রথম দিকে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে ব্যর্থতা এবং শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা দানে ব্যর্থতা মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসন্তোষ বৃদ্ধি করেছিল। উত্তর ভারতে জামাৎ-ই-ইসলাম এবং কেরালায় মুসলিম লীগের পুনরভ্যুদয় ঘটেছিল। শরীয়ৎ আইনের সংরক্ষণ, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুর স্বীকৃতি প্রভৃতির দাবিতে মুসলিম সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলি সোচ্চার হয়ে উছেছিল। ১৯৭৫-৭৬ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সময় কংগ্রেস ও মুসলিমদের মধ্যে দূরত্ব আরো বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৮০-র দশকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পুনরুত্থান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাড়িয়ে তুলেছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে ধারণা জন্মেছিল যে, তাদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত স্বার্থ সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের জন্য অবহেলিত। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব,

১. Partha Pratim Basu, Religious Cleavage, Politics and Communalism in India, in Rakhahari Chatterjee (ed), Politics India, PP. 262-267.

১৯৮০-র দশকে শাহ্‌বানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়, সাম্প্রদায়িক কালে বাবরি মসজিদ নিয়ে বিতর্ক এবং 'তিন তালাক' নিয়ে বিতর্ক গোঁড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের শক্তি আরো বৃদ্ধি করেছে।

(২) জঙ্গী শিখ সাম্প্রদায়িকতা : প্রাক-স্বাধীন ভারতেও পাঞ্জাব রাজনীতির একটা সাম্প্রদায়িক দিক ছিল। ১৯২০-র দশকে 'শিখ গুরুদ্বার সংস্কার আন্দোলন' শিখ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সংগঠনকে এক জটিল রূপ দিয়েছিল। এর পর থেকে অকালি দল শিখদের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন হয়ে ওঠে। প্রাক-স্বাধীন যুগেও শিখ নেতৃত্ব শিখদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথক রাজ্য হিসেবে 'শিখ-সুবা'র দাবি করেছিল। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে অকালি নেতৃবৃন্দ রাজ্য পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় শিখদের অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবি উপস্থাপন করেছিল। অবশেষে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা দু'টি পৃথক রাজ্য গড়ে উঠেছিল। ১৯৮০-র দশকে ভিন্দ্রানওয়ালা অকালি দলের নরমপন্থী নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উগ্র রূপ দিয়েছিল এবং শিখদের পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে খালিস্তানের দাবি করে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু করেছিল। এর ফলশ্রুতি হিসেবে পাঞ্জাবি হিন্দুদের মধ্যে প্রতি-সাম্প্রদায়িকতাকে চরম রূপ দিয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে শিখ জঙ্গী মানসিকতা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি।

(৩) হিন্দু পুনরভ্যুদয়বাদ : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসও প্রাক-স্বাধীন ভারতেই শুরু হয়েছিল। প্রধান হিন্দু প্রতিষ্ঠান রূপে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আর.এস.এস.) এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯২৫ সালে। এর হিন্দু জাতীয়তাবদের ধারণার মধ্যে মুসলমান-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। হিন্দু মহাসভা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু পুনরভ্যুদয়ের শক্তিরূপে গড়ে উঠেছিল প্রক-স্বাধীনতা পর্বে। স্বাধীনতার পর ভারতীয় জন সঙ্ঘ হিন্দুত্বের প্রধান রাজনৈতিক দলরূপে গড়ে ওঠে। গত তিন দশক ধরে হিন্দু মৌলবাদের জঙ্গী পরিবর্তন ঘটে। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে মুসলিম মৌলবাদ যদি চালকের আসনে বসে থাকে, তাহলে বর্তমানে হিন্দু মৌলবাদ সে আসনের অধীশ্বর হয়েছে। এই হিন্দু মৌলবাদের প্রবক্তা হিসেবে যে সব দল এখন খুবই শক্তিশালী ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল আর.এস.এস., বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিব সেনা, বজরং দল এবং তাদের নেতৃস্থানীয় ভারতীয় জনতা পার্টি (বি. জে. পি)। এই সব দল ও সংগঠনের কাছে ভারতের ইতিহাস হ'ল হিন্দু জাতির ইতিহাস, ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি এবং আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি হল হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থাদি। হিন্দু পুনরভ্যুদয়বাদ একদিকে যেমন হিন্দু সমাজের সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে, অপরদিকে হিন্দু স্বকীয়তাকে মুসলিম-বিরোধীরূপে পুনর্গঠিত করে। প্রথম দিকে হিন্দু মৌলবাদ রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিয়েছিল, পরে আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে। হিন্দুত্বের প্রবক্তারা কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে ভন্ড ধর্মনিরপেক্ষতা বলে আক্রমন করে। তারা হিন্দুত্বের স্লোগান মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে হিন্দু সংগঠনগুলির বিরোধী করে তুলেছে। অনেক সমালোচক হিন্দু মৌলবাদকে 'ফ্যাসিবাদের ভারতীয় সংস্করণ' বলে চিহ্নিত করেছেন।

পূর্বে বর্ণিত সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণী বিভাগগুলি ছাড়াও অনেক সময় সংখ্যার ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকতাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় — ১) সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা এবং ২) সংখ্যালঘিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা হ'ল সংখ্যা গরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতা তার উগ্র রূপকে জাতীয়তাবাদের মোড়কে মুড়ে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। বি. জে. পি তথা সঙ্ঘ পরিবারের ভূমিকা থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। অপর দিকে মুসলিম ও শিখ সাম্প্রদায়িকতা হ'ল — সংখ্যা লঘিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা। এর ফল হল বিচ্ছিন্নতাবাদ। এই সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন রূপের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা টেনে দেওয়া যথেষ্ট কঠিন। কারণ প্রতিটি ধরণের সাম্প্রদায়িকতারই সীমানা অতিক্রমকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

অনুশীলনী — ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। তুমি কীভাবে সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণীবিভাগ করবে?

২। উগ্র বা ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িকতা বলতে কী বোঝ?

৩। হিন্দু পুনরভ্যুদয়বাদ বলতে কী বোঝ?

৪। সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৫। হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ অনুযায়ী সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণীবিভাগ কর।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্প্রদায়িকতা বলতে কী বোঝ? সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন রূপ পর্যালোচনা কর।

২। ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ কর।

২.৪ : ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ

ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা মধ্যযুগীয় মতাদর্শের পুনরুজ্জীবন নয়। ব্রিটিশ যুগেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিব বিষবৃক্ষটি রোপিত হয়েছিল। একথা ঠিক যে, ভারতে সাম্প্রদায়িকতা উদ্ভবের পিছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণকে অস্বীকার করা যায় না। এখানে বহু জাতি, বহু ধর্ম ও বহু ভাষাভাষী মানুষ বাস করে। তাই তাদের মধ্যে আত্মিক বন্ধন গড়ে ওঠা কঠিন। তাছাড়া সুবিধাভোগী শ্রেণীর সঙ্গে অধিকারহীন শ্রেণীর দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভেদাভেদকেই প্রধান বলে সাম্প্রদায়িক পথে চালাবার চেষ্টা করা হয়। ভারতে সাম্প্রদায়িকতা উদ্ভবের পিছনে এই সব কারণ থাকলেও ব্রিটিশ শাসকরা যে নিজেদের সামগ্রিক স্বার্থে তাকে কাজে লাগিয়েছিল এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে লালনপালন করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার জন্ম না দিলেও তারা 'বিভক্ত করে শাসন করো' নীতির সাহায্যে তাকে বাড়িয়ে তুলেছিল এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখার কাজে তাকে ব্যবহার করেছিল।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ত্রিশের দশকের শেষদিকে জিন্না হয়ে উঠেছিলেন কট্টর মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীয় এবং 'দ্বিজাতি তত্ত্বে'র মুখ্য প্রবক্তা। আবার জিন্নার বহু পূর্বেই হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকর এবং আর.এস.এস. এর নেতা গোলওয়লকর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' প্রচার করেছিলেন। এইভাবে মুসলমান ও হিন্দুদের দ্বারা প্রচারিত 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' প্রাক-স্বাধীন ভারতে যথাক্রমে সংখ্যালঘিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছিল। বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রাই, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতার জনজাগরণকে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ হিসেবে দেখত মুসলমান সম্প্রদায়। তাই মুসলমান নেতৃবৃন্দ জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা থেকে সরে যায়। সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল ছিলেন একজন গোঁড়া হিন্দু। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হিন্দু মহাসভার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এই সব কারণে প্রাক-স্বাধীন ভারতেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপিত হয়েছিল এবং বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে করা হয়।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলেই যে ভারতে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে স্বাধীন ভারতের স্রষ্টারা ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু এই ধর্মনিরপেক্ষতারই সন্তানরূপে গড়ে ওঠে সাম্প্রদায়িকতা।[১] মূলত: আশির দশক থেকে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বি. জে. পি. ও তার সহযোগী হিন্দু সংগঠনগুলি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ভন্ড ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলে প্রচার করতে শুরু করে এবং তারা দাবি করে যে তাদের সংগঠনগুলিই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ। বি. জে. পি./ আর. এস.এস. তাত্ত্বিকরা প্রমাণ করার নীতির জন্যই তা করেন। ভারতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় য, আশির দশকে রাজীব গান্ধী সরকারে দুমুখো ও সুবিধাবাদী নীতি সাম্প্রদায়িকতা আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। রাজীব গান্ধীর প্রধান মন্ত্রীত্বকালে একদিকে যেমন শাহবানু মামলার রায়কে অগ্রাহ্য করার জন্য মুসলিম মহিলা (সংরক্ষণ) আইন প্রণয়ণ করে মুসলিম মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা করা হয়, অন্যদিকে তেমনি হিন্দু মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট করার জন্য বিতর্কিত বাবরি মসজিদের তালা খুলে দেওয়া হয়। 'ইসলাম বিপন্ন' রব তুলে জামাত-ই-ইসলামী, ইনসাফ পার্টি, অল ইন্ডিয়া বাবরি মসজিদ কনফারেন্স প্রভৃতি মুসলিম সাম্প্রদায়িক প্রচারে ইন্ধন জোগায়। অন্যদিকে মুসলিম মৌলবাদীদের মতো পাঞ্জাবে অকালি দলের নেতৃত্ব শিখ মৌলবাদও খালিস্তাপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মদত দেয়। এইভাবে ধর্মের রাজনীতিকরণ ও রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের মাধ্যমে সাম্প্রতিককালের ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি করে।

২.৫ : ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশের কারণ

ধর্মের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হলেও বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল যে, সাম্প্রদায়িকতা বোধ হয় অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা সাময়িকভাবে স্তিমিত থাকলেও ১৯৮০-র দশক থেকে হিন্দু, মুসলিম ও শিখ সম্প্রদায়ের সংগঠনগুলির কার্যক্রম একদিকে যেমন ধর্ম-নিরপেক্ষতার সংকট ডেকে এনেছে, অন্যদিকে তেমনি ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে নতুন মাত্রা দান করেছে। এর আগে ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্যসা প্রকট আকার ধারণ করেনি, কারণ নেহেরু কর্তৃক অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো শক্তি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ছিল না। তাছাড়া বিশেষ কোন তাত্ত্বিক হাতিয়ারও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হাতে ছিল না। ইন্দিরা গান্ধীর সময়েও আর.এস.এস. এর মতো সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিন্দু-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্লোগান তুলতে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক জাতীয় অবস্থা ঘোষণার পর 'জনতা পার্টি'র উদ্ভব, ১৯৭৯ সালে জনতা সরকারের পতনের পর জনসঙ্ঘের বি.জি.পি.তে রূপান্তর এবং সঙ্ঘ পরিবারের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রদায়িকতা একটি ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপকাশ করে। ইদানীং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছে। সূতরাং সমকালীন ভারতে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পিছনে যে সব পারণগুলি রয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার। ভারতের সাম্প্রদায়িকতা যেহেতু বহুমুখী ব্যাপার, তাই কোন একটি উপাদান এর উদ্ভব ও বিকাশকে যথাযথ ব্যাখ্যা দান করতে পারে না। বিভিন্ন উপাদানের জটিল সংমিশ্রণে সাম্প্রদায়িকতা সাম্প্রতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

---

১. Rajni Kothari, Communalism : The New Phase of Democracy

২.৫.১ ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা

(১) মইন শাকির (Moin Shakir) প্রমুখ গবেষক মনে করেন যে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[১] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে জাতীয়তাবাদের উত্তাল তরঙ্গ রোধ করার উদ্দেশ্যে 'বিভক্ত করে শাসন করা'র নীতি অনুসরণ করতে থাকে। এই নীতি অনুযায়ী ব্রিটিশ শাসকগণ হিন্দু, মুসলমান, উপজাতি ও অস্পৃশ্যদের পরস্পর বিরোধী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবিগুলিকে হাতিয়ার করে তাদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পৃথক সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব চালু করার জন্য প্ররোচিত করেছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়িয়ে তোলার জন্য লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ শাসকদের প্ররোচনায় মুসলনানরা ১৯০৬ সালের শেষ দিকে মুসলিম লীগ নামে একটি দল গঠন করে। ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের পৃথক সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দাবি মেনে নেয়। এরপর ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের মাধ্যমে ঐরূপ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাকে শিখ, ইউরোপীয়, ইঙ্গ-ভারতীয় ও খৃস্টানদের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা হয়। আবার ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত ঘোষণা ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই (১৮৪৭ সালে) ভারতকে দ্বিখন্ডিত করা হয়। যে-সব মুসলমান ভারতে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তারা রাজনীতি ও চাকরির ক্ষেত্রে তাদের পূর্বেকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ ভারতের নতুন সংবিধানে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাদের হতাশা ও ক্ষোভ অনেক সময় মুসলিম সাম্পদায়িকতারূপে প্রকাশ পায়।

দু'শো বছরের ঔপনিবেশিক শাসন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির জগতে আধুনিকতার সূচনা ঘটালেও সাম্প্রদায়িকতার বীজও রোপন করেছিল। কারণ আধুনিকতার সুফল সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে পৌঁছায়নি। মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং পৌর বুদ্ধিজীবীরাই নবজাগরনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মুখোশ পড়ে সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ এই শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছিল। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে তারা এই উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের সমর্থন পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোন সম্প্রদায়ের ঐ বিশেষ শ্রেণীর সমর্থন তাঁরা আদায় করতে পারবেন। তাই তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবেই সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উস্কানি দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসকরা ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন তাঁদের বিভেদ নীতিকে কার্যকর করার জন্য। ব্রিটিশ শাসকদের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি, সাম্প্রদায়িক নির্বাচনমন্ডলী ও প্রদেশ পুনর্গঠনের ব্যবস্থার নীতি সাম্প্রদায়িকতাকে তীব্রতর করেছিল। ইংরেজ শাসকরা যখনই দেখেছিল যে, কোন আন্দোলন ভারতীয়দের ঐক্য দুর্বল করতে পারে তখনই তাকে মদত দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আলিগড় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যুক্ত প্রাতেশিক প্রশাসনে হিন্দুদের নিয়োগকে উৎসাহ দান, ১৯২০ সালের পর বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস -বিরোধী সরকারকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্যাপারে মুসলিমদের দাবি মেনে নেওয়া প্রভৃতি হল বিভেদ নীতির কয়েকটি উদাহরণ।

১. Partha Pratim Basu, Religious Cleavage, Politics and Communalism in India, In Rakhahari Chatterjee, Politics India, PP. 267-268.

(২) স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন জোগাতে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট মিথ্যা ইতিহাসের ভূমিকাও কম নয়। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনার যেমন বিকৃতি সাধন করা হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে। কিছু কিছু ঐতিহাসিক ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ, শিখ যুগ ও ব্রিটিশ যুগ হিসেবে বিভক্ত করেছেন। রোমিলা থাপার, বিপান চন্দ্র, হরবংশ মুখিয়া প্রমুখ ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বলেছেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়।[১] ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট হন। এইভাবে দেখা যায় যে, মুসলিম সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের মাধ্যমে মুসলিম মৌলবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। 'স্টুডেন্টস' ইসলামিক ইউনিয়ন অব্ ইন্ডিয়া''র সভাপতি প্রগতিশীল অধ্যাপক ইরফান হাবিবকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষককে ইসলাম ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি অনুগত থাকবে। বাজারে শিখ, মারাঠা, জাঠ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ইতিহাস বইও পাওয়া যায়। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও বিভিন্ন গবেষণামূলক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছে। এইভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটানোর মাধ্যমে সাম্প্রতিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৫.২ রাজনৈতিক কারণ

সাম্প্রদায়িকতা হল মূলত রাজনৈতিক সমস্যা। তাই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কিন্তু ধর্মের রাজনীতিকরণ ও রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই সমস্যা আরো বাড়িয়ে তুলেছে। রজনী কোঠারীর মতে ভারতীয় গণতন্ত্রের পরিকাঠামোর অবনমন ঘটেছে।[২] বর্তমানে রাজনীতি হয়ে পড়েছে সংখ্যার খেলার মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াই। কোঠারীর মতে, ১৯৭০'র দশক থেকে ভারতের গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র অর্থাৎ একটি নিছক নিবাচন ভিত্তিক গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এই নির্বাচন ভিত্তিক গণতন্ত্র হল আংশিক গণতন্ত্র। বাস্তবে তা চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে সহাবস্থান করে। এর দ্বারা ভারতে বহুত্ববাদী সমাজ বিকৃত রূপ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বনাম সংখ্যালঘিষ্ঠের লড়াই এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি করেছে। ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বহুত্ববাদী এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো টিকিয়ে রাখতে অনেকটাই সমর্থ হয়েছিল। এই পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কোঠারী 'কংগ্রেস-ব্যবস্থা' (Congress System) বলে অভিহিত করেছেন। এই সময়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় ও অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবির মধ্যে সমঝোতা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু নেহেরুর মৃত্যুর পর থেকে এই ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে। এর পর থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে।

ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকে কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ প্রাধান্য লাভ করার ফলে কংগ্রেস

১. 'Historians of Modern India and Communalism', in Romila Thapar, Bipan Chandra and Harbans Mukhia: Commmunalism and Writing of Indian History, P. 36, Quoted in S.L. Sikari, Indian Government and Politics, 1989, Kalyani Publishers, New Delhi, P.282.

২. Rajni Kothari, Communalism : The New Phase of Democracy.

নেতৃত্ব মাঝে মধ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে প্রশ্রয় দিতে থাকে। কখনো কখনো মুসলিম ও শিখ ভোট ব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে কাজ করার ফলে ভারতে মুসলিম ও শিখ সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। পাঞ্জাবে ভিন্দ্রানওয়ালার বিচ্ছিন্নতাবাদী শিখ রাজনীতির আবির্ভাবের পিছনে কংগ্রেস নেতৃত্বের দায়দায়িত্ব কম ছিল না। ১৯৮৪ সাল থেকে উত্তর ভারতে হিন্দু রাজনীতির মধ্যে রাজনৈতিক সুবিধাবাদই প্রাধান্য পায়। মুসলিম মহিলা (সংরক্ষণ) আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মুসলিম মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে কংগ্রেসের ভূমিকাকে পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টি আরো ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে। বস্তুত ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি এর ফলে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। শাসক দল ও রাষ্ট্র নিজেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাম্প্রদায়িকীকরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাপার এই ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে তারা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর ভোট ব্যাঙ্কের সমর্থন লাভের জন্য সচেষ্ট থাকে।

(২) বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের স্বাধীন অবস্থিতিও ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। উল্লেখযোগ্য দলগুলি হল মুসলিম লীগ, অকালী দল, বি.জে.পি. প্রভৃতি। এইসব দলের নেতৃবৃন্দ নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে সাম্প্রদায়িক হিংসার পথে পা বাড়াতে মানুষকে প্ররোচিত করে। এই রাজনৈতিক দলগুলি ছাড়া বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠনও আছে, যথা- আর.এস.এস., শিব সেনা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, জামাত-ই-ইসলামি, মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট প্রভৃতি। এই সব সংগঠন সাম্প্রদায়িক দলের হয়ে কাজ করে, সব সময় ভয় ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মত ছড়িয়ে দেয় এবং অর্ধশিক্ষিত ও আবেগপ্রবণ মানুষকে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতে প্ররোচিত করে। এইভাবে দেখা যায় যে, মুসলমানরা হরিজনদের ধর্মান্তরিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাতে বাধা দান করে। তার ফলে ১৯৮০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

(৩) রজনী কোঠরী দেখিয়েছেন যে, আজকের দিনে রাজনীতি আদর্শহীন হয়ে পড়েছে। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে। তৃণমূলস্তরের রাজনীতিতে লুম্পেনদের অস্বাভাবিক গুরুত্ব বেড়ে গেছে। প্রতিটি রাজনেতিক সংগঠনেই মাফিয়া ও সমাজবিরোধীদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। তারা নির্বাচনী রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সংঘর্ষ জিইয়ে রাখার জন্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য তারা রাজনৈতিক দলগুলিকে সাহায্য করে। এই সব পেশাদারী 'গুন্ডা' ও 'দাদা' নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয় এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।[১]

২.৫.৩ অর্থনৈতিক কারণ

(১) ভারতে সাম্প্রদায়িকতারূপে যার প্রকাশ ঘটে, তার ভিত্তি হল অর্থনৈতিক। মইন শাকির মনে করেন যে, সাম্প্রতিককালের ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বস্তুগত ভিত্তি হল বিলম্বে সংঘটিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি।[২] ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা কোন সমাজবিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবে আসেনি। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটেছিল ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের হাত থেকে ভারতীয় পুঁজিপতিদের হাতে। এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটেনি। তাই পাশ্চাত্য দেশে যেমন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংসসাধন করে পুঁজিবাদের

১. S.L. Sikri, P. 282

২. Moin Shakir, State and Politics in contemporary India, 1986 Ajanta, Delhi, PP. 177-178.

প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ভারতে সেরূপ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়নি। সেইজন্য পুঁজিবাদী কাঠামোর পাশাপাশি সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ও শক্তিগুলির, যেমন গ্রামীন কূলক শ্রেনী, জোতদার, উচ্চবর্ণের ধর্মীয় নেতা ইত্যাদির অবস্থান লক্ষ করা যায়। বস্তুত ভারতের পুঁজিবাদকে সামন্ততন্ত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুঁজিপতি শ্রেণী আধুনিক মতাদর্শরূপে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে নি। প্রাক পুঁজিবাদী অর্থনীতির সহাবস্থানের প্রেক্ষিতে সেকেলে সাম্প্রদায়িক মনোভাবও দূর করা সম্ভব হয়নি।

(২) পুঁজিবাদী অর্থনীতির অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসম অর্থনৈতিক বিকাশ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষীকরণের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে এবং সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধিতে সাহয্য করেছে। ভারতে পুঁজিবাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যবহত হওয়ায় অর্থনৈতিক সম্পদ, চাকরি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বক্ষেত্রেই অপ্রতুল যোগানের সমস্যা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে বাধ্য করে। এই অবস্থায় কোন সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত এলিট শ্রেণী প্রাক-আধুনিক, যুক্তি-বিবর্জিত সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের ভিত্তিতে নিজেদের দাবিগুলিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে তারা শ্রেণীভিত্তিক দাবির পরিবর্তে সম্প্রদায় ভিত্তিক দাবি উপস্থাপিত করে এবং অর্থনৈতিক দাবির সঙ্গে ধর্মীয় দাবি সংযুক্ত করে। এইভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত এলিটদের অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়।

ঔপনিবেশিক যুগে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিকাশের ক্ষেত্রে এই ধরণের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ইংরেজি শিক্ষা প্রথমে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই নবজাগরণের ঢেউ তুলেছিল। সেই তুলনায় মুসলমান সমাজে বৃত্তিজীবী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল অনেক পরে। ফলে তারা যখন দেখল যে হিন্দুরা ইতিপূর্বেই সরকারী চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত আসল জায়গাগুলো দখল করে নিয়েছে, তখন জনিদার বুর্জোয়া ও বৃত্তিজীবী শ্রেণীদের নিয়ে গঠিত মুসলমান সম্প্রদায়ের উচ্চতর শ্রেণী মুসলমান জনগণের ক্রমবর্ধমান জাতীয় ও শ্রেণী জাগরণকে একটা বিকৃত সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে চেষ্টা করেছিল। আর.এস.এস., হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ প্রমুখ সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও দল শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়েই গঠিত হয়েছিল। অনুন্নত অর্থনৈতিক বিকাশের করুণ পরিণতি ছিল এই সাম্প্রদায়িকতা। এতে ইন্ধন যুগিয়েছিল ব্রিটিশ শাসকদের বিভেদ নীতি।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে শিখ সাম্প্রদায়িকতা বা মৌলবাদের বিকাশের ক্ষেত্রেও এই ধরণের অর্থনৈতিক ব্যাখা প্রদান করা হয়ে থাকে।[১] ১৯৬০ এর দশকে 'সবুজ বিপ্লব' পাঞ্জাবের গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষি-বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভুত পরিমাণে সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল এবং হিন্দু শিল্প-বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছিল। পাঞ্জাবে ২০ শতাংশ জাঠ শিখ ৬০ শতাংশ জমির মালিক হওয়ায় সবুজ বিপ্লবের সুবিধা একচেটিয়াভাবে ভোগ করেছিল। তারাই গ্রামীণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্প্রসারণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তারা হিন্দু শিল্পপতিদের কাছ থেকে বাধা পেতে থাকে। নদীর জল, জলবিদ্যুৎ, চন্ডীগড়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অধিক অংশগ্রহণের দাবি জানাল তারা। শহুরে এলাকাতেও হিন্দু ও অ-জাঠ শিখরা ছোট ও মাঝারি শিল্পের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। সেখানেও তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হল জাঠ শিখরা। তারা উপলব্ধি করল যে, পাজাবী হন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর বাধা অতিক্রম

---

১. Moin Shakir, State and Politics in Contemporary India, PP. 179-180

করতে গেলে সমগ্র শিখ সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাই অকালী দল জাঠ শিখ চাষীদের অর্থনৈতিক দাবির সঙ্গে শিখ সম্প্রদায়ের স্বার্থ যুক্ত করে শিখ জনগোষ্ঠীর সমর্থন লাভের জন্য সচেষ্ট হল। এইভাবে পাঞ্জাবে হিন্দু-শিখ মেরুকরণের মাধ্যমে শিখ সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

(৩) স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে প্রবর্তিত অর্ধোন্নত ধনতান্ত্রিক কাঠামো বিধৃত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা জনগণের দরিদ্র্য, ব্যাপক অসাম্য, ক্রমবর্ধমান বেকারী হ্রাস করতে ব্যর্থ হওয়ায় দেখা দিয়েছে হতাশা, দুর্নীতি ও অপ্রতুল সামাজিক-আর্থিক সুযোগের জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা। এই হতাশা ও অপ্রতুলতা সমাজ চেতনাহীন মানুষকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে। মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত চাকুরীপ্রার্থী, ব্যবসায়ী ও ধনী কৃষকরাই যেহেতু সুযোগ সন্ধানী, সেই হেতু তাদের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বেশী। রুডল্ফ এবং রুডল্ফ (Rudolph and Rudolph) দেখিয়েছেন যে, সবুজ বিপ্লব, গরীবী হঠাও, নয়া অর্থনৈতিক নীতি প্রভৃতির ফলে গ্রামীণ ভারতে বুলক ক্যাপিটালিস্ট' (Bullock Capitalist) নামে একটি নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে।[২] এই শ্রেণীটি নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে আঞ্চলিক রাজনীতিকে কুক্ষিগত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। তা করতে গিয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে হাত মেলায় তারা। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় কুসংস্কার ও সমাজ সচেতনতার অভাবকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। রজনী কোঠারী সাম্প্রতিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উৎস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পুঁজিবাদের নতুন পর্যায়কে তুলে ধরেছেন।[১] তাঁর মতে ভারতে পুঁজিবাদ হল জন-বিরোধী ও উন্নয়ন-বিরোধী। এই পুঁজিবাদ দুর্নীতিগ্রস্ত ও কালো টাকা উৎপাদনে লিপ্ত। এই ধরণের জারজ পুঁজিবাদের সঙ্গে রাষ্ট্রও একীভূত। রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয়েছে। দমনমূলক রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক হিংসা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

২.৫.৪ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ

(১) ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের ঘোষিত নীতি হলেও সাম্প্রতিককালে এই আদর্শ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। ভারতের পুরসমাজে জাত, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সনাতনী গোষ্ঠীগুলির প্রভাব ধর্মনিরপেক্ষীকরণের প্রক্রিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অচিন বানায়েক (Achin Vanaik) মন্তব্য করেছেন যে, স্বাধীনতার পর হিন্দু মৌলবাদের উত্থানের পিছনে মধ্যবর্তী জাতগোষ্ঠী এক উল্লেখ যোগ্য সামাজিক শক্তিরূপ কাজ করেছে।[২] স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে এই কৃষি-ভিত্তিক মধ্যবর্তী জাতগোষ্ঠী অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রগতি লাভ করেছে। এইজাতগোষ্ঠীগুলি তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়াবার জন্য বৃহত্তর হিন্দু পরিচিতির মাধ্যমে আধুনিক বারতীয় সমাজে প্রধান কারকরূরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। সঙ্ঘ পরিবার ভারতের পুরসমাজের ওপর নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে। নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য তারা বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে। বানায়েকের মতে, হিন্দু মৌলবাদের 'গ্রামীণকরণ'-এর ফলে সাম্প্রতিক ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠতে পেরেছে।

২. L.I. Rudolph and S.H.Rudolph, In Pursuit of Lskshmi : The Political Economy of he Indian Stste, 1987, Orient Longman, Bombay.

১. Rajni Kothari, Communalism : The New Phase of Democracy.

২. Rakhahari Chatterji(ed) : Politics India, PP. 269-270.

(২) হিন্দু মৌলবাদের আগ্রাসী মনোভাব ও ধর্মীয় উন্মত্ততায় প্রতিক্রিয়া হিসেবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেও সম্পতি মৌলবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। হিন্দুত্ব ও হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণা প্রচারের জবাবে মুসলমানদের মধ্যেও বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং তারা সাম্প্রদায়িক প্রচারে ইন্ধন জোগাচ্ছে। শাহবানু মামলা থেকে বাবরি অ্যাকশন কমিটির আন্দোলমন পর্যন্ত মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রতিটি পদক্ষেপই ক্ষতিকর ফল প্রদান করেছ। সাধু-সন্ত ও মোল্লা-মৌলবাদীদের ভূমিকার ক্ষেত্রেও মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এঁদের ভূমিকা আর ধর্মীয় ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকছে না। রাজনীতির ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছে। আশির দশক থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবানুষ্ঠান আয়োজনের প্রবণতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সবের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়; সাম্প্রদায়িকতা তার সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

(৩) বিপান চন্দ্রের মতে, ভারতের জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। কারণ এর ফলে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সহজেই বাস্তবতাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করে জনসাধারণের কাছে এক ধরণের 'ভ্রান্ত চেতনা' সৃষ্টি করতে পারে। শোষক ও শোষিত শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে দৃষ্টির অগোচরে রেখে সাম্প্রদায়িক বিরোধকে ঊর্ধ্বে তুলে করে মানুষকে ভুল পথে চালানো সম্ভব হয়। ভারতে শিক্ষার এক নেতিবাচক ভূমিকাও লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে আঞ্চলিক আনুগত্য ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতি ঝোঁক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষীকরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ না করে পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে।

২.৫.৫ বিশ্বায়ন ও সাম্প্রদায়িকতা

বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতি ধর্মীয় গোঁড়ামি বা মৌলবাদ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সাম্প্রতিককালে ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, প্যালেস্তাইন, পাকিস্তান ও ভারতের ঘটনার প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করা হয়ে থাকে যে, বিশ্বায়নের পথে গিয়ে আমরা আরও বেশি করে সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছি। বর্তমানে মৌলবাদের চলাচল যেন বিশ্বায়নেরই রাস্তা পরিক্রমা।[১] বিশ্বায়ন বলতে সাধারণভাবে বোঝায় পুঁজির অবাধ যাতায়াত, তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব, জাতীয় কাঠামোর বদলে বহুজাতিক সম্পর্কের বিকাশ। জোসেফ স্টিগলিট্জ (Joseph Stiglitz) তাঁর গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইটস্ ডিসকন্টেন্টস্' (Globalization and its Discontents) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বিশ্বায়নের ফলে যে সুবিধার কথা বলা হয়, আসলে বিশ্বায়নকে কার্যকরী করতে মূল্য দিতে হয় অনেক বেশি। এর ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হয় এবং এত দ্রুতগতিতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন হয় যে, অনেক সময়ই সংশ্লিষ্ট দেশের ঐতিহ্য ও পরম্পরার সঙ্গে সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার নৈতিক অবনতি হয়। ব্যাপক বেকারী বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘ সামাজিক সমস্যা দেকা দেয়, যেমন - লাতিন আমেরিকার সহরের সংঘর্ষ, ইন্দোনেশিয়ায় জাতিগত বা গোষ্ঠীগত সমস্যা ইত্যাদি। নোয়াম চমস্কি (Noam Chamsky) তাঁর 'পীয়ারিং ইনটু দ্য আবিস অব্ দ্য ফিউচার' (Peering into the Abyss of the Future) গ্রন্থে অত্যন্ত মর্মভেদী ভাষায় বিশ্বায়ণের নামে বেশির ভাগ সম্পদের অধিকারিদের ক্ষমতার ঔদ্ধত্য ও তার পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন। বিশ্বায়ন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে, আবার কোথাও সম্প্রদায়ের পরিবর্তে জন্ম

১. মইনুল হাসান, বিশ্বায়ন ও মৌলবাদ, অমিয় কুমার বাগচী সম্পাদিত বিশ্বায়ন ঃ ভাবনা - দুর্ভাবনা, দ্বিতীয় খন্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ২০০২ কলকাতা, এর মধ্যে, পৃষ্ঠা ৩০৫।

দিয়েছে নতুন বিবাদমান গোষ্ঠীর। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। লন্ডনে কৃষ্ণবর্ণের লোকেরা আক্রান্ত হচ্ছে, উত্তর আয়ারল্যান্ডে প্রেটেস্ট্যান্ট-ক্যাথলিক সংঘর্ষ ঘটছে, ফ্রান্সে অভিবাসীর বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষ দেখা দিয়েছে,আফ্রিকা ও সুদূর প্রাচ্যে সম্প্রদায়গত ও গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদী ও মুসলমান বিরোধ তীব্র রূপ নিয়েছে। সেইরকম ভারতের ক্ষেত্রেও সাম্প্রতিক কালের হিন্দু-মুসলমান-শিখ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠের দাঙ্গার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাহ পর হাজার হাজার নিরীহ শিখ নিধন, ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, ২০০২ সালে গোধরা কান্ডের পর সরকারের পরোক্ষ মদতে ব্যাপক লুট ও গণধর্ষণ, গুজরাটের হত্যাকান্ড, সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা গুজরাটের বিশ্ববিখ্যাত অক্ষরধাম মন্দিরের ওপর আক্রমণ, কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে মৌলবাদী সংগঠনগুলির কার্যকলাপ বিশ্বায়নেরই করুণ পরিণতি।

বিশ্বায়ন যে-সব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেছে মৌলবাদী সংগঠনগুলি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে। আগ্রাসনবাদ মৌলবাদীদের দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। বিশ্বায়ন কর্তাদের সঙ্গে তাদের এক্ষেত্রে যথেষ্ট মিল আছে। রক্ষণশীল ধর্মনীতিকে সাংস্কৃতিক জগতে 'প্যাকেজ' হিসেবে ছাড়া হচ্ছে। এর ফলে স্যামুয়েল হান্টিংটনের ভাষায় 'সভ্যতার সংঘাত' দেখা দিচ্ছে। বস্তুত মৌলবাদীদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক থেকে ভারত বাদ যায়নি। বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব ছোট হয়েছে না বড় হয়েছে সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু মানুষ ক্রমশ বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং তাদের মধ্যে উত্তেজনা ও হিংসা বাড়ছে। সামন্ততান্ত্রিক সময়ের এলাকাভিত্তিক সম্প্রদায়ের পরিবর্তে ফিনান্স পুঁজি দ্বারা আজকে বাজারমুখী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, আমেরিকাতে আছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রধান কার্যালয় এবং পরিষদের নেতৃবৃন্দ সেখানকার বিদেশনীতিতে ভয়ংকরভাবে মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করছে। এরা সরাসরি ইরাকে আমেরিকার আগ্রসনে ভারতের সমর্থন জানাচ্ছে এবং পরিবর্তে ভারতে সাম্প্রদায়িক প্রচারের সমর্থন আদায় করছে। কানাডায় আছে সর্বভারতীয় শিখ ছাত্র ফেডারেশনের প্রধান কার্যালয়। অন্য দিকে পাকিস্তান হল ইসলামি মৌলবাদীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তারা সেখান থেকেই ধর্মীয় মৌলবাদকে আশ্রয় দিয়েছে। পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাদবাদীরা আধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করে সঠিকভাবে হিসেব করে তাদের লক্ষ্যস্থানে আক্রমণ করছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকটের যুগে ভারতে পুঁজিবাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত। ভারতীয় পুঁজি বিশ্বের পুঁজির দরবারে ঠাঁই পাবার জন্য মরিয়া হয়ে পড়েছে। বাজার-ভিত্তিক অর্থনৈতিক সংস্কারে নামে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লীতে শহরাঞ্চলের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং প্রচুর বিদেশী মুদ্রার আমদানি হচ্ছে। আর এই সব জায়গাতেই বেশিরকম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটছে। ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আধিপত্য বজায় রাখায় জন্য দাঙ্গা বাধিয়ে দরিদ্র, প্রান্তীয় জনসাধারণ এমনকি মহিলাদেরও সহজ শিকারে পরিণত করেছে। এইভাবে বিশ্বায়ন সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে এক নতুন মাত্রা দান করেছে, হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা মানবিক বোধ এবং মানব সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করেছে।

অনুশীলনী - ৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বিকাশের কোন অর্থনৈতিক কারণ আছে কি? তোমার উত্তরে সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

২। বিশ্বায়ন কীভাবে সাম্প্রদায়িকতা বাড়িয়ে তুলেছে?

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ পর্যালোচনা কর।

২। সাম্প্রতিককালে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বিকাশের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

২.৬ সমস্যার সমাধানের উপায়

ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা হল একটি জটিল সমস্যা। এর বিষবাষ্পে শুধু ধর্মনিরপেক্ষতার বাতাবরণই নষ্ট হচ্ছে না, সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলা করতে গিয়ে রাষ্ট্রশক্তিও জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। রজনী কোঠারী যথার্থই বলেছেন যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ মৌল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তব্যগুলি থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রের দৃষ্টি সরিয়ে দিয়েছে। এর পরিবর্তে রাষ্ট্রের মনোযোগ চলে গেছে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের দিকে। এর ফলে ভারতের বহুত্ববাদী সমাজের একটির পর একটি অংশ আদিম সাম্প্রদায়িক বৃত্তির ওপর নির্ভর করে তাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম চালাচ্ছে। এই প্রবণতা বৃদ্ধির ফলে দেশের সুস্থিতিও নষ্ট হচ্ছে। বস্তুত সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার মূল প্রসারিত হয়েছে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার গভীরে। তার ফলে এর সমাধানের পথ নির্দেশ করা যথেষ্ট কঠিন। তাই এ ব্যাপারে সমাজতত্ত্ববিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে।[১]

সমাজতন্ত্রের আদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলেন। তাঁরা মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িকতা বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠে না। বিদ্যমান সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ হল এই সাম্প্রদায়িকতা। সুতরাং একে প্রতিরোধ করতে হলে সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্তরে সংগ্রাম করতে হবে। ধনতান্ত্রিক নিপীড়ন থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করতে হবে। তাই সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। সর্বস্তরের মানুষকে সাম্প্রদায়িক মনোবাব থেকে বিযুক্ত করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করতে হবে, কারণ সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি পুরসমাজের ওপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিতকে দুর্বল করে দিয়েছে। অপরদিকে রজনী কোঠারীর মতে, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ করতে হলে তৃণমূল স্তরে দলহীন সংগঠনের দ্বারা গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য অন্দোলন করতে হবে। রণবীর সিং মনে করেন যে, ধর্মের একটা ইতিবাচক সামাজিক ভূমিকা আছে। ধর্মের উদারনৈতিক দিকগুলিকে এর অযৌক্তিক দিক থেকে মুক্ত করতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য ধর্মের ইতিবাচক দিকগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে।

১. Rakhahari Chatterji (ed), P. 281

সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করতে গেলে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থাগ্রহণ একটি উল্লেখযোগ্য উপায় বলে অনেকে মনে করেন। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পিছনে যেহেতু যুক্তিহীন ও অবৈজ্ঞানিক মন কাজ করে, সেহেতু যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ গড়ে তোলার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এর জন্য চাই উপযুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার। শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত যে মানুষ নির্মোহ, কুসংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে জগতের সব কিছুকে বিচার করতে শিখবে, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব আমাদের সকলের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তাই আমাদের প্রত্যেককেই এর বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে। যেখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন খুব শক্তিশালী, সেখানে সাম্প্রদায়িকতার ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। সেইজন্য সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

২.৭ সারসংক্ষেপ

ভারতে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বোঝা গেল যে, ধর্মের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখন্ডিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে এক অন্যতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বর্তমানে নানা দিক থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। ধর্মের রাজনৈতিক অপব্যবহার, প্রধান সাম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা'র উত্থান এবং হিন্দু রাষ্ট্রের উত্থান জনিত ভীতি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভিশাপে পরিণত হয়েছে।[১] কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভারতে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ নিয়ে আর বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতের মতো বহুত্ববাদী সমাজে জটিল সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো থাকার জন্য জনগনের বহুমুখী পরিচিতি গড়ে ওঠে, যেমন - শ্রেণী, জাত, অঞ্চল ভিত্তিক পরিচিতি। এর ফলে অনেক সময় তারা একই সাথে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় সীমানা ছাড়িয়ে যায়। এই প্রতি ছেদন ঐক্য (Cross-Cutting Soliderity) ভারতীয় রাজনীতিতে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ গড়ে ওঠার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রেক্ষিতে শাসক দলের বিরুদ্ধে 'মুসলিম তোষণ', 'মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতি' প্রভৃতি অভিযোগ নিয়ে নতুন করে বিচার বিশ্লেষণ করার অবকাশ রয়েছে। একথা সত্য যে, প্রথম তিনটি লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দল মুসলিম ভোট টানতে সমর্থ হয়েছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু এ ব্যাপারে কংগ্রেস দলের ব্যর্থতা পরবর্তী নির্বাচনে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক নষ্ট করেছিল। এর ফলে পরবর্তী কালে লোক দল, সমাজবাদী পার্টি, জনতা দল, বামপন্থী দল প্রভৃতির মধ্যে মুসলিম ভোট ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে মুসলিম রাজনৈতিক ঐক্যের মধ্যে ফাটল লক্ষ করা যায়। ১৯৭০-র দশকের পর থেকে এক নতুন মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব লক্ষ করা যায়। তাদের কাছে ধর্মীয় গোঁড়ামির রাজনীতি অপ্রাসঙ্গিক। বরং তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সংস্কারের দাবি করে।

অপরদিকে, ভারতীয় রাষ্ট্রের হিন্দুত্বকরণজনিত ভীতি ও অনেকটা অতিরঞ্জিত। একথা ঠিক যে, গত দশক থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে বি.জে.পি.-র উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। কিন্তু ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে যথাক্রমে একাদশতম ও দ্বাদশতম লোকসভা নির্বাচনে বি.জে.পি. তার হিন্দুত্ববাদী প্রচার কমিয়ে দিয়েছে এবং অর্থনৈতিক

১. Rakhahari Chatterji (ed), P. 279

নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ১৯৯৮ সালে কেন্দ্রে জোট সরকারের নেতা হিসেবে বাজপেয়ী অভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। অভিন্ন দেওয়ানী আইন, ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রভৃতি স্পর্শকাতর বিষয়গুলি তিনি এই কর্মসূচী থেকে বাদ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, 'রাজনীতির মন্ডলীকরণ' বি.জে.পি.-র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বি.জে.পি.-কে অনগ্রসর শ্রেণী ও দলিতদের রাজনৈতিক শক্তিকে কিছুটা মেনে নিতে হচ্ছে, যা হিন্দুত্বের নীতির বিরোধী। পরিশেষে, সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী প্রচার এবং বিক্ষোভের গুরুত্বও অস্বীকার করা যাবে না। বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ ও রাজনীতিবিদ একটা বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুতরাং ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা প্রতিরোধ করা খুব কষ্টসাধ্য হবে না বলে মনে করা যেতে পারে।

অনুশীলনী - ৪

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের উপায় কী?

২। তুমি কি মনে কর যে, ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে পুরোপুরি নষ্ট করেছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) ঃ জেকব হলিওয়েক (Jacob Holyoake-1817-1906) কে ধর্মনিরপেক্ষতার জনক বলে গণ্য করা হয়। তাঁর মতে ধর্মনিরপেক্ষতা হল স্বাভাবিক নৈতিকতার ভিত্তিতে গঠিত নীতিসম্মত ব্যবস্থা যা বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাসের সহাবস্থানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। পাশ্চাত্যে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মের পৃথকীকরণকে বোঝায়। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল - সরকার সব নাগরিকের প্রতি সমান আচরণ করবে, ধর্মের ভিত্তিতে কোন পক্ষপাতিত্ব করবে না। অর্থাৎ সব ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে রাষ্ট্র সমদূরত্ব বজায় রাখবে।

ধর্মনিরপেক্ষীকরণ (Secularization) ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা হল একটি মতাদর্শ, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যাতে ধর্মীয় সচেতনতা, ধর্মীয় কার্যকলাপ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ ধর্মীয় কার্যকলাপ, ধর্মীয় চিন্তা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবনমন প্রক্রিয়াকে ধর্মনিরপেক্ষীকরণ বলা যেতে পারে। ১৬৪৮ সালে ইউরোপে ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটার পর ধর্মনিরপেক্ষীকরণ শব্দটির প্রথম প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অপরদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানদীপ্তির যুগে মতাদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা আত্মপ্রকাশ করে।

ভ্রান্ত চেতনা (False Conciousness) ঃ বিপান চন্দ্রের মতে, সাম্প্রদায়িকতা হল একটি ভ্রান্ত চেতনা। ধর্মীয় পার্থক্যকে সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধের মৌল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করাই হল ভ্রান্ত চেতনার প্রকাশ। ভ্রান্ত চেতনা হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা মূল বিরোধের বিকৃতি ঘটায়, কখনও বা মূল বিরোধের স্থানে এই বিকৃত বিরোধকে স্থাপন করে। সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শোষক ও শোষিত মানুষের মধ্যেকার বিরোধকে দৃষ্টির অগোচরে রেখে বাস্তবের ভ্রান্ত উপলব্ধি ঘটায়।

শাহবানু মামলা ঃ ১৯৮৫ সালে শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্ট তালাক প্রাপ্ত মুসলিম মহিলাদের ভরন-পোষণ লাভের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

মুসলিম মহিলা (সংরক্ষণ) আইন ঃ শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়কে অগ্রাহ্য করে ১৯৮৬ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার রক্ষার জন্য মুসলিম মহিলা (সংরক্ষণ) আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মুসলিম মৌলবাদীদের সন্তুষ্টিবিধানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন (Criminalization of Politics) ঃ রজনী কোঠারীর মতে, বর্তমান ভারতে রাজনাতির মতাদর্শগত বিচ্যুতি ঘটেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ক্ষমতালাভ বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকেই চরম মোক্ষ বলে মনে করেন। তাই তাঁরা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুর্বৃত্ত, অপরাধী ও গুন্ডাদের কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা লাভ বা ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করেন। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় রাজনীতির দুবৃত্তায়ন।

বুলক্ ক্যাপিটালিস্ট (Bullock Capitalist) **ঃ** রুডলফ্ ও রুডলফ্ তাঁদের 'ইন পারস্যুট অব্ লক্ষ্মী' নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, নেহরুের আমলে ভূমি সংস্কারের ফলে গ্রামীণ ক্ষমতা সামন্ত-জমিদারদের হাত থেকে বুলক-ক্যাপিটালিস্টদের হাতে চলে যায়। এরা ২.৫ থেকে ১৪.৯ একর জমির মালিক। এরা হল স্বনিয়োজিত এবং আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী উৎপাদক। 'সবুজ বিপ্লব' এর সুফলও এরাই ভাগ ভোগ করে ও অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াতে এরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

রাজনীতির মন্ডলীকরণ ঃ ১৯৭৮ সালে জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ মন্ডলের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন, যা মন্ডল কমিশন নামে পরিচিত। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারের কাছে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর জন্য ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষণের জন্য সুপারিশ করা হয়। এই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে সব রাজনৈতিক দলই রাজনীতি করতে শুরু করে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক বাড়াবার জন্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে চাপে রাখার জন্য মূলত কমিশনের সুপারিশকে ব্যবহার করে। এই ধরনের জাতপাতের রাজনীতিকরণকে রাজনীতির মন্ডলীকরণ বলা হয়।

২.৯ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী-১

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ২.২ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ২.২ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ২.২ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ২.২ দেখুন।

৫। অনুচ্ছেদ ২.২ এর শেষ অংশ দেখুন।

৬। অনুচ্ছেদ ২.১ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ২.১ ও ২.২ দেখুন।

অনুশীলনী - ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ২.৩, ২.৩.১, ২.৩.২, ২.৩.৩ থেকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে।

২। অনুচ্ছেদ ২.৩.২ এর শেষ অংশ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ২.৩.৩ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ২.৩.৩ এর শেষ অংশ দেখুন।

৫। অনুচ্ছেদ ২.৩.১ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ২.২, ২.৩, ২.৩.১, ২.৩.২, ২.৩.৩ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ২.৩, ২.৩.১, ২.৩.২, ২.৩.৩ দেখুন।

অনুশীলনী - ৩

সংক্ষিপ্ত-উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। ২.৫.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ২.৫.৫ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ২.৪, ২.৫, ২.৫.১, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪, ২.৫.৫ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ২.৫, ২.৫.১, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪, ২.৫.৫ দেখুন।

অনুশীলনী - ৪

সংক্ষিপ্ত-উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ২.৬ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ২.৬ দেখুন।

২.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

Easy type Questions

1. Trace the emergence and growth of communalism in India since independence.
2. Discuss the major factors responsible for communalizing politics in India during the last two decades.
3. Account for the recent upsurge of communal violence in India.
4. What do you mean by communalism in the Indian context? What are its different forms?
5. Analyse the meaning of communalism in the context of Indian politics.

Short type Question

1. How will you relate religious diversity to communal disharmony in India?
2. Why is communalism regards as a modern phenomenon?
3. How is religion related to communalism in India?
4. How will you define communalism?
5. What are the different forms of communalism in modern India?
6. How is globalization related to communalism in India?
7. Is there any economic factor behind the growth of communalism in India in recent times?
8. What is the distinction between fundamentalism and communalism?

২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. Bipan Chandra, Communalism in Modern India, 1987, Vikas, New Delhi.
2. Rajni Kothari, State Against Democracy, 1989, Ajanta, Delhi.
3. N.L. Madan, Indian Political System, 1989, Ajanta, Delhi.
4. Moin Shakir, State and Politics in Contemporary India, 1986, Ajanta Publications, Delhi
5. Moin Shakir, Politics of Minorities, 1980, Ajanta, Delhi.
6. Rakhahari Chatterjee (ed, Politics India : The State Society Interface, South Asian Pub. New Delhi, 2001.
7. S.L. Sikri, Indian Government and Politics, 1989, Kalyani Pub. New Delhi
8. Jyotirmoy Bhattacharya, Conceptualizing communalism, The Journal of Socio-Political Studies, Vol.I, No.-1, 1992, B.U.

একক - ৩ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ভারতের রাজনীতি (The Minorities and Politics in India)

গঠন —

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ ভারতের সংখ্যালঘু কারা ?

৩.৩ বিভিন্ন ধরণের সংখ্যালঘু

- ৩.৩.১ ভাষাগত সংখ্যালঘু
- ৩.৩.২ ধর্মীয় সংখ্যালঘু
- ৩.৩.৩ জাতভিত্তিক সংখ্যালঘু
- ৩.৩.৪ উপজাতিভিত্তিক সংখ্যালঘু

৩.৪ সংখ্যালঘুদের দাবি

- ৩.৪.১ স্বভূমির দাবি
- ৩.৪.২ ভাষার স্বীকৃতির দাবি
- ৩.৪.৩ সংরক্ষণের দাবি
- ৩.৪.৪ নিরাপত্তার দাবি

৩.৫ সংখ্যালঘু সমস্যার প্রকৃতি ও প্রবণতা

৩.৬ সারসংক্ষেপ

৩.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৩.৮ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৩.৯ নমুনা-প্রশ্নাবলী

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

বহু বিচিত্র সংস্কৃতির দেশ এই ভারত। ভাষা, ধর্ম, জাত, অর্তনৈতিক উন্নয়নের স্তর প্রভৃতির ভিত্তিতে ভারতের জনমন্ডলী বহু ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত। যদিও একটা জাতীয় চেতনা এই গোষ্ঠীগুলিকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে, কিন্তু ভারতীয় জনজীবনের বৈচিত্র অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা ও সংঘাতের সৃষ্টি করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির ক্রিয়াকলাপ অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন করে তুলেছে। তাই অন্যান্য সমস্যার মতো সংখ্যালঘু সমস্যাও ভারতের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছে। এই এককটিতে ভারতের জাতীয় সংহতির প্রতিবন্ধকরূপে সংখ্যালঘু সমস্যার প্রকৃতি ও প্রবণতা পর্যলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ শেষ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জানা যাবে ঃ

- ভারতে সংখ্যালঘু চিহ্নিত করণের সমস্যা
- বিভিন্ন ধরণের সংখ্যালঘুর দাবি
- সংখ্যালঘু সমস্যা ও সমাধানের উপায়

৩.১ প্রস্তাবনা

পৃথিবীর কোন দেশেরই সকল মানুষ সমরূপ নয়। তাই, সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক, উন্নত বা উন্নয়নশীল-সকল দেশের সরকারকেই অল্প বিস্তর সংখ্যালঘু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সংখ্যালঘু সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে; কারণ এই সকল সমাজে ঐতিহ্যবাহী আনুগত্য এবং মানসিকতা খুব প্রবল থাকে এবং আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াও দেশে সংহতি আনার পক্ষে খুব একটা সহায়ক হয় না। আবার ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে কোন সর্বভারতীয় ভাষা ধর্ম বা সংস্কৃতি নেই, সেখানে সংখাযলঘু সমস্যা অতিমাত্রায় প্রবল প্রকৃতির। এখানে ঐতিহ্যবাহী পরিচিতিগুলি শক্তিশালী হওয়ায় সংখ্যলঘুরা ভারতের রাজনীতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই ভারতের জাতীয় সংহতি রাক্ষার্থে সংহতি নাশক শক্তিগুলি প্রতিরোধ করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য।

মাইরন ওয়াইনর (Myron Weiner) মনে করেন যে, ঔপনিবেশিক-উত্তর দেশগুলির মধ্যে ভারত হল এক ব্যাতিক্রম; কারণ এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব সংঘাত ঘটলেও গণতান্ত্রিক রাজনীতি এখনো টিকে আছে।[১] অনেকের মতে, শিক্ষার বিস্তার গোষ্ঠী-চেতনা বাড়িয়ে তুলেছে, অর্থনৈতিক বিকাশ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করেছে এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্র রাজনীতিকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। অনেকে আবার বিকল্প মতও পোষন করেন। তাঁরা বলেন যে, ভারতের বৈচিত্রময় সামাজিক কাঠামোতে জাত, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব একটি জাতিগত বৈশিষ্ট্য। আগেও এই দ্বন্দ্ব ঘটেছিল। এখনও ঘটেছে। তাব মাইরন ভাইনার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে, আগের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘুদের সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে, কারণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবনমন ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি আগের দ্বন্দ্ব ব্যাবস্থাপনায় নীতি কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে ব্রিটিশরা যেহেতু 'বিভক্ত করে শাসন করা'র নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তাই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির দাবি পূরণের কৌশল অবলম্বন করেছিল তারা। স্বাধীন ভারতের নেতারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির দায় হিসেবে ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না কারার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু দেশের সংবিধান প্রণেতা বা রাজনৈতিক নেতা - কেউই সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় মুক্তির ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিল না। তবে ভারতের সংখ্যালঘুদের গোষ্ঠী সচেতনতার মাত্রা বেশী হওয়ায় তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশী। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মোটামুটি একইরকম হওয়ায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের তুলনায় সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িক পরিচিতি অনেক ব্যাপক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যবস্থা ও নতুন

১. Myron Weiner, The Indian Paradox, 1989, Sage, New Delhi, Ch.I

নতুন রাজ্য গঠন করে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। ভোটব্যাঙ্ক সৃষ্টির জন্য সরকারের সংখ্যালঘু তোষণ নীতি এই সমস্যা আরও তীব্র করে তুলেছে। সংখ্যালঘু সমস্যার উৎস যথাযথভাবে উপলব্ধি করে সঠিক নীতি গ্রহণ করতে না পারলে ভারতের জাতিগঠনপ্রক্রিয়া বিপন্ন হবে।

৩.২ ভারতে সংখ্যালঘু কারা ?

ভারতে সংখ্যলঘু বলতে কাদের বোঝায় সে বিষয়ে ধরণাগত সমস্যা আছে। সংখ্যালঘুদের বিষয়ে সর্বাংশে সন্তোষজনক কোন সংজ্ঞা প্রদান করা সহজ নয়। সাধারণভাবে বলা হয় যে, জাতি, ধর্ম, ভাষা বা অন্য কোন এককের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোন সম্প্রদায় যখন মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের কম হয়, তখন সেই সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু বলে বিবেচনা করা হয়। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কারণ হিন্দুরা হল ভারতের মোচ জনসংখ্যার প্রায় তিরাশি শতাংশ। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও নাগাল্যান্ডের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। জম্মু ও কাশ্মীরে মসলমানরা, পাঞ্জাবে শিখরা এবং নাগাল্যান্ডে খ্রীস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে উল্লিখিত জাতি-ধর্মের মানুষের সংখ্যা মোট অধিবাসীদের পঞ্চাশ শতাংশের বেশী। এক দিকে থেকে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে বিবেচিত অন্য দিক থেকে তারা নিজেদের সংখ্যালঘু মনে করে। একজন ভারতীয় সাংবাদিক বলেছেন যে, ভারত হল ইসলাম ধর্মীয় সমুদ্র, যেখানে হিন্দু হল একটা দ্বীপ।[১] যারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে পরিগণিত তারা আবার বহুধাবিভক্ত ও বহুস্তর বিন্যস্ত। বিভিন্ন সংখ্যালঘু উপজাতি এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তফসিলী জাতিভুক্ত অনেক মানুষ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বলে গণ্য হলেও তারা হিন্দু পরিচিত বহন করে না। অনেকে তাই মুসুলমানদেরই প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে মন্তব্য করেন।

শুধু হিন্দুরাই নয়, অহিন্দু সম্প্রদায়গুলিও সুসংহত বা সমরূপ জনগোষ্ঠী বলে বিবেচিত হতে পারে না। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকরকম বিভাগ ও বিভেদ বর্তমান। মুসুলমানদের মদ্যে সিয়া-সুন্নিগত ভেদাভেদ বিশেষভাবে বর্তমান। শিখদের মধ্যে জাট ও অ-জাটগত ভেদাভেদ ছাড়াও শিখরা তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এগুলি হল-নিরংকারী, নানকপন্থী ও নামধারী। তফসিলী জাতি ও উপজাতি এবং খৃস্টানদের মধ্যেও অনূরূপ ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া অসম ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আবার অন্য ধরনের পার্তক্য লক্ষ করা যায়। বাংলা ও তামিলভাষীরা সাধারণভাবে সংখ্যালঘু বলে বিবেচিত নয়। কিন্তু তারা যখন স্বরাজ্যের বাহিরে বাস করে তখন ভাষাগত সংখ্যালঘু বলে বিবেচিত হয়।

ভারতীয় সমাজকাঠামোর উল্লম্বভিত্তিক ও অনুভূমিক বিভাজন থেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয় সমাজের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ভেদাভেদ আছে। ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিই কেবল সংখ্যালঘু বলে গণ্য নয়। জাত, উপজাতি ও ভাষাগত গোষ্ঠীগুলিও বিভিন্ন কারণে স্বনিরূপিত সংখ্যালঘু বলে বিবেচিত হচ্ছে। তারা মনে করেছে যে, তাদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগত পরিচিতি হ্রাস পাচ্ছে। তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যের অধীন হয়ে পড়ছে। তারা ভাবছে যে, সমাজের অন্যের কাছ থেকে অথবা রাষ্ট্রের কাছ থেকে বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়েছে। সংখ্যালঘু ধারণাটি তাই আপেক্ষিক। এটি কেবল সংখ্যাগত ধারণা নয়, রাজনৈতিক। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের সংজ্ঞা নির্ধরণ প্রক্রিয়ায় স্বনিরূপিত বঞ্চনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মাইরণ ওয়াইনারের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, যখন কোন জনগোষ্ঠী সমাজের কেন্দ্রীয় প্রতীক বলে যাকে মনে করে তাতে অংশ গ্রহণ করে না, তখন জনগোষ্ঠী নিজেদের সংখ্যালঘু বলে দাবি করে।[১] এই জনগোষ্ঠী কেবল ক্ষমতার

১. Myron Weiner, The Indian Paradox, P. 42

অভাব বোধ করে না, কেন্দ্র কর্তৃক স্বীকৃত মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতি তাদের নয় বলে তারা মনে কর। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ থেকে প্রতীকে অংশগ্রহণ কোন অংশে কম নয়। সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হল কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু মর্যাদা সম্পর্কে স্ব-আরোপিত ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্প্রদায়। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারতে চার সংখ্যালঘু লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল -– ১) ভাষাগত সংখ্যালঘু, ২) ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ৩) জাত-ভিত্তিক সংখ্যালঘু ও ৪) উপজাতি ভিত্তিক সংখ্যালঘু।

৩.৩ বিভিন্ন ধরণের সংখ্যালঘু

৩.৩.১ ভাষাগত সংখ্যালঘু

ভারতে ভাষাগত বিচার-বিবেচনা ভিত্তিতে রাজ্য-পুনর্গঠনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার ফলে রাজ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘুর সমস্যা নতুন মাত্রা পেয়েছে। রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৫৬ সালে পুর্নগঠন আইন পাশ করা হয়। এই আইন অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করা হলেও ভারতের বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত করা যায়নি। এই কারণে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের একটি সরকারী ভাষা আছে, তাই যারা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকারী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে, তারা নিজেদের ভাষাগত সংখ্যালঘু বলে মনে করে। কোন রাজ্যের ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠনের পরও দেখা যায় যে, রাজ্যের গড়ে ১৮ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা সমশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকারী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা। এই সংখ্যা কেরালায় ৫ শতাংশ থেকে কর্ণাটকে ৩৫ শতাংশ হতে পারে। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম হল আসাম, যেখানে ৪০ শতাংশ মানুষ অসমিয়া ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় কথা বলে।

ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সংশ্লিষ্ট রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করা হতে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠী সংখ্যালঘুদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে তাদের ওপর নিজেদের ভষাকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তাদের ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। কোন কোন রাজ্যে ভূমিপুত্র নীতির ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু হয় রাজ্য থেকে ভাষাগত সংখ্যাগুদের বিতাড়নের জন্য। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের প্রকৃতিও বিভিন্ন ধরণের। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটকে উর্দু ভাষাগোষ্ঠী সমূহের প্রভাব লক্ষ করা যায়। উর্দুভাষা-ভাষী সম্প্রদায় উর্দুকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের দ্বিতীয় সরকারী ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই সব রাজ্যের বেশীর ভাগ মুসুলমান উর্দুকে তাদের মাতৃভাষা হিসেবে পেতে চায়। যে সব সংখ্যালঘুর ভাষা এখনও স্বীকৃতি লাভ করেনি, তারা পৃথক রাজ্যের দাবি করে। সাঁওতালি, সিন্ধী, নেপালী কঙ্কনী প্রভৃতি ভাষাভাষী সম্প্রদায় হল রাজ্যহীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এছাড়া আর এক ধরণের ভাষাগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী আছে যারা বসবাসকারী রাজ্যের ভাষা ছাড়া অন্য এক সরকারী ভাষায় কথা বলে। এই ধরণের সংখ্যালঘুরা স্থানীয় ভাষাভাষীদের মতো 'ভূমিপুত্র' বলে বিবেচিত হয় না। চাকুরী ও শিক্ষার ক্ষেত্রে 'ভূমিপুত্র' বা স্থানীয় লোকদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হতে থাকে। অসম প্রমুখ রাজ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বভূমিতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে অসমে আসু (AASU) গণসংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন এবং মহারাষ্ট্রে শিবসেনার বাঙালী বিতাড়ন আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার কাছাড়ের বাঙালীরা সেখানকার আদি অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিতাড়িত করার জন্য জঙ্গি আন্দোলন শুরু হয়েছে। ত্রিপুরায়

ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি এবং মনিপুরে ন্যাশনাল ফ্রন্ট ভূমিপুত্রের মতবাদের ভিত্তিতে বহিরাগতদের বিতাড়নের ডাক দিয়েছে। কর্ণাটক ও মিজোরামেও এই আন্দোলন হয়েছে।

বস্তুত ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। নতুন নতুন রাজ্য গঠন করে ভাষাগত বৈচিত্র্যের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। ভাষাগত সংখ্যালঘুদেরসমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্য পুনর্গঠনের দ্বারা স্থানীয় এলিটদের হাত শক্ত করা হয়েছে। এই এলিট শ্রেণী মিশ্র সংস্কৃতির ব্যবস্থায় ভাষার বিভিন্নতাকে হাতিয়ার করে নিজেদের কতৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছে। তারা স্থানীয় মানুষকে তাদের জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য এবং অপর গোষ্ঠী থেকে তাদের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন করতে থাকে। এইভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে তারা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে একটি আঞ্চলিক ভাবাদর্শ তৈরি করে। এর ফলে রাজ্যগুলিতে ভাষাগত সংখ্যাগুলিতে সুরক্ষার জন্য যে-সকল ব্যবস্থা তত্ত্বগতভাবে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভাষাগত সংখ্যালঘু কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার সমস্যাসংকুল রাজ্যগুলিতে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুত দেখা যায় যে, ভারতের সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ রাজ্যের স্বাধিকারের দ্বারা প্রতিহত হচ্ছে।

৩.৩.২ ধর্মীয় সংখ্যালঘু

ভারতে সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রধান হল ধর্মীয় সংখ্যালঘু। ১৯৮১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮২.৬ শতাংশ হল হিন্দু। অপরদিকে মুসুলমান হল ১১.৪ শতাংশ, খ্রীস্টান ২.৪ শতাংশ, শিখ ২ শতাংশ এবং বৌদ্ধ ও জৈন ১.২ শতাংশ। ১ সংখ্যাগত বিচারে হিন্দুদের পরেই মুসুলমানদের স্থান। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মুসুলমানরা হল দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। জম্মু ও কাশ্মীরে মুসুলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; কিন্তু অন্যান্য জায়গায় তারা ছড়িয়ে আছে। কেরালায় আছে রাজ্যের জনসংখ্যার ২১.৩ শতাংশ মুসুলমান, পশ্চিমবাংলায় ২১.৫ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ১৫.৯ শতাংশ, বিহারে ১৪.১ শতাংশ এবং কর্ণাটকে ১১ শতাংশ। অন্যত্র তারা রাজ্যের জনসংখ্যার ১০ শতাংশের কম। ভারতে মুসুলমানদের অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তারা এইসব রাজ্যের কয়েকটি নির্বাচিত জেলায় কেন্দ্রীভূত এবং তারা অনুপাতবিহীন শহুরে। অন্ধ্র প্রদেশের জনসংখ্যার ৮.৫ শতাংশ মুসুলমান। কিন্তু হায়দ্রাবাদে জেলার ২৬.৪ শতাংশ মানুষ মুসুলমান। কেরালায় মালাপ্পুরম জেলায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। উত্তরপ্রদেশে রামপুর, আলিগড়, মোরাদাবাদ প্রভৃতি জেলায় মুসুলমানরা কেন্দ্রীভূত। ১৯৭১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যার ১৯.৯ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করত। কিন্তু মুসুলমানদের মধ্যে ২৮.৮ শতাংশ শহুরে। ১৯৮১ সালের আদমসুমারিতে শহুরে মুসুলমানদের সংখ্যাহয়েছে ৩৪ শতাংশ।

ভারতে মুসুলমানদের সমস্যা স্বতন্ত্র ও জটিল। তারা এ দেশীয় জাতীয় জীবনধারা মূল স্রোতের সামিল হতে পারে নি। এলিট মুসুলমানদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতাবোধ গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে অনেক এই ধারণাকে তুলে ধরেন যে, দেশ বিভাগের পর এদেশে মুসুলমানরা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হয়ে পড়েছে। সকল পর্যায়ের সরকারী ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসুলমানদের প্রতিনিধিত্ব অবাঞ্ছিতভাবে হ্রাস পেয়েছে। মুসুলমানদের উর্দু ভাষাকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। তারা প্রায়শই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার শিকার হয়। যদিও এলিট মুসুলমানদের একটি অংশের এই সমালোচনা মূলক বক্তব্যে অনেকাংশে অসঙ্গত ও অসত্য, কিন্তু এদেশের সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নির্বাচনী সাফল্যের স্বার্থে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল মুসুলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন সংগ্রহের ব্যাপারে

Myron Weiner, The Indian Paradox, PP. 67-68

সর্বপ্রকার যত্নবান হয়। সংখ্যালঘু মুসুলমান সম্প্রদায় রাজনৈতিক দলগুলিকে সংখ্যাগুলি মুসুলমান সম্প্রদায়ের ভোটের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়।

মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিখ জনগোষ্ঠীও উল্লেখযোগ্য। শিখরা পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬০.৮), কিন্তু ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে তারা হল ২ শতাংশ। ১৯৪৭ সালে এবং ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব রাজ্যের পুনর্গঠনের পর থেকে শিখরা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হয়েছে। তার আগে তারা পাঞ্জাবেও ছিল সংখ্যালঘু। স্বাধীনতার পর থেকে পাঞ্জাবে শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে আত্ম সনাক্তকরণ এবং পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। শিখ ও হিন্দুরা ভাষাগত ভিত্তিতেও নিজেদের পৃথক করার চেষ্টা করে। ১৯৭১ সালে হরিয়ানায় কোন হিন্দুই নিজেদের পাঞ্জাবী ভাষাভাষী হিসেবে ঘোষণা করেনি। অপর দিকে পাঞ্জাবে বসবাসকারী হিন্দুদের কেবল অর্ধেক অংশ পাঞ্জাবী ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করে।

শিখরা বর্তমান স্বভূমিকর অধিকার ভোগ করেছে। কিন্তু তারাও ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে আছে। ভারতের মোট শিখ জনতার এক পঞ্চমাংশ হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী প্রমুখ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বসবাস করে। তরা শারীরিক দিক থেকে স্বতন্ত্র এবং সারা ভারতের শহরগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু বলে পরিচিত। তারা শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতেও ছড়িয়ে আছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং জার্মানিতে এদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যা লক্ষ্য করা যায়। পাঞ্জাবের রাজনৈতিক আন্দোলনে এদের সমর্থন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

ভারতের খৃস্টানরা শিখদের তুলনায় সংখ্যা বেশী, কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে কম সক্রিয়। ভারতের জনসংখ্যার ২.৪ শতাংশ হল খৃস্টান। অধিকাংশ খ্রিস্টান কেরালা, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রে বসবাস করে। কিন্তু তারা নিবিড়ভাবে কেন্দ্রীভূত উত্তরপূর্ব ভারতে। নাগাল্যান্ডে তার সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮০.২ শতাংশ) এবং মেঘালয়ে তুলনামূলকভাবে কম হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫২.৬ শতাংশ)। তবে যেহেতু উভয় রাজ্যই আয়তনে ছোট এবং শিখদের জন্য যে ভূমিকা পালন করে, এই দুটি রাজ্যের কোনটিই তা পারে না। খৃস্টানরা সাধারণত উপজাতি ও নিম্নবর্ণথেকে ধর্মান্তরিত এবং যে অঞ্চলে বসবাস করে সে ভাষায় কথা বলে। এছাড়া জৈন ও বৌদ্ধরা হিন্দুদের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে তাদের সাধারণভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বলে মনে করা হয় না।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ এক, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ; দুই, হিন্দুদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। শিখ, মুসলমান ও খৃস্টান - তিনটি প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনটিই সংসক্তিপ্রবণ নয়। শিখদের মধ্যে তফসিলী জাতি ও অ-তফসিলী জাতি এবং জাট ও অ-জাট শিখদের মধ্যে বিরোধ আছে। রাজনৈতিক দলগুলি এই বিরোধকে কাজে লাগায়। মুসলমানরাও সংসক্তিপ্রবণ নয়। তাদের মধ্যেও বিভিন্ন ভাগ আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের মুসলমানরা আরব দেশের সঙ্গে যুক্ত। কাশ্মীরী মুসলমানরা কাশ্মীরী পরিচিতির উপর গুরুতব আরোপ করে। উত্তর ভারতের হিন্দীভাষী অঞ্চলের মুসলমানরা উর্দু ভাষায় কথা বলে। অন্ধ্র ও কেরালার মুসলমানরা স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে দাবি করে এবং নিজেদের ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগঠন করে। খৃস্টানদের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, উত্তর-পূর্ব ভারতের খৃস্টানরা দক্ষিণ ভারতের খৃস্টানদের থেকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে স্বতন্ত্র্য।

---

১. Myron Weiner, The Indian Paradox, P. 51

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সংখ্যগুরু হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা উদার ছিল। ইসলাম, খ্রিস্টান বা শিখ ধর্মের মতো গোঁড়ামি হিন্দু ধর্মে ছিল না।[১] হিন্দুদের সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতাকে মুসলমান, শিখ বা খৃস্টানরা অনেকটা তির্যক দৃষ্টিতে দেখত। শিখ বা মুসলমানদের মতো হিন্দুরা ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলত না। কিন্তু সাম্প্রতিক ভারতে হিন্দু মৌলবাদের উত্থান ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। হিন্দু মৌলবাদীরা ভারতকে একটি শক্তিশালী হিন্দু রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে চায়। তাঁরা মনে করে যে, ভারতের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সংখ্যাগুরু হিন্দুদের এই ধরণের অ-সহনশীল মনোভাব সংখ্যালঘু সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

৩.৩.৩ জাতভিত্তিক সংখ্যালঘু

জাতভিত্তিক সংখ্যালঘু বলতে ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত তফসিলি জাতিদের বোঝায়। ভারতের কয়েক হাজার তফসিলি জাতির কোনোটিই দেশের যে কোন একটি অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। জাতভিত্তিক সংখ্যালঘু সংখ্যার ভিত্তিতে নয়, মর্যাদার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। নিম্ন সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবম হিন্দুদের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার প্রভৃতির ভিত্তিতে ভারতীয়রা সাধারনত পূর্বতন অস্পৃশ্য বা তফসিলি জাতিদের সংখ্যালঘু বলে মনে করে। তফসিলি জাতিসমূহের সঙ্গে সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের ধর্ম বা ভাষার দিক থেকে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তারা সকলেই হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী এবং আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষায় কথা বলে। তবে তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য দ্রাবিড় শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় তাদের সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। তাদের সাদারণ বৈশিষ্ট্য হল, তারা অধিকাংশই দরিদ্র, অর্থনৈতিকভাবে শোষিত এবং শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর। পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত তফসিলি জাতি বাস করে তাদের মধ্যে বাগদি, বাউরি, চামার, ধোপা, ডোম, হারি, কৈবর্ত ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। তফসিলি উপজাতিসমূহের সঙ্গে তফসিলি জাতিরাও কতকগুলি সাংবিধানিক বিশেষাধিকার ও সুবিধা ভোগ করে যা অন্যান্য সংখ্যালঘু পায় না - যেমন সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচনে আসন সংরক্ষণ, বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে এবং সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষনণ ইত্যাদি।

ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৪.৬ জন হল তফসিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত। রাজ্য হিসেবে পাঞ্জাবেই সব থেকে বেশি তফসিলি জাতির মানুষ বাস করে। পাঞ্জাবের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ তফসিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশে তফসিলি জাতির কেন্দ্রীভবন লক্ষ করা যায়। তফসিলি উপজাতি, শিখ বা ভাষা গোষ্ঠীর মতো তারা স্বভূমির দাবি করে না। তবে তাদের গোষ্ঠী পরিচিতি বৃদ্ধির জন্য সাংস্কৃতিক প্রতীক ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর তারা গুরুত্ব আরোপ করে। তারা সংরক্ষণ ও ভূমি সংস্কারের জন্য আন্দোলন করে। সাম্প্রতিককালে অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু অনগ্রসরতার মানদন্ড কী হবে তাই নিয়ে মতবিরোধ আছে। ১৯৮০ সালে মন্ডল কমিশন সামাজিক, শিক্ষাগত ও অথনৈতির্ক মানদন্ডের ভিত্তিতে অনগ্রসর সম্প্রদায়কে চিহ্নি করার চেষ্টা চালায়। তবে এখানেও জাতের মানদন্ডই বেশি গুরুত্ব পায়। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে, তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ কোনক্রমেই ৫০ শতাংশের বেশি হতে পারবে না। বিভিন্ন রাজ্যে সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সংঘর্ষ অনেক সময় হিংসাত্মক রূপ নেয়।

৩.৩.৪ উপজাতিভিত্তিক সংখ্যালঘু

ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উপজাতি গোষ্ঠীর ভূমিকা নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৬.৯ শতাংশ (১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী) হল উপজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের বেশির ভাগই স্বভূমিতে বাস করে। এগুলির মধ্যে অনেক অঞ্চল সরকার কর্তৃক তফসিলি এলাকা বলে চিহ্নিত। ভারতে ছয়টি উল্লেখযোগ্য উপজাতি গোষ্ঠী হল –- মধ্যভারতের গঁদ, পশ্চিমভরতের ভীল, বিহার পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার সাঁওতাল, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে ওঁরাও, রাজস্থানের মীনা এবং বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার মুন্ডা। এই উপজাতিরা ভারতের মোট উপজাতির অর্ধেক। কিছু উপজাতি আবার যে অঞ্চলে বাস করে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ। এগুলি হল–- উত্তরপূর্ব ভারতে নাগা, খাসি এবং গাড়ো।

উপজাতিরা ভারতের জাতীয় সংখ্যালঘু। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অংশের তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী নাগাল্যান্ডে তাদের সংখ্যা হল ৮৯ শতাংশ, মেঘালয়ে ৮০ শতাংশ এবং অরুণাচলপ্রদেশে ৭৯ শতাংশ। ভারতের উপজাতিরা তিনটি প্রধান অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। একটি হল উত্তর পূর্বাঞ্চল। দ্বিতীয়টি হল মধ্যভারত যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিহার, ওড়িশার পার্বত্যঅঞ্চল, মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণপূর্বাঞ্চল এবং অন্ধ্রের উত্তরাংশ।, তৃতীয় বিভাগটি হল ভারতের পশ্চিমাংশ যার মধ্যে রয়েছে গুজরাটের পূর্বাংশ, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং দক্ষিণ রাজস্থান। এছাড়া উপজাতি-অধ্যুষিত ছোট অঞ্চলগলির মধ্যে রয়েছে হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল এবং তামিলনাড়ুর নীলগিরি পাহাড়। সাদারণত দেকা যায় যে, উপজাতিরা গ্রামীণ এলাকায় কেন্দ্রীভূত এবং শহরগুলি উপজাতির প্রভাবমুক্ত।

ভারতের উপজাতিরা পুরোপুরিভাবে বিচ্ছিন্ন না হলেও আধুনিকরণের প্রবাব থেকে মুক্ত। অন্য ভারতীয়দের তুলনায় তাদের মৃত্যুর হার বেশি, স্বাক্ষরতার হার কম। বস্তুত তারা শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল। সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার - এক কথায় জীবনধারাগত বিচারে এরা ভারতের অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।এদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশিষ্টতা দান করেছে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এরা দীর্ঘদিন ধরে এরা শোষিত ও অবহেলিত। তথাকথিত ভদ্রলোক ও বাবু সম্প্রদায় এদের অবজ্ঞা চোখে দেখে। দারিদ্র ও শিক্ষার অভাবের ফলে তারা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তবে এইসব উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যেও ক্ষমতা ও অথনৈতিক সমৃদ্ধির বিচারে এক এলিট শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। নিজেদের সমাজ সংগঠনের সংস্কার সাধন ও সংরক্ষণের স্বার্থে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও আর্থ-রাজনীতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী আন্দোলন করছে। ঝাড়খন্ড ও ছত্রিশগড় আন্দোলনের পলে দুটি নতুন রাজ্য গঠিত হয়েছে। বোড়ো আন্দোলন চলছে।

এইসব উপজাতিগোষ্ঠীর মূল সমস্যা হল এই যে, তারা সমাজ ও রাজনীতির মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তারা এখনো পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক এবং উপজাতীয় আনুগত্যের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত। এই আনুগত্যবোধ জাতির মূল স্রোতে তাদের ফিরিয়ে আনার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। এছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতে

ঔপনিবেশিক আমলে উপজাতিরা ইংরেজ আধিকারিকদের দ্বারা পরিচালিত হত। তারা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে চাইত না। তাদের মধ্যে এক ভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক চেতনা গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে এই ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক হতাশা উপজাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব গড়ে তুলেছে।

অনুশীলনী — ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। ভারতে সংখ্যালঘু রাজনীতি গড়ে উঠেছে কেন?

২। ভারতে সংখ্যালঘুদের কীভাবে চিহ্নিত করবে?

৩। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের কীভাবে চিহ্নিত করবে?

৪। উপজাতি-ভিত্তিক সংখ্যালঘু কারা?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। ভারতে বিভিন্ন ধরণের সংখ্যালঘু সম্পর্কে পর্যালোচনা কর।

৩.৪ সংখ্যালঘুদের দাবি

৩.৪.১ স্বভূমির দাবি

ভারতে সংখ্যালঘুদের দাবি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধরণের সংখ্যালঘু বিভিন্ন রকম দাবি উপস্থাপন করে। তবে প্রায় সব ধরণের সংখ্যালঘুর একটি প্রধান দাবি হল — 'আমরা স্বভূমি চাই।' ১৯৪৭ সালের পূর্বে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দু-সাংখ্যাধিক্য এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানদের স্বভূমির দাবি প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে তাদের ধারণা হয়েছিল যে তাদের স্বভূমি নিরাপদ হবে না যদি তারা নিজেদের জাতি-রাষ্ট্র গঠন করতে না পারে। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে কিছু শিখ নেতা শিখদের স্বভূমির জন্য দাবি উপস্থাপন করেছিল। তারা তখন ইসলাম, হিন্দু ও শিখ ধর্মের জন্য তিনটি জাতি গঠনের ধারণা পোষন করেছিল। ১৯৪৭ সালের পরে যখন শিখ-সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তখন সেকালে শিখ নেতাদের মধ্যেই স্বভূমির দাবি ছিল প্রধান চালিকাশক্তি। ১৯৬৬ সালে রাজ্য পুর্নগঠনের ভিত্তিতে শিখ-সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পাঞ্জাব পুনর্গঠিত হয়েছিল। কিন্তু শিখ জাতীয়তাবাদী সন্তুষ্ট হতে পারেনি, কারণ শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ (জাঠ ও অ-জাঠ শিখদের মধ্যে দ্বন্দ্ব) তাদের ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে।

১৯৫০ এর দশকের পর থেকে ভাষাগত স্বভূমি বা রাজ্যগঠনের দাবি ভারতের রাজনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। ভাষাগত সংখ্যালঘুরা নিজেদের রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিল যাতে তারা নিজ রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে। তাদের দাবির ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে ভারতের রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে ভারতের সংবিধানের অষ্টম তফসিলি বর্ণিত প্রায় সব ভাষাগোষ্ঠী (উর্দু ও সিন্ধী ভাষাভাষী ছাড়া) নিজেদের রাজ্য সংখ্যা গরিষ্ঠে পরিণত হয়েছে।

ভারতের বেশ কিছু উপজাতি অঞ্চলেও স্বভূমির দাবি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মুন্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে এই দাবি বিশেষভাবে গড়ে উঠেছে। কিছু ক্ষেত্রে এই আন্দোলন ব্যর্ত হয়েছে, কারণ কয়েকটি জেলা ছাড়া অধিকাংশ অঞ্চলে উপজাতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তবে অন্যান্য অঞ্চলে উপজাতিরা সংখ্যায় বেশি হওয়ায় স্বভূমির আন্দোলন গড়ে উঠেছে। স্বভূমির আন্দোলন থেমে থাকেনি, আর এই আন্দোলন নির্মুল হয়েও যায়নি। ভারতের উত্তর-পূর্বঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে তাদের স্বার্থ ও জীবনধারণাগত স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হয়ে পড়লে তার বিক্ষোভ বিদ্রোহের সামিল হয় এবং পৃথক রাজ্যের দাবি করে। এইভাবে অনেক নতুন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গোষ্ঠার সঙ্গে ভূখন্ডের সংযোগ খুব নিবিড়। কোন গোষ্ঠী যে-ভূখন্ডে বাস করে সেই ভূখন্ডকে তারা তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পীঠস্থান বলে মনে করে। উপজাতি ও ভাষাগত গোষ্ঠীগুলি স্বভূমিকে তাদের একান্ত আপন বলে ভাবে। তারা নিজেদের ভূখন্ডের সুযোগ সুবিধা ও চাকরির অধিকার থেকে অন্যদের বঞ্চিত করার জন্য সচেষ্ট হয়। ভাষাগত সংখ্যাগরিষ্ঠরা নিজেদের 'ভূমিপুত্র' বলে ঘোষণা করে এবং বহিরাগতদের ভূখন্ডের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা, চাকরি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। তারা শুধু ভুখন্ড দখল করে না, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণও প্রয়োগ করে।

এইসব কারণে অনেক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যখন একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখন্ডে বাস করে তখন তারা পৃথক রাজ্যের জন্য দাবি উপস্থাপন করে। পৃথক রাজ্যের ভিত্তিতে তারা সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হয়। এর ফলে সংখ্যলঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক আত্মীকরণকে প্রতিহত করতে পারে। বস্তুত, সরকারি চাকরি, সম্পদ, শিক্ষা প্রভৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণবজায় রাখতে সমর্থ হয় তারা। উত্তরপূর্ব ভারতে উপজাতি কর্তৃক নতুন রাজ্যগঠন অন্যদের উৎসাহিত করেছে। অসমে বোড়ো রাজ্য গঠনের জন্য আন্দোলন চলছে। উপজাতিরা পৃথক রাজ্যের জন্য আন্দোলন করছে কেবল সম্পদের উপর নিন্ত্রণের জন্য নয়, স্থানীয় শ্রম বাজারে অ-উপজাতিদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য। উত্তরপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে, অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রের উপ-অঞ্চলে ভুখন্ডগত ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি রক্ষা করার জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি উঠেছে। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলি সরকারি ভাষা হিসেবে তালিকাভুক্ত নয়এমন ভাষাগত গোষ্ঠীগুলি স্বতন্ত্র পরিচিতির জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি করছে। পশ্চিমবঙ্গ, মহাররাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারকে কয়েকটি এককে পুনর্গঠন করলে মুসলমানরা, উপজাতিরা ও নেপালীরা নতুন রাজ্য গঠনের মাধ্যমে নিজেদের সংখ্যা বাড়াতে পারবে। বস্তুত গোষ্ঠী পরিচিতির সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার গভীর সংযোগে ভারতের প্রতিটি গোষ্ঠীকে স্বতন্ত্র্য রাজ্যের জন্য আন্দোলন উৎসাহিত করেছে।

৩.৪.২ ভাষার স্বীকৃতির দাবি

অনেক ভাষাগোষ্ঠীর একটি প্রধান হল নিজ ভাষায় সাংবিধানিক স্বীকৃতি। নেপালী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষা এভাবেই সংবিধানের অষ্টম তফসিলি স্থান পাওয়ায় দাবি তুলেছিল। সংবিধানের অষ্টম তফসিলে স্থান পেলে ভাষাগোষ্ঠীগুলি তাদের নিজ নিজ ভাষায় সর্বভারতীয় পরীক্ষা দিতে পারে। সেই রকম কোন রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেলে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী রাজ্য সরকারি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম। সাংবিধানিক স্বীকৃতি ভাষাগত আত্মীকরণ প্রতিহত করে এবং গোষ্ঠীর পরিচিতি ও ঐক্যবোধ বৃদ্ধি করে। সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠী গুলির যদি শ্রেণী গঠনে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিশু থাকে তাহলে তারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বা সরকারি চাকরির জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা

প্রযোজ্য হবে কীনা - সে বিষয়ে বিতর্ক গড়ে উঠেছে। দার্জিলিং ও দেরাদুনের নেপালীরা, কর্ণাটকের মারাঠী ভাষীরা, অসমের বাঙালীরা এবং কোন রাজ্যে সংখ্যায় বেশি আছে এমন উর্দুভাষা ভাষীরা এই ধরণের দাবি উপস্থাপিত করেছে। ভাষাগত গোষ্ঠীর আন্দোলনের ফলে ১৯৬৭ সালে ২১ তম সংবিধান সংশোধন আইনে সিন্ধিকে এবং ১৯৯২ সালে ৭১তম সংবিধান সংশোধন আইনে কোঙ্কনি, মনিপুরি ও নেপালীকে অষ্টম তফসিলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩.৪.৩ সংরক্ষণের দাবি

বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পৃথক রাজ্যের জন্য দাবির বিকল্প হিসেবে আইনসভা এবং প্রশাসনিক কৃত্যকে আসন সংরক্ষণের দাবি উপস্থাপিত করে থাকে। অনুন্তত শ্রেণীর উন্নতিবিধানের জন্য সংরক্ষণের সমস্যা ভারতের অন্যতম সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েই সামাজিকভাবে নিপীড়িত ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীসমূহের সমস্যা জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের নজরে আসে। ড: আম্বেদকর কর্তৃক উত্থাপিত অনুন্নত শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনী এলাকার দাবিকে চ্যালেঞ্জ করে গান্ধীজি যখন অনশন শুরু করেন তখন থেকে এই শ্রেণীর দাবিদাওয়া জাতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য পায়। ১৯০৯ সালের সংস্কার আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী এলাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইংরেজরা পরবর্তীকালে শিখ সম্প্রদায়, তফসিলি জাত, ইঙ্গ ভারতীয় সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য পৃথক নির্বাচনী এলাকার ব্যবস্থা করে। ব্রিটিশরা এই ব্যবস্থা নিয়েছিল 'ভাগ করা শাসন করা'র নীতিকে কার্যকর করার জন্য। স্বাধীনতা লাভের পর তফসিলি জাতি ও উপজাতি ও ইঙ্গ ভারতীয়দের জন্য আসন সংরক্ষণ ছাড়া সব রকম পৃথক নির্বাচনী এলাকা বিলুপ্ত করা হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে নতুন সংবিধান রচনার সময় সংবিধান প্রণেতারা অনগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে। কারণ জাতিগঠন ও সমাজ পুনর্গঠনের জন্য এদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে মৌলিক অধিকার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হয়। কমিটির প্রতিবেদনে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে তিনটি প্রচলিত মতের উল্লেখ করা হয়। একটি মত ছিল ব্রিটিশ আমলে প্রচলিত সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে আইনসভায় আসন সংরক্ষণ করা উচিত। পরামর্শদাতা কমিটি এই শেষোক্ত মতই সমর্থন করে। এরই ভিত্তিতে ভারতের সংবিধানে একদিকে যেমন অস্পৃশ্যতা প্রথাকে বেআইনি ঘোষনা করা হয়েছে, অন্যদিকে তফসিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়। এই ব্যবস্থাগুলি হল - সরকারি চাকরিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ সংরক্ষণ, পার্লামেন্ট, রাজ্য আইনসভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থায় আসন সংরক্ষণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

ইংরেজ আমলে মুসলমানরা সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু নতুন সংবিধানে সংরক্ষণের আওতা থেকে তাদের বাইরে রাখা হয়েছে। মুসলিম নেতারা দাবি করে যে চাকরি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে আছে;[১] সেইজন্য তাদের ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু ভারত সরকার ধর্মীয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে

১. S.L.Skri, Indian Goverment and Politics, P. 58

সংরক্ষণের দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, কারণ এর ফলে ভারতের ঐক্য ও সংহতি বিঘ্নিত হতে পারে। শিখরাও ভারত সরকারের সংরক্ষণ নীতির বিরোধিতা করে থাকে। তারা মনে করে যে, সংরক্ষণ নীতি শুধু তাদের বঞ্চিতই করছে না, সামরিক বিভাগে নৃকুলগত ভারসাম্য রক্ষার নাম করে রাজ্যগুলি থেকে আনুপাতিক হারে যে নিয়োগ পদ্ধতি চালু হয়েছে তার ফলে সামরিক বিভাগে শিখদের প্রাধান্য খর্ব করা হচ্ছে।[১] সাম্প্রতিককালে ভূমিপত্রের অধিকার জন্যও সংরক্ষণ আনি সম্প্রসারিত হয়েছে।

অনগ্রসর শ্রেণী বলে কাদের চিহ্নিত করা হবে –- এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। তবে এ নিয়ে যে বিভিন্ন কমিশন গঠিত হয়েছিল। তাদের প্রতিবেদনে অনগ্রসরতা নির্ণয়ের মানদন্ড হিসেবে জাতকেই স্বীকার করা হয়। এ বিষয়ে ১৯৮০ সালে প্রদত্ত মন্ডল কমিশনের প্রতিবেদনে সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক — এই তিনটি মানদন্ডের ভিত্তিতে অনগ্রসর শ্রেণীকে চিহ্নিত করা হয়। এই কশিনের সুপারিশে বলা হয় যে, তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য যে ২২.৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে সেটি ছাড়াও ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসর মানুষদের জন্য থাকা উচিত। ১৯৯০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং মন্ডল কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নেন। তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল মানুষদের জন্য কমিশন যে আরও ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করেছিল সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করে দেয়।

সাম্প্রতিককালে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও বিহারে সংরক্ষণের বিরোধিতা করে আন্দোলন করেছে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষকে সামাজিক অবিচার ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথে সংরক্ষণমূলক বৈষম্য ব্যবস্থা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু এই ব্যবস্থা ভারতে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এরূপ ব্যবস্থা জাতপাতের মানসিকতাকে পরিপুষ্ট করেছে। সংরক্ষণ নীতিকে এলিট গোষ্ঠী ভোটের রাজনীতিতে এক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে। রাজনীতির মন্ডলীকরণ ঘটেছে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের সংঘর্ষ জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন করে তুলেছে।

'সংরক্ষণমূলক বৈষম্য' ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও কোনো সম্প্রদায়কেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। সুবিধাপ্রাপক শ্রেণী মনে করে যে, এই নীতি যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। অপরদিকে যারা সংরক্ষণের আওতার বাইরে আছে তারা এই ব্যবস্থাকে বৈষম্যমূলক বলে মনে করে। বস্তুত কেবলমাত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে অনগ্রসর সংখ্যালঘু শ্রেণীর সমস্যা মেটাননো যাবে না। আমূল ভূমি সংস্কার, শিক্ষার প্রসার ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে সামাজিক অনগ্রসরতা কোনদিনই দূর করা যাবে না।

৩.৪.৪ নিরাপত্তার দাবি

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও সংখ্যালঘু তাদের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত। দলিত এবং অস্পৃশ্যরা উচ্চবর্ণের মানুষ কর্তৃক আক্রান্ত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে সংখ্যালঘুরা বারবার অভিযোগ জানিয়েছে যে, তারা পুলিশ প্রশাসনের ওপর আর ভরসা রাখতে পারছে না; পুলিশরাই তাদের ওপর আক্রমণ করছে অথবা আক্রমণকারীদের সমর্থন করেছে।[২] পাঞ্জাব, গুজরাট এবং উত্তর প্রদেশে নৃকুলগত দ্বন্দ্ব দমনে পুলিশ

১. Myron Weiner, The Indian Paradox, PP. 67-682

২. Ibid P. 68

কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে নৃকুলগত দ্বন্দ্ব দমনে ঘনঘন কেন্দ্রীয় পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর ব্যবহার এবং রাজ্য সরকারের পতন ঘটানো ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির অবক্ষয়ই সূচিত করে। সাম্প্রতিককালে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজনীতিমুক্ত পুলিশ গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অনুশীলনী — ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। সংখ্যালঘুদের স্বভূমির দাবি বলতে কি বোঝায়?

২। ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের দাবি কী?

৩। 'সংরক্ষণমূলক বৈষম্য' বলতে কি বোঝায়?

৪। আদিবাসীদের দাবিগুলি চিহ্নিত কর।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। সংখ্যালঘুদের দাবিগুলি বিশ্লেষণ কর।

৩.৫ সংখ্যালঘু সমস্যার প্রকৃতি ও প্রবণতা

অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও সংখ্যালঘুগোষ্ঠী প্রয়শই বৈষম্যজনিত আচরণের শিকার হয়। সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর কাছে তারা অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র বলে বিবেচিত হয় এবং সামাজিক কার্যকলাপে সামগ্রিকভাবে অংশগ্রহণে তাদের বাধা দেওয়া হয়। ভারতে সংখ্যালঘু সমস্যা ওপনিবেশিক আমলের পরিণতি হিসেবেই গড়ে উঠেছে। এ.আর.দেশাই মনে করেন যে, জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু সমস্যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান সমস্যাগুলোর অন্যতম।[১] তাঁর মতে অন্ধ্র, মালয়ালী, কর্ণাটকী, মহারাষ্ট্রীয়, বালুচি ইত্যাদি জাতি - ভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহ ও ভারতীয় মুসলমান, শিখ, অবনত শ্রেণী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ বৃদ্ধি পাওয়াতে সমস্যাটা চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন এবং স্বাধীনতা উত্তর ভারতের রাষ্ট্রকাঠামোর প্রকৃতি — উভয়ের দিক থেকেই সমস্যাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এইসব জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী সমূহের আন্দোলন আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রেরণা, স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে স্বচ্ছন্দে উন্নতি করার আকাঙ্খা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমান ও অন্যান্য অবনত শ্রেণী সমূহ সমগ্র দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকলেও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন শুরু করেছিল এবং তাতে ইন্ধন দিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা। এর পরিণতি হিসেবে দেশবিভাজনের মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটে।

ভারতের বর্তমান সংখ্যালঘু সমস্যা এই প্রেক্ষিতেই বেড়ে উঠেছে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভারতের নেতৃবৃন্দ সংখ্যালঘু সমস্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেছিলেন। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সমূহের স্বার্থরক্ষায় কিছু ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের সংবিধানে সরকারি

১. A.R. Desai, Social Background of Indian Nationalism, Popular Prakashan, Bombay, 1981, P.381

চাকরির ক্ষেত্রে অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহের জন্য পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের সংবিধান সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার, নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, সংরক্ষণ ও পরিচালনার অধিকার, আইন সভায় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রভৃতি নিশ্চিত করেছে। কিছু কিছু অনগ্রসর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে এবং ঐ গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছাত্রসমাজকে বৃত্তিদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সমূহের অধিকাংশ মানুষই অর্থনৈতিক শোষম ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়ে চলেছে। বস্তুত, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো মৌল পরিবর্তন না হয়োয় ফলেই আজও সংখ্যালঘু সমস্যা এমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

রজনী কোঠারী প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে, সাম্প্রতিককালে ভারতে কয়েকটি মৌলিক ক্ষেত্রে গুরুতর অবক্ষয় ঘটেছে।[২] প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে এই অবক্ষয় বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে নয়, মানব সম্পদ ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও এই অবক্ষয় লক্ষ করা যায়। এসব কিছুই সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণে সাহায্য করেছে। অন্য দিকে সাবেকী পরিচিতি ও আঞ্চলিকতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সেখানে সংখ্যালঘুরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংখ্যালঘুরা পরিবেশ আন্দোলন, সংস্কৃতি সংরক্ষণের আন্দোলন, মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন, দলিত আন্দোলন প্রমুখ নতুন সামাজিক আন্দোলন (New Social Movemens) এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে।

ভারতে সংখ্যালঘুদের গোষ্ঠী সচেতনতার মাত্রা বেশী হওয়ায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাাও বেশি। সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক সচেতনতার তিন ধরনের প্রকাশ লক্ষ করা যায় -- ১) অভাব অভিযোগজনিত অবস্থার অভিব্যক্তি, ২) স্বতন্ত্র পরিচয়ের সংকট এবং ৩) বিচ্ছন্নতার মাধ্যমে স্বভূমির স্বপ্ন।[১] শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি, রাজনৈতিক ালাপ আলোচনা, নির্বাচনী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের অভাব-অভিযোগজনিত ক্ষোভকে প্রশমিত করা যায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র পরিচিতি সংরক্ষণ জনিত সমস্যারও সহজেই সমাধান করা যায়। এক্ষেত্রেও জাতীয় সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা গভীর সমস্যা ও জটিল সংকটের সৃষ্টি করেছে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীগুলির বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে স্বভূমির স্বপ্ন জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি করে।

একদিকে যেমন সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে তাদের বিভিন্নরকমের দাবি উপস্থাপিত হয়েছে, অপরদিকে সংখ্যাগুরুদেরও মর্যাদা রক্ষার জন্য নতুন করে দাবি উপস্থাপিত হচ্ছে।[২] আত্মসচেতন সংখ্যাগুরুর দাবি নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। দুটি অধিক্রমনকারী পরিচিত সংখ্যাগুরু মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। একটি হল হিন্দুত্ব ; অপরটি ভাষাগত আঞ্চলিকতাবাদ। সাম্প্রতিককালে 'হিন্দুত্বের পুনরুত্থান' বা 'হিন্দু নবজাগরণ' এক অন্যতম রাজনৈতিক প্রবণতা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই প্রবণতার বিভিন্ন রূপ লক্ষ করা যায়; যেমন, খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আর.এস.এস. এর জঙ্গী অবস্থান, সমাজ সংস্কার এবং হিন্দু ঐক্য -- উভয়ের জন্যই বিরাট হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠা, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের পুনর্ধমান্তরকরণ এবং উপজাতিদের হিন্দুকরণের জন্য আন্দোলন প্রভৃতি।

---

২. Rajni Kothari, State Against Democracy : In Search of Humane Governance, 1988, Ajanta, Delhi.

১. S.L. Sikri, Indian Goverment and Politics, P. 58

২. Myron Weiner, The Indian Paradox, p. 59

সংখ্যাগুরুর মর্যাদা রক্ষার্থে অপর একটি দাবিদার হল ভাষাগত আঞ্চলিকতাবাদ। এর ধারণা অনুযায়ী সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে পার্থক্য করা হয় আঞ্চলিক স্তরে, জাতীয় স্তরে নয়। এর বিভিন্ন রূপ লক্ষ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, ভূমিপত্রের আবেগ, শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, পাঠ্যপুস্তকে আঞ্চলিক ইতিহাস, আঞ্চলিক প্রতীক ও আঞ্চলিক গর্বের অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি। হিন্দু পুনরুত্থান যেমন শিখ, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের ভয়ের কারণ, তেমনি ভাষাগত আঞ্চলিকতাবাদও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের কাছে ভীতিপ্রদ। হিন্দুদের অন্য ধর্মকে আত্তীকরণের প্রচেষ্টা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাছে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে ভাষাগত সংখ্যাগুরুদের আত্তীকরণগত দৃষ্টিভঙ্গি সাংস্কৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

ভারতে সকল নৃকুলগত গোষ্ঠীর দুটি প্রধান উদ্দেশ্য হল — ১) গোষ্ঠী পরিচিতি শক্তিশালী করা, ২) গোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি করা। গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ সিদ্ধি হয় রাজনীতির পথ ধরে। তারা তাই রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। নির্বাচনে সাফল্য লাভের জন্য সংখ্যালঘুদের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই তাই সংখ্যালঘুদের ভোট তাগের অনুকূলে আনতে চায়। একথা সত্য যে, ভারত শ্রেণী সচেতনতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, পাঞ্জাবে কৃষকরা সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়। আসামে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরির বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করে। কিন্তু এগুলি আবার ভিন্ন মাত্রা পায় যখন তারা শিখ এবং অসমীয়া হিসেবে ভূমিকা পালন করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যে সব রাজনৈতিক দল দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের কাছে পৌঁছোনোর পথ হিসেবে শ্রেণী আবেদনকে ব্যবহার করে তাদের তুলনায় যে-সব দল সরাসরি সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও পরিচিতিকে তুলে ধরে, তারা অধিক সাফল্য পায়।[৩] ১৯৭৭ সালের পর থেকে সাধারণ নির্বাচনগুলির ফলাফল পর্যালোচনা করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। বর্তমানে 'হিন্দু স্বীকারোক্তির রাজনীতি' (Hindu Confessional Politics) ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।[৪] একদিকে 'স্বীকারোক্তির রাজনীতির' উদ্ভব, অন্যদিকে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীসমূহের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে।

৩.৬ সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ শাসনকাল ভারতে জাতিগঠনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা-উত্তর কালেও অব্যাহত আছে। স্বাধীনতার এত বছর পরেও জাতীয় সংহতি যে নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠতে পারেনি তার অন্যতম কারণ হল এই সংখ্যালঘু সমস্যা। এই সমস্যার সঠিকভাবে সমাধান করতে না পারলে ভারতের জাতিগঠনের প্রক্রিয়াও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাছাড়া জাতীয় সংহতি বজায় রেখে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে হলেও সংখ্যালঘুদের সমস্যা মেটানো প্রয়োজন।

মাইনর ভাইনার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞাণী মনে করেন যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা গোষ্ঠী সমস্যা মেটাতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কংগ্রেসের এই ভূমিকা সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক অবনমন ও পুলিশের রাজনীতিকরণ সরকারের দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার নীতিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া যে-সব সরকারী নীতি পূর্বে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব প্রশমিত করেছিল, সেগুলিই এখন দ্বন্দ্বের উৎসে পরিনত হয়েছে। বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে তফসিলি জাতি

৩. Rudolph and Rudolph, In Pursuit of Lakshmi, P. 48
৪. Ibid. PP. 46-47

ও উপজাতিদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে অন্যান্য গোষ্ঠীর জন্য এই নীতির সম্প্রসারণের দাবি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং ভাষাগত, ধর্মীয় এবং উপজাতি ভিত্তিক সংখ্যালঘুদের স্বভূমি প্রদানের জন্য রাজ্য পুনর্গঠনের নীতি ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে অনেকাংশে দ্বন্দ্বের প্রশমন ঘটিয়ে ছিল। কিন্তু ১৯৮০'র দশকের পর থেকে এই নীতি আর গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না, কারণ অধিকাংশ রাজ্যই বর্তমান কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনবিন্যাস দাবি করছে। ভারতের বহুত্ববাদী দেশে সাম্প্রতিককালে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু — উভয় গোষ্ঠীর দাবির প্রেক্ষিতে সরকারের পূর্বের সফল দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার নীতির পুনর্বিবেচনা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

মইন সাকির বলেছেন যে, সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানের জন্য দু'টি পদ্ধতির কথা অনেক সময় বলা হয়ে থাকে –- ১) আত্তীকরণ নীতি ও ২) বহুত্ববাদী নীতি। আত্তীকরণবাদীদের বক্তব্য হল, দেশের ধর্মীয় ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের অবসান ঘটাতে হবে এবং অ-হিন্দুদের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিরসাথে সংযুক্ত করে নিতে হবে। গোঁড়া হিন্দু গোষ্ঠী এবং তাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলি এই ধরণের মত পোষণ করে। অপরদিকে বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের শাসক গোষ্ঠী। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন ধরণের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির সহাবস্থানকে সমর্থন করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা ও বৈষম্যমূলক সংরক্ষণের নীতিকে প্রধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই বহুত্ববাদী পদ্ধতি সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। 'স্বীকারোক্তির রাজনীতি' (Confessional Politics) ধর্মনিরপেক্ষতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, ভারতের মতো বহুত্ববাদী দেশে, যেখানে বহুভাষাভাষী ও বহুজাতির মানুষ বাস করে, সেখানে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার যথার্থ রূপায়ণ ছাড়া সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দেশে সহিষ্ণুতার বাতাবরণ গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে। সংখ্যাগুরু — সংখ্যালঘু দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনায় রাজ্য সরকারগুলিকে উদ্যোগী হতে হবে। সংখ্যালঘু রাজনীতির ভবিষ্যৎ কি হবে তা নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কার্যাবলীর ওপর। যদি রাজ্য সরকারগুলির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে ব্যর্থ হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার তার কার্যাবলীর দ্বারা কেন্দ্রবিরোধিতায় প্ররোচিত করে, তাহলে সংখ্যালঘু সমস্যার হতাশাজনক চিত্র দেখা যাবে। আর যদি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের দাবির সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেয় এবং সংখ্যাগুরুর সাংস্কৃতিক পরিচিতি ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষায় দক্ষতা দেখাতে পারে তাহলে সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক চিত্র লক্ষ করা যাবে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, শুধুমাত্র আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের সমস্যা মেটানো যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

অনুশীলনী — ৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। সংখ্যালঘু সমস্যায় সাম্প্রতিক প্রবণতা কী?

২। সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ কী?

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। সংখ্যালঘু সমস্যার প্রকৃতি ও প্রবণতা বিশ্লেষণ কর।

৩.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা (Conflict Managment) ঃ মাইরণ ওয়াইনার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞাণী মনে করেন যে, ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যেমন গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করেছে, তেমনি দ্বন্দ্ব মেটানোর ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে। ভারতে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক দল এই দ্বন্দ্ব মেটানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে কংগ্রেস দল দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানিক অবনমন ঘটায় এই ভূমিকার ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিয়েছে।

ভাষাগত রাজ্য পুনর্গঠন (Linguistic Reorganization of States) ঃ স্বাধীনতার আগে থেকেই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশিক পুনর্গঠনের দাবি উপস্থাপিত করা হয়েছিল। কিন্তু এই দাবি মানা হয়নি। স্বাধীনতার পর এ ব্যাপারে বিভিন্ন কমিশন হয়েছিল। এই দাবি জাতীয় স্বার্থ বিরোধী বলে মানা হয়নি। তবে ১৯৫৩ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠনের ঘোষনা করা হয়। এই কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ হয়। এই আইন অনুযায়ী ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠিত হতে থাকে। কিন্তু এর ফলেও নতুন করে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভাষাগত সংখ্যালঘুর সমস্যা গড়ে উঠেছে।

ভূমিপুত্র (Sons of Soil) ঃ বর্তমানে ভারতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন জনসম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কতৃত্ব কোন জনগোষ্ঠীর জীবনধারণাগত স্বাতন্ত্র ক্ষুন্ন করার জন্য 'ভূমিপুত্র' এর বিশেষাধিকারের মতবাদ গড়ে ওঠে। এর ভিত্তিতে 'অসম অসমীয়াদের জন্য', 'তামিলনাড়ু তামিলদের জন্য' প্রভৃতি জিগিরের সৃষ্টি হয়েছে।

স্বভূমি (Homeland) ঃ বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগুরুতে পরিণত হবার জন্য স্বতন্ত্র্য রাজ্য গঠনের দাবি করে। তাদের এই দাবিকে স্বভূমির দাবি বলে। ১৯৬০-এর দশক থেকে স্বভূমির দাবির ভিত্তিতে অনেক নতুন রাজ্য গড়ে ওঠে।

সংরক্ষণমূলক বৈষম্য (Protective Discrimination) ঃ ভারতীয় সংবিধানে যদিও সাম্যের অধিকার প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু অনগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ কার হয়েছে। তাই একে সংরক্ষণমূলক বৈষম্য বলা হয়। সংবিধানের ষোড়শ অংশে তিনটি অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এই তিনটি অনগ্রসর সম্পরদায় হল –– তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং ইঙ্গ ভারতীয় সম্প্রদায়। এছাড়া আছে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী। জাতিগঠন ও সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সকলকে সমান অংশীদার করার উদ্দেশ্য দুর্বলতর শ্রেণীর উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য এই সংরক্ষণমূলক বৈষম্য নীতি গ্রহণ কার হয়েছে। একে বিপরীত বৈষম্য (Reverse Discrimination) ও বলা হয়।

স্বীকারোক্তির রাজনীতি (Confessional Politics) ঃ রুডল্ফ এবং রুডল্ফ তাঁদের 'ইন পারসুট অব্ লক্ষী (In Pursuit of Laksmi) গ্রন্থে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার পথে বাধা হিসেবে 'স্বীকারোক্তির রাজনীতির' কথা বলেছেন। তাঁর মতে, কোন ধর্মকে স্বীকার করা হল কোন ধর্মীয় পরিচিতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতাকে সরকারীভাবে

প্রকাশ করা। প্রাক স্বাধীনতা পর্বের মতো স্বাধীনতা-উত্তর ভারতেও এই স্বীকারোক্তির রাজনীতি গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের উপাদানে পরিণত হয়েছে। ভারতের জাতীয় স্বীকারোক্তির রাজনীতিতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রাতিষ্ঠানিক অবনমন (Decline of Institutions) ঃ অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভারতের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক অবনমনের কথা বলেছেন। বর্তমানে গণতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটেছে। ১৯৫০ এর দশকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনায় সফল হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এদের অবনমন ঘটায় গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

৩.৮ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ৩.১ দেখুন ।

২। অনুচ্ছেদ ৩.২ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ৩.৩.৪ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। অনুচ্ছেদ ৩.২ ও ৩.৩ দেখুন।

অনুশীলনী - ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ৩.৪.১ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৩.৪.২ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ৩.৪.৩ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ৩.৪.১ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। অনুচ্ছেদ ৩.৪ দেখুন।

অনুশীলনী -৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর

১। অনচ্ছেদ ৩.৫ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৩.৬ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। অনুচ্ছেদ ৩.৫ ও ৩.৬ দেখুন। ⊠

৩.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay type

1. Discuss, in brief, the major types of demands the minorities in India have raised since independance.
2. How would you identify minorities and their problems in contemporary India? Argue your case.
3. Explain the nature and trend of minority politics in India.
4. Explain the changing nature of minority politics in India.
5. Explain the relationship between minority politics and the problem of national integration in India.

Short type

1. What is reverse discrimination?
2. How are lingustic minorities identified in India?
3. Who are minorities in India?
4. What is positive discrimination?
5. How will you identity the minorities in India?

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. Myron Weiner, 1989, The Indian Paradox : Essays in Indian Politics, Sage Publications, New Delhi.
2. Rudolph L.I. and S.H., 1987, In Pursuit of Lakshmi : The Political Economy of the Indian State, Orient Longman, Bombay.
3. Moin Shakir, 1980, Politics of Minorities : Some Perspectives, Ajanta Publications, Delhi.
4. Moin Shakir, 1980
5. S.L.Sikri, 1989, Indian Goverment and Politics, Kalayani Publishers, New Delhi.

একক -৪ ভারতীয় রাজনীতিতে জাত ও শ্রেণী (Caste and Class in Indian Politics)

গঠন —

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ জাতের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
৪.৩ জাত-ব্যবস্থার উৎপত্তি
৪.৪ জাত ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
৪.৫ জাত-ব্যবস্থার পরিবর্তন
৪.৫.১ প্রাক-স্বাধীন ভারতে জাত-ব্যবস্থা
৪.৫.২ স্বাধীন ভারতে জাত-ব্যবস্থার পরিবর্তন
৪.৫.২.১ জাতপাতের রাজনীতিকরণ
৪.৫.২.২ সাম্প্রতিক ভারতের রাজনীতিতে বিভিন্ন ধরণের জাতের ভূমিকা
৪.৬ শ্রেণীর সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
৪.৭ শ্রেণী ও জাতের মধ্যে পার্থক্য
৪.৮ স্বাধীনোত্তর ভারতীয় সমাজের শ্রেণীবিন্যাস
৪.৯ ভারতে জাত ও শ্রেণীর পারস্পরিক অনুপ্রবেশ
৪.৯.১ প্রাক-স্বাধীন ভারতে জাত ও শ্রেণী
৪.৯.২ স্বাধীনোত্তর ভারতে জাত ও শ্রেণী
৪.৯.৩ সংরক্ষমূলক বৈষম্য নীতি এবং জাত ও শ্রেণীর পারস্পরিক অনুপ্রবেশ
৪.১০সারসংক্ষেপ
৪.১১ প্রধান শব্দগুচ্ছ
৪.১২ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা
৪.১৩ নমুনা-প্রশ্নাবলী
৪.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

স্বাধীনোত্তর ভারতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোন বিশ্লেষকই জাত-ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। কারণ ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটলেও জাত ব্যবস্থা শুধু টিকে নেই, রাজনীতির অন্যতম নির্ণায়ক উপাদানে পরিণত হয়েছে. ভারতের পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাবে নতুন নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটলেও জাতের প্রভাব বিলীন হয়ে যায়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে তা আর শক্তিশালী হয়েছে। ভারতের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় জাত ও শ্রেণীর মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া ঘটেছে। এই এককটিতে তাই ভারতের রাজনীতিতে জাত ও শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ শেষ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যাবে ঃ

- জাত ব্যবস্থা কী?
- ভারতে জাত ব্যবস্থার পরিবর্তন কীভাবে ঘটেছে?
- ভারতীয় সমাজে শ্রেণী-বিন্যাসের প্রকৃতি।
- ভারতের জাতও শ্রেণীর মধ্যে পারস্পারিক অনুপ্রবেশ কীভাবে ঘটেছে?

৪.১ প্রস্তাবনা

ভারতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাস্তব রূপ সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এক জটিল উপস্থাপিত করে। যে কোন দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে এক মিথষ্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়। রাজনীতি ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে দ্বিমুখি সম্পর্ক গড়ে ওঠে একে অপরকে প্রভাবিত করে। রাজনীতির প্রতিফলনকারী ভূমিকা ও আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অনেক সময় সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব গড়ে তোলে। ভারতের মতো উত্তরণমুলক সমাজে, যেখানে সামাজিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠানের, সম্পর্কও পরিচিতি পরিবর্তনশীল অবস্থায় রয়েছে এবং নতুন সামাজিক বর্গ ও সম্পর্ক আরো জটিলও বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। বস্তুত, ভারতে সাবেকি সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর অবস্থান সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে এক অসংলগ্নতা গড়ে তুলেছে। সাম্প্রতিক ভারতের রাজনীতিতে জাতপাতের ভূমিকা এই অসংলগ্নতারই ফল।

মরিস্ জোনস ভারতের সমাজও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষন করে বলেছেন যে, ভারতের রজেনৈতিক ব্যবস্থার উপর পাশ্চাত্যকরনের প্রভাব মোটামুটি সম্পূর্ণ হলেও ভারতীয় সমাজের উপর এর প্রভাব অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। তাই এখানে সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে অসংলগ্নতা লক্ষ করা যায়।[১] তাঁর মতে ভারতের রাজনৈতিক জীবন তিনটি প্রধান ভাষার দ্বারা পরিচালিত। এই তিনটি ভাষা হল--১) আধুনিক, ২) সাবেকি এবং ৩) সাত্ত্বিক (Saintly)। রাজনৈতিক প্রতিষ্টানগুলি হল আধুনিক ভাষার প্রতিফলন। জাতপাত নিয়ে গঠিত সনাতন সমাজ সাবেকি ভাষাকে সূচিত করে। এই দুটি ভাষার মিশ্রন দ্বন্দ্ব ভারতের রাজনীতিতে বিশিষ্টতা প্রদান করেছে. তাছাড়া ভারতে ধণতন্ত্রের বিকাশ খুব ধীর গতিতে হওয়ায় প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের সঙ্গে ধনতান্তিক সম্পর্কের সহাবস্থান গড়ে উঠেছে। তাই পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান ধারণা, আদর্শ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ফলে জাতভিত্তিক সনাতন গোষ্ঠীর আনুগত্য এখনো ভারতীয় সমাজের ভিত্তিতে শিকড় গেড়ে রয়েছে. অন্য গিকে ধনতন্ত্রের আর্বিভাবের পলে জাত কাঠামোর সমান্তরাল একটি শ্রেণী কাঠামোরও জন্ম হয়েছে। ফলে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী বিরোধের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জাতভেদের এক জটিল সংমিস্রণ গড়ে উঠেছে।

এইভাবে ভারতের সামাজিক কাঠামোয় দু'ধরনের স্তরবিন্যাসের লক্ষ করা যায়, যথা--১)সাবেকি 'বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা' এবং ২) 'উদীয়মানমুক্ত শ্রেণী ব্যবস্থা'। ভারতের সাবেকি বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থাই হল

১. O.P. Goyal, 1985,Indian Political System, Macmillan, Delhi, p. 17.

২. C.P. Bhambri, Politics in India, 1947- 1987, P.178.

জাত-ব্যবস্থা। কিন্তু জাতভিত্তিক সমাজও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ সমাজ নয়। এখানেও সামাজিক সচলতার সুযোগ আছে। জাত-ব্যবস্থার মধ্যেও মুক্ত শ্রেণী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দেরীতে গড়ে ওঠা ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রভাবে ভারতে নতুন নতুন শ্রেণীর আর্বিভাব ঘটলেও জাতের প্রভাব বিলীন হয় নি। জাতও শ্রেণীর এই মিথষ্ক্রিয়া ভারতের সমাজ ও রাজনীতির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়েছে।

৪.২ জাতের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

ভারতের জাত-ব্যবস্থা সামাজিক স্তর বিন্যাসের অন্যন উদাহরণ। মূলত হিন্দুধমের ভিত্তিতে গটিত এই জাত-ব্যবস্থা সমাজে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করে। ভারতের মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, জৈন প্রভৃতি অ-হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাতপাত সুলভ ভেদাভেদ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের ইস্পাত কাঠামো বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ কোনো বৈদেশিক আক্রমন বা ধর্ম আন্দোলন এই কাঠামোয় ভাঙন ধরাতে পারেনি। বরং অন্যান্য ধর্মও জাতপাতের দ্বারা প্রবাবিত হওয়ায় এই ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই ব্যবস্থা কোন-না-কোন রূপে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

'জাত' অর্থে ইংরাজি 'কাস্ট' (Caste) শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ শব্দ 'কাস্টা'(Casta) থেকে। 'কাস্টা' বলতে বংশজাতি বা বংশগত গুণাবলির একটি যৌগকে বোঝায়। পর্তুগীজরা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার 'জাতি' নামক প্রতিষ্টানটিকে বোঝাতেই এই স্প্যানিশ প্রথম ব্যবহার করেছিল। কিন্তু 'নেশন' শব্দটিরও বাংলা প্রতিশব্দ হল 'জাতি'। মূল শব্দটির অর্থ কিছু রদবদল করে ফরাসি ও ইংরাজি ভাষায় কাস্ট (Caste) শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। ফরাসি ভাষায় এর অর্থ হল সামাজিক স্তর বিভাজন এবং ইংরাজিতে শব্দটি বিশেষ সন্মান বা মর্যাদার প্রতীক।

কাস্টের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'জাত' শব্দটি, ব্যবহার করা হয়। 'জাতি' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'জন্' ধাতু থেকে। 'জন' বলতে 'জন্মগ্রহণ করা'- কে বোজায়। সুতরাং বুৎপত্তিগত অর্থে 'জাত' বলতে জন্মভিত্তিক গোষ্ঠীকেই বোঝায়।বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন জাতের সংজ্ঞা দিয়েছে। ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)-এর মতে জাত-ব্যবস্থা হল মর্যাদার স্তর বিভাজনের ব্যবস্থা। ডি.এন. মজুমদার এবং টি.এন.মদন (D. N. Majumder and T. N. Madan) জাত বলতে একটি 'বদ্ধ গোষ্ঠী' কে বুঝিয়েছেন। ম্যাকআইভার ও পেজ (Mac lver and Page) এর মতে, সমাজে মানুষের মর্যাদা যখন পূর্ব- নির্ধারিত থাকে এবং জন্মের পর সে তার সামাজিক মর্যাদা এবং ভাগ্যের কোনরুপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না, তখন সামাজিক স্তরবিন্যাস জাতের রুপ পরিগ্রহ করে। এছাড়া ব্লান্ট (Blunt), আঁদ্রে বেতেল্লী (Andre Beteille) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলিকে সমন্বিত করে জাতের একটি সাধারণ সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারি যা হল নির্দিষ্ট নামের এক জনগোষ্ঠী, যা অন্তর্বিবাহের নিয়ম মেনে চলে, যার সদ্যসপদ বংশানুক্রমিক, যার একটি নির্দিষ্ট জীবনযাপন পদ্ধতি আছে, গতানুগতিক বৃত্তি পালন করে এবং সাধারণভাবে যা শুচিতা ও অশুচিতার ধারণার ভিত্তিতে একটি ক্রমশ স্তরবিন্যাসে সুনির্দিষ্ট মর্যাদার অধিকারী।

সনাতন ধারণা অনুযায়ী জাত, ও বর্ণ অভিন্ন। বর্ণাশ্রম প্রথায় জন্ম হয় বৈদিক যুগে। এই প্রথা অনুসারে ভারতীয় সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত। এই চারটি বর্ণ হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। সমাজে সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল ব্রাহ্মন। তার নীচে পর্যায়ক্রমে অবস্থান করত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। সমাজের এই বিভাজনের ছিল গুণ ও কর্ম অনুযায়ী। এই বিভাজন ছিল মোটামুটি সার্বিক ও অলঙ্ঘনীয়। আধুনিক রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, বর্ণব্যবস্থা ও জাত ব্যবস্থা এক ও অভিন্ন নয়। তাঁরা জাতের অস্তিত্ব বাস্তবের প্রেক্ষাপটে জাতের পর্যালোচনা করতে সচেষ্ট। বর্ণাশ্রমের ধারণা অনুযায়ী সমাজে মাত্র চারটি স্বীকৃত বর্ণের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আধুনিক ধারণা অনুযায়ী জাতের অস্তিত্ব আঞ্চলিকভাবে নির্দিষ্ট এবং তার কাঠামোগত গঠন বস্তুগত পরিবর্তনের ধারা অনুযায়ী অনেক বেশী নমনীয়। যেমন ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষি অঞ্চলের এক একটি কাণ্ডে কয়েকশত জাতের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জাত সবসময়ই স্তরবিন্যাসের নীতি মেনে চলে না। জাতগুলি বর্ণের তুলনায় আরো বেশী বিভক্ত। বস্তুত বর্ণ হল একটি ধারণাগত প্রকল্প এবং জাত হল প্রকৃত সামাজিক গোষ্ঠী বা বর্গ।

৪.৩ জাত ব্যবস্থার উৎপত্তি

জাত ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোদ আছে। তাই এ বিষয়ে একাদিক মতবাদ প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল সাবেকী তত্ত্ব । এই তত্ত্ব অনুসারে মনুষ্য সমাজে জাতের স্রষ্টা হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তাই এই ব্যবস্থা হল স্বাভাবিক ব্যবস্থা। এই ব্যখ্যায় বলা হয়েছে যে, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে জাতের উৎপত্তি ঘটেছে। কর্মের ধারণা অনুসারে কোনো ব্যক্তি যদি ইহজন্মে সৎকর্ম করে ও সামাজিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তাহলে পরজন্মে উচুঁ জাতে জন্মগ্রহন করবে। অর্থাৎ কর্মফলই জাত নির্ধারণ করে দেয়। ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি জাত-ব্যবস্থাকে মেনে নেয় এবং নিজ জাতের আচরণবিধি যথাযথ পালন করে তাহলে তাকে ধর্মের অনুগামী বলে মনে করা হবে। শ্রীনিবাস, লুই দ্যুঁম্য (Louis Dumount) প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদ শুদ্ধ ও ওশুদ্ধের মধ্যে পার্থক্যকে জাত ব্যবস্থার ভিত্তি বলে মনে করেছেন। এই ধারণা অনুযায়ী নিচু জাতের তুলনায় উঁচু জাত বেশী শুদ্ধ। এই বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্যই জাত পার্থক্য সুদৃঢ় হয়।

জি.এস. ঘুরে (G. S. Ghurye) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী জাতপাতের উদ্ভবের কারণ হিসাবে ব্রাহ্মণ্য তত্ত্বের উপস্থাপন করেছেন। এই তত্ত্বের মূল কথাহোল--ভারতে ব্রাহ্মণরাই তাদের নিজেদের স্বার্থে জাত-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। ব্রাহ্মণরা ঘোষণা করে যে, সমাজের মধ্যে তাদের স্থান সবার উর্দ্ধে। নিজেদের মযাদা সুরক্ষিত করতে অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গুলির ওপর তারা নানা ধরণের আরোপ করে। এইভাবে আদিম আদিবাসি ও শুদ্রদের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার বাইরে রাখার জন্য জাত-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

নেসফিল্ড (Nesfield), ইব্বেতসন (Ibbetson), প্রমুখের মতে, জাত-ব্যবস্থার উৎপত্তির ক্ষেত্রে ভূমিকা ছিল বৃত্তি বা পেশার। একই বৃত্তিজীবী মানুষদের সংঘ বা গিল্ড পরবর্তীকালে জাত হিসেবে পরিচিত হয়। হার্বার্ট রিজলি (Herbert Risley)-র মতে, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাই জাত ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিলে।[১] এই তত্ত্ব অনুসারে বহিরাগত আর্যরা ভারতের আদি বাসিন্দাদের তাদের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে মনে করত। তারা নিজেদের জাতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এছাড়া

১. প্রদীপ বসু, জাতি,শ্রেণী, ও আজকের ভারত, সুজিত সেন সম্পাদিত জাতপাতের রাসণীতি এর মধ্যে, পৃষ্টা ৫৯

জে.এইচ.হাটন (J.H.Hutton) প্রমুখ মনে করেন যে, বিজয়ী আর্যদের সঙ্গে ভারতের বিজিত বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠীসমূহের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে জাতের আর্বিভাব ঘটেছিল।

জাত-ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে যে তত্ত্বগুলি উল্লেখ করা হল তাদের কোনোটিই সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ প্রত্যেকটি তত্ত্বই একটি বা দু'টি উপাদানকে জাত-ব্যবস্থার উৎপত্তির কারণ হিসাবে দেখিয়েছে। তাছাড়া এই সব তত্ত্বে জাত-ব্যবস্থার উৎপত্তি আর্থ- সামাজিক কারণকে উপেক্ষা করা হয়েছে। জাত সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যায় এই সব ত্রুটি দূর করার চেষ্টা হয়েছে। মার্কসবাদীরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোক জাত-ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। এ.আর.দেশাই (A.R.Desai)-এর মতে, ভারতে জাত-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল প্রাক-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার উদাহরণ হল সামন্ততন্ত্র ও এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা। এই উৎপাদনব্যবস্থার অধীনে উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করার কাজটি চলত বর্ণ ও জাতব্যবস্থার মাধ্যমে। কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ উচ্চবর্ণের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভারতের সামাজিক ইতিহাসকে নতুনভাবে রচনা করেছেন। তাঁর মতে, জাতব্যবস্থা ভারতের কোনো মৌলিক প্রতিষ্ঠান নয়। শ্রেণী সংগ্রামের বিবর্তনের ফলেই জাত-ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে। এই শ্রেণী সংগ্রামে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের হাতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র সকলেই কম বেশি নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। ড: দত্ত বলেছেন যে, ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ যখন চরমে পৌঁছায় তখনই জাত কাঠামো পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। তবে একথা মনে রাখতে মনে রাখতে হবে যে, মার্কসবাদিরা যদিও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোক জাত-ব্যবস্তার বিবর্তন ব্যাখ্যা করা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু জাত সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব মার্কসবাদে এখনও গড়ে ওঠেনি। বস্তুত, জাত-ব্যবস্থার উৎপত্তি কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে হঠাৎ ঘটেনি। ভারতীয় ইতিহাসের বিবর্তনের স্রোতধারায় বর্ণব্যবস্থা একসময় জাত ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং ভারতীয় সমাজ স্তর-বিন্যস্ত হয়ে পড়েছে।

৪.৪ জাত-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট

ভারতের জাত-ব্যবস্থা হল একটি ক্রমোচ্চ বিন্যস্ত সামাজিক স্তরবিন্যাস যা ভারতের সামাজিক কাঠামোর অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। তবে প্রাচীনকালে জাত-ব্যবস্থার যে বৈশিষ্ট্য ছিল, সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার আরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এইসব পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতের জাত-ব্যবস্তার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। এগুলি হলঃ ১) জাত-ব্যবস্থা হল বংশানুক্রমিক । জন্মসূত্রে জাতের সদস্যপদ নির্ধারিত হয়। যে জাতভুক্ত পরিবারে ব্যক্তির জন্ম হয়, আজীবন সে সেই জাতের পরিচয় বহন করে। ২) প্রত্যেকটি জাতের পেশা বা বৃত্তি হল বংশানুক্রমিক। এক জাত অন্য জাতের পেশা অবলম্বন করতে পারে না। তবে বর্তমানে নানা কারণে বংশানুক্রমিক বৃত্তি গ্রহনের বাধ্যবাধকতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। ৩) জাত-ব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অন্তর্বিবাহে বা স্বজাতির সঙ্গে বিবাহ। এই নিয়ম অনুসারে অসবর্ণ বিবাহ লোকনীতি বিরুদ্ধ। ৪) সমাজ প্রত্যেক জাতের একটি নির্দিষ্ট স্থান বা মর্যাদা থাকে। বংশগত পদমর্যাদার ভিত্তিতে জাতগুলি একটি ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিন্যস্ত ব্যবস্থায় বিভক্ত হয়। প্রতিটি জাত আবার অনেকগুলি উপজাতে (Subcastes) বিভক্ত। জাত-ব্যবস্থায় প্রতিটি জাত নিজস্ব রীতি ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র বজায় রাখে। ৬) প্রতিটি জাত বিশেষ কিছু ধর্মীয় আচার আচরণ এবং বিশেষ করে স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতার নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। ৭) প্রতিটি জাত

চায় তার সদস্যরা জাতসংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলুক। এজন্য জাতের মধ্যেই একটা কতৃত্বের কাঠামো গড়ে ওঠে। এই কতৃত্ব জাত পরিষদ (Caste Council) নামে পরিচিত। ৮) জাত-ব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক সচলতার অভাব। ভারতের জাতভিত্তিক সমাজ হল বদ্ধসমাজ। এর ফলে এক জাত থেকে অন্য জাতে উন্নীত হওয়া প্রায় অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়। নীচু জাতের মানুষ উঁচু জাতের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে না, কিংবা উঁচু জাতের পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্কেও আবদ্ধ হতে পারে না। তবে অনেক সমালোচক মনে করেন যে, পাশ্চাত্যের শ্রেণী সমাজ বদ্ধ নয়। এম এন শ্রীনবাস(M.N. Srinivas) গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, 'সংস্কৃতায়ন' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নীচু জাতের মানুষ উঁচু জাতে উন্নীত হতে পারে।

এইভাবে দেখা যায় যে, ক্রমোচ্চ স্তর-বিন্যস্ত ভারতীয় জাতব্যবস্থা শুচিতা-অশুচিতার ধারণার ভিত্তিতে ক্ষমতা ও মর্যাদার অসম বন্টনকে স্থায়ী রূপ দিয়েছে । এটি একদিকে ধ্যানধারণা ও মূল্যবোদের সঙ্গে জড়িত একটি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, অন্যদিকে একটি কাঠামোগত ব্যবস্থা, যা কতৃত্ব ও অধীনতা, বিশেষাধিকার ও বঞ্চনা প্রভৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জাত-ব্যবস্থাকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার অন্যতম কৌশল বলেও চিহ্নিত করা যায়। সামাজিক ঐক্য ও রাজনৈতিক সংহতির রূপেও এই জাতব্যবস্থাকে দেখা যায়।

৪.৫ জাত-ব্যবস্থার পরিবর্তন

সুপ্রাচীন কাল থেকে জাতব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে টিকে রয়েছে। তাই অনেকে এই ব্যবস্থাকে 'অনন্য ও অদ্বিতীয় ব্যবস্থা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু সাবেকী জাতব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি ইতিহাসের গতিপথে অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যুগে যুগে পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে জাতব্যবস্থাও নিজের রূপ ও প্রকৃতি পরিবর্তন করে নিয়েছে। বর্তমান ভারতে জাতের রাজনীতিকরণ ঘটেছে। তাই বর্তমান ভারতের জাত-ব্যবস্থার সঙ্গে সাবেকী জাত-ব্যবস্থার অনেক পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করা হয়। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে ভারতে জাত-ব্যবস্থার যেসব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল, ব্রিটিশ যুগ থেকে সেগুলির পরিবর্তন করে সূচিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে জাত-ব্যবস্থা কাঠামো ও কার্যগত ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু জাত-ব্যবস্থার প্রকৃতিগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হলেও তা আদৌ মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়নি। বরং দেখা যায় যে, জাত পাতের মতো একটি সাবেকি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও আধুনিক উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপোযোগী ভূমিকা পালন করেছে, অর্থাৎ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করছে।

৪.৫.১ প্রাক-স্বাধীন ভারতে জাত ব্যবস্থা

প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে সমাজ কার্যত নিশ্চল থাকার ফলে জাত-ব্যবস্থার দুষ্পরিবর্তনের আকার ধারণ করেছিল। মধ্যযুগের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণরা অনেক বেশী পরিমাণে বিশেষাধিকার ভোগ করত। মুসলমান শাসকদের আমলে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্নবলে ব্রাহ্মণরা মনে করেছিল। তাই আরো কঠোরভাবে জাত-ব্যবস্থাকে বলবৎ করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। বস্তুত মুসলিম শাসিত ভারতে জাত-ব্যবস্থায় কার্যত

কোন ভাঙন দেখা যায়নি। তবে প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে সামাজিক সচলতা একেবারেই ছিলনা-একথা বলা যায় না। শ্রীনিবাসের মতে, নিম্ন জাতভূক্ত মানুষের মধ্যে জমির মালিকানা ঊর্দ্ধমুখি সচলতা কার্যকর করতে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। নিম্নজাতভূক্ত মানুষ কিছু ক্ষেত্রে উচ্চজাত বলে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা খুব কমই ঘটেছিল। তাই প্রাক-ব্রিটিশ যুগে ভারতের জাত-ব্যবস্থা প্রায় অবিকৃতই ছিল, বলা যেতে পারে।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতের তাৎপর্য কমে আসে, কিন্তু অর রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ভারতকে আন্তজার্তিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পত্তন ঘটায়। এর ফলে শ্রেণী ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সূচনা হয়। গ্রামীণ ক্ষেত্রেও চাষের বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে। জাত-ব্যবস্থার সমাজ ছিল স্থানীয় পর্যায়ে ছোট ছোট পৃথক সংগঠনে বিভক্ত। ব্রিটিশ শাসনে স্থানীয় পর্যায়ে আবদ্ধ জাত-ভিত্তিক সামাজিক সংগঠনগুলি ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগঠনের অর্ন্তগত হয়ে গেল। ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জাত পাতের বিচার করার ক্ষমতা সংকুচিত। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে গ্রামীণ জন-সম্প্রদায় ও অর্থনীতির সঙ্গে জাত-ব্যবস্থা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ গ্রামীণ জনসম্প্রদায়ের ভিতকে বিনষ্ট করে; কারণ তাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের অন্তরায় হিসাবেগণ্য করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও নতুন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে জাত-ব্যবস্থা পরিবর্তিত রূপে থাকে। ব্রিটিশ শাসকরা ভারতে শিল্পায়ন চেয়েছিল, কিন্তু শিল্পোন্নত দেশ গড়তে চায়নি। ভারতীয় সমাজের জাত সংঘাতকে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ কাজে লাগিয়েছিল এবং বিভক্ত করে শাসন করার নীতি নিপুনতা সহকারে প্রয়োগ করেছিল।

জাত-ব্যবস্থা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকার যথেষ্ট যত্নবান ছিল। বিশ্বের দরবারে ভারতের বৈশিষ্ট্য হিসেবে জাত-ব্যবস্থাকে তুলে ধরা হত।[১] গ্রামীণ ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্কে পরিবর্তিত হয়নি। যজমানী ব্যবস্থার মাধ্যমে জাত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে আধুনিক কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও। ব্রিটিশ আইনে বেনে ও অস্পৃশ্যদের মতো অকৃষিজীবি জাতকে জমির মালিকানালাভের অধিকার দেওয়া হয়নি। ব্রিটিশ শাসনে অন্যান্যভাবেও জাতিভেদ বজায় থেকে গেল। সরকারী চাকররি ব্যাপারে জাত প্রাসঙ্গিক রয়ে গেল। প্রথমদিকে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি শিক্ষিত জাতের লোকেরাই চাকরি পেয়ে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় শুরু হল মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর অব্রাহ্মণ আন্দোলন। ঔপনিবেশিক ভারতে প্রথম লক্ষ করা যায় জাতের রাজনৈতিক পরিচয় ও কার্যকলাপ। আদমসুমারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে জাত বিভাজন স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে সমপর্যায়ের জাতগোষ্ঠির মধ্যে ঐক্য আন্দোলন এবং জাত সংশোধনী আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শাসনকালে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এই প্রবণতাকে সাহায্য করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা ছিলেন উচ্চতর জাতের লোক। অস্পৃশ্যদের কাছে এইসব জাতের লোকেই পীড়ক ও শোষক বলে পরিচিত। ঔপনিবেশিক সরকার নিম্নতর জাতগুলিকে কিছুকিছু চাকরি ও সুযোগসুবিধা প্রদান করে জাত-ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছিল। অস্পৃশ্যদের চোখে কংগ্রেস হল শত্রু এবং ব্রিটিশ সরকার হল বন্ধু। ঔপনিবেশিক ভারতে প্রথম পর্যায়ে বহু জাত সংগঠন গড়ে ওঠে এবং তারা জাতীয় আন্দোলন অংশগ্রহন করার মধ্য দিয়ে জাতসংস্কারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যায়।

---

১. অঞ্জন ঘোষ, সামাজিক স্তরায়ন ও রাজনীতি, সত্যব্রত চক্রবর্তী, রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি এর মধ্যে, পৃষ্টা-১৮৬

অন্যদিকে দেখা দেয় দলিতদের সংস্কার ও আন্দোলন। তারাও ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তবে সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার ফলে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতাও গড়ে ওঠে। এইভাবে ব্রিটিশ আমলে জাত-ব্যবস্থার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিবর্তন ঘটলেও এর অবসান ঘটেনি। বরং জাত-সচেতনতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৪.৫.২ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে জাত-ব্যবস্থার পরিবর্তন

স্বাধীনতা-উত্তর পর ভারত আমলের জাতও রাজনীতির নিকট সম্পর্ককে উত্তরাধিকার সূত্রে হ্রহণ করে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অনেক গুণগত পরিবর্তন ঘটলেও জাত-সচেতনতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাদিকারের নীতির ওপর ভিত্তি করে স্বাধীন ভারতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্বাধীনতা, সাম্য, সৌভ্রাত্র প্রভৃতি আদর্শের ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অংশে সাম্যের অধিকার স্বীকৃতিলাভ করেছে। অস্পৃশ্যতাকে দন্ডনীয় সামাজিক অপরাধ বলে স্বীকার করা হয়েছে। এছাড়া তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরণমূলক বৈষম্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। জাতপাতের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য নানা ধরণের প্রগতিশীল আইনও পাশ করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতের সরকার মনে করেছিল যে, শিল্প বিপ্লব ও উন্নয়ন ঘটাতে পারলে সমাজচেতনায় আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি। কাজের বিশেষীকরণ বা সংরক্ষনের ফলে জাতের পরিচয় অন্যভাবে প্রকাশ পেল। গ্রামাঞ্চলে জাতের প্রভাব শুধু টিকে রইল না, আরো সম্প্রসারিত হল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতি চেতনার পরিধিও সম্প্রসারিত হল। ধর্মীয় বৈধকরণের ফলে জাত-ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বর্তমান ভারতীয় জাত-ব্যবস্থার কাঠামোগত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। একদিকে নিম্নজাত সমূহের মধ্যে নিজেদের ভাগ্য পরিবতনের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্খা পরিপূরনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর ফলে সাম্প্রতিক ভারতে জাতপাতের সংঘর্ষ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরূপ পরিবর্তনের কারণ হিসেবে অনেকে 'সংস্কৃতায়ন' ও 'পাশ্চাত্যকরণ' কে চিহ্নিত করেছেন। দলিত জাতির জাগরণের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা স্বাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। আবার দলিতরা যেসব ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে সেক্ষেত্রে তাদের দেখা যাচ্ছে উচ্চবর্ণীয় মানুষদের অনুকরণে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে। দলিতরা ক্ষমতায় এলেও জাতব্যবস্থা লোপ পাচ্ছে না। সাম্প্রতিক ভারতে এক ধরণের নতুন ও ধর্মনিরপেক্ষ জাত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

৪.৫.২.১ জাতপাতের রাজনীতিকরণ

সাম্প্রতিক ভারতে সমাজব্যবস্থায় জাতপাত দুর্বল হয়ে যায়নি, কার্যত নতুন শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। রজনী কোঠারী যর্থাথই বলেছেন যে, সাম্প্রতিক জাত ও রাজনীতির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষনীয়। তাঁর মতে জাত ও রাজনীতির কখনো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল না, সাম্প্রতিককালে জাত ও রাজনীতির পারস্পারিক সম্পর্কের চরিত্র অনেকটা বদলেছে। আগে যে সর্বজাত রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে রাজনীতিতে জাতের ভূমিকা বেড়েছে। জাতপাতকে আশ্রয় করে গণভিত্তিক

রাজনীতি পরিপুষ্টি লাভের চেষ্টা করছে। রজনী কোঠারী একে 'রাজনীতিতে জাতপাত'(Casteism in Politics) 'জাতপাতের রাজনীতিকরণ' (Politicisation of Caste) বলে অভিহিত করেছেন।[১] জাত-ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার মাধ্যমে রাজনীতি তার লক্ষ্য পূরণের পথে অগ্রসর হয়। আবার জাতপাতভিত্তিক গোষ্ঠীগুলিকে তাদের মর্যাদা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করে। রাজনীতিবিদরা জাতগোষ্ঠীগুলিকে তাদের সদস্যের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এইভাবে জাতপাত ও রাজনীতি উভয়ের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া গড়ে উঠেছে। ভারতীয় রাজনীতিতে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল সক্রিয়, তাদের অনেকের মূল ভিত্তি হল বিশেষ বিশেষ জাত। বহুজন সমাজ পার্টি, মহারাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টি, তামিলনাড়ুর ডি.এম.কে এবং এ.আই.ডি.এম.কে ইত্যাদি দল জাতপাতের রাজনীতিকরণের অন্যতম উদাহরন হল 'রাজনীতির মন্ডলিকরণ' (Mondalization of Politics)। মন্ডল কমিশনের প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণের স্বার্থরক্ষার জন্য সংরক্ষণের রাজনীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক বাড়াবার জন্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে চাপে রাখার জন্য কমিশনের সুপারিশকে ব্যবহার করে। বস্তুত ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতগুলি হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক সমাবেশকরণ (Political Mobilization)-এর মাধ্যমে। পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই জাত ও রাজনীতির মিথষ্ক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

কোঠারীর মতে, আধুনিক ভারতে জাত ও রাজনীতির এক সংমিশ্রণ ঘটেছে তিনটি পর্যায়ে।[২] প্রথম পর্যায়ে অগ্রগণ্য জাতরাই (Entrenched Castes) রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। উদাহরণ স্বরুপ তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ, বিহারের কায়স্থ এবং বাংলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের উল্লেখ করা যায়। এরা সর্বপ্রথম ইংরাজি শিক্ষালাভ করে ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহভাজন হয় এবং অধস্তন হিসাবে ক্ষমতার অংশলাভ করে। এদের অগ্রগতি দেখে অপরাপার উচ্চতর ও মধ্যবর্তী পর্যায়ের জাতের মনে বঞ্চনা বোধ ও বিদ্বেষ সঞ্চার হয়। তাদের মনে হয় যে তারা অনেক পিছনে পড়ে গেছে। এই বিশ্বাসে তারা যেটুকু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তাই দিয়ে আত্মোন্নতি করার চেষ্টা করতে থাকে। এই সব উঠতি জাত (ascendant caste) ছিল প্রধানত স্বত্ববান কৃষক (যথা- মহারাষ্ট্রের মারাঠা-কুনরি, তামিলনাড়ুর ভোল্লা, নাদার, বিহারের ভূমিহার এবং বাংলার মাহিষ্য)। দ্বিতীয় পযায়ে সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতার ভাগ নিয়ে 'উঠতি ' জাতগুলির মধ্যে প্রতিযোগীতা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে নিম্নতর জাতগুলি অনেক ক্ষেত্রে উচ্চতর জাতের নেতাদের সঙ্গে জুটে তাদের সমর্থন করতে থাকে। এর ফলে জাতভিত্তিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল জাতি সংস্কারের তাথে রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই এর অংশীদার হওয়া।[৩] এতে করে জাত রাজনীতির সঙ্গে বেশী করে জড়িয়ে পরতে লাগল। তৃতীয় পর্যায়ে সমমর্যাদাসম্পন্ন জাতির অংশ বিশেষদের সম্মেলন গড়ে ওঠে নতুন রাজনৈতিক যেমন---তামিলনাড়ুর দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগম বা ডি. এম .কে। এইভাবে দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক ভারতের রাজনীতিতে জাত ও রাজনীতির মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে জাতের ভূমিকা বেড়েছে এবং জাতকে জড়িয়ে রাজনীতি করার কৌশলও পালটেছে।

---

১. Rajani Kothari(ed), Caste in Indian Politics, P.5.

২. Ibid. PP. 14-16

৩. উদাহরণ স্বরূপ তামিলনাড়ুর 'বানিয়া কুল ক্ষত্রিয় সঙ্গম', 'নাদার মহাজন সঙ্গম' প্রভৃতি সমিতির নাম উল্লেখ করা যায়।

৪.৫.২.২ বিভিন্ন ধরণের জাতের ভূমিকা

জাতের রাজনীতিকরণ ঘটার ফলে জাতপাতের মতো একটি সাবেকী সামাজিক প্রতিষ্ঠানও আধুনিক উদারনৈতিক রাজনৈতিক উপযোগী ভূমিকা পালন করেছে। জাত ও রাজনীতির মিথষ্ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের জাতের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এম. এন. শ্রীনিবাস প্রাধান্যকারী জাত(Dominant Caste) ও অগ্রগণ্য জাতের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। রজনী কোঠারী জাতের রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়ায় উঠতি জাতের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীনিবাসের মতে, যখন কোন জাত গ্রাম বা স্থানীয় অঞ্চলে সংখ্যাধিকারের জোরে অন্য জাতের ওপর কতৃত্ব করে এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়, তখন সেই জাতকে প্রাধান্যকারী জাত' বলা হয়।[১] প্রাধান্যকারী জাত কেবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে না, সংখ্যার দিক থেকেও গ্রাম, বা স্থানীয় অঞ্চলে শক্তিশালী। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংখ্যার খেলায় এই জাত জয়লাভ করে। অপরদিকে 'অগ্রগণ্য জাত' যদিও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করতে সমর্থ এবং আনুষ্ঠানিক মর্যাদার দিক থেকেও উচ্চে, কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে তুলনামূলকভাবে কম।[২] তবে যেসব অঞ্চলে বৃহৎ কৃষক সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য অবস্থায় থাকে সেখানে এই দুটি ধারণার মধ্যে অধিক্রমণ ঘটতে পারে। সব গ্রামেই যে একটি প্রাধাণ্যকারি জাত গোষ্ঠীর মধ্যে যারা অধিকাংশ জমি নিয়ন্ত্রণ করে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, যেমন— গ্রামের মধ্যেকার বিবাদ নিষ্পত্তি করা, জনকল্যাণমূলক কাজ করা, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নির্বাচিত হওয়া ইত্যাদি।

অগ্রগণ্য জাতরা কোনো জঙ্গী সচেতনতার মাধ্যমে সংঘটিত হয়নি। তারা সাংগঠনিক বা রাজনৈতিক সমাবেশকরণের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ না হয়ে অভিন্ন সামাজিক ও বৌদ্ধিক ভাষা (idiom)-র মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। যখন অগ্রগণ্য জাতগুলি উচ্চতর জাত বা উপ-জাতের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় তখন অপরাপর উচ্চ পর্যায়ের জাতের মনে বঞ্চনাবোধ ও বিদ্বেষ সঞ্চার হয়। এর ফলে উচ্চ জাতগুলির থেকে নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হল। এদের কোঠারী 'উঠতি জাত' বলে অভিহিত করেছে।[৩] এরা সামাজিক ক্ষেত্রে পারস্পারিক নির্ভরশীল এবং পরিপূরক হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত নয়। এই ভাবে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতা মুখোমুখি হয়ে জাত কাঠামোর হয়ে জাত কাঠামোর মেরুভবন ঘটে; জাত রাজনীতির অগ্রগণ্য জাত এবং উঠতি জাতের মধ্য দ্বিপাক্ষিক কাঠামো গড়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণ বনাম অব্রাহ্মণ, রাজস্থানের রাজপুত বনাম জাট, অন্ধ্রপ্রদেশের কাম্মা বনাম রেড্ডি, কেরালার নায়ার বনাম এঝাভা প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। কখনো কখনো আবার ক্ষমতার ভাগ নিয়ে উঠতি জাতও উপজাতগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব জটিল আকার ধারণ করে। এতে করে রাজনীতির সঙ্গে জাত আরো বেশী করে জড়িয়ে পড়ে।

১. M.N,Srininas, The Dominant Caste in Rampura, American Anthropologist, Feb. 1959, Quoted in RajaniKothari(ed), Caste in Indian Pollitics, P.25
২. Rajni Kothari, P.25
৩. Ibid P.25.

অনুশীলনী—১

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। জাত বলতে কী বোঝ?

২। ভারতে জাত ব্যবস্থার উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে?

৩। জাত-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

৪। জাতপাতের রাজনীতিকরণ বলতে কী বোঝায়?

৫। শ্রীনিবাস কীভাবে প্রাধান্যকারী জাত ও অগ্রগণ্য জাতের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন?

৬। 'উঠতি জাত' বলতে কী বোঝায়?

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে জাত-পাতের ভূমিকা পর্যালোচনা কর।

৪.৬ শ্রেণীর সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে সমাজকাঠামো একক কোনো রেখায় অঙ্কিত নয়। এখানে আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে ঐতিহ্যমন্ডিত সামাজিকতার মেলবন্ধন উপস্থিত। তাই স্তরায়নের একাধিক নিরিখ করা যায়। জাত-কাঠমোর সমান্তরাল একটি শ্রেণী কাঠামোরও জন্ম হয়েছে। এর ফলে দু'ধরণের সামাজিক স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়-- বদ্ধ ব্যবস্থা ও মুক্ত ব্যবস্থা। জাত ব্যবস্থা হল বদ্ধ ব্যবস্থার এবং শ্রেণী কাঠামো হল সমাজের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ভারতের রাজনীতিতে জাতের সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক বুঝতে হলে শ্রেণীর প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট দারণা থাকা প্রয়োজন। তবে শ্রেণীর একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করা বেশ কঠিন। কারণ এই সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ম্যাকাইভার ও পেজ শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, সমাজের যে-সব অংশ সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক তাদেরকেই শ্রেণী বলা যায়। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে কারুর মর্যাদা উঁচু আবার কারুর মর্যাদা নিচু। কিন্তু এই সংজ্ঞায় অর্থনৈতিক বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। টম বটোমোর (Tom Bottomore) সামাজিক শ্রেণীকে এমন একটি মুক্ত বাস্তব গোষ্ঠী বলে বর্ণনা করেছন যা ধর্ম বা আইনের দ্বারা নিদিষ্ট বা স্বীকৃত নয়। তাঁর মতে শ্রেণীর ভিত্তি মূলত অর্থনৈতিক হলেও শ্রেণী নিছক অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর অতিরিক্ত কিছু।

মার্কসীয় তত্ত্বে শ্রেণীর আলোচনায় অর্থনীতিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। মার্কস-এঙ্গেল্‌স তাঁদের বিভিন্ন রচনায় শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করলেও কোথাও শ্রেণীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করেননি। তবে তবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে, আদিম সাম্যবাদের পরবর্তী পর্যায়ে সমাজ এমন কতকগুলি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে যারা সামাজিক উৎপাদনে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে, উৎপাদন-উপকরণের সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সেই কারণে উৎপন্ন

সামগ্রীতে তাদের নিজ নিজ অংশ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে। এই গোষ্ঠীগুলিই হল সামাজিক শ্রেণী এবং তাদের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক নিয়েই গঠিত হয় শ্রেণীসম্পর্ক বা শ্রেণীকাঠামো। ১৯১৯ সালে রচিত 'এ গ্রেট বিগিনিং' (A Great Beginning) নামক প্রবন্ধে লেনিন শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, শ্রেণী হল সেইসব বৃহৎ জনগোষ্ঠী, যারা ঐতিহাসিকভাবে নিদির্ষ্ট সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান, উৎপাদন-উপকরণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের (অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনে নিবদ্ধ ও সংহত), শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা এবং সেইহেতু সামাজিক সম্পদের যে-অংশ তারা ভোগ করে তার পরিমান ও অর্জন করার পদ্ধতি অনুসারে পরস্পর থেকে পৃথক। শ্রেণী হল এমন সব জনগোষ্ঠী, সামাজিক অর্থনীতির একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় পৃথক পৃথক অবস্থানের দৌলতে যাদের একটি অপরটি শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে।" এইভাবে প্রতিটি বৈর উৎপাদন সম্পর্ক বিশিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করে উপরিকাঠামোর উপাদানের সাহায্যে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

উদারনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) এর মতে, শ্রেণী হল সেই সব মানুষের সমষ্টি যারা দ্রব্য সামগ্রী অর্জনের সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী এবং যাদের জীবনযাত্রার মানও অভিন্ন। শ্রেণী আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সম্পদ-বন্টনের ভিত্তি ও বাজার-পরিস্থিতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর ফলে শ্রেণীর যে অংশ বাজারে বেশী মূল্য আদায় করতে পারে তার কতৃত্ব তত বেশি হয়। এই কারণে একটি শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন মর্যাদা গোষ্ঠীর আর্বিভাব হতে পারে। ওয়েবারের মতে, শ্রেণী কখনই সমসত্তাবিশিষ্ট হতে পারে না। কারণ একটি শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু মর্যাদা গোষ্ঠীর মধ্যে এরূপ বিভাজন না থাকায় তারা ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে সমাজের নানা ক্ষেত্রে আধিপত্য বজায় রাখতে পারে। এ ধরনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী হল আমলাতন্ত্র।

৪.৭ শ্রেণী ও জাতের মধ্যে পার্থক্য

ভারতের সামাজিক স্তর বিন্যাসের দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসেবে শ্রেণী ও জাতের মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক উভয়ই লক্ষ করা যায়। শ্রেণী ও জাতের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১) জাত ব্যবস্থা ভারত ছাড়া বিশ্বের অন্য দেশে গড়ে ওঠেনি। একে ভারতীয় সমাজের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়। শ্রেণী ব্যবস্থা হল একটি সর্বজনীন বিষয়। ২) জাতপাত হল একটি বংশানুক্রমিক ব্যবস্থা । কিন্তু সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে সমাজে শ্রেণীভেদ দেখা যায়। ৩) সামাজিক সচলতার পথ রুদ্ধ থাকে বলেই জাতব্যবস্থাকে বদ্ধ ব্যবস্থা বলা হয়। গুণ ও যোগ্যতার পরিবর্তন ঘটলেও এক জাতের মানুষ অন্য জাতের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু শ্রেণী ব্যবস্থা হল মুক্ত ব্যবস্থা। তাই এখানে সামাজিক সচলতার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। ৪) সাবেকী জাত-ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তির বৃত্তি বা পেশা পূর্বনির্ধারিত থাকে। তাই পেশা বদলানো যায় না। কিন্তু শ্রেণী ব্যবস্থায় পেশা পূর্ব-নির্ধারিত নয়। গুণ বা যোগ্যতা অনুসারে ব্যক্তি পেশা নির্বাচন করতে পারে। ৫) অন্তর্বিবাহ হল জাত-ব্যবস্থা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই অসবর্ণ বিবাহ জাতের রীতিনীতি-বিরুদ্ধ। অন্যদিকে সামাজিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর সদস্যদের অন্য শ্রেণীর সদস্যদের সাতে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে কোন সামাজিক বাধা নেই। ৬) জাতব্যবস্থা হল একটি জৈবিক ব্যবস্থা। শ্রমবিভাজনের এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পারিক নির্ভরশীলতা বর্তমান থাকে। কিন্তু

শ্রেণীব্যবস্থার চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে শ্রেণী সহযোগিতার পরিবর্তে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বিরোধ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ৭) জাত ব্যবস্থার একটি ধর্মীয় দিক আছে। বিভিন্ন জাতের বিন্যাসকে ঈশ্বরের বিধান বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু শ্রেণীব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। কঠোর বিধিনিষেধও এখানে নেই।

জাত ব্যবস্থা ও শ্রেণী ব্যবস্থার মধ্যে নানাবিষয়ে পার্থক্য থাকলেও বাস্তব সমাজে উভয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। শ্রেণী ব্যবস্থার মধ্যে জাতব্যবস্থার এবং জাত ব্যবস্থারহ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। উচ্চ শ্রেণীর পরিবারের সন্তানরা যে উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হয়তা অনেকটাই আরোপিত ও বংশানুক্রমিক। শ্রমিকের সন্তান বড়জোর কেরানী হতে পারে, শিল্পপতি নয়। আবার জাতভিত্তিক সমাজ ও সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ সমাজ নয়। এখানেও সামাজিক সচলতার সুযোগ আছে। শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষার প্রসার, সংস্কৃতায়ন ইত্যাদির প্রভাবে নিম্নজাতের মানুষ উচ্চজাতের বৃত্তি গ্রহন করে বা তার জীবনধারা অনুকরণ করে জাতের মর্যাদা উন্নত করতে পারে। ভারতের গ্রাম সমাজে অনেক সময় জাত ও শ্রেণী একাকার হয়ে যায়। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাই যেমন প্রাধান্যকারী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে, তেমনি কৃষিশ্রমিক ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর দল নিচু জাতের মানুষদের নিয়েই গঠিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে জাতপাতের বিরোধ এবং শ্রেণী বিরোধ অনেক সময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতও শ্রেণীর এই মিথষ্ক্রিয়া সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, জাত ব্যবস্থা ও শ্রেণী ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য আছে।

৪.৮ স্বাধীনোত্তর ভারতীয় সমাজের শ্রেণী-বিন্যাস

ভারতে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জাত ও শ্রেণীর পৃথকীকরণ আরম্ভ হয়। ঔপনিবেশিক শাসন শুধুমাত্র নতুন শ্রেণীর জন্ম দেয় না, জাতপ্রথা থেকে শ্রেণীবিন্যাসের পৃথকীকরণের প্রক্রিয়াও আরানভ হয়। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিকাশ ভারতে হতে পারেনি, আবারও ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিকাশ হয় অসমান। কৃষিতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বহু জায়গায়ই বর্তমান। ফলে শ্রেণীর যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীন বিকাশ হয়নি, তেমনি জাত কেবল আংশিকভাবে লোপ পেয়েছে। তবে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্টান, পুরাতন মূল্যবোধ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পুরাতন ব্যবস্থা প্রভৃতিকে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে ব্যবহার করতে শুরু করে। ফলে সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজের ধনবৈষম্য ও শ্রেণী বিরোধের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জাতভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় অনুশাসনের প্রাধান্য প্রভৃতির সংমিশ্রন ঘটেছে। ভারতের সমাজব্যবস্থায় জাতপাতের ব্যবধান, হরিজন নিগ্রহ প্রভৃতির সঙ্গে জমিদার ও পুঁজিপতিদের শোষন অব্যাহতভাবেই চলছে।

স্বাধীনতার ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার মধ্য দিয়ে গেল যে, এখানে জাতের প্রভাব হ্রাস পায়নি, বরং জাত ও শ্রেণী মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। নির্বাচনের সময় সব রাজনৈতিক দলই প্রাধান্যকারী জাতের সদস্যকে তাদের প্রার্থী করার চেষ্টা করে। এই প্রাধান্যকারী জাত কেবল সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, অর্থনৈতিক বলে বলীয়ান। প্রাধান্যকারী জাতের বিরোধীতা করে নির্বাচন জেতা দুষ্কর বলে কোন রাজনৈতিক দলই জাতি গোষ্ঠীর সাহায্য নিতে পিছপা নয়। অর্থাৎ অঞ্চল বিশেষে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিশিষ্ট জাত গোষ্ঠী চিহ্নিত হয় ক্ষমতার উৎস হিসেবে। সেখানে শুধু অর্থনৈতিক

বর্ধিষ্ণুতা বা সামাজিক মর্যাদা এককভাবে সেই জাতগোষ্ঠীর ক্ষমতা বা প্রতিপত্তির নিরিখ হতে পারে না, বরঞ্চ একে অন্যের পরিপূরক। তাই ভারতীয় সমাজকাঠামোয় জাতও শ্রেণীর পারস্পারিক অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সামাজিক স্তর বিভাজনের মাত্রা নির্ধারিত হয়।

এইভাবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও নেতা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা সুরক্ষিত রাখার জন্য জাতপাতকে ব্যবহার করে। উদাহরণ হিসেবে চৌধুরী চরণ সিং, কর্পূরী ঠাকুর, দেবরাজড আর্স প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যায়। জাতপাতের ভিত্তিতেই মানুষ নির্বাচনের সময় ভোটদান ও রাজনৈতিক সংগঠনে অংশগ্রহণ করে। বস্তুত ভারতে জাত বিভাজন শ্রেণী বিভাজনের প্রতিচ্ছবি হয়ে পড়েছে। তাই একটি শ্রেণী বা অর্থনৈতিক স্তরের বিকাশ এবং তার রাজনৈতিক প্রকাশ জাতপাতের লড়াই এর মধ্যে দিয়ে ঘটে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শক্তি তাদের নিজ নিজ শ্রেণী ও গোষ্ঠীর স্বার্থে বিভিন্ন জাতের সঙ্গে নিজেদের একীভূত করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী ও বর্ণ কার্যত সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে শোষক ও শোষিত শ্রেণী যথাক্রমে উচ্চ ও নিম্ন জাতভুক্ত। উচ্চজাতের শোষকরা নিম্নজাতের মানুষদের অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণ করে আবার বর্ণ নিপিড়নও করে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন রাজ্যে হরিজন নিগ্রহ এর অন্যতম দৃষ্টান্ত।

ভারতের ক্ষমতা কাঠামো পযালোচনা করলে দেখা যায় যে, এখানে শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রধানত তিন ধরনের দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে-১) শ্রমিক- কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে শোষক দ্বন্দ্ব এবং ২) পুরানো শোষক শ্রেণীর সঙ্গে নতুন গড়ে ওঠা সম্পদশালী শ্রেণীগুলির দ্বন্দ্ব এবং ৩) শোষক শ্রেণীগুলির নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। এই শ্রেণী দ্বন্দ্বগুলির আবার তিন প্রকার জাতপাতগত দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রতিফলিত হয়- ক) উচ্চ জাতের সঙ্গে নিম্ন জাত ও অস্পৃশ্যদের দ্বন্দ্ব, খ) উচ্চজাতের সঙ্গে মধ্যবর্তী জাতের দ্বন্দ্ব এবং গ) উচ্চ জাত গুলির নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। মহারাষ্ট্রে মাহারদের আন্দোলন প্রথম শ্রেণী দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত। এখানে শিল্পায়নের ফলে মাহারদের একটি বড় অংশ শিল্প শ্রমিকে পরিণত হয়। এখানকার এই তফসিলি সম্প্রদায় এবং মারাঠা উচ্চ বর্ণের দ্বন্দ্ব হল মূলত শোষিতের সঙ্গে শোষক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব। বিহার পিছিয়ে পড়া জাতগুলির জন্য চাকরি সংরক্ষণের দাবিতে আন্দোলন হল দ্বিতীয় ধরনের শ্রেণী দ্বন্দ্ব উদাহরণ। অর্থাৎ জাতপাতের এই দ্বন্দ্ব হল পুরানো শোষক শ্রেণীর সঙ্গে নতুন গড়ে ওঠা সম্পদশালী শ্রেণীর দ্বন্দ্ব। তামিলনাড়ুতে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল তাও মূলত পুরানো সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গে নতুন গড়ে ওঠা কুলাক সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব। অন্ধ্রে কাম্মা ও রেড্ডিদের, কর্ণাটকে লিঙ্গায়েৎ ও ভেক্কালিগাদের এবং অন্যান্য রাজ্যে অগ্রগণ্য জাতগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হল মূলত শোষক শ্রেণীগুলির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ এই দ্বন্দ্বগুলি তৃতীয় ধরণের দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের শাসক শ্রেণী আজ জাতপাতের রাজনীতির বেশী উৎসাহী হয়ে পড়েছে। যে সামাজিক শক্তিগুলি শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানায় তাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত স্তরে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে জাতিভেদ প্রথাকে ব্যবহার করে শাসক শ্রেণী। কেরালার এই ধরণের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়।১ এর ফলে ভারতের রাজনীতিতে জাতের প্রভাব ক্ষীয়মান নয়। সুদীপ্ত কবিরাজ বলেছেন যে, ঐতিহাসিক দিক থেকে জাতের শ্রেণীগত ফল (class effect of caste) দেখা দিয়েছে।[২] জাতপাত শ্রেণীর রাজনৈতিক কাজগুলি গ্রহণ করেছে। জাতপাতের লড়াই এখন আর কেবল আনুষ্ঠানিক মর্যাদা লাভের জন্য লড়াই নয়। ধর্মনিরপেক্ষ সুবিধাগুলি আদায়ের জন্যই আজ সম-স্তর জাতগত ঐক্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

৪.৯.৩ সংরক্ষণমূলক বৈষম্যনীতি এবং জাত ও শ্রেণীর পারস্পারিক অনুপ্রবেশ

সাম্প্রতিক ভারতে জাতও শ্রেণীর মিথষ্ক্রিয়া সংরক্ষণ মূলক নীতিকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠেছে। ভারতের সংবিধানে অনগ্রসর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এর আওতায় রয়েছে তফশিলি জাত, তফশিলি উপজাতি, ইঙ্গভারতীয় সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী। পঞ্চাশ বছরের বেশি হয়ে গেল এই সংরক্ষণ নীতি চালু রয়েছে। তা সত্ত্বেও এই সব অনুন্নত শ্রেণীর কাঙ্খিত মানোন্নয়ন ঘটে নি। একদিকে এদের ব্যাপক অংশ পশ্চাদপদই রয়ে গেছে। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কিছু লোক (ওই সব জাতির সচ্ছল অংশ) এর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। উচ্চবর্ণভুক্ত সাধারণ মানুষের মধ্যেও সংরক্ষণ নীতি অব্যাহত থাকার জন্য যথেষ্ট ক্ষোভ সঞ্চালিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে ভারতে গরীব কৃষকদের আন্দোলন, সমাজে নিপিড়িত ও পদদলিত জাতের আন্দোলন এবং জাতীয় আন্দোলন একটা সার্বিক অথচ জটিল ও পরস্পর বিরোধী চরিত্রের রূপ নেয়। একদিকে জাতও শ্রেণীর যেমন পারস্পারিক অনুপ্রবেশ ঘটে, অন্যদিকে তারা নিজেদের স্বতন্ত্র কাঠামোগত পরিচয়ও বজায় রাখে। বিংশ শতাব্দি জুড়ে ভারতের গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী রাজনীতিতে জাতের ভাষা ব্যবহার করেছিল। সেই সঙ্গে দলিত ও উপজাতির লোকদের স্বতন্ত্র ও নিজস্ব সংস্কৃতি, উপভাষা, জীবনধারা, সামাজিক কাঠামো, রীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি আছে। আবার কর্মক্ষেত্রে তাদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত কৃষিজীবি এবং নিজেদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য গড়ে তুলেছে। কৃষিক্ষেত্রে তাদের সমস্যা অন্য সাধারণ কৃষকদের মতোই। ভারতে প্রায় ৪১৪টি উপজাতি সম্প্রদায় আছে। তাদের ২১২ টি সম্প্রদায়কে তফসিলি উপজাতীয় আন্দোলনগুলি মুলত কৃষি ও বন ভিত্তিক। কারণ বনের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা জমির ওপর নির্ভরশীলতা জমির ওপর নির্ভরশীলতার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এইভাবে দেখা যায় যে, উপজাতি ও দলিতরা শ্রেণী ও জাত উভয় আন্দোলনেরই অংশ। দেশের বিভিন্ন অংশে দলিতরা কখনো হরিজন, কখনো অবর্ণ, কখনো পঞ্চমা, অতিশুদ্র, অজন্তা আবার কখনো নমশুদ্র নামে পরিচিত। হিন্দু জাত ব্যবস্থায় এদের অবস্থান একেবারে নীচের সারিতে। ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ১৬ শতাংশ হল এই উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ।২০০১ সালের হিসেব অনুযায়ী এদের সংখ্যা প্রায়১,৬৮০ লক্ষ। এদের অনেকেই কৃষিজীবি শ্রমিক। তপসিলি জাতের লোকেরা কোনো বিশেষ অঞ্চলের পরিবর্তে সমগ্র দেশ জুড়েই ছড়িয়ে আছে। আইনত তারা আর অস্পৃশ্য নয়। কিন্তু কার্যগত এদের মধ্যে অনেককেই এর শিকার হতে হয়। তাদের বিক্ষোভ দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে।

এই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল অনেক আগেই ১৮৮০ সালে মাদ্রাজে। ঔপনিবেশিক আমলেই ভাগ করে শাসন করার নীতির স্বার্থে শাসকবর্গ সমাজের তথাকথিত এলিটদের তুষ্ট করার জন্য ফলে ভারতে নতুন শ্রেণীগুলির আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল।তাই স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে জাত ব্যবস্থার পাশাপাশি শ্রেণী ব্যবস্থার অবস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

১. C.P.Bhamri, Politics in India, P.184

২. Quoted in Rahhahari Chatterji, Politics India, P.323

এখানে পুঁজিপতিদের পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থিতি যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে ইংরাজী শিক্ষায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আবার গ্রামাঞ্চলে যে-সব শ্রেণীর অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, সেগুলির মধ্যে মিশে, উল্লেখযোগ্য হল জমিদার; বড় এস্টেটের মালিক; উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন স্তরভুক্ত কৃষকশ্রেণী, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর প্রভৃতি।

ভারতের শিল্প-বুর্জোয়াদের প্রধানত ভাগ করা যায়--১) একচেটিয়া বৃহৎ বুর্জোয়া, ২) মাঝারি বুজোয়া এবং ৩) ছোট বুর্জোয়া। শ্রমিকদেরও প্রধানত তিন ভাগে করা যেতে পারে-- দক্ষ শ্রমিক, আধা দক্ষ শ্রমিক এবং অদক্ষ শ্রমিক। কে. ম্যাথু কুরিয়ান (K.Mathew Kurian) ভারতের গ্রামীণ সমাজে অবস্থিত শ্রেণীগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন-১) ভূমিহীন ক্ষেত মজুর, ২) গরীব কৃষক, ৩) মাজারি কৃষক, ৪) ধনী কৃষক এবং ৫) জমিদার বা ভূস্বামী। প্রণব বর্ধন ভারতীয় রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ভারতে তিন ধরণের প্রাধান্যকারী শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে । এই তিনটি শ্রেণী হল- শিল্প বুর্জোয়া, ধণী চাষী ও পেশাদার শ্রেণী। রুডলফ ও রুডলফ্ (Rudolph and Rudolph) গ্রমীণ সমাজের শ্রেণীকাঠামোকে চার ভাগে ভাগ করেছেন, যথা-১) ভূমিহীন কৃষক, ২) ক্ষুদ্র চাষী (০.০১-২.৯৮ একর জমির মালিক), ৩)'বুলক ক্যাপিট্যালিস্ট' (Bullock Capitalist) (২.৫-১৪.৯ একর জমির মালিক) এবং ৪) বৃহৎ ভূস্বামী (১৫ একরের অধিক জমির মালিক। রুডলফ্ দম্পতির মতে, নেহেরুর আমলে ভূমি সংস্কারের ফলে গ্রামীণ ক্ষমতা সামন্ত জমিদারদের হাত থেকে 'বুলক ক্যাপিট্যালিস্ট'দের হাতে চলে গিয়েছিল। এরা হল স্বনিয়োজিত এবং আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী উৎপাদক। সবুজ বিপ্লবের যাবতীয় সুফল ভোগ করার ফলে এরাই আধিপত্যকারী কৃষক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। বুলক ক্যাপিট্যালিস্টদের সঙ্গে পুঁজিবাদী কৃষক ও কৃষি শ্রমিক উভয়েরই অবৈধ সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে এবং এরাই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

৪.৯ ভারতে জাত ও শ্রেণীর পারস্পারিক অনুপ্রবেশ

ভারতে জাত ও শ্রেণীর সম্পর্ক বিশ্লেষণে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।[১] কার্যবাদীরা মনে করেন যে, জাতপ্রথা কেবল আগেকার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, এর দ্বারা সমাজের আধুনিকীকরনের পথও নানাভাবে সুগম হতে পারে। বিভিন্ন জাতের নিজস্ব সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই সব সংগঠনের কার্যকলাপের ফলে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার হয়েছে। এটাকে জাত প্রথার একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্ম-নিরপেক্ষ ক্রিয়া বলে ধরা যেতে পারে। কার্যবাদীদের মতে, জাতপাতের শিকড় ভারতীয় সমাজের গভীরে প্রোথিত। তাই জাত সংগঠনের সহায়তা ছাড়া বৃহত্তর ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে সমপোযোগী করে তোলা সম্ভব নয়।

অপরদিকে কয়েকজন মার্কসবাদি তাত্ত্বিক মনে করেন যে, সমাজ জাত লোপ পাচ্ছে, তার জায়গায় শ্রেণীর উন্মেষ হচ্ছে। এঁদের মত এই যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুন আধুনিকতার সূচনা হলেই জাত ভেঙে যাবে এবং লোক শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হবে। ঘনশ্যাম শাহ্ বলেছেন যে, বর্তমান ভারতে জাতের

১. অঞ্জন ঘোষ, সাম্প্রতিক ভারতে জাত ও শ্রেণী, সুজিত সেন সম্পাদিত 'জাতপাতের রাজনীতি' এর মধ্যে, পৃষ্টা-৭৭

সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার কোনরূপ সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শ্রেণীর সঙ্গে জাতপাত সম্পর্কহীন। মইন জাকির বলেছেন যে, অনগ্রসর অঞ্চলগুলির তুলনায় উন্নত অঞ্চলগুলিতে সামাজিক শ্রমবিভাগের গরুন জাতের ভূমিকা অনেকটা ম্রিয়মান হয়ে গেছে। কোন কোন মার্কসবাদী মনে করেন যে, আগেকার পরিস্থিতিতে যেভাবে শ্রমবিভাগ করা হত তাতে জাতব্যবস্থা কার্যকর ছিল, কিন্তু আধুনিক কালে সমাজের বস্তুগত ভিত্তি যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে জাতে জাত সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক। এ অবস্থায় জাত লোপ পাবেই, অনেক দিকে দিয়ে ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে।

জাত ও শ্রেণী সর্ম্পকে এই দু'ধরনের বিশ্লেষণই অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট। ভারতীয় সমাজকে কেবল জাতভিত্তিক কিংবা কেবল শ্রেণী ভিত্তিক বলে চিহ্নিত করা আদৌ সমীচীন নয়। ভারতে জাত ও শ্রেণীর মধ্যে যান্ত্রিকভাবে পার্থক্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টা কেবল অতিসরলীকরণই নয়, তা ভারতের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সাযুজ্যহীনও বটে। উত্তরাধিকার সূত্র ভারতীয় সমাজে জাতপাত যে কাঠামো বিরাজ করছে, তার মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটেছে। ফলে শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সামাজিক নিপিড়নের বিরুদ্ধে লড়াই পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাতের রাজনীতিকরণ ঘটায় জাত ও শ্রেণী মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হয় শ্রেণী সংগ্রাম, নয়তো জাত-পাতের বিরোধ- সমস্যাটিকে এইভাবে তুলে ধরা সমীচীন নয়। ভারতের আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন জাতগোষ্ঠী ক্ষমতার জন্য পাস্পারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার ফলে তারা জাত ব্যবস্থার বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেচে। এইভাবে জাতব্যবস্থা শ্রেণীব্যবস্থার মতো ক্রমশ মুক্ত হয়ে পড়েছে এবং শ্রেণী ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ভারতের গ্রামাঞ্চলে জাতগুলির মধ্যে গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে সমস্তর সমৈকতা (Hojizonal solidarity) বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের জাত নিয়ে একধরনের জাতিসঙ্ঘ গড়ে ওঠে। এই সঙ্ঘকে আমরা এক ধরণের শ্রেণী সংগঠনের প্রাথমিক অবস্থা বলতে পারি। কিন্তু পুঁজিবাদের অসম বিকাশের ফলে এই ধরনের শ্রেণী সংগঠনের বিকাশও সম্পূর্ণ হয় না। জাতপাতের আনুগত্য প্রধান হয়ে দাড়ায়। আজকের গ্রমাঞ্চলে যে জাতি দাঙ্গা ঘটেছে জাত কারণ হিসাবে আমরা দেখতে পাই চাষী জাতির সেন্টিমেন্টকে এতে ব্যবহার করা হচ্ছে। শহরাঞ্চলেও যে জাতি সংঘর্ষ ঘটেছে তা উচ্চজাতির সঙ্গে অতিশুদ্র জাতির লড়াই। এই সংঘর্ষ যদিও জাতি সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে, কিন্তু অর মূল কারণ সেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক। বস্তুত ভারতের সমাজ কাঠামোর প্রাচীন কাল থেকেই জাত ও শ্রেণী একে অপরের অধিকক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করেছে। জাতপাতের সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের আন্তঃসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জাত-কাঠামোর মধ্যেই শ্রেণী শোষণ গড়ে উঠেছে।

৪.৯.১ প্রাক্- স্বাধীন ভারতে জাত ও শ্রেণী

প্রাচীন সমাজ বর্ণাশ্রম প্রথার মধ্যেহ শ্রেণী শোষনের ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। অস্পৃশ্যতা ছিল শোষক শ্রেণী এবং উচ্চবর্ণের কাছে একটি ধারালো হাতিয়ার, যা তাদের শ্রেণী শাসন ও শ্রেণী শোষণকে অব্যাহত

রেখেছিল। ব্রিটিশ আমলে ভারতে প্রচলিত জাত ব্যবস্থার বেশ কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হলেও উচ্চবর্ণের লোকরাি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জন করেছিল। নিম্নজাতের ভূমিহীন কৃষক ও কারিগরদের ওপর ভূস্বামী ও মহাজনদের শোষন প্রত্যক্ষভাবে জাতগত অত্যাচার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমর্থন করলেও তাঁরা প্রাচীন হিন্দু সমাজ ও আধাসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছে। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরা জাতপাত ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে সমর্থ হননি। ঔপনিবেশিক সরকার ভাগ করে শাসন করার নীতি গ্রহণ করে জাতিভেদকে কাজে লাগিয়েছিল। তবে কৃষক আন্দোলন উপলক্ষ্যে একাধিক জাত মিলিত বৃহত্তর গোষ্ঠী তৈরী করেছিল।

৪.৯.২ স্বাধীনোত্তর ভারতে জাত ও শ্রেণী

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণী দেশের সামাজিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের কথা ঘোষণা করে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রর্বতন, সংরক্ষণমূলক বৈষম্য নীতি অনুসরণ প্রভৃতির কথা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস সাধন করে পুঁজিবাদি সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তাই প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যও এখানে থেকে গেছে। তাই ভারতীয় বুর্জোয়ারা পুরাতন মূল জাতিয়তাবাদি আন্দোলন থেকে সমাজের পিছিয়ে পড়া ও বঞ্চিত শ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বর্ণহিন্দু ও তথাকথিত বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক শাসক তাদেরই নির্মিত অবহেলিত শ্রেণীর পরিত্রাতা হিসেবে সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন জানায়। ১৯৩২ সালের 'পুনা প্যাক্ট' এবং ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইনই' স্বাধীনোত্তর সংবিধানের সংরক্ষণ নীতি নির্ধারিত করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসকদের মতোই ভারতের সংবিধান প্রণেতারা সংখ্যালঘুর পরিত্রাতা হিসেবে নিজেদের জাহির করার জন্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন নি। অনেকে যর্থাথই বলে থাকেন যে, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা হিন্দুদের দিয়েছে ভারত, মুসলমানদের পাকিস্তান এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের দিয়েছে সংরক্ষণ। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই নীতিকে এক রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মধ্যে এলিটদের তুষ্ট করাই ছিল এই সংরক্ষণের উদ্দেশ্য। ভারতের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ অস্পৃশ্যতা বর্জনের কথা বলা হয়েছে। একে কার্যকর করার জন্য ১৯৫৫ সালে আইনও পাস হয়। কিন্তু সেই আইনও প্রায়শই লঙ্ঘিত হত। সংবিধান সংসোধন করে ১৯৭৫ সালে নতুন আইন পাশ করা হয়। কিন্তু নতুন আইনও বিশেষ কার্যকর হয়নি।

ভারতীয় সমাজে শ্রেণী বৈষম্য ও জাতবিরোধের আর্থসামাজিক কারণগুলির খুঁজে দেখবার জন্য ১৯৩৫ সালে ও ১৯৭৮ সালে দু'টি কমিশন গঠিত হয়। প্রথমটি হল কাকা কালেলকার কমিশন, আর দ্বিতীয়টি মন্ডল কমিশন। কাকা কালেলকার জাতকে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ার কারণ হল হিসেবে

চিহ্নিত করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুণগত দিকটি উপেক্ষা করে পরিমানের ওপরই বেশি নজর দেওয়া হয়েছে। ২৩৯৯ জাতের সদস্যকে সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে সর্তক করে দেওয়া হয় যে, কখনই ৪৯ শতাংশের বেশি সংরক্ষন থাকা উচিত নয়। কিন্তু ঐ কমিশনের রির্পোট যথেষ্ট বাস্তবমুখি ছিল না বলে মনে করে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার তা গ্রহন তা গ্রহণ করেনি।

মন্ডল কমিশনও সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক মানদন্ডের ভিত্তিতে অনগ্রসর সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালায়। তবে এখানেও জাতের মানদন্ডেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পায়। মন্ডল কমিশন হিন্দু ও অ-হিন্দুদের মধ্যে ৩৭৪৩ টি জাত বা সম্প্রদায়কে অনুন্নত বলে ঘোষণা করে. মোট জনসংখ্যার কমপক্ষে ৫২ শতাংশ এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। বিচারবিভাগীয় বাধ্যতার কারণে মন্ডল কমিশন পূর্ববতী কমিশনের মতোই সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ৪৯.৫ শতাংশ সংরক্ষণের সুপারিশ করে। এর মধ্যে তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য যথাক্রমে ১৫ শতাংশ, ৭.৫ শতাংশ, এবং ২৭ শতাংশ সংরক্ষনের কথা বলা হয়েছে। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার কমিশনের রিপোর্ট বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ছিল। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং- এর নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার ১৯৯০ সালের ৭ই আগষ্ট মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার কথা গোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিহার ওড়িশা, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন ব্যপকভাবে চলতে থাকে।

মন্ডল কমিশনের সুপারিশ বিষয়ে কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তা বা মোর্চা সরকারের সক্রিয়তা মধ্যে আসলে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। বঞ্চিত বা নিপীড়িত মানুষের কাছে এগুলো আদৌ কোন সদর্থক ইঙ্গিত বহন করে না। রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক বাড়ানোর জন্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বি দলকে চাপে রাখার জন্যই মূলত কমিশনের সুপারিশকে ব্যবহার করে। এর ফলে রাজনীতির মন্ডলায়ন গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দলগুলি কত পরিমানে এবং কোন মাপকাঠি প্রয়োগ করে সংরক্ষণ করা উচিত এই প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন রাজ্যে উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে সংর্ঘষ হিংসাত্মক রূপ নেয়। বিভিন্ন নির্বাচনে সংরক্ষণের ইস্যুকে কেন্দ্রকে করে জাতপাতের প্রশ্ন সামনের সারিতে এসে হাজির হয়। বিশেষ করে উত্তর ভারতের হিন্দি বলয়ের কোনো নির্বাচনকেই আজ জাতপাতের বাইরে নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না।

সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল হরিজনদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনার যে বিশেষ প্রতিকার হয়েচে তা বলা যাবে না। বস্তুত সংরক্ষণের নীতি রাজনৈতিক চমক ছাড়া আর কিছু নয়। শাসক শ্রেণী যখন ইচ্ছে করে তখনই বিষয়টি নিয় তুমুল সোরগোল তোলে, আবার সুবিধামতো তাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখে। প্রাধান্যকারী শ্রেণী, যারা রাষ্ট্রের মুল চালিকাশক্তি, তারাই আসলে এই সংরক্ষণের সুবিধা কাজে লাগায়। পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর সমস্যা সমাধান ঔপনিবেশিক শাসক ও স্বাধীন ভারতের শাসকগোষ্ঠীও শেষ পর্যন্ত সুবিধাভোগী শ্রেণী ও উচ্চবর্ণহিন্দুর স্বার্থে অসম ক্ষমতাবন্টনের পক্ষেই সমঝোতা করেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, স্বাধীনতার ভারতে সংরক্ষণমূলক বৈষম্যনীতি আসলে জাতের সংঘাত বাড়িয়ে তুলেছে। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমির মালিকানা পুনর্বন্টন, সকলের জন্য বাধ্যতামুলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার নিশ্চয়তা এবং কাজের অধিকারের সুনিশ্চয়তা— এই নীতিগুলিই আসলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে।

৪.১০ সারসংক্ষেপ

ভারতীয় সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্বের চরিত্র ইউরোপীয় সমাজের বিবর্তনের ছকের সঙ্গে মেলে না বলে অনেক ইউরোপীয় পন্ডিত মনে করেন যে,ভারতের নিজস্ব কোনো ঐতিহাসিক গতি নেই।[১] তাঁরা বলেন যে, ইউরোপের এসেছে শ্রেণীদ্বন্দ্ব, এসেছে পুঁজিবাদ, যুক্তিবাদ, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। অপরদিকে ভারতে একই সমাজ কাঠামোকে ক্রমান্বয়ে জিইয়ে রাখা ছাড়া আর কিছু করা হয়নি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মৌলিক প্রভেদ নিয়ে এ ধরনের কথা আমরাও প্রায়শই বলে থাকি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারে ভারতীয় সমাজের জাতিভেদপ্রথার মূল নীতি অমান্য করা হয়েছে-জাতব্যবস্থার ভেতরে থেকেই হয়েছে। নিম্নজাতি শুধু উচ্চের আদর্শ অনুকরণ করে মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে, এটাই একমাত্র সত্য নয়। উচ্চের ধর্মাদর্শকেই সে বহু সময় অমান্য করেছে, বর্জন করেছে , বিপরীত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানিয়েছে। বস্তুত ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে নানা পরিবর্তন, বিরোধ আর নানা সংমিশ্রনের মধ্যে উচ্চনীচের পারস্পারিক ক্ষমতার বিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের গ্রামাঞ্চলে জাতপাতের বিরোধ অনেক দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের গ্রামাঞ্চলে জাতপাতের বিরোধ অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত বিরোধ পরিণত হয়েছে। কিন্তু জাতপাতের প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতপাতেও পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। জাত ও শ্রেণীর পারস্পারিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

সাম্প্রতিক কালে জাত-শ্রেণীর মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বিভিন্নজাতের সমাহারে শ্রেণীসাদৃশ্য জাতিসংঘের উদ্ভব হয়েছে। এই কারণে প্রাগ্রসর ও অনগ্রসর অথবা সবর্ণ এবং দলিত প্রভৃতি অভিপ্রায় জাতের পরিচয় জ্ঞাপন করা হচ্ছে। এগুলি জাতব্যবস্থার নিজস্ব বর্গ নয়, এগুলি রাষ্ট্র তৈরি করে দিয়েছে অথবা নিপীড়িত জাতগুলি নিজেদের অবস্থা বোঝাবার জন্য এই ধরণের অভিধা গ্রহণ করেছে। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা জাত ওশ্রেণী উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সমাজব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বিভেদের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। অতীত আঞ্চলিক স্তরে প্রাধান্যকারী জাতই প্রধান ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে জাত অথবা শ্রেণী নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো রাজনৈতিক দলে পদমর্যাদার ভিত্তিতে ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। প্রাধান্যকারী জাতের সদস্যপদ ও ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য উপাদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিহারে মাওবাদি কমিউনিষ্ট দল তাদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতপাতকে গুরুত্ব দিয়ে রণবীর সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছে। বস্তুত স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে শিল্পায়ন ঘটা সত্ত্বে বুর্জোয়া আধিপত্যের অসম্পূর্ণতার জন্য জাতপাতের প্রভাবে থেকে গেছে। বিভিন্ন জাত পৃথক পরিচয় পরিহার করে যত একত্রিত এবং সংঘবদ্ধ হবে জাত সম্পর্কে ধারণা ততই বদলাতে থাকবে। সকল নিপীড়িত গোষ্ঠীর অনুভূমিক সংঘবদ্ধতা গড়ার প্রয়াসে ভারতীয় সমাজের নিজস্ব বিশিষ্টতাদ্যোতক শ্রেণী গঠনের ইঙ্গিত রয়েছে। এই অভিনব শ্রেণীর মধ্যে জাতের পরিচয় থেকে যেতে পারে, কিন্তু তাতে শ্রেণী সংঘর্ষ ব্যাহত হবে না।

১. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের ইত্তরাধিকার, পৃষ্টা-৯২

২.অঞ্জন ঘোষ, সাম্প্রতিক ভারতে জাত ও শ্রেণী, সুজিত সেন সম্পাদিত 'জাতপাতের রাজনীতি' এর মধ্যে, পৃষ্টা-৮২

অনুশীলনী—২

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। শ্রেণীর সংজ্ঞা দাও।

২। শ্রেণী ও জাতের মধ্যে পার্থক্য কী?

৩। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সমাজব্যবস্থা শ্রেণী বিন্যাস কীরূপ?

৪। ভারতে জাত ও শ্রেণীর পারস্পারিক অনুপ্রবেশ বলতে কী বোঝ?

৫। সংরক্ষণমূলক বৈষম্য বলতে কী বোঝায়?

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। ভারতের সমাজব্যবস্থায় জাত ও শ্রেণীর পারস্পারিক অনুপ্রবেশ পর্যালোচনা কর।

২। ভারতে সংরক্ষণমূলক বৈষম্য নীতির ওপর বিতর্কের প্রেক্ষিতে জাতও শ্রেণীর পর্যালোচনা কর।

৪.১১ প্রধান শব্দচ্ছ

প্রাধান্যকারী জাত (Dominant Castes)ঃ- শ্রীনিবাসের মতে, যখন কোনো উচ্চ জাতি একটি গ্রামের অধিকাংশ চাষের জমি নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের সংখ্যাধিক্য থাকে তখন তারা ঐ গ্রামের প্রাধান্যকারী জাত বলে পরিচিত হয়।

অগ্রগণ্য জাত (Entrenched Castes)ঃ- শ্রীনিবাসের অগ্রগন্য জাতকে প্রাধান্যকারী জাত থেকে কিছুটা পৃথক করে দেখেছেন। অগ্রগন্য জাত যদিও প্রাধ্যান্যকারী জাতের মতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করে এবং আনুষ্ঠানিক মর্যাদার দিক থেকেও উচ্চে অবস্থান করে, কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে তারা তুলনামূলক কম। রজনী কোঠারীর মতে, জাতও শ্রেণীর মিথষ্ক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে অগ্রগন্য জাতরাই রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। যেমন তামিলনাড়ু ও মহারাষ্টের ব্রাহ্মণ।

উঠতি জাত (Ascendant Castes)ঃ- যখন অগ্রগন্য জাতরা উচ্চতর জাতের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়, তখন অপরাপার উচ্চপর্যায়ের জাতের মনে রচনাবোধ জেগে ওঠে। এর ফলে উচ্চজাতগুলি থেকে নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এদের কোটারী 'উঠতি জাত' বলে অভিহিত করেছেন।

রাজনীতির মন্ডলায়ন(Mondalisation of Politics)ঃ- সংরক্ষণমূলক বৈষম্যনীতিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্য পিছিয়ে পড়া জাতিগুলি চিহ্নিত করার জন্য ১৯৭৮ সালে বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ মন্ডলের নেতৃত্ব একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই মন্ডল কমিশনের সুপারিশ নিয়ে দেশব্যাপী বির্তক ও আন্দোলনের চনতে থাকে। রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ ভোট ব্যাঙ্ক বাড়াবার জন্য মন্ডল কমিশনের সুপারিশকে ব্যবহারে করতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে 'রাজনৈতিক মন্ডলায়ন' বলা হয়ে থাকে।

বুলক ক্যপিট্যালিস্ট(Bullock Capitalist)ঃ- রুডল্ফ্ ও রুডল্ফ্ তাঁদের রচিত 'ইন পারস্যুট অব্ লক্ষ্মী' (In pursuit of lakshmi) গ্রন্থে ভারতের সমাজব্যবস্থায় এই নতুন শ্রেণীর ভূমিকার কথা

উল্লেখ করেছেন। এরা হল স্বনিয়োজিত এবং আর্থিক গিক থেকে স্বাবলম্বী উৎপাদক। ভূমি সংস্কার ও সবুজ বিপ্লবের যাবতীয় সুফল ভোগ করার ফলে এরাই আধিপত্যকারী কৃষক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে এবং এরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়ম প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

সংস্কৃতায়ন (Sanskritization)ঃ- শ্রীনিবাসের মতে,'সংস্কৃতায়ন' হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো নীচু জাত বা উপজাতীয় গোষ্ঠী তাদের সমাজভুক্ত অন্য কোনো উঁচু জাতের জীবনচর্চা অনুকরণ করে নিজস্ব মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চায়। সাধারণত, বর্ণশ্রেষ্ঠ হিসেবে ব্রাহ্মণের জীবনচর্চাই অনুকরণযোগ্য আদর্শ বলে গৃহীত হয়।

৪.১২ অনুশীলনী পরখ- করার উত্তরমালা

অনুশীলনী-১

সংক্ষিপ্ত উত্তর

১। ৪.২ অনুচ্ছেদ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৪.৩ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ৪.৪ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ৪.৫ , ২.১ দেখুন।

৫। অনুচ্ছেদ ৪.৫ ,২.২ দেখুন।

৬। অনুচ্ছেদ ৪.৫ , ২.৩ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। অনুচ্ছেদ ৪.৫.২, ৪.৫.২.১, ৪.৫.২.২, দেখুন।

অনুশীলনী-২

সংক্ষিপ্ত উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ৪.৬ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৪.৭ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ৪.৮ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ৪.৯ দেখুন।

৫। অনুচ্ছেদ ৪.৯.৩ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। অনুচ্ছেদ ৪.৯, ৪.৯.১, ৪.৯.২ দেখুন।

১। অনুচ্ছেদ ৪.৯, ৪.৯.১, ৪.৯.২, ৪.৯.৩ দেখুন।

৪.১৩ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay type

1. Do the agree with the view that political mobilization in India is more a fuvction of caste thav that of class? Answer with special reference to the debates centering around the policy of protective discrimination.
2. How is caste related to politics in India? Answer with reference to the implications of the policy of protective discrimination.
3. Examine the interlinkages between caste and class as bases of political mobilization in India during the post-1967 period.
4. Examine the changing role of caste in India politics.
5. Examine the role of caste and class in India politics
6. Analyse the growing 'politicization of caste' in indian politics in recent yeare
7. Analyse the relation between caste and ploitics in india.

Short type

1. What is meant by politicization of caste?
2. What is positive discrimination?
3. How will you related social classes to the caste structure in India?
4. How dose Srinivas distinguish between 'dominant' caste and 'entrenched' caste in India?
5. How is caste related to social classes in India ?
6. Do you think that class may be a substitute for caste in India? Give reasons for your answer?
7. Do caste and class overlap?

৪.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

1. Rajani Kothari(ed), Caste in Indian politics, 2001, Orient Longman, Hyderabad
2. Rakhahari Chatterjee(ed), politics India, The State Society Interface, south Asian, new Delhi, 2001.

3. C. P. Bhambhri, Politics in India (1947-1987), Vikas Publishing House,1988.

4. Moin Shakir, Politics of Minorities, 1980, Ajanta, delhi.

5. সুজিত সেন সম্পাদিত, জাতপাতের রাজনীতি,১৯৮৯, পুস্তক বিপনি, কলকাতা।

6. মনোরঞ্জন বড়াল সম্পাদিত, বৈষম্য ব্যাধি ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ১৯৮৯, পথসংকেত প্রকাশনা, কতকাতা।

7. সত্যব্রত চক্রবর্তী সম্পাদিত, রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি, ২০০২, একুশে, কলকাতা।

8. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, ২০০০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

একক - ৫ ❑ ভারতের জাতীয় সংহতি (National Integration in India)

গঠন —

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ জাতীয় সংহতির অর্থ

৫.৩ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় সংহতির ধারণা

৫.৪ ভারতে জাতীয় সংহতির সমস্যাবলী

- ৫.৪.১ সাম্প্রদায়িকতা
- ৫.৪.২ আঞ্চলিকতাবাদ
- ৫.৪.৩ জাত-ব্যবস্থা
- ৫.৪.৪ ভাষাগত সমস্যা
- ৫.৪.৫ উপজাতীয়তাবাদ
- ৫.৪.৬ গোষ্ঠীবাদ
- ৫.৪.৭ রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা
- ৫.৪.৮ সংরক্ষণের রাজনীতি
- ৫.৮.৯ ভূমিপুত্র নীতি
- ৫.৪.১০ অন্যান্য সমস্যা

৫.৫ জাতীয় সংহতির ভবিষ্যত

- ৫.৫.১ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ
- ৫.৫.২ সমস্যা দূর করার উপায়সমূহ

৫.৬ সারসংক্ষেপ

৫.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৫.৮ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৫.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৫.০ উদ্দেশ্য

ভারতের জাতী গঠন (nation building) প্রক্রিয়ার এক অপরিহার্য অঙ্গ হোল জাতীয় সংহতি রক্ষা। ভারতের মূল সংবিধানে জাতীয় সংহতি রক্ষার ব্যাপারে কোন কিছু বলা না থাকলেও ১৯৭৫ সালের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় জাতীয় সংহতি রক্ষার ব্যাপারে, বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মৌলিক কর্তব্যের অধ্যায়েও জাতীয় সংহতি রক্ষা করাকে নাগরিকদের অন্যতম কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতের মতো বহুবিচিত্র সমস্কৃতির দেশে জাতীয় সংহতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই এককটি পাঠ শেষ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যাবেঃ

- জাতীয় সংহতি কী?
- ভারতের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংহতির ধারণা।
- ভারতে জাতীয় সংহতির সমস্যা
- ভারতে জাতীয় সংহতির ভবিষ্যত কী?

৫.১ প্রস্তাবনা

জাতীগঠন ও রাষ্ট্র-গঠন প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংহতি এক অপরিহার্য অঙ্গ। আধুনিক রাষ্ট্রমাত্রই জাতীয় সংহতি সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষভাবে সক্রিয়। তবে জাতীয় সংহতি সম্পর্কিত সমস্যাদি দেশ ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন দেশে এই সংহতির অপরিহার্যতা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভারতের মতো বহুত্ববাদী সমাজে জাতি-গঠন ও রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে এই জাতীয় সংহতির অপরিহার্যতা অনস্বীকীর্য। ভারত এমন একটি দেশ, যেখানে বহু জাতি ও বহু বর্ণের মানুষ বসবাস করে। তাদের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি পার্থক্য রয়েছে তাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এরূপ বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারত একটি জাতি হিসেবে যাতে গড়ে ওঠে, সেজন্য বিভিন্ন সময়ে, বিশেষতঃ স্বাধীনোত্তর ভারতে জাতীয় নেতৃবৃন্দ জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতীয় সমাজের বৈচিত্র্য অনেক ক্ষেত্রে জন জীবনে সংঘাত সংঘর্ষের সৃষ্টি করে এবং সমস্যার সম্মুখীন হয়। এর ফলে রাষ্ট্রগঠন ও জাতিগঠন প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। জাতীয় সংহতির পথে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। বস্তুতঃ ভারতের মতো বহু বিচিত্র সংস্কৃতির দেশে জাতীয় সংহতি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গেলে জাতপাতগত, সম্প্রদায়গত, ভাষাগত, বর্ণগত কিংবা আঞ্চলিকতাবাদী সংকীর্ণ মনোভাবের ঊর্ধে অশুভ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

৫.২ জাতীয় সংহতির অর্থ

জাতীয় সংহতির ধারণা সম্পর্কে কার্ল ডয়েস্ (Karl Deutsch), এডওয়ার্ড শিলস্ (Edward Shils), ড্যানিয়েল লারনার (Daniel Lerner), মাইরন ভাইনার (Myron Weiner) প্রমুখ চিন্তাবীদ বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তবে তাঁরা সকলেই সহমত পোষণ করেছেন যে, জাতীয় সংহতির ধারণা বিশেষভাবে

ব্যাপক এবং অসংখ্য রাজনীতিক বিষয় 'সংহতি' শব্দটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।[১] এডওয়ার্ড শিলস্ প্রমুখ চিন্তাবিদ জাতীয় সংহতি সাধনের ক্ষেত্রে আধুনিক এলিট শ্রেণীর সঙ্গে জনসাধারণের ব্যবধানকে সংকুচিত করা মনে করেছেন। কার্ল ডয়েসের মতে, জাতীয় সংহতি সাধনের জন্য উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। প্রথম জাতীয় সংহতি সম্মেলনে বলা হয় যে, জাতীয় সংহতি হোল এক সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষা সম্পর্কিত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সমঝোতা বোধের সৃষ্টি হয় এবং যার দ্বারা অভিন্ন নাগরিকতার চেতনা ও জাতির প্রতি গভীর আনুগত্যের বোধ দেশবাসীর মধ্যে জাগ্রত হয়।[২]

ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও জাতীয় সংহতি পৃথক পরিচিতির বিরোধী নয়। জাতীয় সংহতির মূল কথা হোল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধন। এইচ. এ. গনি (H.A. G*a*ni) র মত অনুযায়ী, জাতীয় সংহতি হোল এক বিশেষ অবস্থা, যাতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সুনিশ্চিত হবে এবং জনসমাজের সকল অংশই সমভাবে মর্যাদা লাভ করবে ও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হবে। বস্তুতঃ জাতীয় সংহতিকে সুনিশ্চিত করতে হলে বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। যদি অভিন্নতা বা ঐক্যই প্রথম ও শেষ কথা হয় তাহলে সংহতির প্রয়োজনীয়তা থাকে না। বিপরীতক্রমে বৈচিত্র্যই যদি সব হয় তা হলে সংহতি সাধন সম্ভব নয়। তেমনি আবার বৈচিত্র্যকে অভিন্নতায় রূপান্তরিত করাকে সংহতি বলে না। সুতরাং সংহতি হোল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধনের এক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সকল রকম স্বতন্ত্র্য সূচক উপাদান ও শক্তি সমূহের মধ্যে ঐক্য চেতনার সৃষ্টি হয়। জাতীয় সংহতির মাধ্যমে এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, যার মধ্যে সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সকলে এক শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ দেশগঠনের অভিন্ন উদ্দেশ্যে উপযোগী হয়।

মাইরন ভাইনারের মত অনুযায়ী, জাতীয় সংহতির ধারণা অতিমাত্রায় ব্যাপক ও বিস্তৃত। বহুবিধ মানবিক সম্পর্ক ও মনোভাব এর অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় সংহতি হোল বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন জীবনধারাগত সত্তার সংহতি এবং জাতীয় চেতনার বিকাশ, একটি কর্তৃত্বপূর্ণ সরকারের অধীনে রাজনীতিক একক সমূহের সুনির্দিষ্ট রাজ্য সীমার মধ্যে সুসংবদ্ধভাবে অবস্থান, শাসক ও শাসিতের মধ্যে সংহতি, অভিন্ন রাজনীতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নাগরিকদের সংহতি, এবং উদ্দেশ্যমূলক কার্য সম্পাদনের স্বার্থে ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠন সমূহের মধ্যে সংহতি।[১] ভাইনারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলি চিহ্নিত করা যায় ঃ (১) ভূখণ্ডগত ঐক্য রক্ষা ও জাতীয় পরিচিতি প্রতিষ্ঠা; (২) রাজনীতিক সংহতি প্রতিষ্ঠা; (৩) শাসক এলিট শ্রেণী ও শাসিত জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধানের অবসান ও সংযোগ সাধন; (৪) সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মূল্যবোধের ব্যাপারে ন্যূনতম সহমতের সৃষ্টি এবং (৫) সমাজের সকলের মধ্যে সমন্বয় মূলক আচার-আচরণের মাধ্যমে অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা। এইভাবে দেখা যায় যে, জাতীয় সংহতি হোল এক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জাতি-গঠন ও রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়া কার্যকর হয়ে থাকে।

৫.৩ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় সংহতির ধারণা

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতির বৈচিত্র্য অল্পবিস্তর বর্তমান। কিন্তু ভারতের মতো

১. S.L Sikri, Indian Government and Politics, Kalyani Publishers, New Delhi, P. 237

২. K.K. Ghai, Indian Government and Politics, Kalyani Publishers, New Delhi, 2002, P. 405

১. Quoted in K.K. Ghai, P.405

বহুত্ববাদী দেশে বৈচিত্র্যের আধিক্য নিতান্তই স্বাভাবিক। এই প্রেক্ষিতে জাতি ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ বিশেষত উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই জাতীয় সংহতি বলতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা বলা হয়। বলা হয় যে, বিদ্যমান বৈচিত্রকে বজায় রাখতে হবে এবং একই সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। জাতি-বংশ, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঐক্য সাধন সম্ভব। এখানে জাতীয় সংহতির ধারণা মধ্যে ঐক্য ও বৈচিত্র্য উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অপরের পরিপূরক। বস্তুতঃ, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় সংহতি হোল সমসংযোগ, একীকরণ নয়; পুঞ্জীভবন, আত্তীকরণ নয়।

অনেকে এই অভেমত পোষণ করেছেন যে, অতীতে ভারতীয়রা যাবতীয় জাতীয় সমস্যা ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকের মোকাবিলা করেছেন ঐক্যবদ্ধভাবে। জাতীয় জীবনের সংকটকালীন মুহূর্তে বিবিধ শক্তিকে জয় ভারতীয়রা একটি অখণ্ড জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয়কে ঊর্দ্ধে তুলে ধরেছে। সুতরাং একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে ভারতীয়দের উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ভারতীয়দের মধ্যে জাতিগঠনের প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। জাতি গঠনের পথে এখনও এদেশের মানুষকে অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে। ভারতের বহুত্ববাদী সমাজে অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে। ভারতের বহুত্ববাদী সমাজে উপ-জাতীয় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে অতিক্রম করে সর্বত্র জাতীয় পরিচিতি গড়ে তোলা এখনও সম্ভব হয়নি। ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবোধের অভাব অস্বিকার করা যায় না। সকলে এক অভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত - এই বোধ বা 'আমরা বোধ' (We feeling) এখনও ভারতীয়দের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতা লাভের পর অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল অতিক্রান্ত হলেও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে অতিক্রম করে ভারতীয়রা সুসংহত হতে পারেনি। ভারতের মতো বিরাট দেশে বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্র ও অর্থনীতিক সংকটের মোকাবিলা করতে গেলে সংহতি বিরোধী শক্তির অবসান আবশ্যক, জাতীয় স্তরে উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য। ভারতের মতো বহুযুক্তরাষ্ট্রীয় (multi-federal) এবং গণতান্ত্রিক দেশে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নামে স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্যা যেমন গভীর, তেমনি জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। ভারতের সংবিধানেও এর গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে প্রস্তাবনাকে সংশোধন করে জাতীয় অখণ্ডতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলা হয়েছে।

৫.৪ ভারতে জাতীয় সংহতি সমস্যাবলী

রাজনীতি ও সমাজের মধ্যে এক গতিশীল সম্পর্ক লক্ষ করা যায় - একে অপরকে প্রভাবিত করে, আবার অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারতের মতো উপনিবেশিকতা - উত্তর সমাজে আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা এবং প্রাক ধনতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের সহাবস্থান রাজনীতিকে এক বিশিষ্টতা প্রদান করেছে। কিন্তু রাজনীতির আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা। বস্তুতঃ, সনাতন সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে আধুনিক রাজনীতিক উপরিকাঠামোর অবস্থান ভারতে সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে অসংলগ্নতা গড়ে তুলেছে। এই অসংলগ্নতার ফল হিসেবেই ভারতে জাতীয় সংহতির সমস্যা তাই বিচ্ছিন্ন কোন সমস্যা নয়। পরিবর্তনশীল সমাজ ও রাজনীতি থেকে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ভারতের সামাজিক-রাজনীতিক ব্যবস্থায় ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, অঞ্চল, জাতপাত ও উপজাতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং পৃথক পরিচিতির জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সংহতিনাশক শক্তিগুলির উদ্ভব ও বিকাশ ভারতের জাতীয় সংহতির পথে নানারূপে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

৫.৪.১ সাম্প্রদায়িকতা

ভারতে জাতীয় সংহতি বর্তমানে যে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা অন্যতম। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি যা জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। অন্ধ বিশ্বাসের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িকতা গণতান্ত্রিক রাজনীতিক সংস্কৃতি সৃষ্টির কাজকে ব্যাহত হয়ে দাড়িয়েছে। অন্ধ বিশ্বাসের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িকতা গণতান্ত্রিক রাজনীতিক সংস্কৃতি সৃষ্টির কাজকে ব্যাহত করছে। এর ফলে সাম্প্রদায়িকতা প্রগতি-বিরোধী মতবাদ গড়ে তুলেছে। এর দ্বারাই ভারতের জাতীয় সংহতি আজ আক্রান্ত। স্বাধীনতা লাভের পর অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। কিন্তু এখনও আমরা সাম্প্রদায়িকতার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রান্ত করতে পারেনি। বরং বিপরীতক্রমে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলি আরও শক্তিশালী হয়েছে। জাতীয়তাবাদী শক্তি হীনবল হয়েছে; পাশাপাশি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক অন্ধ গোঁড়ামি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতাকে অনেকে একটি ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বলে চিহ্নিত করেছেন। একে ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তন বা ঐতিহ্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু একথা সর্বাংশে সত্য নয়। বিপান চন্দ্র, প্রমোদ কুমার প্রমুখ চিন্তাবিদদের মতে, দ্বাম্প্রদায়িকতা হোল একটি ভ্রান্ত চেতনা, বিকৃত মতাদর্শ। কারণ তা বাস্তবতাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে না, বরং বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করে। বৈষম্যমূলক সমাজে অসম অর্থনীতিক ব্যবস্থায় যে শ্রেণী দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে তাকে আড়াল করে ধর্মীয় পার্থক্য সমূহের গুরুত্ব দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ফুলে ফেঁপে উঠেছে এই উপমহাদেশে। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলে, সরকারী প্রশাসন ও উন্নয়নের ব্যাপারে কোন বিশেষ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চিন্তাধারাকে প্রাধান্য দিয়ে এবং অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি ঘৃণার মনোভাব ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় অখণ্ডতাকে বিঘ্নিত করছে।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলেই ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাধীন ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চাও রাজনীতিক সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তবে মূলতঃ আশির দশক থেকে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে এসে পড়েছে। একদিকে হিন্দু মৌলবাদের উত্থান এবং অন্যদিকে সংখ্যালঘু মৌলবাদীদের কার্যকলাপের ফলে বিভিন্ন সময়ে ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভারতীয় ঐক্য ও সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করেছে। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সঙ্গে এর তফাত হোল এই যে, যে সময় মুসলিম মৌলবাদ যদি চালকের আসনে বসে থাকে, তাহলে বর্তমানে হিন্দু মৌলবাদ সে আসনের অধীশ্বর হয়েছে। এই হিন্দু মৌলবাদের প্রবক্তা হিসেবে যে-সব দল ও সংগঠন এখন খুবই শক্তিশালী ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হোল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর.এস.এস), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিব সেনা, বজরং দল এবং তাদের রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় ভারতীয় জনতা পার্টি (বে.জি.পি)। এই সব দল ও সংগঠনের কাছে ভারতের ইতিহাস হোল হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থাদি। এরা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ এবং 'এক জাতি এক দেশ ও এক সংস্কৃতি' প্রতিষ্ঠার শ্লোগান তুলে মুসলিম ও খ্রীস্টনদের বিরুদ্ধে কার্যতঃ জেহাদ ঘোষণা করেছে। হিন্দুত্বের নামে রামমন্দির নির্মাণ, একাত্মতা যাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে সঙ্ঘ পরিবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে একদিকে যেমন ভারতের রাজনীতিকে অস্থিরতার আবর্তে নিমজ্জিত করেছে, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছে।

হিন্দু মৌলবাদের আগ্রাসী মনোভাবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রতি মৌলবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। 'ইসলাম বিপন্ন' রব তুলে জামাত-ই-ইসলামী, ইনসাফ পার্টি, অল ইণ্ডিয়া বাবরি মসজিদ কনফারেন্স প্রভৃতি মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি মুসলমানদের বিপথে চালিত করে লড়াই-এর ময়দানে নেমে পড়েছে। শাহবানু মামলা থেকে বাবরি অ্যাকশন কমিটির আন্দোলন পর্যন্ত মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রতিটি পদক্ষেপই জাতীয় ঐক্য এবং সংহতিকে বিনষ্ট করেছে। নির্বাচনী রাজনীতি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব বৃদ্ধিতে আরও সাহায্য করেছে। ভারতীয় ভোটদাতাদের ১৩ শতাংশই হলেন মুসলিম এবং সংসদের লোকসভার প্রায় ১০০ টি আসনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রন হয় এই মুসলিম ভোট দাতাদের দ্বারা। সেই কারণেই প্রতিটি রাজনৈতিক দল মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের সমর্থন লাভের আশায় সচেষ্ট থাকে। এর ফলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ আরও বেড়ে উঠেছে। মুসলিম মৌলাবাদের মতো পাঞ্জাবে অকালিদলের নেতৃত্বে পরিচালিত শিখ মৌলবাদও খালিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মদত দিয়েছিল। এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতার মতো সংখ্যালঘিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতাও 'ধর্মের রাজনীতিকরণ' এবং ' রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ' ঘটিয়ে জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতি মৌলবাদের বৃদ্ধি ঘটিয়ে ভারতের জাতীয় সংহতিকে আরও বিপন্ন করে তুলেছে। বর্তমানে মৌলবাদের চলাচল যেন বিশ্বয়নেরই রাস্তা পরিক্রমা।[১] বিশ্বায়ন বলতে সাধারণভাবে বোঝায় পুঁজির অবাধ যাতায়াত, তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব, জাতীয় কাঠামোর বদলে বহুজাতিক ও সম্পর্কের বিকাশ। বিশ্বায়ন যে-সব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করছে মৌলবাদী সংগঠনগুলি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে। আগ্রাসনবাদ মৌলবাদীদের দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। বিশ্বায়ন কর্তাদের সঙ্গে তাদের এক্ষেত্রে যথেষ্ট মিল আছে। রক্ষণশীল ধর্মনীতিকে সাংস্কৃতিক জগতে 'প্যাকেজ' হিসেবেছাড়া হচ্ছে। এর ফলে স্যামুয়েল হান্টিংটনের ভাষায় 'সভ্যতার সংঘাত' দেখা যাচ্ছে। গোধরার ঘটনা, গুজরাটের হত্যাক্যণ্ড, সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা গুজরাটের বিশ্ববিখ্যাত স্বামীনারায়ণ অক্ষরধাম মন্দিরের ওপর অক্রমণ এই সভ্যতার সংগ্রাম কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বস্তুতঃ মৌলবাদীদের আন্তজার্তিক নেটওয়ার্ক থেকে ভারত বাদ যায়নি। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে, মৌলবাদ সংগঠনগুলি তাদের কাজকর্ম বাড়িয়ে তুলেছে। এ সবই ভারতের জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে।

অনুশীলনী — ১

★ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ★

১। জাতীয় সংহতির অর্থ কী?

২। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় সংহতির ধারণা কী?

★ রচনাত্মক প্রশ্ন ★

১। সাম্প্রদায়িকতা কীভাবে ভারতের জাতীয় সংহতির প্রতিবন্ধিকরূপে দেখা দিয়েছে?

---

১. মইনুল হাসান, বিশ্বায়ন ও মৌলবাদ, অমিয় কুমার বাগচী সম্পাদিত বিশ্বায়ন ঃ ভাবনা - দুর্ভাবনা, দ্বিতীয় খণ্ড ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০২, এর মধ্যে, পৃষ্ঠা - ৩০৫

৫.৪.২ : আঞ্চলিকতাবাদ

ভারতের জাতীয় সংহতির পথে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হোল আঞ্চলিকতাবাদ। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিশালী বিট্রিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়ে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৫০-৬০ এর দশকে আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনগুলি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্যকে খর্ব করেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আঞ্চলিক আন্দোলনগুলির মধ্যে সংকীর্ণতাবাদ প্রাধান্য পাওয়ায় জাতীয় সংহতির পক্ষে এই প্রবণতা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বিভিন্ন ধরণের আঞ্চলিকতাবাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। কখনো ধর্ম ও জাত অথবা জাত ও ভাষা ও নৃকুলগত উপাদান আবার কখনও সংকীর্ণ স্থানীয় ঐক্যবোধ আঞ্চলিকতাবাদের চালিকাশক্তি রূপে দেখা দিয়েছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আর্থনীতিক বঞ্চনা, শোষণ, কেন্দ্রের অবহেলা প্রভৃতি আর্থনীতিক উপাদানই হোল আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনগুলির মূল কারণ। ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের বিবিধ অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে অধিকতর নীতির ভিত্তিতে আন্দোলন, রাজ্য সরকারের চাকরিতে রাজ্যবাসীর একচেটিয়া অধিকারের দাবী প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। এ সব থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সংকীর্ণ মানসিকতা, প্রাদেশিকতা, ধর্মান্ধতা প্রভৃতি বর্তমান। এর ফলে জাতীয় সংহতি সাধনের পথটি দুর্গম হয়ে পড়েছে।

১৯৫৬ সালে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন ব্যবস্থা রোগ নিরাময়ের সঠিক ওষুধ ছিল না। এর পর থেকে ভারতের মানচিত্র বিভিন্ন ধরণের চ্যানেঞ্জের সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে ভাষাগত উপাদান ছাড়াও অন্যান্য শক্তি আরও সমস্যা ও বিরোধের সৃষ্টি করেছে। সমভূমির মানুষ কর্তৃক শোষণের অভিযোগে পার্বত্য অঞ্চলে নতুন নতুন রাজ্য গড়ে উঠতে থাকে। কোন রাজ্য স্ব-শাষিত পরিষদ গঠনের দাবী জানায়। জম্মু ও কাশ্মীর স্ব-শাসনের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বিভক্ত পাঞ্জাবকে বিভক্ত করে পাঞ্জাব ও হিন্দী ভাষী হরিয়ানা গঠিত হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। আসাম টুকরো টুকরো হবার পরও আবার টুকরো করার চেষ্টা চলছে। রাজ্য ভেঙ্গে নতুন নতুন রাজ্যগঠনের প্রক্রিয়া এখনও সমানে চলছে। আঞ্চলিকতাবাদের চরমতম রূপ হিসেবে অঞ্চলকে মূল ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাওয়া হয়। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, নাগাল্যাণ্ডে যে আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম হয়েছে তা ভারতের ভৌগলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। একথা ঠিক যে, সব আঞ্চলিকতাবাদই বিচ্ছিন্নতাবাদ নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা ও লক্ষ করা যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় নেতৃত্বের অভাবে ও বিদেশী মদতপুষ্ট হয়ে আঞ্চলিকতাবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং এর ফলে ভারতীয় জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আঞ্চলিক সমস্যাদির রাজনীতিকরণের প্রচেষ্টার ফলে ফলে ভারতের আঞ্চলিকতাবাদ এক ঘৃণ্য রূপ পাচ্ছে।

৫.৪.৩ জাতব্যবস্থা

জাতব্যবস্থা হোল ভারতীয় হিন্দু সমাজের এক দুরারোগ্য ব্যাধি। কারণ, জাতপাতকে কেন্দ্র করে সমগ্র হিন্দু সমাজ আজ শতধাবিভক্ত। অসাম্য-বৈষম্য এই বদ্ধ সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। তাই সামাজিক সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে জাতব্যবস্থা প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কে. আর. নারায়ণের মতে, ভারতের ঐক্য ও আবেগময় সংহতির পথে সব থেকে বড় বাধা হোল অসংখ্য জাতি, উপজাতি ও জনজাতিতে ভারতীয় জনসমাজের বিভাজন; আঞ্চলিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত বিভাজন এক্ষেত্রে ততটা মারাত্মক নয়।[১] একথা ঠিক যে, স্বধীন ভারতে সংস্কৃতায়ন, পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকীকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক সচলতার নানা

সুযোগ তৈরী হয়েছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সামাজিক বৈষম্য, বঞ্চনা ও কুসংস্কারের প্রতীক হিসেবে জাতব্যবস্থা ভারতে হীনবল হয়ে পড়েছে এমন কথা বলা যাবে না। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সাম্যের অধিকার স্বীকৃতি লাভ করলেও বা অস্পৃশ্যতা দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হলেও ভারতীয় সমাজের বুক থেকে এই দুষ্ট ক্ষতটির নিরাময় করা এখনও সম্ভব হয়নি।

ভারতের রাজনীতিতে জাতপাতের গুরুত্ব পর্যালোচনা করে রজনা কোঠারী প্রমুখ চিন্তাবিদ 'জাতের রাজনাতিকরণ' ধারণাটি ব্যবহার করেছেন। রাজনীতিবিদরা জাতগোষ্ঠীগুলিকে তাদের ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে যেমন ব্যবহার করেন, তেমনি আবার জাতভিত্তিক গোষ্ঠীগুলিও সামাজিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাদের সদস্যদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে। বস্তুতঃ, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই জাত ও রাজনীতির মিথক্রিয়া লক্ষ করা যায়। আবার অনেক সময় জাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন বহুজন সমাজ পার্টি, জাস্টিস্ পাটি, ডি.এম.কে, এই.আই.ডি.এম, তেলেগু দেশম প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। এইসব জাতভিত্তিক সমগঠন ও দলসমূহের আবির্ভাবের ফলে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, তামিলনাড়ু, গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে জাতভিত্তিক সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করেছে। তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে, অসমে অধোম ও কলিতাদের মধ্যে, বিহারে যাদব ও ঠাকুর এবং ভূমিহার ও রাজপুতদের মধ্যে, উত্তরপ্রদেশে রাজপুত ও জাঠদের মধ্যে, হরিয়ানায় জাঠ ও আহিরদের মধ্যে, রাজস্থানে জাঠ ও রাজপুতদের মধ্যে, অন্ধ্রে কাম্মা ও রেড্ডিদের মধ্যে, গুজরাটে বানিয়া ও পাতিদারদের মধ্যে, কর্ণাটকে লিঙ্গায়েত ও ওক্কালিগাদের মধ্যে এবং কেরলে নায়ার ও এঝাভাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত লক্ষ করা যায়। এই সবজাতিগত সংঘাত-সংঘর্ষ ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুর্বল করে তুলেছে। সর্বোপরি, বর্তমান ভারতে জাত ও শ্রেণীর পারস্পরিক অনুপ্রবেশ হেতু জাতপাতের দ্বন্দ্ব অনেক সময় শ্রেণী দ্বন্দ্বের আকার ধারণ করেছে কিংবা শ্রেণীদ্বন্দ্ব জাতপাতের দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এইভাবে সাম্প্রতিককালে ভারতের রাজনীতিতে জাতপাতের ভূমিকা জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে।

৫.৪.৪ ভাষাগত সমস্যা

ভারত গোল একটি বহুভাষাভাষির দেশ। সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু লিখেছেন যে, এ কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে ১৬৫২ টি কথ্য ভাষা প্রচলিত আছে, যার মধ্যে ৬৩ টি অ-ভারতীয় ভাষাও রয়েছে। ভাষার বিভিন্নতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবাসীকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হতে দেয়নি ভাষা একদিকে যেমন সংহতিমূলক ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে তেমনি সংহতিনাশক শক্তি হিসেবেও কাজ করে। সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা প্রমুখ দেশে ভাষাগত বৈচিত্র জাতীয় ঐক্যকে ক্ষুণ্ণ করেনি। কিন্তু ভারতে ভাষা নিয়ে রাজনীতি করার ফলে ভাষা এক্ষেত্রে বিভেদকামী শক্তি হিসেবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ভারতে ভাষাগত সমস্যা এক অন্যতম সমস্যায় পরিণত হয়েছে। মরিস জোনস্ (Morris Jones) তাঁর 'দি গভর্নমেন্ট এ্যাণ্ড পলিটিক্স্ অব্ইন্ডিয়া' (The Government and Politics of India) গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন যে, আঞ্চলিকতাবাদ ও ভাষার প্রশ্ন ভারতীয় রাজনীতির সম্মুখসারিতে চলে এসেছে এবং সাম্প্রতিক রাজনীতিক ইতিহাসে এত বেশি তাদের কথা

১. K.R. Narayanan, Images and Insights, P. 65, Quoted in S.L. Sikri, Indian Government and Politics, PP . 261-262.

উচ্চারিত হচ্ছে যে, তারা যে জাতীয় সংহতির একমাত্র বিষয় নয় এ কথাই আমরা সহজে বুঝতে পারি না।

জাতীয় ভাষার প্রশ্নে আজও আমরা ঐক্যমতে উপনীত হতে পারিনি। সংবিধানে হিন্দীকে কেন্দ্রের সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি এবং বিশেষভাবে তামিলনাড়ু হিন্দী বিরোধিতায় আক্রমণমুখী। তামিলনাড়ুতে হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনে বহু জীবনহানি ও রক্তক্ষয় ঘটেছে। বিক্ষোভকারীদের শ্লোগান ছিল 'ইংরেজি থাক, কিন্তু হিন্দী কখনই নয়'। তামিলনাড়ুর হিন্দী বিরোধী আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে। এইভাবে ভাষা-ভিত্তিক রাজনীতি ভারতের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধকে তীব্রতর করেছে।

১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে ভারতায় যুক্তরাষ্টকে পুনর্গঠিত করা হলেও ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের আন্দোলন থেমে যায়নি। বরং প্রবল রাজনীতিক চাপ ও আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে কেন্দ্রীয় সরকারকে বারে বারে বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা বদল করে নতুন নতুন রাজ্য গঠন করতে হয়েছে। বর্তমানে ২৮টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য পুনর্গঠনের আন্দোলন অব্যাহত হয়েছে। মহারাষ্ট্রে বিদর্ভ, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানা, আসামে বোডোল্যান্ড প্রভৃতি নতুন রাজ্য গঠনের দাবী জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

ভাষাকে কেন্দ্র করে অন্য এক ধরণের বিরোধও ঘটতে দেখা যাচ্ছে। কর্ণাটকের কন্নড় ও তামিল, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে উর্দু ও হিন্দী, পাঞ্জাবে পাঞ্জাবী ও হিন্দী, গোয়াতে মারাঠী ও কোঙ্কন, অসমে বাংলা ও অসমিয়া প্রভৃতি ভাষার বিরোধ ভাষার ভিত্তিতে ভারতীয়দের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছে। এর ফলে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া পুনর্গঠিত রাজ্য সমূহেও ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সমস্যা বেড়েই চলেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠীসমূহ সংখ্যালঘুদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে তাদের ওপর নিজেদের ভাষাকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। প্রাধান্য বিস্তারকারী ভাষা গোষ্ঠীগুলির আগ্রাসী ভূমিকা ক্ষতিকারক হিসেবে দেখা দিয়েছে। আসামে বাঙ্গালী বিরোধী আন্দোলন ভারতের সংহতি নষ্ট করেছে। কিছু কিছু ভাষাগত সম্প্রদায়, যেমন মৈথিলী বা গোর্খালি এখনও নিজস্ব রাজ্যের দাবিতে অনড়। বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার ভিত্তিতে 'ভূমিপুত্র'দের আন্দোলন মাঝেমাঝেই রাজনীতিক পরিস্থিতিকে অশান্ত করে তুলেছে। সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদের রাজনীতিও ভাষাভিত্তিক রাজনীতি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে।

এই সব দিক থেকে বিশ্লেষণ করে ভাষাগত সমস্যাকে অনেক চিন্তাবিদ ভারতের জাতীয় সংহতির পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেছেন।[১] রুডল্ফ দম্পতি বলেছেন যে, বহুত্ববাদী সমাজে ভাষ ভিত্তিক নির্ধারণবাদ হোল একটি সমন্বয়-বিরোধী দাবভী এবং তাই ভারতের জাতীয় ঐক্যের পক্ষে বিপজ্জনক। তবে পরবর্তীকালে পল্ ব্রাস (Paul Brass), দীপঙ্কর গুপ্ত প্রমুখ পন্ডিত মনে করেন যে, ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র বিভিন্ন সময়ে সমস্যা সৃষ্টি করলেও বহুত্ববাদী নীতির মাধ্যমে তাদের সমাধান সম্ভব হয়েছে। যাই হোক, ভারতের জাতীয় সংহতির প্রশ্নে ভাষা যে যথোচিত গুরুত্ব দাবি করে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

৫.৪.৫ উপজাতীয়তাবাদ (Tribalism)

ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় উপজাতীয়তাবাদ জাতীয় সংহতির প্রক্রিয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। উপজাতীয়তাবাদের এই সমস্যা ব্রিটিশ আমল থেকে দেখা দিয়েছিল। স্বাধীন ভারতে বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব

ভারতে উপজাতি-গোষ্ঠীগুলি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে উপজাতীয় আন্দোলনে 'স্যালারিয়েট' (Salariate) শ্রেণী প্রধান চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করছে। 'স্যালারিয়েট' কোন মূল শ্রেণী নয়, এটি হল এক সাহায্যকারী গোষ্ঠী, যার উৎপত্তি হয়েছিল ব্রিটিশ রাজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। প্রখ্যাত পাকিস্তানি চিন্তাবিদ আম্‌জা আলভি (Hamza Alovi) 'স্যালারিয়েট' বলতে এমন এক জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন, যার মধ্যে সরকারী পরিকাঠামোয় বাবু-কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও অনুরুপ কাজ পেতে আগ্রহী ব্যক্তিরা রয়েছেন। 'স্যালারিয়েট' পরিচালিত উপজাতীয় রাজনীতির তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটে 'সংরক্ষণ' এর রাজনীতির মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় চাকুরীপ্রার্থী নব্য শিক্ষিত যুবকদের হতাশা, আপেক্ষিক বঞ্চনার মনোভাব, আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতির ফলে উপজাতীয় রাজনীতির দ্রুত প্রকাশ ঘটে। এছাড়া উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে অ-উপজাতীয়দের বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হতে থাকলে ঐসব উপজাতি তাদের উপজাতীয় পরিচিতি ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাই তারা নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতি সংরক্ষণের কাজে আত্মনিয়োগ করে। কোন কোন উপজাতি আবার বাংলাদেশ, মায়নমার, চীন প্রভৃতি বিদেশী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী এলাকার অধিবাসী। ঐ সব উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পৃথক উপজাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা অনেক সময় লক্ষ করা যায়। কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্র সীমান্তবর্তী উপজাতি-গোষ্ঠীগুলির বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন উৎসাহ যুগিয়েছে।

জাতীয় সংহতির ওপর প্রথম আঘাত এসেছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা উপজাতিদের কাছ থেকে। ব্রিটিশ আমলেই এই অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি অঞ্চল হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রেখে নাগা উপজাতি গোষ্ঠীর ক্ষোভকে প্রশমিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও নাগা উপজাতিগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু 'স্যালারিয়েট'দের নেতৃত্বে উপজাতীয়রা তাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহী। বিগত শতকের ষাটের দশকে ফিজো (Phizo) ভারতের বাইরে পৃথক নাগা-রাষ্ট্রের, দাবি তোলে। আশির দশকের প্রথমদিকে ঐ একই দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন লালডেঙ্গা (Laldenga)। আসামে উপজাতীয়তাবাদ এখন সন্ত্রাসবাদী পথে চালিত হচ্ছে। এই আন্দোলনের চাঁই হোল আসাম মুক্তি মোর্চা (United Liberation Front of Assam/ULFA)। একইরকমভাবে আসাম-পশ্চিম বাংলার সীমান্তে অবস্থিত পশ্চিমবাংলার উত্তরবঙ্গীয় অঞ্চলের রাজবংশীরা মনে করে যে, তারা উন্নত ও সুবিধাপ্রাপ্ত বাঙালীদের দ্বারা বঞ্চিত। তাই তারা এখন পৃথক 'কামতাপুর' রাজ্যের দাবি জানাচ্ছে। ঝাড়খন্ড অসংখ্য উপজাতির রাজ্য। ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উপজাতীয় পরিচিতির ওপর নির্ভর করেই সংগঠিত হচ্ছে এবং অধিকতর স্বাতন্ত্রের দাবি করছে। বস্তুত উপজাতি-গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা নিশ্চিতভাবেই জাতীয় সংহতি পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

৫.৪.৬ গোষ্ঠীবাদ

ভারতের জাতীয় সংহতির আর একটি অন্যতম সমস্যা হোল গোষ্ঠীবাদের উদ্ভব। এই গোষ্ঠীবাদ বিশেষত ধর্মীয় উপদলীয় মনোভাব থেকে সৃষ্ট। এর ফলে একই ধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে সিয়া-সুন্নীর বিরোধ এবং শিখদের মধ্যে নিরঙ্কারী ও অকালীদের বিরোধের কথা উল্লেখ করা যায়। এই বিরোধের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে লক্ষ্ণৌতে সিয়া ও সুন্নীর মধ্যে এবং অমৃতসর ও কানপুরে

নিরঙ্কারী ও অকালী শিখদের মধ্যে প্রায়শই দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হতে বাধ্য হতে দেখা যায়। ভারতের মতো বহু বিচিত্র সংস্কৃতির দেশে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধনই এক অন্যতম সমস্যা। তার সঙ্গে এই উপদলীয় মনোভাব ও বিরোধ জাতীয় সংহতির পক্ষে নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিকারক।

৫.৪.৭ রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা

ভারতে রাজনৈতিক দলগুলির ভোট-ব্যাঙ্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টা জাতীয় সংহতির পথে অন্যতম বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে। গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে রাজনৈতিক দলের ইতিবাচক ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও জাতীয় স্বার্থের গ্রন্থীকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এই রাজনৈতিক দল একদিকে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে হিসেবে কাজ করে, অন্যদিকে জনগণের মধ্যে আবেগপূর্ণ সংহতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালের ভারতে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল সংকীর্ণ স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী ভূমিকা পালন করছে। এদেশের অনেক রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক স্বার্থকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছে। আবার অনেক রাজনৈতিক দল জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতাবাদ, ভাষা, উপজাতীয়তাবাদ প্রভৃতিকে ব্যবহার করে নির্বাচনী লড়াইয়ে জয়লাভ করার চেষ্টা করছে। বি. জে. পি., হিন্দু মহাসভা, মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট, জামাত-ই ইসলামী, অকালী, গোর্খা, ডি.এম.কে, এ.ডি.এম.কে, মুসলিম লীগ, ত্রিপুরা যুব সমিতি প্রভৃতি হোল এধরণের রাজনৈতিক দলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় দলগুলিও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তুলেছে। রজনী কোঠারী যথার্থই বলেছেন যে, ভারতের রাজনীতি হয়ে পড়েছে সংখ্যার খেলার মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াই। রাজনৈতিক দলগুলির এই ধরণের কার্যকলাপ সাম্প্রতিককালে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে।

৫.৪.৮ সংরক্ষণের রাজনীতি

সাম্প্রতিককালে ভারতীয় সংবিধানের 'সংরক্ষণমূলক বৈষম্যনীতি' জাতীয় সংহতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারূপ দেখা দিয়েছে। সংবিধানের ষোড়শ অংশে তিনটি অনগ্রসর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এই তিনটি সম্প্রদায় হোল তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং ইঙ্গভারতীয় সম্প্রদায়। এছাড়া সংরক্ষণের আওতায় রয়েছে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী। জাতিগঠন ও সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সকলকে সমান অংশীদার করার উদ্দেশ্যে দুর্বলতর শ্রেণীর উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য এই সংরক্ষণমূলক বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রবর্তনের প্রাক্কালে বলা হয়েছিল যে, বৈষম্যমূলক এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা দশ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। তারপর এই মেয়াদ দশ বছর করে বারে বারে বাড়ানো হয়েছে। পঞ্চাশ বছরের ওপর হয়ে গেল এই সংরক্ষণ নীতি চালু হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই অনুন্নত শ্রেণীর কাঙ্খিত মানোন্নয়ন ঘটেনি। একদিকে এদের ব্যাপক অংশ পশ্চাৎপদই রয়ে গেছে। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কিছু লোক এর সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। মাইরণ ভাইনার, রজনী কোঠারী প্রমুখ পন্ডিত এই মত পোষণ করেন যে, দেশের শাসক শ্রেণী সংরক্ষণের বিষয়টিকে রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। নির্বাচনী রাজনীতির কারণে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এই নীতি সমগ্র দেশেই সামাজিক বিরোধ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। গত শতাব্দীর সত্তর-এর দশক থেকে নব্বই-এর দশকের

গোড়া পর্যন্ত আমরা দেশব্যাপী সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলিও এই প্রশ্নে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে সুবিধাভোগী উঁচু জাতগুলির নিচু জাতের প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত মনোভাব এবং অন্যদিকে তীব্র বেকার সমস্যাজনিত উদ্বেগ ও আশঙ্কা এই সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন ঘটাতে সাহায্য করছে। এইভাবে দেখা যায় যে, সংরক্ষণমূলক বৈষম্যের পক্ষে ও বিপক্ষে সংঘটিত আন্দোলন ভারতের জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে।

৫.৪.৯ ভূমিপুত্র নীতি

বর্তমানে ভারতে শিক্ষিত বেকরের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন জনসম্প্রদায়ের রাজনীতিক কর্তৃত্ব কোন জনগোষ্ঠীর জীবনধারাগত স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন করার জন্য ভূমিপুত্র (Sons of the Soil) এর বিশেষাধিকারের মতবাদ গড়ে উঠেছে। ভারতের সংবিধানের ১৬(৩) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্লামেন্ট যে কোন অঙ্গরাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারী চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বসবাসগত যোগ্যতাকে অন্যতম শর্ত হিসেবে আরোপ করে আইন প্রণয়ন করতে পারে। এই আইন অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে ভূমিপুত্রের ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এর ভিত্তিতে 'অসম অসমীয়াদের জন্য' 'তামিলনাড়ু তামিলদের জন্য' প্রভৃতি জিগিরের সৃষ্টি হয়েছে। দেশব্যাপী এই শ্লোগান দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এই মতবাদ প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয়, একনাগরিকত্ব বা ভারতীয় নাগরিকত্বকে দুর্বল করে। স্বভাবতই ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি হীনবল হয়ে পড়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড ও সিকিমের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এই মতবাদকে উৎসাহিত করেছে। ভূমিপুত্রের মতবাদ অনুযায়ী বহিরাগতদের রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে অসমে আসু (AASU) ও গণ সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন এবং মহারাষ্ট্রে শিবসেনার বাঙালী বিতাড়ণ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার কাছাড়ের বাঙালীরা সেখানকার আদি অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিতাড়িত করার জন্য জঙ্গী আন্দোলন শুরু হয়েছে। ওড়িশায় মারওয়াড়ি বিতাড়নের আন্দোলন হয়েছে। ত্রিপুরায় বহিরাগতদের বিতাড়নের ডাক দিয়েছে। কর্ণাটক, মিজোরামেও এই আন্দোলন হয়েছে। এইভাবে দেখা যায় যে, ভূমিপুত্রের বিশেষাধিকারের ভিত্তিতে আন্দোলন ভারতের জাতীয় সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।

৫.৪.১০ অন্যান্য সমস্যা

উপরিউক্ত সমস্যাগুলি ছাড়াও কিছু সমস্যা আছে যা ভারতের জাতীয় সংহতির পথে বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে।ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তরপূর্বে ভারতে এবং জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গী আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত যুগিয়েছে এবং জাতীয় সংহতির প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে। ভারতের নতুন কৃষিনীতির ফলে এক নতুন প্রাধান্যবিস্তারকারী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে, যাকে রুডল্ফ দম্পতি 'বুলক ক্যাপিটালিস্ট' (Bullock Capatalist) বলে অভিহিত করেছেন।[১] এই শ্রেণী সিদ্ধান্তপ্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। এদের স্বার্থের সঙ্গে শিল্পপতি শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত দেখা দিয়েছে। এর ফলে আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভব এবং গ্রাম বনাম শহরের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে এবং জাতীয় সংহতি বিপন্ন হচ্ছে।

অনুশীলনী - ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। 'সংরক্ষণমূলক বৈষম্য' বলতে কী বোঝায়?

২। ভূমিপুত্র নীতি কী?

৩। ভাষাগত বৈচিত্র কী জাতীয় সংহতির পরিপন্থী? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। আঞ্চলিকতাবাদ কীভাবে ভারতের জাতীয় সংহতি বিপন্ন করছে?

২। জাপানের রাজনীতি কীভাবে জাতীয় সংহতির পরিপন্থীরূপে দেখা দিয়েছে?

৩। ভারতের জাতীয় সংহতির সমস্যাগুলি পর্যালোচনা কর।

৫.৫ জাতীয় সংহতির ভবিষ্যৎ

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি হোল ভারত ও ভারতবাসীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ। কিন্তু এই লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে কোন একক প্রচেষ্টায় তা সম্ভব নয়। কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর একক দায়িত্বও নয়। সকলের মিলিত প্রচেষ্টা এবং সদর্থক ও সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমেই জাতীয় সংহতি সাধনের প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলা সম্ভব। এর জন্য একদিকে যেমন সরকাররে সদর্থক ও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে, অপরদিকে তেমনি জনসাধারণের মনোভাব-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

৫.৫ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী শক্তিগুলির কার্যকলাপ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহরুকে বিশেষ চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। তাই তিনি ১৯৬১ সালে প্রথম জাতীয় সংহতি পরিষদ গঠন করে। এর দ্বারা ঐসব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির মনোভাব গড়ে তোলার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতাবাদ, জাতপাত প্রভৃতি সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ওপর জোর দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় সংহতি কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় সংহতি কমিটি ছাড়াও নেহরু রাজ্য সমূহের শিক্ষামন্ত্রীদের সুপারিশক্রমে আবেগপূর্ণ সংহতিসাধক কমিটি (Committee of Emotional Integration) নিয়োগ করেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে দন্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য এই কমিটি সুপারিশ করে। ভারত সরকার ১৯৬১ সালে একটি জাতীয় সংহতি সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলন রাজনৈতিক দল ও সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আচরণবিধি তৈরি করার সুপারিশ করা হয়েছিল।

জাতীয় সংহতি সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬১ সালে জাতীয় সংহতি পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদ রাজনৈতিক দল, সংবাদ মাধ্যম ও ছাত্রদের আচরণবিধি বেঁধে দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে জাতপাতগত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলেও এই পরিষদ কার্যত কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ১৯৭৭ সালে জনতা সরকারের আমলে এই পরিষদের পুনরুজ্জীবনের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। ১৯৮০ সালে মোরাদাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ও আসামে বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলে জাতীয় সংহতি পরিষদকে সক্রিয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 'ইন্দিরা গান্ধী' এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে শুরু করে। এর পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রধান মন্ত্রী এই জাতীয় সংহতি পরিষদের ইতিবাচক ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও বাস্তবে এর থেকে কোন সুফল পাওয়া যায়নি।

৫.৫.২ সমস্যা দূর করার উপায়সমূহ

ভারতের জাতীয় সংহতির সমস্যাগুলি পর্যালোচনা বোঝা যায় যে, যেহেতু জাতিগঠন প্রক্রিয়া এখনও পরিপূর্ণতা লাভ করেনি, তাই জাতীয় সংহতির লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। সংহতি-বিরোধী শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র পরিষদ ও কমিটি গঠন করে বা আইন প্রণয়ন করে এই সমস্যাগুলি দর করা সম্ভব নয়। অশুভ সক্তিগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জনসাধারণকে সচেতন হতে হবে। এ সম্পর্কে জাতীয় সংহতি কমিটির সুপারিশ উল্লেখ করা যেতে পারে।[১] জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারকে তাই শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে হবে। শিশু ও কিশোরদের মধ্যে নিজ নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে পর ধর্মের প্রতি মূল্যবোধ জাগ্রত করে তুলতে হবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও সম্প্রীদির চেতনা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালিত করতে হবে। ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে রক্ষা করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। আমরা ভারতবাসী এটাই হবে আমাদের একমাত্র পরিচয়। আমরা ভারতমাতার সন্তান, আমাদের ধমনীতে ভারতমাতার রক্ত প্রবাহিত- এই মনোভাব সকল ভারতবাসীর মধ্যে সঞ্চালিত করতে হবে। এর জন্য রাজনৈতিক দল, প্রচার মাধ্যম, নেতৃবর্গ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। প্রয়োজন হলে যে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির মোকাবিলা করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও খেলাধূলার বিকাশ ঘটিয়ে জনগণকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে হবে।

রজনী কোঠারীর মতে, কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ পরস্পর বিরোধী নয়। অতি মাত্রায় ক্ষমতায় কেন্দ্রীকরণ জাতীয় সংহতির পরিপন্থী রূপে দেখা দিতে পারে। তাই অনেকে মনে করেন যে, বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা জাতীয় সংহতির সহায়ক। বস্তুত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে ভাবতে পারে যে, জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় তারাও সমান অংশীদার, তার জন্য যতটা স্বাতন্ত্র্য দেওয়া প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিশেষে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সুসংহত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আর্থনীতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা হোল এক অপরিহার্য পদক্ষেপ। আর্থনীতিক উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক অসাম্য ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যের মোকাবিলা করা যায়। এর ফলে সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনার প্রশমন ও বিরোধের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়। তাই মানুষের আর্থ-সামাজিক সমাধানের জন্য সরকারকে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষিত বেকার ও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫.৬ সারসংক্ষেপ

ভারতের মতো বহুত্ববাদী দেশে জাতীয় সংহতির বিষয়টির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই জাতীয় সংহতি সাধন হল ভারতের জাতীয় লক্ষ্য। কিন্তু এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো একান্ত প্রয়োজন।[২] ভারতের জাতীয় নেতৃবর্গ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। জাতীয় সংহতি বিরোধী বিপজ্জনক শক্তিগুলি সম্পর্কে তাঁরা সচেতনও ছিলেন। কিন্তু মূল সমস্যাগুলি দূর করতে কার্যত ব্যর্থ হয়েছেন তাঁরা। কাগুজে সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলি যদি সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার না করে, রাজনীতিকে কেবল ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াই-এর ক্ষেত্রে পরিণত করে, তাহলে ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে। সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষিতে যেটা বিশেষ প্রয়োজন তা হোল রাজনৈতিক দল সমূহের বিশেষত - শাসক দল সমূহের সদিচ্ছা। অন্যথায় গুজরাটের মতো নারকীয় হত্যাকান্ড বারবার সংঘটিত হবে।

অনুশীলনী - ৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। ভারতের জাতীয় সংহতির ভবিষ্যৎ কী?

৫.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

জাতি-গঠন (Nation-building) ঃ

জাতি-গঠন হল একটি অতিদীর্ঘ জটিল ও প্রলম্বিত প্রক্রিয়া। এর দ্বারা সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে এক মৌলিক গুণগত পরিবর্তনকে বোঝানো হয়। সকল দেশেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি প্রবল আনুগত্য পরিলক্ষিত হয়। জাতিগঠনের জন্য এই সমস্ত সাবেকী আনুগত্যকে হীনবল করে এক জাতি তথা মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্য এবং এক রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

সাম্প্রদায়িকতা (Communalism) ঃ

সাম্প্রদায়িকতা হল এমন একটি মতামর্শ, বিশ্বাস ও দর্শন যার দ্বারা কোন সম্প্রদায় অন্যান্য ধর্মীয়, জাত-ভিত্তিক বা ভাষাগত সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে বা তাদের স্বার্থকে ক্ষুন্ন করেও নিজের সংকীর্ণ সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করতে চায় এবং উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বাস্তবতাকে বিকৃত করে মানুষের মনে ভ্রান্ত চেতনার জন্ম দেয়।

আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism) ঃ

আঞ্চলিকতাবাদ হোল রক্ত-সম্পর্ক, ধর্ম, জাতিকুল বা ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর সেই বিশেষ ধরণের চেতনা, যা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা ভূখন্ডকে একান্তভাবে নিজস্ব কর্মক্ষেত্র বলে বিবেচনা করে।

ভূমিপুত্র মতবাদ (Sons of the Soil Theory) ঃ

কোন অঞ্চলের আদি অধিবাসীরা দাবি করে যে, তাদের অধিকারকেই প্রাধান্য দিতে হবে। কেবল ভূমিপুত্ররাই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসী হিসেবে যাবতীয় সুযোগ সুবিধার অধিকারী হবে। বহিরাগতদের রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে।

সংরক্ষণমূলক বৈষম্য (Protective Discrimination) ঃ

এই নীতি হোল অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। বৃহত্তর সাম্যের স্বার্থে বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করা হয়। একে ইতিবাচক বৈষম্য (Positive discrimination) ও বলা হয়।

৫.৮ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ৫.২ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৫.৩ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ৫.৪ ও ৫.৪.১ দেখুন।

অনুশীলনী - ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। ৫.৪.৮ অনুচ্ছেদ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৫.৪.৯ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ৫.৪.৪ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর

১। অনুচ্ছেদ ৫.৪.২ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৫৪.৩ দেখুন।

৩। ৫.৪ অনুচ্ছেদের সকল অংশ দেখুন।

অনুশীলনী - ৩

১। অনুচ্ছেদ ৫.৫ এর সকল অংশ এবং ৫.৬ দেখুন।

৫.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay type Questions

1. Examine the problems and prospects of national integration in India.
2. What are the impediments to national integration in India? How can they be removed?

Short type Questions

1. What is meant by national integration in the Indian context?
2. Is India's linguistic diversity a real threat to national integration? Give reasons for your answer.
3. Do you think that national integration will continue to be an unattainable goal in India? Give reasons for your answer.

৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. S.L.Sikri, Indian Government and Politics, Kalyani Publishers, New Delhi, 1989
2. K.K. Ghai, Indian Government and Politics, Kalyani Publishers, New Delhi, 2002
3. Rakhahari Chatterjee (ed), Politics India : The State-Society Interface, South Asian Publishers, New Dhlhi,2001.
4. N.L.Chawla, 'Threats to National Integration', in Times of India, February, 21, 1980.

ভারতে অধিকার বিষয়ক রাজনীতি
(Politics of Rights in India)

চতুর্থ পত্র ঃ দ্বিতীয় অর্ধ

পর্যায় - ২

একক - ৬ □ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও রাজ্যের অধিকার (Federalism and the States' Rights)

গঠন —

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কী ?

৬.৩ ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৬.৩.১ প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব

৬.৩.২ গণপরিষদ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

৬.৪ ভারতের সাংবিধানিক কাঠামো ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

৬.৫ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক ঃ বিরোধের ক্ষেত্রসমূহ

৬.৫.১ আইন বিষয়ক সম্পর্ক

৬.৫.২ প্রশাসনিক সম্পর্ক

৬.৫.৩ আর্থিক সম্পর্ক

৬.৬ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও রাজ্যগুলির অধিকাররক্ষার রাজনীতিক দিক

৬.৭ সারকারিয়া কমিশনের প্রতিবেদন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

৬.৮ সারসংক্ষেপ

৬.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৬.১০ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৬.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী

৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৬.০ উদ্দেশ্য

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোন সুনির্দিষ্ট অনমনীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই দেখা যায় যে, ১৯৫০ থেকে ১৯৬৭ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত ভারতে 'আধিপত্যকারী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য খর্ব হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা 'প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রে' পরিণত হয়েছিল। এই সময়ে রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যের দাবী বিশেষ জোরদার হয়ে ওঠে। এরপর ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রে সর্বপ্রথম অ-কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতীয়

যুক্তরাষ্ট্র 'প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র' থেকে 'সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রে' পরিণত হয়। বর্তমানে এটা উপলব্ধি করা হয়েছে যে, ভারতের মতো বহু বিচিত্র সংস্কৃতির দেশে বহুস্তর বিশিষ্ট ও সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রই রাজ্যগুলির অধিকার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই এককটি পাঠ শেষ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যাবে ঃ

- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অর্থ কী ?
- ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ এব্যাপারে কী ভেবেছিলেন?
- সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কীরূপ প্রতিফলন ঘটেছিল?
- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কার্যগত রূপ কীরকম হয়েছে?
- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরোধের ক্ষেত্রসমূহ।
- সারকারিয়া কমিশনের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি।
- বহুসংস্কৃতিবাদী এবং বহুস্তর বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্যগুলির অধিকার রক্ষা।

৬.১ প্রস্তাবনা

ভারত হোল এক প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশ। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের মহিমায় ভাস্বর। বিভিন্ন জাতি, ভাষা, ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির মহামিলন ঘটেছে এই ভারতে। বস্তুতঃ ভারত হোল একটি বিরাট ও বহু বিচিত্র সংস্কৃতির উপমহাদেশ। ভৌগলিক গঠন, স্থানীয় ইতিহাস, ভাষা, ধর্ম, জাতিসত্তা, আর্থনীতিক উন্নয়নের স্তর ইত্যাদির ভিত্তিতে ভারতের জনমণ্ডলী বহু ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই প্রেক্ষিতে ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী বহুদলীয় ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে। এই বহুবিচিত্র সংস্কৃতির মধ্যে জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে ভারতরে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিভিন্ন জাত-গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার এক হাতিয়ার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে এশিয়ার যে তিনটি দেশে - ভারত, পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ায় - আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে একমাত্র ভারতেই এই ব্যবস্থা আপেক্ষিকভাবে কৃতকার্য হয়েছে। ১৯৬৫ সালে মালয়েশিয়া থেকে সিঙ্গাপুর বিচ্যুত হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন সময়ে সঙ্কট দেখা দিলেও গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে একদিকে বহুসংস্কৃতিবাদ ও রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা সম্ভব হয়েছে, অপর দিকে জাতীয় সংহতিও গড়ে উঠেছে। বস্তুতঃ ভারত একটি জাতি-রাষ্ট্র (nation-state) নয়, বহু স্তর বিশিষ্ট বহু সংস্কৃতিবাদী যুক্তরাষ্ট্র (multi-cultural federation)।[১]

৬.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কী ?

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একটি প্রাচীন ধারণা। প্রায় ৩২০০ বছর আগে ইসরাইলী উপজাতিদের মধ্যে প্রথম এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এই ধরণের ব্যবস্থা আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, গ্রীস এবং এশিয়ার

১. Harihar Bhattacharyya, India as a Multicultural Federation, 2001, Helbing and Lichtenhahn, Bale, P.2

অনেক উপজাতিদের মধ্যেও লক্ষ করা গিয়েছিল। রোমান পিরাবলিকও একধরণের 'রাষ্ট্র সমবায়' ছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে যে 'রাষ্ট্র সমবায়' গঠিত হয়েছিল তা ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলে ১৭৮৭ সালে প্রথম আধুনিক যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠে আমেরিকায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃত বৃদ্ধি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে। এমনকি ইউরোপেও বহুসংস্কৃতি ভিত্তিক সমাজের প্রয়োজনের তাগিদে জাতি রাষ্ট্র থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ইউরোপের পুনর্গঠনের ফলে ১৯৯০ এর দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধারণা বিশেষ গুরুত্ব পায়। বস্তুতঃ, বর্তমান যুগ হোল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পুনরুত্থানের যুগ। ড্যানিয়েল এলাজার (Daniel Elazar) যথার্থই বলেছেন যে, আধুনিক যুগ থেকে উত্তর-আধুনিক যুগে মানবসমাজের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণা এক অন্যতম রাজনীতিক শক্তিরূপে নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।[১]

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ' ফেডারাল' (Federal) বা 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ' ফোয়েডাস' থেকে এসেছে। এর অর্থ হোল চুক্তি (Covenant)। যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণাটি বাইবেল থেকে গড়ে উঠেছে। মূল ধারণাটি ছিল ধর্মীয়, যার দ্বারা ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সম্পর্কের কথা বোঝানো হোত। এই ধারণাটি মূল আকারে ছিল রাজনীতিক। তবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হবস, লক, রুশো, মঁতেস্কু ও ম্যাডিসন একে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক কৌশল হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। এ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্তক্য লক্ষ করা যায়। এলাজার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে এক অংশীদারী চুক্তি হিসেবে দেখেছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণার মধ্যে দু'টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নীতি জড়িত রয়েছে। এদু'টি হোল ঃ স্ব-সাশন এবং বন্টিত শাসন। রাইকার (Riker) এর মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হোল সংবিধানসঙ্গ ত ভাবে নির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থার স্তরকাঠামো, যেখানে স্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গ রাজ্য স্তরের সরকারের অস্তিত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট থাকে। মঁতেস্কুর ভাষায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হোল এমন একটি চক্তি, যার দ্বারা একই ধরণের কতকগুলি রাষ্ট্র একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের সদস্যপদ গ্রহণে সম্মত হয়। অধ্যাপক ডাইসি (Dicey)-র মতে, জাতীয় ঐক্য ও শক্তির সঙ্গে অঙ্গ রাজ্যগুলির অধিকারের সমন্বয়ের রাষ্ট্রনীতিক উপায়কে যুক্তরাষ্ট্র বলে। বস্তুতঃ রাষ্ট্রনীতিক নীতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হোল অংশগ্রহণকারী উপাদনগুলির মধ্যে সাংবিধানিক ক্ষমতা বন্টনের পদ্ধতি, যার দ্বারা একদিকে কিছু সাধারণ উদ্দেশ্যে ঐক্যের ইচ্ছা পূরণ হয়, অপরদিকে স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করা হয়।২

যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে গণতন্ত্র অপরিহার্যভাবে যুক্ত নয়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য গণতন্ত্র অপরিহার্য। কারণ গণতন্ত্রের মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বহুসংস্কৃতি-ভিত্তিক সমাজে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে। কোন দেশের কার্যগত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তার সামাজিক, রাজনীতিক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। ওয়াট্স (Watts) যথার্থই বলেছেন যে, কোন একটি পুরোপুরি বিশুদ্ধ আদর্শ

১. Quoted in Harihar Bhattacharyya, P. 9

2. Harihar Bhattacharyya, P. 11

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকতে পারে না, যা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বাস্তবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্নভাবে স্ব-শাসনের সঙ্গে বণ্টিত শাসনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গতিশীল শাসন ব্যবস্থা, স্থিতিশীল নয়। যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমাজ ও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে পরিবর্তিত হতে পারে, সেই যুক্তরাষ্ট্রই কৃতকার্য হতে পারে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রূপে গড়ে উঠেছে।

৬.৩ ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ভারত হোল একটি উপমহাদেশ। এর জনসংখ্যা বিপুল। বিভিন্ন অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক ঐতিহ্যগত এবং জীবনধারাগত তারতম্য ব্যাপক। এইরকম একটি বহুবিচিত্র সংস্কৃতির দেশে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই কারণে দেখা যায় যে, কোন সম্রাট বা রাজাই দীর্ঘদিন ধরে ভারতের ওপর তাঁদের শাসন বা নিয়ন্ত্রণকে কায়েম করতে পারেন নি। উদাহরণ হিসেবে মৌর্য সাম্রাজ্য, মুঘল সাম্রাজ্য প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ এককভাবে কোন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এরকম একটি দেশে সুশাসন কায়েম করা অসম্ভব ব্যাপার। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব তেমন বোঝা যায়নি। কারণ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে সকল অঞ্চলের মানুষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সামিল হয়েছিল। কিন্তু প্রাদেশিক রাজনীতিক নেতারা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ইংরেজরা ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নীতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এতে অতিমাত্রায় কেন্দ্র প্রবণতা ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর গণপরিষদের ওপর এই সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল। গণপরিষদের সদস্যগণ সমকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিশীল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নীতিকে গ্রহণ করেছিলেন।

৬.৩.১ প্রাক স্বাধীনতা পর্ব

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ঔপনিবেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ উভয়েরই দায় (Legacy) হিসেবে গড়ে উঠেছে। ভারতের মতো বিরাট ও বহু বিচিত্র সংস্কৃতির দেশে ব্রিটেনের এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার মডেল ব্যর্থ হয়েছিল। তাই প্রধানতঃ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা ইংরেজ শাসিত ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠনের প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। মরিস্ জোনস (Morris Jones) এর মতে, কানাডার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুকরণে এই আইন সুস্পষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধাঁচ নির্দিষ্ট করেছিল।[১] কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ছিল অতিমাত্রায় এককেন্দ্রিক। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঔপনিবেশিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাধানকে মেনে নিতে পারেনি; ভারতের জন্য উপযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠনের দাবী করেছিল। ১৯২০র দশক থেকে জাতীয় কংগ্রেস নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনীতিক সংগঠন হিসেবে পুনর্গঠিত করেছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারত গড়ে তোলার জন্য অধিকতর সচেষ্ট হয়েছিল। পরিশেষে স্বাধীন ভারতে সমাধানহীন এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমস্যার গণপরিষদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

১. Harihar Bhattacharyya, P. 16

৬.৩. ২ গণপরিষদ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা ভারতে যে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। তবে দেশীয় রাজ্যগুলি এই ব্যবস্থার সামিল হতে সম্মত হয়নি। ১৯৩৭ সালে এপ্রিল মাস থেকে প্রাদেশিক স্বতন্ত্র্যের নীতি প্রবর্তন করা হয়। এই নীতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে প্রাদেশিক নেতারা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের মূল্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ভারতের গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশই ছিলেন প্রাদেশিক নেতা। এই নেতারা প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্য ভোগের অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে গণপরিষদের সদস্যগণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিষয়টি আলোচনা করেছিলেন। ১৭৮৭ সালের ফিলাডেলফিয়া কনভেনশনে যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, গণপরিষদের বিতর্কে এ নিয়ে বিশেষ কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নি। প্রাদেশিক নেতারা প্রদেশগুলির জন্য আয়ের উৎস বাড়াবার পক্ষে দাবি তুলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সহমত পোষণ করেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই অর্থ সংগ্রহ করবে এবং তারপর তা অঙ্গরাজ্য গুলির মধ্যে বন্টন করবে। অস্টিন মন্তব্য করেছেন যে, এই ধরণের ব্যবস্থা কখনই রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যের অধিকার রক্ষা করতে পারে না। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এবং ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের প্রেক্ষিতে রাজ্যগুলির অধিকারের প্রশ্নটি গণপরিষদের সদস্যদের কাছে গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তবে নতুন রাজনীতিক ব্যবস্থায় রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেওয়া হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিষয়ক কমিটি এই অভিমত পোষণ করেছিল যে, একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, সেই সময় সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা, ক্ষমতা হস্তান্তর, আর্থনীতিক অস্থিতিশীলতা, খাদ্য, ত্রাণ, প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং জাতীয় সংহতি প্রভৃতি সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য গণপরিষদের সদস্যগণ শক্তিশালী কেন্দ্র গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা সব সময়ই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে এককেন্দ্রিকতার সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। নেহেরু বলেছিলেন যে, স্বাধীন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠন করা হবে; তবে যে কোন ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠিত হবে।[১] কিন্তু সংবিধান রচনাকালে রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করার কথা বলা হয়নি। ড: আম্বেদকর ভারতের সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলেই অভিহিত করেছেন ; কারণ এখানে দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার দ্বারা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করে।[২] তবে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ভারতের সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনমনীয় ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় 'মডেল' পরিহার করেছে। বস্তুতঃ ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোন সুনির্দিষ্ট নিশ্চল ধারণা নয়। তাই গণপরিষদের সদস্যগণ বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে এক নতুন রূপ দিয়েছেন। ভারতে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজন মেটাতে এবং পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরিবর্তনশীল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

---

১. Harihar Bhattacharyya, P. 16

২. G. Austin, 1966, The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation, Clarendon Press, Oxford P. 189

৬.৪ ভারতের সাংবিধানিক কাঠামো ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা গণপরিষদ (১৯৪৬-৪৯) কর্তক রচিত এবং ১৯৫০ সাল থেকে কার্যকর ভারতের সংবিধান হোল মৌলিক যুক্তরাষ্ট্রীয় দলিল। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং রাজ্য স্তরের নীচে অবস্থিত কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার উৎস হোল এই সংবিধান। ভারতের সংবিধানের ১(১) নং ধারায় ভারতকে 'রাজ্যসমূহের একটি ইউনিয়ন' (A Union of States) বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করা হলেও ভারতের সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতি ড. আম্বেদকর বলেছিলেন যে, যদিও গঠণগত দিক থেকে ভারতের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় তথাপি কয়েকটি যুক্তির ভিত্তিতে কমিটি, 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটির পরিবর্তে 'রাজ্য সমূহের একটি ইউনিয়ন' কথাগুলি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করেছে। প্রথমতঃ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কোন অধিকার রাজ্যগুলির নেই।[২] আম্বেদকর গণপরিষদে বলেছিলেন যে, ভারতের সংবিধানে রাজ্যগুলি কোনভাবেই কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল নয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই 'রাজ্যগুলির ইউনিয়ন' শব্দদুটি ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াটস্ (Watts) বলেছেন যে, ভারতের মতো নতুন যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশের সংবিধান রচয়িতাগণ তত্ত্বগত যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণাকে পরিহার করে বাস্তব দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; তাই স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনশীলতার স্বার্থে রাজ্যসরকারের স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩]

ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ বৈশিষ্টগুলি লক্ষ করা যায়। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন, আপেক্ষিকভাবে, অনমনীয় সংবিধান, সংবিধানের অভিভাবকরূপে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা - এগুলি হোল যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। ভারতের সংবিধানে এগুলির অস্তিত্ব আছে। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই শাসনব্যবস্থা গঠনে সংসদীয় গণতন্ত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ভারতের নাগরিকরা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই কর্তৃত্বের অধীন। রাজ্য সরকারগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নির্বাচিত এবং আইনবিভাগীয় ও শাসনবিভাগীয় কার্যের ক্ষেত্রে আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের 'এজেন্টে ' পরিণত হয়নি। ভারতের সংবিধানে তিনটি তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে আইনবিষয়ক ক্ষমতা বন্টন করা হয়েছে। এই সংবিধানে প্রশাসনিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতাও বন্টন করা হয়েছে।

ভারতের সংবিধানের মধ্যে সমবায়ী যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়। নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া ও কেন্দ্র রাজ্য উভয়েরই যৌথ দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্র আছে, যেখানে উভয়েরই পরামর্শ ও সহযোগিতা আবশ্যিক। যে-সব বিষয়ে আইনবিষয়ক দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে বন্টন করা হয়েছে সেখানেও প্রশাসনিক ও আর্থিক দিক থেকে সহযোগিতা বজায় রাখার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা আছে। এছাড়া সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে

২. D.D. Basu, (1997), Introduction to the Constitution of India, Prentice Hall, New Delhi, P.50

৩. Harihar Bhattacharyya, P. 112

রাজ্যপালদের সম্মেলন, মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন, আন্তঃরাজ্য পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ প্রভৃতির কথা বলা যায়। এইভাবে অঙ্গরাজ্যগুলিকে শুধু সিদ্ধান্ত রূপায়নই নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে আলাপ আলোচনার সৃষ্টি হয়। এই দিক থেকে ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Cooperative Federalism) বলা যেতে পারে। ভারতের সংবিধানে আন্তঃরাজ্য সহযোগিতার ব্যবস্থা রেখে রাজ্যগুলির আপেক্ষিক সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে আন্তঃরাজ্য সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বর্ধিত করার জন্য আন্তঃরাজ্য পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, উত্তরপূর্ব পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলা হয়েছে। ২৬১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কেন্দ্র ও প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সকল সরকারী আইন, দলিল ও বিচারবিভাগীয় কার্যবিবরণীকে সমগ্র ভারতীয় অঞ্চলে সমান মর্যাদা দেওয়া হবে। এই সব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠিত রাজ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা সম্ভব হয়েছে, আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতের সংবিধানে ৩ ও ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজ্যগুলির সীমানা ও নাম পরিবর্তন করতে পারে। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ দু'টিকে অযুক্তরাষ্ট্রীয় বলে সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতে রাজ্যগুলির অবস্থান সংক্রান্ত ধারণা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি; কারণ বহু সংস্কৃতির কাঠামোর প্রেক্ষিতে এটা প্রয়োজন ছিল। এই অনুচ্ছেদ দু'টি না থাকলে উপজাতীয় ও জাতি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হোত না। বস্তুতঃ, রাজ্যগুলির অধিকার রক্ষা অপেক্ষা রাজনীতিক গতিশীলতা বেশী গুরুত্বপূর্ণ; তাই সংবিধানে এধরণের অনুচ্ছেদ রাখা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট রাজ্য গঠনের কথা বলা হয়েছে। উপজাতীয় ও জাতিগত দ্বন্দ্বের মীমাংসায় এদের ভূমিকা রয়েছে। বস্তুতঃ, এই অনুচ্ছেদ দু'টি রাজ্যগুলির বিষয়টিকে নমনীয় রেখে দেশের ঐক্য বর্ধিত করেছে, দুর্বল করেনি। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির অধিকার রক্ষার সাংবিধানিক ব্যবস্থা দেশের গতিশীল রাজনীতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে।

ভারতের বিচারালয়ও বিভিন্ন মামলার রায়ে সংবিধানের ব্যাখ্যা করেছে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতাকে সমর্থন করেছে। ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতীর মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করেছে যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হোল সংবিধানের মৌল কাঠামোর একটি অন্যতম অঙ্গ এবং সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করা যাবে না। অতীতেও ভারতের কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষেই রায় দিয়েছে। ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ বনাম কেন্দ্রীয় সরকারের মামলায় বিচারপতি সুব্বা রাও বলেছন যে, ভারতের সংবিধান 'যুক্তরাষ্ট্র' ধারণাটি গ্রহণকরেছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করেছে।

অনুশীলনী —১

★ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ★

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

২। বহু সংস্কৃতি-ভিত্তিক সমাজের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কী ?

৩। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে গণপরিষদের সদস্যদের কী অভিপ্রায় ছিল?

৪। ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে কী ধরণের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে?

৬.৫ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক ঃ বিরোধের ক্ষেত্রসমূহ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার এক অন্যতম অপহার্য বৈশিষ্ট্য হোল কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ। ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রবর্তন করে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ব্যবস্থা করেছেন। গণপরিষদে ড. আম্বেদকর বলেছেন যে, ভারতের সংবিধান দ্বৈত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির হাতে পৃথক পৃথক ক্ষমতা অর্পণ করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে এবং তাদের ক্ষমতার উৎস হোল সংবিধান। তবে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতি এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই প্রেক্ষিতে ক্ষমতা বন্টনের নীতির ভিত্তিতে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি নির্ধারণের প্রশ্নে যে মতবিরোধ গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা এখনও পর্যন্ত চলছে। বস্তুতঃ আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিকাশের সঙ্গে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়েও পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে। এর ফলে ভারতে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের বিষয়টি একটি গতিশীল বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

৬.৫.১ আইন বিষয়ক সম্পর্ক

বিশ্বের অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতেও দু'টি দিক থেকে ক্ষমতা বন্টিত হয়েছে, যথা - (১) ভূখণ্ডগত ক্ষেত্রে ক্ষমতার বন্টন এবং (২) বিষয় (Subject) সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ক্ষমতার বন্টন। ভূখণ্ডগত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, পার্লামেন্ট সমগ্র দেশ বা তার যে-কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করার অধিকারী।[১] কিন্তু একটি রাজ্য-আইনসভা সমগ্র রাজ্যের জন্য বা রাজ্যের কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে।[২] ভারতের সংবিধানের একাদশ অংশ এবং সপ্তম তফসিলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইনবিষয়ক ক্ষমতার বন্টন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে সুনির্দিষ্ট

১. ২৪৫ (১) নং ধারা।

২. ২৪৫ (১) নং ধারা।

বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা অর্পণ করে অবশিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব অঙ্গরাজ্যগুলিকে প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে কানাডার সংবিধানে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র তালিকা ও রাজ্য তালিকা নামে দু'টি তালিকা মাধ্যমে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্য-আইসভাগুলির ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে অর্পিত হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে ভারত এককভাবে কোন দেশের পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। তবে এ ব্যাপারে কানাডীয় পদ্ধতি এবং ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের আইনের প্রভাব অনস্বীকার্য।

বস্তুতঃ, ১৯৩৫ সালের'ভারত শাসন আইন' কে অনুসরণ করে তিনটি তালিকার কথা ভারতের সংবিধানের সপ্তম তফসিলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই তিনটি তালিকা হোল কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। এই তিনটি তালিকার মাধ্যমে যথাসম্ভব বিস্তারিত ভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলিতে কেন্দ্র এককভাবে আইন প্রণয়নের অধিকারী।[১] রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলিতে সাধারণভাবে রাজ্য আইনসভা আইনপ্রণয়নের অধিকারী হলেও বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্র এই তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।[২] যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলি যৌথভাবে আইন প্রণয়নের অধিকারী হলেও কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে রাজ্য-আইনের বিরোধ বাধলে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ থাকবে।[৩] এই তিনটি তালিকা বহির্ভুত যাবতীয় অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে অর্পিত হয়েছে।[৪] এক্ষেত্রে কিছুটা কানাডার সংবিধানকে অনুসরণ করা হয়েছে।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আইন বিষয়ক ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে তত্ত্বগতভাবে মনে হতে পারে যে, রাজ্যগুলির অধিকার খর্ব করে কেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধিত করা হয়েছে। অধিক সংখ্যক এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ক্ষমতা সমূহও কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়গুলিতেও কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করতে পারে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রেরই প্রাধান্য থাকে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ তাত্ত্বিক ধারণা গ্রহণ না করে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। তাই তাঁরা স্থায়িত্ব ও গতিশীলতা উভয়েরই স্বার্থে এবং সমগ্র দেশের প্রেক্ষিতে রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যের ওপর কিছু কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রেখেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন ব্যবস্থা অত্যন্ত বিশদভাবে আছে। সুতরাং কেন্দ্রের ওপর ন্যস্ত অবশিষ্ট ক্ষমতার বিষয়টি গুরুত্বহীন। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে পূর্বের সার্বভৌম রাজ্যগুলির সমষ্টিকরণের ফলে। তাই ঐ সব দেশে অবশিষ্ট ক্ষমতা রাজ্যগুলির ওপর অর্পিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কেন্দ্রপ্রবন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সমষ্টিকরণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। ভারতে রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রের কারণ নয়, এর ফল। তাই এখানে অবশিষ্ট বিষয়গুলি কেন্দ্রের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এসব থেকে মনে করার কোন কারণ নেই যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির কেন্দ্রের এজেন্টে পরিণত হয়েছে। রাজ্যগুলির আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সংবিধান ও রাজনীতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

---

৩. ২৪৬ নং ধারা।

১. ২৪৯,২৫০,২৫২,২৫৩ নং ধারা।

২. ২৫৪ নং ধারা।

৩. ২৪৮ নং ধারা।

৬.৫.২ প্রশাসনিক সম্পর্ক

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হোল কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে প্রশাসনিক সম্পর্কের সমন্বয় সাধন করা। তাই ভারতের সংবিধানের একাদশ অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে শাসনবিষয়ক সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সাধারণভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির শাসনবিষয়ক ক্ষমতা আইন বিষয়ক ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংবিধানের প্রশাসনিক সম্পর্ক বিষয়ক অনুচ্ছেদগুলি (২৫৬-২৬৩) পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, কেন্দ্র-রাজ্য প্রশাসনিক সম্পর্কের মুখ্য উদ্দেশ্য হোল তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা। তবে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার নামে রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য কিছুটা খর্ব হয়েছে বলে মনে করা হয়। ২৫৬ ও ২৫৭ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কেন্দ্র জাতীয় স্বার্থের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। এছাড়া ৩৩৯(২) ধারা অনুযায়ী তফসিলী উপজাতিগুলির জন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং ৩৫০(ক) ধারা অনুযায়ী সংখ্যালঘু ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের সন্তান সন্ততিদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিতে পারে। ৩৬৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কোন অঙ্গরাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিদের্শ অমান্য করলে বা মানতে ব্যর্থ হলে, সেই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার আদেশ নির্দেশের মাধ্যমে রাজ্যের প্রশাসনিক এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করতে এবং রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন করতে পারে বলে সমালোচনা করা হয়।

ভারত হোল এক বৃহদায়তন বিশিষ্ট সমস্যাসঙ্কুল দেশ। এখানে বহু ভাষাভাষী ও বহু ধর্মাবলম্বী মানষের বাস। ভারতের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এখানে সতত সক্রিয়। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যগুলির ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। সংবিধানের ২৫৮ ধারার মাধ্যমে ভারতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যরে মধ্যে নিরন্তর সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাকে সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী-উপত্যকাগুলিকে নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব পার্লামেন্টের হাতে প্রদান করা হয়েছে,[১] ২৬৩ নং ধারায় আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠনের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য কিংবা রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির ওপর গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সংবিধানের ৩১২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, পার্লামেন্ট সর্বভারতীয় কৃত্যক গঠন করতে পারে। ঐসব সর্বভারতীয় প্রশাসনিক ও পুলিশ কর্মচারী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের দ্বারা নির্বাচিত এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা যেরাজ্য সরকারের কার্যে নিযুক্ত থাকেন, সেই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বেতন, ভাতা ইত্যাদি লাভ করেন। তাঁদের চাকরির শর্তাদি ও বেতনক্রম কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করেন। ড: আম্বেদকর ঐসব সরকারী কর্মচারীর পদকে কৌশলগত পদ বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে

১. ২৬২ নং ধারা

তাঁরা রাজ্য সরকারের কার্যাবলী সংবিধান বিরোধী কিংবা জাতীয় নীতির পরিপন্থী কিনা সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখেন। সমগ্র ভারতে একই ধরণের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রয়োগের জন্য সর্বভারতীয় চাকরির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া রাজ্যসভার প্রস্তাবক্রমে সর্বভারতীয় চাকরি সৃষ্টি করা হয়। এই রাজ্য সভায় সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধি থাকেন। সুতরাং সর্বভারতীয় চাকরির সৃষ্টি ভারতের সমবায়ী যুক্তরাষ্ট্রের পরিপন্থী নয়।

কোন রাজ্যের রাজ্যপাল হলেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন এবং তাঁর কার্যকাল নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির তথা কেন্দ্রের সন্তুষ্টির ওপর।[২] তিনি একদিকে যেমন রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে কাজ করেন, অপরদিকে কেন্দ্রের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। যদিও রাজ্যপালের ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্র রাজ্যের বিরোধের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রশাসন সম্পর্কে কেন্দ্রকে ওয়াকিবহাল করেন এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যোগ সূত্র রচনা করেন।

সংবিধান অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কিন্তু সংবিধানের ৩৫৫ নং ধারায় রাজ্যসমূহকে বহিরাক্রমণ ও অভ্যন্তরীন গোলযোগ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কোন রাজ্যে যখন আইন শৃঙ্খলার গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয় তখনই সেখানে কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত বাহিনী প্রেরণ করা হয়। অনেক সময় দেখা গেছে যে, কেন্দ্র-বিরোধী দল পরিচালিত রাজ্য সরকারকেও প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী প্রেরণের জন্য আবেদন করতে হয়েছে।[৩] সুতরাং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সাংবিধানিক ধারা সাময়িকভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা সৃষ্টি করলেও প্রকৃতপক্ষে রাজ্যগুলির স্বার্থই রক্ষা করে।

এভাবে দেখা যায় যে, কেন্দ্র-রাজ্য প্রশাসনিক সম্পর্ক নিয়ে যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার আদেশ নির্দেশের মাধ্যমে রাজ্যের প্রশাসনিক এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করতে পারে বলে মনে হয়; কিন্তু ২৫৮, ২৬৩ প্রমুখ অনুচ্ছেদের প্রধান উদ্দেশ্য হোল কেন্দ্র-রাজ্যের সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করা। বস্তুতঃ যুক্তরাষ্ট্র নিছক একটি অনড় প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হোল যৌথ বা সমবায়িক ক্রিয়াকলাপের একটি কার্যগত ব্যবস্থা। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, ২৫৮, ২৬২,২৬৩ প্রমুখ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সংবিধানের কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যপকভাবে সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৬.৫.৩ কেন্দ্র-রাজ্যের আর্থিক সম্পর্ক

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক বন্টন ব্যবস্থার ওপর রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। কেন্দ্র ও রাজ্যের হাতে রাজস্ব সম্পর্কিত এমন ক্ষমতা থাকা উচিত যা তাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পালনের পক্ষে পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়, যা তাদের স্বাধিকার রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট বলে পরিগণিত হয় এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। তবে মনে রাখার প্রয়োজন যে,

২. ১৫৫ ও ১৫৬ নং ধারা

৩. ১৯৮০ সালে ত্রিপুরার ঘটনা বলা যেতে পারে।

রাজস্ব বন্টনের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণই একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর সঙ্গে প্রশাসনিক সুবিধার দিকটিও বিচার-বিবেচনা করা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাধারণতঃ রাজস্ব সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে পৃথক করে দেওয়া হয়। কিন্তু কেবল স্বকীয় রাজস্বের উৎস থেকে রাজ্যগুলির পক্ষে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। সকল রাজ্যই যাতে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে তার জন্য কেন্দ্রের দিক থেকে রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য বা অনুদানের ব্যবস্থা করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাতেই কেন্দ্র কর্তৃক অঙ্গ রাজ্যগুলিকে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও তার ব্যতিক্রম নয়।

ভারতের সংবিধানের দ্বাদশ অংশে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিস্তারিতভাবে অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। তবে ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ কেন্দ্র ও রাজ্য সমূহের মধ্যে রাজস্ব বন্টন করতে গিয়ে প্রধানতঃ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে ভিত্তি হিসেবে ধরলেও ঐ আইনের দোষত্রুটিগুলিকে পরিহার করার চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক সংবিধানের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আছে। ভারতের সংবিধানে একদিকে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজস্ব বিষয়ক এক্তিয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারকে অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কেন্দ্র-রাজ্যের আর্থিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতেও অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রাজস্বের উৎস কেন্দ্রের ওপর ন্যস্ত। রাজ্যের তুলনায় কেন্দ্রের আয়ের উৎসগুলি স্থিতিস্থাপক।[১] রাজ্যের হাতে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যয় সংক্রান্ত ক্ষমতাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিই দায়ী, তাই তাদের সাংবিধানিক ব্যয় সংক্রান্ত ক্ষমতা অনেক বেশী।[২] পলএপেল্‌বি (Paul Apple by) বলেছেন যে, ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি হোল এমন যে, অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি রাজ্য সরকারগুলির ওপর ন্যস্ত। এর ফলে, কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রই রাজ্যগুলির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতেও রাজ্যগুলির রাজস্ব ঘাটতি পূরণ এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সাধারণ অনুদানের সাহায্যে কেন্দ্র বিভিন্ন রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সমতা আনয়ন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া রাজ্যের তফসিলী উপজাতিদের কল্যাণ সাধনের জন্য অথবা তফসিলী উপজাতি অঞ্চলে প্রশাসনের মান উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনসহ রাজ্য সরকার যদি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে তবে কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট বা বিশেষ অনুদান প্রদান করতে পারে।[৩] ২৮২ নং ধারায় কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্য সরকারকে জনস্বার্থে অনুদান ও ঋণ প্রদানর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই প্রকার অনুদানকে স্ববিবেচনামূলক অনুদান ও ঋণ নামে অভিহিত করা হয়। এই অনুদান ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে মন্তব্য করা হয়।

---

১. Sarda Rath, Federalism Today, 1984, Sterling Publishers, New Delhi, P. 44

২. Harihar Bhattacheryya, P. 117

৩. ২৭৫ নং ধারা।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, সব যুক্তরাষ্ট্রেই এই ধরণের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। দেশের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে আর্থিক ক্ষেত্রে কিছুটা কেন্দ্রীয় কর্তৃক ও নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে নিতেই হবে। বস্তুতঃ ভারতের উন্নয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে রাজ্যগুলিরই দায়িত্ব থাকে। রজনী কোঠারীর মতে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একদিকে যেমন কেন্দ্রর ওপর অধিক আয়ের উৎস ও ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে, অপরদিকে রাজ্যগুলিকেও শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমতা ও সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।[১]

৬.৬ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রাজনীতিক দিক

কোন যুক্তরাষ্ট্রই পুরোপুরি সংবিধান অনুযায়ী কার্যকর হয় না। বিভিন্ন রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যা অনেক ক্ষেত্রে মূল সংবিধানে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে ওঠে। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ভারতের শাসন ব্যবস্থায় সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে লঙঘন করে প্রাধান্য বিস্তারকারী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়েছিল; পারস্পরিক নির্ভরশীলতার পরিবর্তে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল সারা দেশে আধিপত্যশীল দলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার জন্য। কিন্তু ঐ সময়ে কেন্দ্রাতিগ (centrifugul) শক্তিগুলির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। বিধান চন্দ্র রায়, জি.বি. পান্ত, কামরাজ প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের সঙ্গে দর কষাকষি করে রাজ্যের অধিকার রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়া ১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য আন্দোলন ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির অধিকারকে প্রাধান্য দিয়েছে। ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রকে ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিকতাবাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতে আধিপত্যশীল দলীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটেছিল। এরপর থেকে দলীয় ব্যবস্থা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বহুদলীয় ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে। অঙ্গরাজ্যগুলি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের জন্য দাবি উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে ভারতীয় রাজনীতিতে রাজ্য ও অঞ্চলগুলিতে ক্রমবর্ধমান স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার রাজনীতিক চরিত্র মরিস্ জোনস্ (Morris Jones) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দরকষাকষি' রূপে অভিহিত করেছেন।[২] ১৯৬০ এর দশকে ভারতের যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এবং রাজ্যগুলির পক্ষে ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তন বলে মনে করেছেন তিনি। মারকাস্ ফ্রান্ডা (Marcus Franda)ও মনে করেছেন যে, সামগ্রিকভাবে কেন্দ্র অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকারকে সম্মান দেয়।[৩] গ্রেনভিল অস্টিন (Granville Austin) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাস্তব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, ভারত এক 'সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র'।[৪] তাঁর মতে, ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী

১. Quoted in Harihar Bhattarchyya. PP. 24-25
২. Morris Jones W.H., The Government and Politics of India, 1964, London, P. 132
৩. Marcus Franda, West Bengal and The Federalisin Process in India, 1968, Princeton University Press, Princeton.
৪. Austin, G. The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation 1966, The Clarendon Press, Oxford, PP. 186-187

হোলেও রাজ্য সরকারগুলি দুর্বল নয়। সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য স্বীকৃত হোলেও অঙ্গরাজ্য সমূহকে কেন্দ্রের প্রশাসনিক এলাকয় পরিণত করা হয় না। কেন্দ্র ও রাজ্য পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন একটা অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়, যেখানে পরস্পরের মধ্যে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব। ভারতে এই ধরণের সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।

১৯৬০ -এর দশকের শেষ থেকে ১৯৭০ এর দশকের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির পর্বটি একদিকে ছিল রাজ্যগুলির অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অধ্যায়, অপরদিকে তা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের পক্ষে সঙ্কটজনক হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই সঙ্কট ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট হয় নি। সমকালীন সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এই সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়, ১৯৬৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের বিভাজন, ১৯৭০-র দশকের প্রারম্ভিক পর্বে বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গে চরম বামপন্থী আন্দোলন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সংহিস দমন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই পর্ব অতিক্রান্ত হয়েছিল। অবশেষে এই পর্ব শেষ হয়েছিল ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ১৮ মাস ধরে জরুরী অবস্থা জারীর মধ্য দিয়ে। এই পর্বে কেন্দ্রপ্রবণতা ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। কোঠারীর মতে, এই পর্বটি ছিল 'প্রাতিষ্ঠানিক বিশৃঙ্খলা' (institutional disorder) র পর্ব, মরিস জোনস্ একে হ্রাসমান প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণ (diminishing institutionalization) বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৭৭ সালে জরুরী অবস্থার শেষ এবং গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নতুন রূপ, বৈধতা ও সামর্থ্য লাভ করে।

জরুরী অবস্থা-উত্তর পর্বে (১৯৮০-র দশকের পর থেকে) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ইতিবাচক দিকের ওপর আলোকপাত করেন বিভিন্ন গবেষক ও চিন্তাবিদ। কে. আর. বোম্বওয়াল (K. R. Bombwall) জাতিসত্তার দিক থেকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রক্রিয়াগত পরিবর্তনশীলতা আছে এবং এর দ্বারা জাতিগোষ্ঠীগত ও আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের মধ্যে সমঝোতা সম্ভব হয়েছে। রুডল্ফ ও রুডল্ফ (Rudolph and Rudolph) ১৯৮৭ সালে রচিত 'ইন পারস্যুট অব্ লক্ষ্মী' (in Pursuit of Lakshmi) গ্রন্থের মধ্যে দেখিয়েছেন যে, ভারতের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুতঃ, ১৯৮০ -এর দশক থেকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একদিকে যেমন রাজ্যগুলির অধিকারের দাবি তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আঞ্চলিক ও স্থানীয় পরিচিতি ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রাধান্য পেয়েছে। মার্কসবাদী নেতা ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ (E. M.S. Nambudripad) আঞ্চলিকতাবাদের মধ্যে অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকার রক্ষা সম্ভব হচ্ছে বলে মনে করেন। রজনী কোঠারী ভারতের বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে তিন ধরণের আন্দোলন চিহ্নিত করেছেনঃ (১) ভারতীয় সমাজের সনাতন বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বেচ্ছাধীনতা (Voluntarism) নতুনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে; (২) ক্ষমতা ও সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের দাবি কেবল রাজ্যের স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে নি, নিম্নস্তরেও প্রাধান্য পেয়েছে; (৩) নৃকুলগত পরিচিতির উত্থানের মাধ্যমে নতুন রাজ্যের দাবি উপস্থাপিত হচ্ছে। এই দিকগুলির বিকাশকে ভারতের অধিকতর যুক্তরাষ্ট্রীয় ও গণতান্ত্রিক রূপের প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন। [১]

---

১. Harihar Bhattacharyya, P. 33

১৯৯০ -এর দশকে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে তিনটি স্তর স্বীকৃতি পেয়েছেঃ কেন্দ্র, রাজ্য ও আঞ্চলিক। রাজ্যস্তরের নীচে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ তম ও ৭৪ তম সংবিধান (সংশোধনী) আইন (১৯৯২) এর মাধ্যমে আঞ্চলিক গ্রামীণ ও পৌর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তৃতীয় স্তরের ওপর নতুন চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। সুব্রত কুমার মিত্র তাঁর 'দ্য নেশন, স্টেট এ্যাণ্ড দ্য ফেডারেল প্রসেস ইন ইন্ডিয়া' (The Nation, State and the Fedeal Process in India) গ্রন্থের মধ্যে নয়া প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কার্যকরী রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে রাজ্যস্তরের নীচে তৃতীয় স্তরে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উল্লম্বভিত্তিক বিকাশ ঘটেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এই নতুন ও বাস্তব রূপ ভারতের শাসনব্যবস্থাকে বিভিন্ন সঙ্কটের মধ্যেও আপেক্ষিক শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব প্রদান করেছে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এই নতুন রূপকে অনেকে 'বহুস্তর বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র' বলে অভিহিত করেছেন।

অনুশীলনী — ২

★ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ★

১। কেন্দ্র-রাজ্য আইন বিষয়ক সম্পর্ক কি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে খর্ব করেছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২। কেন্দ্র-রাজ্য প্রশাসনিক সম্পর্ক কি সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রের পরিপন্থীরূপে দেখা দিয়েছে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

৩। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ওপর কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের প্রভাব কীরূপ?

৪। কোন দিক থেকে ভারতকে 'বহুস্তর বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র' বলা যেতে পারে?

★ রচনাত্মক প্রশ্ন ★

১। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের আলোকে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

৬.৭ সারকারিয়া কমিশনের প্রতিবেদন

১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পরে বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্র বিরোধী দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ সংগঠিত রূপ ধারণ করেছিল। তবে রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস দল ক্ষমতাসীন থাকার সময় কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ বাধেনি এমন নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানচন্দ্র রায় এবং অন্ধ্রপ্রদেশে নিলম সঞ্জীব রেড্ডী মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তা দলীয় নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়েছে। ১৯৬৭ সাল থেকে কেন্দ্র বিরোধী রাজ্যগুলি অধিক ক্ষমতার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবি জোরদার আকার ধারণ করে। এই দাবি ক্রমশ সংগঠিত ও দৃঢ় রূপ ধারণ

করে। এই দাবির কাছে নতি স্বীকার করে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮৩ সালের ২৪শে মার্চ সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি আর. এস. সারকারিয়া (R. S. Sarkaria) এর নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন সারকারিয়া কমিশন (Sarkaria Commission) নামে পরিচিত। সারকারিয়া কমিশন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের কার্যগত দিকটি পর্যালোচনা করে এবং ১৯৮৭ সালের শেষ দিকে ভারত সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন পেশ করে।

সারকারিয়া কমিশন বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ করেছে। তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

(১) সারকারিয়া কমিশন শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে কেন্দ্রের ক্ষমতা খর্ব করার দাবির বিরোধিতা করেছে কমিশন।১ কমিশনের মতে, সংবিধানের মৌল প্রকৃতির পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই, ভারতের মতো বহুত্ববাদী সমাজে বিভিন্ন সঙ্কটের মোকাবিলায় সংবিধান যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করেছে। তবে কমিশন অযৌক্তিকভাবে কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধ করার গুরুত্ব স্বীকার করেছে।

(২) সংবিধানের ২৪৬ নং ধারা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা কমিশন স্বীকার করেনি। তবে কমিশনের মতে, রাজ্যগুলির অধিকার রক্ষার জন্য সংবিধানের কিছু কিছু অংশের পরিবর্তন আবশ্যক। সংবিধানের ২৫০ নং ধারা অনুসারে জরুরী অবস্থার সময়েও রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে রাজ্যগুলির আইন প্রণয়নের অধিকার থাকবে বলে কমিশন সুপারিশ করেছে। সুপারিশ করা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত ৯৭ নং বিষয়টি সংশোধন করা দরকার। এই বিষয়টি হোল ঃ রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন অবশিষ্টাংশ বিষয়। সংশোধনের মাধ্যমে এই অবশিষ্টাংশকে যুগ্ম তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। তবে কমিশন অর্থ সংক্রান্ত বিষয়কে এই সংশোধনের আওতা থেকে বাদ দিয়েছে। রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ৫ নং বিষয়টির সংশোধন প্রয়োজন বলে কমিশন সুপারিশ করেছে। এই সংশোধনের উদ্দেশ্য হোল স্থানীয় সংস্থাগুলি যাতে যথাযথ ভাবে কাজ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা। এরজন্য সংসদকে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কমিশনের মতে, কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের বর্তমান কোন পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন নেই; তবে কোম্পানী করের একাংশ রাজ্যের হাতে অর্পণ করা সমীচীন। কৃষি আয়ের ওপর করের বিষয়টিকে একটি স্পর্শকাতর বিষয় বলে বর্ণনা করে কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন পর্ষদে গভীর ও সামগ্রিকভাবে বিচার বিবেচনার প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে।

(৩) সারকারিয়া কমিশন একটি 'সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র' গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অধিকরতর সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশন সংবিধানের ২৬৩ নং ধারা অনুসারে আন্তঃরাজ্য পরিষদের পরিবর্তে আন্তঃসরকারী পরিষদ গঠনের সুপারিশ করেছে। এর গঠন ও কার্যাবলীর সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ হোল - পরিষদের একটি সাধারণ সভা, একটি স্থায়ী কমিটি এবং একটি সবিচালয় থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন সাধারণ সভার সভাপতি। তিনি ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

---

১. "We absolutely need to have a strong centre and there is no doubt about it. Without that everything will wither away." - Quoted in K. K. Ghai, Indian Government and Politics, 2002, Kaly□□i Publishers, New Delhi, P. 319.

এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের দেখাশোনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের নিয়ে সাধারণ সভা গঠিত হবে। বছরে অন্ততঃ দুবার সভার অধিবেশন বসবে। অন্তঃ সরকারী পরিষদের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য যে-স্থায়ী কমিটি গঠিত হবে, তার সভাপতি হবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছাড়া ৬ জন মুখ্যমন্ত্রী (প্রতি অঞ্চল থেকে একজন করে প্রতি বছর মনোনীত হবে) এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ৬ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী থাকবেন এই কমিটিতে। সভা বা তার স্থায়ী কমিটি বিশেষ বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য একটি উপ কমিটি গঠন করতে পারে। পরিষদ সাধারণভাবে রাজনীতিক ও প্রশাসনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার অধিকারী।

(৪) 'সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র' গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র ওরাজ্যের মধ্যে অধিকতর আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে কমিশন। কমিশনের মতে, জাতীয় অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন পর্ষদকে হতে হবে এমন এক মঞ্চ, যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির সমর্থক রাজ্যগুলি অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন, রূপায়ণ ও তত্ত্বধানে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আর তা করতে পারলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এবং পরিকল্পনা কমিশন একতরফাভাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার অবসান ঘটবে। অঙ্গ রাজ্যগুলির মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করতে হবে যে, তারাও হোল সমগ্র পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অংশীদার। পরিকল্পনা কমিশনকে তার কার্যধারার দ্বারা এ ধরণের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে।

(৫) রাজ্যপালের পদটিকে বর্তমান অবস্থাতেই অব্যাহত রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে কমিশন। রাজ্যপালের নিয়োগ পদ্ধতি, ক্ষমতাবলী প্রভৃতি সংক্রান্ত বর্তমান সবকিছুকেই কমিশন অবিকৃতভাবে বজায় রাখার সুপারিশ করেছে। তবে কমিশন রাজ্যপালদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অপপ্রয়োগের সমালোচনা করেছে। এ ব্যাপারে কমিশনের অভিমত হোল, রাজ্যপালদের কেবল বিরল ও ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করা উচিত। এসব ক্ষেত্রে তিনি সুবিবেকের এবং সংবিধান মান্য করার কর্তব্যের অধীনে থেকে কাজ করতে বাধ্য থাকবেন।

(৬) সংবিধানের ৩৫২ এবং ৩৫৬ নং ধারায় বর্ণিত জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থার কোন রকম পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন আছে বলে কমিশন মনে করে না। তবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ৩৫৬ নং ধারা যাতে প্রয়োগ করা না হয় সে ব্যাপারে কমিশন অনুরোধ করেছে। কমিশন এও মন্তব্য করেছে যে কেন্দ্রের শাসক দল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনীতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটায়। এছাড়া কোন অঙ্গরাজ্যের অ-সামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিজের উদ্যোগে সশস্ত্রবাহিনী নিয়োগের ব্যাপারে কমিশন বলেছে যে, কোন রাজ্যে কোন অংশকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা এবং সেখানে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে সবকিছু জানানো এবং তার সঙ্গে পরামর্শ করা সঙ্গত। সংবিধানের ৩৫৫ নং ধারাকেও সঙ্গত বলেই মনে করেছে কমিশন। কমিশনের মতে, সর্বভারতীয় কৃত্যক নিয়োগের ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ। সারাদেশে ত্রিভাষা সূত্র কার্যকর করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে কমিশন। ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু কমিশনকে কার্যকর করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

সারকারিয়া কমিশনের প্রতিবেদনের প্রদত্ত সুপারিশগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, কমিশনের মতানুসারে ভারতের শাসনব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয়। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নটিকে কমিশন বিশেষ

গুরুত্ব দিয়েছে। কমিশনের মতে, কেন্দ্র হবে শক্তিশালী এবং কেন্দ্রের হাতে কার্যকর ক্ষমতা থাকতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গরাজ্যগুলির হাতেও নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যাবতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকতে হবে। সর্বোপরি কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতার মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা প্রয়োজন। স্থানীয় সংস্থার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সারকারিয়া কমিশন মূলতঃ সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে অধিক আন্তরিকতা দেখিয়েছে। কমিশনের মতে, আলোচ্য সংবিধানের বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই এই নীতি কার্যকর করা সম্ভব।

৬.৮ সারসংক্ষেপ

১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী এবং উপ-জাতীয় রাজনীতিক গোষ্ঠীগুলি রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি উপস্থাপিত করেছে। নতুন নতুন রাজ্য, কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল, আঞ্চলিক পরিষদ প্রভৃতি গঠনের মাধ্যমে নতুন যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্য গড়ে উঠেছে। রাজ্য, আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভিত্তিতে রাজনীতিক উদযোজন ভারতের বহুস্তর বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকাশ হিসেবে দেখা দিয়েছে। যদিও ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কিন্তু বহুস্তর ও বহু সংস্কৃতি বিশিষ্ট জাতীয় পরিচিতি হোল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রাণশক্তি। ভারতের এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যান্ত্রিক ভারসাম্য না হয়ে গতিশীল রাজনীতিক ভারসাম্য রূপে গড়ে উঠেছে। এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও বহু সংস্কৃতির রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এখানকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে আন্তঃরাজ্য সহযোগিতা ও বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এর ফলে ভারতে কেন্দ্র, রাজ্য ও আঞ্চলিক - এই তিন স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটছে। তাই অনেকে ভারতকে বহু-স্তর বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র বলে অভিহিত করেছেন।[১]

বস্তুতঃ যুক্তরাষ্ট্র কোন সুনির্দিষ্ট নিশ্চল ধারণা নয়। ভারতে একে গতিশীল ভারসাম্য রূপেই গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অন্য কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুকরণ মাত্র নয়। ভারতের প্রয়োজন ও পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিসমূহকে সংযোজিত ও পুনর্বিন্যস্ত করে গ্রহণ করা হয়েছে। গত তিন দশক ধরে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ও উপ-জাতীয় গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজ্য ও অঞ্চলগুলির অধিকার রক্ষা করে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। ভারতের সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বিভিন্নতার কথা মনে রেখে আঞ্চলিক দাবিগুলি কিছু পরিমাণে মেনে নেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সারকারিয়া কমিশনও সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এছাড়া, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে সফল করে তুলতে হবে। আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

১. "Harihar Bhattacharyya, P-85.

অনুশীলনী — ৩

★ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ★

১। সারকারিয়া কমিশনের দু'টি প্রতিবেদন বিশ্লেষণ কর।

২। ভারতের সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি কীভাবে সারকারিয়া কমিশনের প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে ?

★ রচনাত্মক প্রশ্ন ★

১। ভারতের কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ে সারকারিয়া কমিশনের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ কর।

৬.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র (Co-operative Federalism) ঃ

সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রের মূল কথা হোল কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্র। এই ধরণের যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্য অথবা বিভিন্ন রাজ্য পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে এবং বিরোধ হ্রাস করতে সচেষ্ট হয়। সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রকে মূলতঃ ক্ষমতার পরিবর্তে কার্যাবলীর দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়ে থাকে। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সমান অংশীদার হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র (Competitive Federalism) ঃ

সনাতন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণতঃ প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র হয়ে থাকে। এই ধরণের যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা দেয়। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করে। এই যুক্তরাষ্ট্র হোল সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীত ধরণের। সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র হোল গতিশীল, কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র হোল নিশ্চল।

আধিপত্যকারী যুক্তরাষ্ট্র (Dominant Federalism) ঃ

আধিপত্যকারী যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হোলেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়ে থাকে।

বহুসংস্কৃতিবাদ (Multiculturalism) ঃ

বহুসংস্কৃতিবাদ ধারণাটি নির্দেশ করে যে, সাম্প্রতিককালের সকল সমাজেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় এবং এর ফলে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য গড়ে ওঠে। বহু সংস্কৃতিবাদের মূল কথা হোল ঃ (১) মানুষ সাংস্কৃতিগতভাবে গ্রথিত; (২) সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না এবং তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে ওঠে; এবং (৩) প্রত্যেক সংস্কৃতি আবার অভ্যন্তরীণ দিক থেকে বহুবিধ।

রাষ্ট্রসমবায় (Confederation) ঃ

রাষ্ট্র সমবায়ে কেন্দ্রীয় সংগঠনটি অংশগুলির ওপর নির্ভরশীল এবং অংশগুলির সাহায্যে কার্য সম্পাদন করে। অংশগুলি রাষ্ট্রসমবায় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে ও নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পেতে পারে। রাষ্ট্র সমবায় যুক্তরাষ্ট্রের মতো 'অবিনাশ্য রাজ্যগুলির অবিনাশ্য ইউনিয়ন' নয়।

৬.১০ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

★ সংক্ষিপ্ত-উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ★

১। ৬.২ অনুচ্ছেদ দেখুন।

২। ৬.২ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩। ৬.৩.২ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪। ৬.৪ অনুচ্ছেদ দেখুন।

অনুশীলনী - ২

★ সংক্ষিপ্ত-উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ★

১। ৬.৫.১ অনুচ্ছেদ দেখুন।

২। ৬.৫.২ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩। ৬.৫.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪। ৬.৬ অনুচ্ছেদ দেখুন।

★ রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর ★

১। ৬.৫ ও ৬.৬ অনুচ্ছেদ দেখুন।

অনুশীলনী - ৩

★ সংক্ষিপ্ত-উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ★

১। ৬.৭ অনুচ্ছেদ দেখুন।

২। ৬.৭ অনুচ্ছেদ দেখুন।

★ রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর ★

১। ৬.৭ ও ৬.৮ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৬.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী

★ Short type Questions ★

1. In what sense is India a mlti-layered federal state?
2. Comment on any two recommendations of the Sarkaria Commission on centre-state relations.
3. In what sense is there Co-operative Federalism in India?

★ Essay type Questions ★

1. Discuss critically the major recommendations of the Sarkaria Commission pertaining to centre-state relations in India.
2. Examine the nature of multi-layered and multi-cultural federdalism in India.

৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

1. Harihar Bhattacharyya, India as a Multicultural Federation, 2001 Helbring of Lichtenhahn, Bale.
2. Granville Austin, 1966, The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation, Clarendon Press, Oxford.
3. Sarada Rath, 1984, Federalism Today, Sterling, New Delhi.
4. Bonita Aleaz, India's Federal Order, in Rakhahari Chatterji, (ed) Politics India, South Asian Publishers, New Delhi, 2001.
5. Sushil Ranjan Roy, Co-operative, Federalism : Its Adminsitrative Implications in India, in Perspectives in Political Science, ASC, B.U. 1997.

একক - ৭ ভারতের জোট রাজনীতি (Coalition Politics in India)

গঠন —

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.১ প্রস্তাবনা

৭.২ জোট-রাজনীতির অর্থ ও প্রকৃতি

৭.৩ জোটের শ্রেণীবিভাগ

৭.৪ জোট-রাজনীতির ক্রমবিকাশ

৭.৪.১ জাতীয় স্তরে জোট রাজনীতির ক্রমবিকাশ

৭.৪.২ রাজ্যস্তরে জোট-রাজনীতির ক্রমবিকাশ

৭.৫ জোট-রাজনীতির কারণ

৭.৬ জোট-রাজনীতির ফলাফল

৭.৭ সারসংক্ষেপ

৭.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৭.৯ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৭.১০ নমুনা-প্রশ্নাবলী

৭.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৭.০ উদ্দেশ্য

সাম্প্রতিককালে ভারতের রাজ্যগুলিতে ও কেন্দ্রে জোট সরকারের অভিজ্ঞতা রাজনীতিবিদদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অনেকে মনে করেন যে, ভারতের বহুত্ববাদী সমাজব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই জোট রাজনীতি গড়ে উঠেছে। অনেকে একথাও বলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ একদলীয় সরকারের আমল অতিক্রান্ত, সেদিন আর ফিরে আসবে না। বস্তুত জোট, মহাজোট, ফ্রন্ট প্রভৃতি এখন ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই গবেষকগণ ভারতে জোট-রাজনীতির উৎস কী, এর ভবিষ্যৎই বা কী — এ নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। এই এককটিতে তাই জোট-রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রবণতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ শেষ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যাবে ঃ

- জোট-রাজনীতি বলতে কী বোঝায়?
- জাতীয় ও রাজ্যস্তরে জোট-রাজনীতি কীভাবে গড়ে উঠেছে।
- জোট-রাজনীতি গড়ে ওঠার কারণ ও ফলাফল।
- ভারতে জোট-রাজনীতির ভবিষ্যৎ কী।

৭.১ প্রস্তাবনা

ভারতে এখন জোট রাজনীতি বিশেষভাবে জনসাধারণের স্বীকৃতি লাভ করেছে। অঙ্গরাজ্যগুলিতে ত ' বটেই, কেন্দ্রেও জোট রাজনীতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে ভারতের দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতিগত ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আধিপত্যকারী দলীয় ব্যবস্থা থেকে এখন বহুদলীয় ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটেছে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় যখন কোন একটি রাজনৈতিক দল নিজ শক্তিতে ক্ষমতায় আসতে ব্যর্থ হয় তখন কয়েকটি দল একত্রিত হয়ে সম্মিলিত সরকার গঠন করার চেষ্টা করে। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর বিহার, কেরালা, ওড়িশা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়। এর পর থেকে রাজ্যগুলিতে এই জোট রাজনীতি জনপ্রিয়তালাভ করেছে। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে প্রথম সম্মিলিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের পর থেকে কেন্দ্রেও জোট রাজনীতির কৌশল অবলম্বন করে সম্মিলিত সরকার গঠিত হতে থাকে। জোটের বিষয়টি এখন কেবল নির্বাচনের রাজনীতির বিষয় নয়। জোট রাজনীতি বর্তমানে নির্বাচনপূর্ব রাজনৈতিক বোঝাপড়ার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বস্তুত বৃহত্তর বিচারবিবেচনার প্রেক্ষিতে জোট রাজনীতি এখন ভারতের রাজনীতির একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ভারতের কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক এবং আন্তর্দলীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিতা-প্রতিযোগিতা মূলক দৃষ্টিভঙ্গির উৎসরূপে জোট রাজনীতির বিকাশ ঘটেছে।

ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বহুত্ববাদী প্রকৃতির অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই জোট-রাজনীতির আবির্ভাব ঘটেছে। প্রাক-১৯৬৭ সাল পর্বে আধিপত্যকারী দল ব্যবস্থায় ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বহুত্ববাদী প্রকৃতি সুপ্ত অবস্থায় ছিল। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এরই ফলশ্রুতিরূপে জোটরাজনীতির প্রতিষ্ঠানিক রূপায়ণ ঘটে। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের উপজাত হিসেবে জোট-রাজনীতির উদ্ভব ঘটেছে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় ত্রিশঙ্কু (Hung) আইনসভার ক্ষেত্রে জোট সরকারই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় বিকল্প (The Second Best Option) হিসেবে কাজ করছে। প্রথম দিকে সংসদীয় ব্যবস্থায় কিছু সংকট সৃষ্টি করলেও বর্তমান জোট-রাজনীতি ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে।

৭.২ জোট রাজনীতির অর্থ ও প্রকৃতি

'কোয়ালিশন' (Coalition) বা জোট শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ' কোয়ালিশিয়' (Coalitio) থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ হল একসঙ্গে যাওয়া বা বড়ো হয়ে ওঠা। সাধারণভাবে ' কোয়ালিশন' বা জোট বলতে বোঝায় কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হওয়া। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে ' কোলালিয়ন' বা 'জোট' এর অর্থ হল ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী বা উপদলের সংসদীয় বা রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপন। এফ.এ. অগ (F.A. Ogg) এর মতে, কোয়ালিশন বা জোট হল এক সমবায়মূলক ব্যবস্থা যেখানে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলসমূহ

অথবা সব ক্ষেত্রে এরূপ দলের সদস্যবৃন্দ একটি সরকার বা মন্ত্রিসভা গঠনেরর জন্য ঐকবদ্ধ হয়।১ গ্যামসন (Gamson) বলেছেন যে, জোট গড়ে ওঠে এক মিশ্র উদ্দেশ্যমূলক অবস্থার প্রেক্ষিতে, যেখানে বিভেদ ও ঐকমত্য - উভয়েরই একসঙ্গে অবস্থান লক্ষ করা যায়।[২] এখানে দুয়ের অধিক একক অন্তর্ভুক্ত হয়। জোট ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোগত দ্বন্দ্ব গভীরভাবে যুক্ত থাকে। আবার কার্য পরিচালনার জন্য কিছুটা নিরপেক্ষতা ও ঐকমত্যেরও প্রয়োজন হয়। এইভাবে দেখা যায় যে জোট গঠন হল এক প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোনো সামাজিক সংগঠনে বিভেদ ও ঐকমত্যের মধ্যে এক ভারসাম্য রক্ষা করা হয়।

এই ধারণাটি রাজনৈতিক তত্ত্বে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে ক্রীড়ামূলক তত্ত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে। জন ভন নিউম্যান(John Von Neuman), অস্কার মর্গেনস্টার্ন (Oskar Morgenstern), উইলিয়ম এইচ রাইকার (William H. Riker) প্রমুখ পণ্ডিত এই তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন। এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, বিরোধপূর্ণ পরিবেশ ও অবস্থার মধ্যে কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকরা হয়। আইনসভা, কমিটি, ক্যাবিনেট এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জোট উল্লেখযোগ্য সামাজিক সংগঠন হিসাবে কাজ করে। ক্রীড়ামূলক তত্ত্বের একটি মডেল হল 'শূন্য অঙ্কের খেলা' (Zero-sum-game) যেখানে দুটি পক্ষের এক পক্ষ যা হারায় অন্য পক্ষ তা জিতে নেয়। কিন্তু এর চেয়ে অধিক উপযোগী মডেল হল 'বহুদল ভিত্তিক শূন্য অঙ্ক বিহীন খেলা' (multi-party non-zero sum game)। এখানে বিরোধের মধ্যে দু'য়ের বেশি প্রতিযোগী থাকায় নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। কোন কোন প্রতিযোগীর মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এই অবস্থায় দুই বা ততোধিক প্রতিযোগী সম্মিলিত হয়ে জোট বা কোয়ালিশন গঠন করতে পারে। এই জোটের প্রধান লক্ষ্য হল যৌথভাবে সর্বোচ্চ সুযোগ লাভ করা এবং জয় সুনিশ্চিত করা। বিজয়ী জোট নিজের সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ ভাগ করে নেয়। রাইকারের মতে, যেহেতু রাজনীতি হল মূল্যদ্যোতক সামগ্রীর কর্তৃত্ব সম্পন্ন বন্টন এবং বন্টন হল জোট গঠনের এক প্রক্রিয়া, তাই জোট নীতি হল রাজনৈতিক তত্ত্বের এক অন্যতম অংশ।[৩]

জোট গঠনের ক্ষেত্রে চারটি শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন। এগুলি হল — পরিস্থিতি, প্রেরণা, সহাবস্থানযোগ্যতা এবং মিথষ্ক্রিয়া। প্রথমত, নিম্নলিখিত যে কোন এক ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে জোট গঠিত হতে পারে ঃ ১) বহুদলীয় ব্যবস্থায় যদি কোন দলই এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারে তখন জোট গঠনের পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রে এই ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ২) দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় যদি উভয়দলের মধ্যে ভারসাম্যের ফলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তখন যে কোন একটি দল নিরপেক্ষ বা দলত্যাগীদের নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে। ৩) যে কোন দেশে জাতীয় সংকটকালে সাধারণ স্বার্থে সমস্ত দলের মধ্যে ঐকমত্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখনও জোট গঠনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

---

1. F.A. Ogg : "Coalition", in Encyclopaedia of the Social Sciences, ed. Edwin R.A. Seligma, Macmillan, Vol. III, P. 600
2. W.A. Gamson, 'Coalition Formation' in International Encyclopaedia of the Social Science, ed. David L. Sills, Macmillan, Vol. 2, P. 531
3. W.H.Riker, 'The Study of Coalitions in International Encyclopaedia of the Social Services, Vol. 2 PP. 524-526.

দ্বিতীয়ত, জোট গঠনের একটি অন্যতম শর্ত হল কিছু দলের একত্রিত হওয়ার ইচ্ছা বা প্রেরণা। অনিচ্ছুক কারকদের জোর করে জোটবদ্ধ করা যায় না। জোটকে কৃতকার্য করতে হলে সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে জাতীয়তাবোধ, বিশ্বাসের মনোভাবে, সহিষ্ণুতা, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সদর্থক উপাদনগুলি গড়ে তুলতে হবে। নিজেদের মধ্যে জাতপাতের দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িকতা ও পারস্পরিক অবিশ্বাস বর্জন করতে হবে। উচ্চমন্যতা ও আত্মম্ভরিতা, যা জোটের পক্ষে ক্ষতিকারক, কখনোই প্রকাশ করা উচিত নয়।

তৃতীয়ত, জোট গঠনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কারকগুলির আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। জোটবদ্ধ হতে ইচ্ছুক দলগুলির মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির ওপর আদর্শগত দিক থেকে কম পার্থক্য জোট গঠনের প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে। পরস্পর বিরুদ্ধ আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলি যদি কেবলমাত্র ক্ষমতালাভের আশায় জোট গঠন করে, তাহলে সেই জোট বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না।

জোট রাজনীতি কৃতকার্য করার ক্ষেত্রে চতুর্থ শর্ত হল দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া। আগের তিনটি উপাদন জোট গঠনের পরিস্থিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু রাজনৈতিক যোগাযোগ ও পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া জোট রাজনৈতিকে কৃতকার্য করে তোলে। এটা ঘটে সাধারণত রাজনৈতিক দর কষাকষির মাধ্যমে। যেহেতু জোট রাজনীতি সমঝোতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই আন্তর্দলীয় শৃঙ্খলা, ঐক্য ও সংসক্তি হল এর পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান।

জোট ব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, জোট গঠিত হয় কোন নির্দিষ্ট ফল লাভের আশায়। এই ফল অবশ্যই বস্তুগত; তবে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতিরও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, জোট হল এক ধরণের সাহচর্য (Company), ভিড় (Crowd) নয়। এর একাধিক অংশীদার থাকে, যারা অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয় সম্মিলিত হতে। তৃতীয়ত, জোট রাজনীতি হল দেওয়া-নেওয়ার এক প্রক্রিয়া। এর ফলে

এক ভারসাম্য গড়ে ওঠে, যেখানে কারকরা তাদের সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। পরিশেষে, জোট রাজনীতি স্থিতিশীল নয়, গতিশীল। কারণ উত্থান ও পতনের প্রক্রিয়ার মাধ্যম এই সহযোগিতা মূলক ব্যবস্থা চলে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন জোট কাঠামোর গঠন, বিনির্মাণ ও পুনর্গঠন চলতে থাকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলের আসা-যাওয়ার মাধ্যম। এইভাবে দেখা যায় যে, জোট-রাজনীতি হল ক্ষমতা বন্টনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী অথবা সংগঠনের রাজনৈতিক মৈত্রী।

যেহেতু জোট-রাজনীতি হ'ল বহুদলীয় ব্যবস্থার এক ব্যাপার, তাই ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে যেখানে বহুদলীয় ব্যবস্থা আছে সেখানে জোট হল এক স্বাভাবিক ব্যাপার, ব্যতিক্রম নয়। ফ্রান্স, ইটালি, জাপান, অষ্ট্রিয়া, জার্মানি, নেদারল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশে জোট প্রায়শই গঠিত হয়। ফ্রান্স ও জার্মানির মতো দেশে ৬-৭ টি দল আছে। আবার চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো দেশে ২০-৩০টি দল আছে। স্বাভাবিকভাবেই তাই এই সব দেশে সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়। কখনো দক্ষিণপন্থী কখনো বামপন্থী দলগুলি উভয় প্রকার সরকার গঠন করে। অনেক ক্ষেত্রে বাম ও দক্ষিণ উভয় প্রকার গোষ্ঠীর মৈত্রীর মাধ্যমে জোট সরকার গড়ে ওঠে। ইউরোপীয় দেশগুলিতে জোটবদ্ধদলগুলি নিয়মপদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা গ্রহণ

করে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করে। রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে তারা দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে। এই সব দেশে জোট সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর হয়ে থাকে। ফ্রান্স ও ইটালির জোট রাজনীতি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, জোট সরকার সব সময়েই রাজনৈতিক অস্থিরতা ডেকে আনে না বা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংকট সৃষ্টি করে না। সাম্প্রতিককালে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেও বহুদলীয় ব্যবস্থার ফলশ্রুতিরূপেই জোট-রাজনীতি প্রাধান্যলাভ করেছে।

৭.৩ জোটের শ্রেণীবিভাগ

ভারতে জাতীয় স্তরে ১৯৮৯ সালের পর থেকে এবং রাজ্যস্তরে ১৯৬৭ সালের পর থেকে জোট-রাজনীতি যে-ভাবে প্রসারলাভ করেছে তাতে বিভিন্ন ধরণের জোট লক্ষ করা গেছে। এইসব জোট তাদের ধরণ অনুযায়ী ভারতের সংসদীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন দিক থেকে জোটগুলিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যেতে পারে ঃ[১]

সময়ের ক্রম অনুযায়ী জোট দু'রকমের হতে পারে — প্রাক-নির্বাচনী জোট এবং নির্বাচনোত্তর জোট। অনেক সময় নির্বাচনের আগে কতগুলি দল কয়েকটি ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে একত্রিত হয়। নির্বাচনের পর জয়লাভ করলে এই জোট 'সম্মিলিত সরকার' এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কেরালা ও ওড়িশায় গড়ে ওঠা সম্মিলিত সরকার, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার এই ধরেণর জোটের উদাহরণ। অপরদিকে নির্বাচনোত্তর জোট রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণত নির্বাচনের পর যদি দেখা যায় যে, কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি, তাহলে আগ্রহী দলগুলি ন্যুনতম সাধারণ কর্মসূচী ও নেতৃত্ব নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু করে। এর ফলে নির্বাচনোত্তর জোট সরকার গড়ে ওঠে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ প্রমুখ রাজ্যে এইধরণের জোট সরকার গড়ে উঠেছিল। উভয় ধরণের জোটের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাক-নির্বাচনী জোট যেহেতু নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা অনুমোদিত, তাই এইধরণের জোট বৈধতার দাবি রাখে। কিন্তু নির্বাচনোত্তর জোট নির্বাচকমন্ডলীর অনুমোদন ছাড়াই সমঝোতা করে। তাই এতে বৈধতার অভাব দেখা যায়। তাছাড়া প্রাক-নির্বাচনী জোটে পারস্পরিক সুবিধা আদান-প্রদানের প্রক্রিয়ায় আন্তর্দলীয় দ্বন্দ্ব অনেক কম হয়। এর যৌথ কর্মসূচী সহজে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ক্ষমতা ও দায়িত্ব বন্টনের ভিত্তিতেও জোট দু'রকমের হতে পারে — অনুক্ত (tacit) এবং আনুষ্ঠানিক(formal)। অনেক সময় কোন দল প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলেও অপর একটি বা কয়েকটি দলের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। এক্ষেত্রে অন্য দলগুলি কোনো সরকারী পদের ভাগ নেয় না। মন্ত্রিসভার বাইরে থেকে সমর্থন প্রদানের মাধ্যমে এরা সরকারী সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে এবং ক্ষমতাও ভোগ করে, কিন্তু কোনো দায়িত্বের ভাগ নেয় না। আনুষ্ঠানিকভাবে জোটেও তারা অংশ গ্রহণ করে না।

১. Sushil Ranjan Roy, Coalition Politics and the Federalising Process in India, M.Phil. Dissertation, B.U. 1984, PP. 15-22

১৯৬৭-৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু ঘোষ মন্ত্রিসভাকে কংগ্রেস দল এইরকম সমর্থন জানিয়েছিল। ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রে দেবগৌড়ার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হয় এবং কংগ্রেস দল ঐ সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন জানায়। এইভাবে রাজ্যগুলিতে এবং কেন্দ্রেও অনুক্ত জোট গড়ে উঠেছিল। অপরদিকে আনুষ্ঠানিক জোট কয়েকটি দলের মধ্যে সুস্পষ্ট ও বৈধ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে আগ্রহী দলগুলি ক্ষমতা ও দায়িত্ব উভয়েরই ভাগ নেয়। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচণের পর উত্তরপ্রদেশের চরণ সিং সরকার এই ধরণের জোটের উদাহরণ। ওড়িশার সিং দেও সরকারও ছিল ঐ ধরণের আনুষ্ঠানিক জোট। এই দু'ধরণের জোটের মদ্যে অনুক্ত জোটের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা কম।

জোটের মধ্যে দলগুলির শক্তির ভিত্তিতে জোটকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় — সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরে প্রাধান্য সমন্বিত জোট ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের প্রাধান্য সমন্বিত জোট। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার হল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রাধান্য বিস্তারকারী জোট সরকার। এই সরকারে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইধরণের সরকারের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সালে গঠিত অজয় মুখার্জী মন্ত্রিসভা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের প্রাধানবিস্তারকারী জোট সরকার। এই সরকারে ১৪টি দল অংশগ্রহণকরেছিল। সি.পি.এম. ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম শক্তিসম্পন্ন বাংলা কংগ্রেস দলের নেতা অজয় মুখার্জী সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

জোটে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যার ভিত্তিতে জোট সরল ভারসাম্য এবং বহুমুখী ভারসাম্য হতে পারে। কেবলমাত্র দু'টি দল নিয়ে জোট সরকার গড়ে উঠলে তাকে সরল ভারসাম্য জোট বলে। এখানে জোটের নেতাকে কেবলমাত্র একটি বাইরের দলের সঙ্গে সমঝোতা করতে হয়। ১৯৬৯ সালে পাঞ্জাবে গঠিত অকালি - জনসংঘ জোট হল এই ধরণের জোটের অন্যতম উদাহরণ। অপরদিকে বহুদলীয় জোট সরকারে বহুমুখী ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন হয়। এই ধরণের সরকারের নেতাকে বিভিন্ন দলের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে যে ১৪ দলের জোট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল তাকে বহুমুখী ভারসাম্য জোট বলা যেতে পারে। ১৯৮৯ সালে কেন্দ্রে ভি.পি.সিং এর নেতৃত্বে যে জোট সরকার গড়ে উঠেছিল তাকেও এই ধরণের জোট বলা যেতে পারে।

মতাদর্শগত দিক থেকেও জোট রাজনীতি গড়ে উঠতে পারে এবং তা দু'রকমের হতে পারে। যথা — মতাদর্শভিত্তিক সমরূপ জোট এবং মতাদর্শভিত্তিক অসদৃশ জোট। প্রথমটি মতাদর্শ, কর্মসূচী, নীতি প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই ধরণের জোট দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী হতে পারে, রক্ষণশীল বা প্রগতিশীল হতে পারে। ১৯৬৭ সালে ওড়িশায় স্বতন্ত্র ও জন-কংগ্রেসের জোট সরকার দক্ষিণপন্থী জোট সরকারের উদাহরণ। আবার পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার হল বামপন্থী জোট সরকারের উদাহরণ। অপরদিকে মতাদর্শভিত্তিক অসদৃশ জোট সরকারে মতাদর্শের ভূমিকা থাকে গৌণ। অংশগ্রহণকারী দলগুলি ক্ষমতা লাভের খেলায় মেতে ওঠে। নীতি অপেক্ষা ব্যক্তির প্রাধান্য বেশি থাকে। নির্বাচনী ইস্তাহারে যে আদর্শের কথা থাকে জোটে তা পরিবর্তন করে আপস করা হয়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে এই ধরণের জোট সরকার গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে সুবিধাবাদী রাজনীতি গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিকভাবে জনপ্রতিনিধি কেনা-বেচার মাধ্যমে দলত্যাগের রাজনীতিও দেখা দিচ্ছে। এর ফলে জোট সরকারের স্থায়িত্ব ক্ষুন্ন হচ্ছে।

---

1. S. R. Roy, P. 23

ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জোটের ধরণ যে রকমই হোক, একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, জোট-রাজনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতার ভারসাম্যের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। আধিপত্যশীল দলীয় ব্যবস্থা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বহুদলীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরের ফলে রাজ্যগুলি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছে।[১] রাজ্য ও অঞ্চলগুলিতে ক্রমবর্ধমান স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আঞ্চলিক দলগুলি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে কেন্দ্র অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকারকে সম্মান দিতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হতে পেরেছে।

অনুশীলনী —১

★ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ★

১। ভারতে জোট-রাজনীতি গড়ে উঠেছে কেন?

২। জোট রাজনীতি বলতে কী বোঝায়?

৩। জোট গঠনের শর্তগুলি কী ?

৪। তুমি কীভাবে জোটের শ্রেণীবিভাগ করবে?

★ রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ★

১। ভারতের রাজনীতির প্রেক্ষিতে জোট-রাজনীতির অর্থ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

৬.৪ জোট-রাজনীতির ক্রমবিকাশ

যদিও জোট-রাজনীতি হল ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এর উৎস ভারতীয় রাজনীতির ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত। ভারতে জোট-রাজনীতির ইতিহাস প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়।[২] ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর পাঞ্জাবে এক ধরণের জোট সরকার গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৬ সালে ভারতে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটিও ছিল এক রকমের জোট-সরকার। কারণ এই সরকারের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, অকালি দল ও অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ছিল।

স্বাধীনতার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সারা দেশে জাতীয় কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ছিল জোটেরই প্রতীক। কারণ প্রকৃতপক্ষে তখন একে দল বলা থেকে 'ব্যবস্থা' (System) বলাই ছিল যুক্তিসঙ্গত। রজনী কোঠারি নেহেরুর সময়ে কংগ্রেসের শাসনকে 'কংগ্রেস ব্যবস্থা' (The Congress System) বলে অভিহিত করেছেন।[৩] 'কংগ্রেস ব্যবস্থা' জোট রাজনীতির মডেলে

১. Sushil Ranjan Ray, P. 23

২. K. K. Ghai, Indian Government and Politics, 2002, Kalyani, P. 524.

৩. Rajani Kothari, The Decline of the Modern State, in Zoya Hosan (ed) Politics and the State in India, PP. 190-192

গড়ে উঠেছিল। জাতীয় কংগ্রেস বাস্তবে অনেকগুলি দলের দল ছিল। কোঠারির মতে, শাসক কংগ্রেস ছিল ঐকমত্যের দল আর বিরোধী পক্ষ ছিল 'চাপ সৃষ্টিকারী দল।' এর ফলে বিরোধী দলগুলি কংগ্রেস শাসনের পরিবর্তন করা বা বিকল্প সরকার গঠন করার চেষ্টা না করে কংগ্রেসের মধ্যে সমমতাদর্শী উপদলগুলির সঙ্গে কাজ করে কংগ্রেসের নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। কংগ্রেসের অনিয়তাকার সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীকে জড়ো করা হয়েছিল। এর দ্বারা অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের নীতি রূপে ভারতীয় সমাজের ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করা হয়েছিল। কংগ্রেসের পক্ষে তার প্রাধান্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ এর মধ্যে বহুত্ববাদী রাজনৈতিক মত অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কংগ্রেস হয়ে পড়েছিল এক ছাতারূপ প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী প্রভৃতি বিভিন্ন দল ও উপদল আশ্রয় পেয়েছিল। এই সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটেছিল। এই দলগুলি মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র, গান্ধীবাদ এবং উদারনীতিবাদকে প্রতিফলিত করেছিল। এই প্রবণতাগুলি কংগ্রেসের মধ্যে উপদলীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। এর ফলে কংগ্রেসের পক্ষে আধিপত্যশীল দলীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এটা কখনোই কর্তৃত্ববাদে পরিণত হয় নি; বরং গণতান্ত্রিক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিবেশ সুনিশ্চিত করেছিল। জাতীয় কংগ্রেস মতাদর্শ দিক থেকে ছিল নমনীয়। তাই বিভিন্ন ধরণের দল এর মধ্যে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল। এইভাবে 'কংগ্রেস ব্যবস্থা' নিজের মধ্যেই এক জোট গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।

১৯৫২ সালে কেরালায় কংগ্রেস জোট-সরকার গঠন করেছিল। কেরালায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে জোট-রাজনীতি এক স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ১৯৬৭ সাল থেকে রাজ্যস্তরে জোট রাজনীতি ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে প্রথম জোট সরকার গঠিত হয়। ১৯৮৯ সাল থেকে ভারতের জাতীয় স্তর ও রাজ্যস্তর উভয় ক্ষেত্রেই জোট-রাজনীতি বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। ভারতে জোট রাজনীতির ক্রমবিকাশকে দু'টি অংশে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে — জাতীয় স্তরে জোট রাজনীতি ও রাজ্যস্তরে জোট রাজনীতি।

৭.৪. ১ জাতীয় স্তরে জোট-রাজনীতির ক্রমবিকাশ

১৯৬৭ সাল ভারতীয় রাজনীতির এক মোড় হিসেবে দেখা দিয়েছিল। কংগ্রেস বিরোধী ঢেউ গড়ে ওঠার ফলে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কয়েকটি রাজ্যে অ-কংগ্রেসী জোট সরকার গঠিত হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রের রাজনৈতিক চিত্রের তখনও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তবে ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে জাতীয় জরুরী অবস্থার ঘোষণা কেন্দ্রের রাজনৈতিক চিত্রেরও ওলটপালট ঘটিয়েছিল। এই ঘোষণার দ্বারা নাগরিকদের পৌর স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিল। এই দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বিহার, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে যে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন জয়প্রকাশের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে। ইন্দিরা গান্ধীর এই অগণতান্ত্রিক কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অ-কংগ্রেসী মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই ষষ্ঠ লোক সভার নির্বাচনে (১৯৭৭) ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দলের পরাজয় ঘটে। মোরাজী দেশাই-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম কেন্দ্রে একটি অ-কংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়। এই সরকার জনতা পার্টির সরকার হিসেবে পরিচিত হলেও বাস্তবে এটি ছিল একটি জোট সরকার। কারণ ভারতীয়

জনসঙঘ, ভারতীয় লোকদল, সংগঠন কংগ্রেস ও সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টিকে নিয়ে জনতা পাটি গঠিত হয়েছিল। এইভাবে জাতীয় স্তরে সর্বপ্রথম একটি রাজনৈতিক দলের ব্যানারে কার্যত জোট রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে। এই জনতা সরকারে অংশগ্রহণকারী দলগুলি সরকার গঠনের পরেও তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট ছিল।

জনতা সরকার নির্বাচনী ইস্তাহার অনুযায়ী অভিন্ন প্রগতিশীল কর্মসূচীর প্রতি দায়বদ্ধ ছিল। 'রুটির সঙ্গে স্বাধীনতা' র জন্য জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু জনতা পার্টির অন্তর্ভুক্ত দলগুলির মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকায় ঐ সরকার দু'বছরের মধ্যে ভেঙে যায়। এই সরকার ভেঙে যাওয়ার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল আর.এস.এস.-এর নির্দেশে জনসঙঘ নেতাদের পরিচালিত হওয়া। তাছাড়া, চৌধুরী চরণ সিং- এর ক্ষমতা লিপ্সাও সরকারের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল বলে অনেকে মনে করেন। দেশাই সরকারের পতনের পর কংগ্রেস(ই) এর সমর্থন নিয়ে চৌধুরী চরণ সিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু এইসরকারও ৬ মাসের বেশী টিকে থাকে নি। পার্লামেন্টে আস্থাভোটে জয়লাভ করার পূর্বেই এই সরকারের পতন (২৮..১৯৭৯-১৪.১.১৯৮০) ঘটে। ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পুনরায় কংগ্রেস(ই) দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থা ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল।

অনেকসময় একটি বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে জনবিক্ষোভ গড়ে ওঠে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য বিশ্বনাথ প্রতাশ সিং প্রমুখ বেশ কয়েকজন নেতা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা শাসক দল কংগ্রেস(ই) থেকে বেরিয়ে গিয়ে 'জনমোর্চা' নামে নতুন দল গঠন করেন। ১৯৮৮ সালে জনতা পার্টি, জনমোর্চা ও লোকদলের মিলন ঘটে। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এর নেতৃত্বে একটি রাষ্ট্রীয় মোর্চা গড়ে ওঠে। কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় মোর্চাও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত সি.পি.আই(এম), ও বি.জে.পি.র সমর্থন লাভের পর বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং জোট সরকার গঠন করেন। কিন্তু এই সরকারও স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। 'রথযাত্রা'র বিষয়কে কেন্দ্র করে বি.জে.পি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ভি.পি. সিং সরকারের পতন হয় (১০.১১.১৯৯০)। এর পর কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর সরকার ছিল একটি জোট সরকার। কিন্তু এই সরকারেরও আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র কয়েক মাস। রাজীব গান্ধীর সঙ্গে নানা কারণে এই সরকারের মতপার্থক্য হওযায় শেষ পর্যন্ত মার্চ মাসে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। ফলে দশম লোকসভা নির্বাচন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনেও কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত পি.ভি.নরসিমা রাও-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রে কংগ্রেস(ই) দল সরকার গঠন করে। প্রথম আড়াই বছর রাও সরকার ছিল একটি সংখ্যালঘু সরকার। পরবর্তী সময়ে দলত্যাগের রাজনীতি কার্যকর করে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে। জোট রাজনীতির কৌশল অবলম্বন করে রাও সরকার পুরোপুরি পাঁচ বছর ক্ষমতায় টিকে থাকে।

১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ লোকসভা নির্বাচনেও কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। বি.জে.পি. লোকসভায় ১৬০টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা অর্জন করে। রাষ্ট্রপতি বি.জে.পি.কে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানালে ঐ দলের নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। কিন্তু এই সরকার মাত্র ১৩ দিন টিকে ছিল। লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের পূর্বে বাজপেয়ী পদত্যাগ করেন। কারণ বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন জোটের সেই সময় লোকসভায় আদৌ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না।

সেই সময় জনতা দলের নেতৃত্বাধীন 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি জোট ছিল। বাজপেয়ী সরকারের পদত্যাগের পর কংগ্রেস(ই) দলের নিঃশর্ত সমর্থন লাভ করার ফলে যুক্তফ্রন্টের নেতা এইচ. ডি. দেবেগৌড়া সরকার গঠন করেন। কিন্তু নানা কারণে তদানীন্তন কংগ্রেস (ই) সভাপতি সীতারাম কেশরী প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তনের জন্য চাপ দিলে যুক্তফ্রন্ট সেই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। যদিও এই সরকার অভিন্ন কর্মসূচী অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের ওপর নির্ভরশীলতা ঐ সরকারের টিকে থাকার পথে বাধা হয়ে উঠেছিল। এক বছরের মধ্যে দেবেগৌড়ার পদত্যাগের পর কংগ্রেসের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী হন আই.কে গুজরাল। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারও ৬ মাসের বেশি টিকে থাকেনি। ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে ঐ সরকারের ওপর থেকে কংগ্রেস (ই) দল সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে গুজরাল সরকারের পতন ঘটে। এই সরকার তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে কাজ করে।

১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে দ্বাদশ লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনেও আগের মতো তিনটি প্রধান জোটের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ ছিল। এই ৩টি জোট হল - বি.জে.পি-র নেতৃত্বাধীন জোট, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট এবং জনতা দলের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট। ঐ নির্বাচনে কোন জোট লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বি.জে.পি. নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয় এবং তেলেগু দেশমের সমর্থনে ঐ সংখ্যালঘু সরকার আস্থাভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই শরিক দলগুলির মধ্যে সহযোগিতার অভাব এবং এ.আই.এ.ডি.এম.কে. ও জনতা দলের দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপ, ঐ সরকারের জাতীয় কর্মসূচী রূপায়নের পথে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। তাই মাত্র দেড় বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ঐ সরকারের পতন ঘটে। অন্য দলগুলিও বিকল্প সরকার গঠনে ব্যর্থ হওয়ায় ঐ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে কাজ করে।

১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে যে তিনটি প্রধান জোটের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল, সেগুলি হল ১) বি.জে.পি.-র নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা (National Democratic Alliance) ২) কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট এবং ৩) বাম-জোট। এই তিনটি জোটের বাইরে থাকা সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পাটি, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির মতো রাজনৈতিক দল এবং নির্দলরাও এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। নির্বাচনী ফলাফলে বি.জে.পি-জোট ৩০৩টি, কংগ্রেস জোট ১৩৬টি এবং বাম জোট ৪৩টি আসন লাভ করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ জোটের নেতা হিসেবে বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হন। এই এন.ডি.এ. সরকার ছিল ২৪টি দলের জোট সরকার। প্রথম থেকেই নির্বাচনী ইস্তাহারে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচী ও নীতিগুলি রূপায়নের জন্য চেষ্টা করেছিল এই সরকার। শরিক দলগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হয়েছিল। বস্তুত আগের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এন.ডি.এ. সরকার ঐকমত্যের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল।[১] আঞ্চলিক দলগুলিও এই সরকারের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেছিল। এইভাবে ঐ জোট সরকার পুরো সময় ক্ষমতাসীন থাকতে সমর্থ হয়েছিল। ২০০৪ সালে চতুর্দশ লোকসভার নির্বাচনে দু'টি প্রধান জোট ও অন্যান্য দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এই দু'টি জোট হল - কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন জোট এবং বি.জে.পি নেতৃত্বাধীন জোট। সংখ্যাগরিষ্ঠ জোট হিসেবে কংগ্রেস জোট সংযুক্ত প্রগতিশীল মৈত্রী সরকার(United Prograssive Alliance Govern-

১. K. K. Ghai, Indian Government and Politics, P. 527.

ment) গঠন করে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বাইরে থেকে এই সরকারকে সমর্থন করে। কংগ্রেস নেতা মনমোহন সিংহ এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। এই সরকারও পরিচালিত হচ্ছে জোটের নীতি অনুযায়ী। অদ্যাবধি এই সরকার ক্ষমতাসীন থাকতে সমর্থ হয়েছে।

জাতীয় স্তরে জোট-রাজনীতির প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৭৭ সালের পর থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে দুটি উপাদান বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। একটি হল নির্বাচনী রাজনীতিতে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি। অপরটি হল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের, বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেসের অবক্ষয়। সাম্প্রতিককালে ভারতের জোট রাজনীতির মধ্যে যে দলব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাকে অনেকে 'দ্বি-প্রণালী বিশিষ্ট' (Bi-modal) বহুদল ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। এই ব্যবস্থায় দুটি রাজনৈতিক দল— কংগ্রেস ও বি জে পি প্রধান শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু লোকসভার নির্বাচনে কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারছে না। কংগ্রেস দলের পক্ষে আর আগেকার 'কংগ্রেস ব্যবস্থা' গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই উভয় দলকেই জোট গঠনে উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে। আঞ্চলিক দলগুলি প্রাধান্য পাচ্ছে। ভারতে এখন 'অঞ্চল ভিত্তিক বহুদলব্যবস্থা' গড়ে ওঠার ফলে দল ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীয়করণ সম্ভব হয়েছে।[২]

৭.৪. ২ রাজ্যস্তরে জোট-রাজনীতির ক্রমবিকাশ

ভারতে জাতীয় স্তরে জোট-রাজনীতির বিকাশ সাম্প্রতিককালে ঘটলেও রাজ্যস্তরে এরূপ রাজনীতি প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫২) থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন মাদ্রাজ রাজ্যের বিধান সভায় টি.প্রকাশনের নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রধান শরিক দল হিসেবে নিয়ে গঠিত অ-কংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করেছিল। কিন্তু নেহেরুর নির্দেশে সি.রাজাগোপালাচারী যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল।[৩] ১৯৫৭ সালে কেরালায় সি.পি.আই এর নেতৃত্বে প্রথম অ-কংগ্রেসী জোট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু ১৯৫৯ সালে এই সরকারকে বলপূর্বক অপসারণ করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়। ১৯৬০ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ও পি.এস.পি.জোট জয়ী হয় ও সরকার গঠন করে। ১৯৬৫ সালে সবকটি দলই এককভাবে নিজেদের শক্তি পরীক্ষায় নামে। কোনো দলই ঐ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। জারি হয় রাষ্ট্রপতির শাসন। প্রায় দু'বছর রাষ্ট্রপতির শাসন জারি ছিল। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কেরালায় বামপন্থীরা জোট গঠন করে এবং জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। ১৯৭০ এর দশকের শেষভাগে কেরালার রাজনৈতিক অস্থিরতা নতুন জোট গঠনের রাস্তা খুলে দেয়। দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও সি.পি.আই(এম) এর নেতৃত্বে কেরালার রাজনীতি দু'টি জোটের রাজনীতিতে পরিণত হয়। বামপন্থী দলগুলি নিয়ে গঠিত হয় সি.পি.আই(এম) নেতৃত্বাধীন এল.ডি.এফ(লেফ্ট ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট) এবং আঞ্চলিক দলগুলোকে নিয়ে কংগ্রেস গঠন করে ইউ.ডি.এফ (ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট)। এর পর থেকে কেরালার নির্বাচনে কখনো এল.ডি.এফ. আবার কখনো ইউ.ডি.এফ. জোট জয়ী হয় এবং কেরালার জোট রাজনীতি স্থিতিশীল হতে শুরু করে।

২. Aditi Dey-Sharma, The Party System : National, in Rakhahari Chatterji (ed) Politics India, P. 61

৩. S.K. Khanna, Contemporary Indian Politics, PP. 87-88

পশ্চিমবঙ্গে জোট রাজনীতি শুরু হয়েছিল চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে বামপন্থী দলগুলি জোটবদ্ধ হবার চেষ্টা করেছিল কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। কিন্তু তারা তখন সফল হতে পারেনি। ১৯৬৫ সালে অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেসের উদ্ভবের ফলে বামপন্থী দলগুলি নতুন করে জোট গড়ার চেষ্টা করেছিল। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে যখন কোনো দলই বিধান সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি তখন অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শরিক দলগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রথম দিকে জোট সরকার স্থায়ী হতে পারেনি। কিন্তু ১৯৭৭ সাল থেকে সি.পি.এম. এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট স্থায়ী জোট সরকার গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অদ্যাবধি এই জোট ক্ষমতাসীন থাকতে সমর্থ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের সাফল্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে জোটরাজনীতি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় অন্য কয়েকটি রাজ্যে ১৯৬৭ সালের পর থেকে জোট রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করে। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের একাধিপত্য হ্রাস পায়। জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা কমে আসে। তাই ঐ নির্বাচনে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা ও পাঞ্জাব মোট ৮টি রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে। পাজাবে ১৯৬৭ সালে অকালি দল ও জনসঙঘ জোট ক্ষমতাসীন হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে অকালি দল ও বি.জে.পি জোট ক্ষমতা দখল করেছিল। ১৯৬৬ সালে হরিয়ানা রাজ্যের গঠনের পর থেকেই সেখানে জোট ও দলত্যাগের রাজনীতি শুরু হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীরা সেখানে 'হরিয়ানা কংগ্রেস' নামে নতুন দল গঠন করে। কংগ্রেস দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে সেখানেও জোট সরকারের অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে। এইভাবে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, হিমাচল প্রদেশ, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, গোয়া এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি বিভিন্ন সময়ে জোট সরকারের দ্বারা শাসিত হয়েছে।

১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত রাজ্যস্তরে জোট রাজনীতির যেপর্যায় গড়ে উঠেছিল তাতে কংগ্রেস বিরোধিতা প্রধান শক্তিরূপ দেখা দিয়েছিল। ঐ জোট সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ছিল না। ক্ষমতা দখলই প্রধান লক্ষ্য ছিল। অস্থিরতার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। রাজ্যগুলি অধিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য দাবি তুলেছিল। কেন্দ্র রাজ্য বিরোধ অন্যতম সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মসূচী ভিত্তিক জোট রাজনীতি গড়ে উঠেছিল। এই পর্যায়ে কংগ্রেস বিরোধিতা আর প্রধান শক্তিরূপে কাজ করতে পারে নি। মতাদর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচীকে কার্যকর করার জন্য জোট সরকারের শরিক দলগুলি সচেষ্ট হয়েছিল। এরপর থেকে সর্বভারতীয় দলগুলির প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং আঞ্চলিক দলগুলির প্রভাব বাড়তে থাকে। রাজ্যগুলির সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যক্তিগত রাজনীতি ও ক্ষমতা দখল জোট সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দেয়।

১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত যে ৭৪টি সংখ্যালঘু সরকার গঠিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে মাত্র ৩১টি নির্বাচনের ফলে এবং ৪৩টি দল বিভাজন বা দলত্যাগের কারণে গঠিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে মাত্র ১১টি সরকার পূর্ণ মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এই ১১টির মধ্যে ৮টি ছিল পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরার রাজনৈতিক মতাদর্শভিত্তিক বামফ্রন্ট। ১৯৯৫ সালের পর থেকে অদ্যাবধি যে সবরাজ্যে জোট সরকার

গঠিত হয়েছে, সেইসব সরকারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ঐ সব সরকারের অধিকাংশই হল সংখ্যালঘু সরকার। কেবল এর ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারগুলি। জোট সরকারগুলির স্থায়িত্ব নিয়ে সমস্যা দেখা দিলেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সব দলই জোটের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, জোট গঠনে ব্যর্থ হলে দলগুলির পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। সাম্প্রতিককালে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি এই ধারণার সত্যতা প্রমাণ করেছে।

অনুশীলনী — ২

★ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ★

১। কেরালার জোট-রাজনীতি সম্পর্কে টিকা লেখ।
২। 'কংগ্রেস ব্যবস্থা' বলতে কী বোঝ?
৩। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ভারতের জোট রাজনীতি কীরূপ ছিল?
৪। দ্বি-প্রণালী বিশিষ্ট .(Bi-modal) বহুদল ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?
৫। পশ্চিমবঙ্গে জোট রাজনীতির প্রকৃতি কীরূপ?
৬। ১৯৯৬ সালের পর থেকে ভারতের জোট রাজনীতির বৈশিষ্ট্য কীরূপ?

★ রচনাত্মক প্রশ্ন ★

১। ভারতের জাতীয় স্তরে জোট-রাজনীতির বিকাশ পর্যালোচনা কর।
২। ভারতের রাজ্যস্তরে জোট-রাজনীতির বিকাশ বিশ্লেষণ কর।
৩। ১৯৬৭ সালের পর থেকে ভারতের জোট-রাজনীতির বিকাশ আলোচনা কর।
৪। ১৯৭৭ সালের পর থেকে ভারতের জোট-রাজনীতির বিকাশ পর্যালোচনা কর।
৫। ভারতের রাজনীতি কীভাবে জোট-রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে তা আলোচনা কর।

৭.৫ জোট-রাজনীতির কারণ

জোট রাজনীতি ভারতের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে এক স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এইজোট রাজনীতি গড়ে ওঠার কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ১) ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহুত্ববাদী প্রকৃতির অনিবার্য ফলশ্রুতি রূপে জোট রাজনীতির উদ্ভব ঘটেছে। ভারতের এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রয়েছে, যার মাধ্যমে তার ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, প্রথা ও নৃকুলগত উৎসের মধ্যে এক জটিল বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। ভারতের মতো বহুত্ববাদী সমাজে কোনো একক সংস্কৃতি, বিশ্বাস বা ভাষার আধিপত্য বহুকাল ধরে গড়ে ওঠা 'অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য' এর নীতিকে ধ্বংস করবে। ভারতের সমাজ সংস্কৃতির এই বহুত্ববাদী প্রকৃতি জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে ভালোভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। রজনী কোঠারি যথার্থই বলেছেন যে, নেহেরুর আমলে 'কংগ্রেস ব্যবস্থা'র মধ্যে এক ধরণের ঐকমত্য গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেসের একাধিপত্যের অবসান ঘটেছে। দেশের জনসাধারণ কংগ্রেসকে আর পূর্বের মতো গ্রহণযোগ্য একটি দল বলে মনে করতে পারছে না। ভারতের বহু বিন্যস্ত সমাজের প্রকৃতি রক্ষায় কংগ্রেসের ব্যর্থতা জোট রাজনীতির উদ্ভব ঘটাতে অনেকাংশে সাহায্য করেছিল।

২) দলীয় ব্যবস্থার আঞ্চলিকীকরণ হল জোট গঠনের আর একট অন্যতম কারণ। সাম্প্রতিক ভারতের দলীয় ব্যবস্থার প্রবণতাকে অনেকে দলীয় ব্যবস্থার আঞ্চলিকীকরণ বলে অভিহিত করেছেন। পাশ্চাত্য দেশের মতো ভারতে জাতীয় রাজনৈতিক সচেতনতা প্রবল নয়। শিক্ষা, সাক্ষরতা ও সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধীর গতির জন্য সনাতন ভাবধারা ও মূল্যবোধ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আঞ্চলিক এলিটরা জাতপাত, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে সিদ্ধান্তপ্রণয়ন প্রক্রিয়ার চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিক দলগুলি তাই জাতীয় বিষয় থেকে সরে এসে আঞ্চলিক বিষয়কে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করছে। অঞ্চলগুলির প্রতি কংগ্রেসের বৈষম্যমূলক আচরণ, তাদের বঞ্চনার মনোভাব এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি আঞ্চলিক দলগুলির উদ্ভবে সাহায্য করেছে। অনেক রাজ্যে আঞ্চলিক দল কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতাসীন হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগু দেশম, পাঞ্জাবে অকালি দল, তামিলনাড়ুতে ডি.এম.কে/এ.আই.এ.ডি.এম.কে, অসমে অসম গনপরিষদ, মিজোরামে মিজো ন্যাশানাল ফ্রন্ট প্রভৃতি দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। অপরদিকে একটি জাতীয় দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেও বি.জে.পি. অদ্যাবধি এককভাবে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুত, হিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যগুলি এবং মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও কর্ণাটক ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বি.জে.পি-র তেমন কোন রাজনৈতিক প্রভাব নেই। আবার জনতা দল কার্যত বিহার, কর্ণাটক ও ওড়িশার মতো কয়েকটি রাজ্যের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হলেও অন্যত্র তাদের প্রভাব নামমাত্র। সি.পি.আই(এম) ও সি.পি.আই -এর রাজনৈতিক প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরা ও বিহার রাজ্যের মধ্যে কার্যত সীমাবদ্ধ রয়েছে। বস্তুত, জোট গঠন না করলে কোন দলের পক্ষেই বর্তমানে এককভাবে কেন্দ্রে সরকার গঠন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এক সময় জোট নীতির তীব্র বিরোধিতা করলেও কংগ্রেস এখন জোট রাজনীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে বাধ্য হয়েছে। অনুরূপভাবে বি.জে.পি.ও জোট গঠনের রাজনীতিতেই আত্মনিয়োগ করেছে। এই পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক দলগুলি জোট রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে ক্ষমতা লাভ করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

৩) ভারতীয় সমাজের অবহেলিত, দুর্বল অংশগুলির উদ্‌যোজন (mobilization) জোট রাজনীতি গঠনে অনেকাংশে সহায়তা করেছে। দীর্ঘকাল ধরে ভারতের কয়েকটি সম্প্রদায় অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রভাবিত করার মতো কোনো সামর্থ্য তাদের ছিল না। ১৯৬০ এর দশকের পর তাদের রাজনৈতিক উদ্‌যোজন ঘটে। তাদের অধিকার সম্পর্ক অধিকতর সচেতন হয় তারা। সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়াতে তারা চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। তারা বুঝতে পারে ভারতের রাজনীতিতে তারাও সমান অংশীদার। বর্তমানে তারা এত সক্রিয় হয়ে উঠেছে যে, কোনো প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের পক্ষে তাদের অবহেলা করা সম্ভব নয়। দলিত, আদিবাসী, অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়, ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রভৃতি গোষ্ঠী এর অন্যতম উদাহরণ।

৪) কেন্দ্রতিগ (Centrifugal) শক্তিগুলির প্রভাব বৃদ্ধিও জোট রাজনীতিকে শক্তিশালী করেছে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কেন্দ্রাতিগ শক্তিগলির সঙ্গে কেন্দ্রভিগ (Centgripetal) শক্তিগুলির দ্বন্দ্ব বরাবর ঘটেছে। কেন্দ্রাভিগ শক্তিগুলি ভারতে কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেও ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মেনে নিতে হয়েছিল। স্বাধীনতার পর আধিপত্যশীল দলব্যবস্থা

এককেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক গড়ে তুললেও এক ধরণের ঐকমত্য গড়ে তুলেছিল। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস আধিপত্যের অবসান ঘটলে বিভিন্ন রাজ্যে জোট সরকার গঠনের মাধ্যমে রাজ্যগুলির অধিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি উপস্থাপিত করা হয়। জোট-রাজনীতির মাধ্যমে একদিকে যেমন কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে, অপরদিকে, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরা প্রমুখ রাজ্যে আমূল সংস্কারবাদী প্রকৃতিও প্রতিফলিত হয়।[১]

৫) প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মতাদর্শহীনতাও জোট-রাজনীতির উদ্ভব ঘটাতে সাহায্য করেছে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছে যে কোন প্রকারে ক্ষমতা লাভ করা। এর জন্য যে কোন দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে তারা প্রস্তুত। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য সর্বপ্রকার ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে জোট গঠনে তারা অগ্রণী হয়। রাজনৈতিক মতাদর্শহীনতার জন্য দক্ষিণ পন্থী, মধ্যপন্থী ও বামপন্থী দলগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ক্ষমতার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি আদর্শ বিসর্জন দিয়েছে। এর ফলে রাজনীতিতে আদর্শের অবসান (end of ideolgoy) ঘটেছে।

৭.৬ জোট-রাজনীতির ফলাফল

ভারতে জোট-রাজনীতির প্রতিক্রিয়া সম্ভুত ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক ভারতে জোট রাজনীতি মোটামুটি সফল হলেও এর প্রতিকুল প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে ভারতীয় রাজনীতি অব্যাহতি পায়নি। জোট-রাজনীতির প্রথম নেতিবাচক দিক হল সংসদীয় গণতন্ত্রের যৌথ দায়িত্বশীলতার নীতি উপেক্ষা করা। মন্ত্রিসভার মধ্যে বিভিন্ন বক্তব্য শোনা যায়। জোট সরকারে নির্দেশ ও ঐক্যবোধ হারিয়ে যায়। জোট-ব্যবস্থায় কোনো প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর দলভুক্ত নন, এমন কোনো অবাধ্য ক্যাবিনেট সদস্য যৌথ দায়িত্বশীলতা, গোপনীয়তা রক্ষা প্রভৃতির মতো সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতিগুলি উপেক্ষা করলেও তাকে তিনি অপসারিত করতে পারেন না। অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে গঠিত ক্যাবিনেটের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। জোটের শরিক দলগুলির মধ্যে সব থেকে ছোট দলের অন্যায় এবং অযৌক্তিক দাবির কাছে প্রধানমন্ত্রীকে নতি স্বীকার করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, জোট রাজনীতির একটি অন্যতম প্রতিকুল প্রতিক্রিয়া হল এর স্থায়িত্বহীনতা, যা প্রশাসনের দক্ষতা খর্ব করে। নব্বই-এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রে একের পর এক জোট সরকার যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া স্বল্পকালের মধ্যেই অধিকাংশ সরকারের পতন ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে ভি.পি.সিং, চন্দ্রশেখর, দেবেগৌড়া, গুজরাল ও বাজপেয়ীর নেতৃত্বে গঠিত সরকারগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে কেবল রাও সরকার এবং বাজপেয়ীর নেতৃত্বে গঠিত তৃতীয় জোট সরকার তাদের কার্যকালের মেয়াদ পূরণ করেছে। কিন্তু এই দুটি সরকারও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ অনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেছিল। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর রাজ্যগুলিতে যে জোট-সরকার গড়ে উঠেছিল সেগুলিও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। এর পিছনে প্রধান কারণ ছিল জোটভুক্ত শরিকদলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ক্ষেত্রে ভিন্নতা এবং পারস্পরিক বিরোধিতা। উদাহরণ হিসেবে ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে

১. Anjali Ghosh, Peaceful Transition to Power, 1981, PP. C-I, C-2.

র যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক কালে উত্তরপ্রদেশের বি.জে.পি ও বহুজন সমাজ পার্টির জোটের কথাও বলা যেতে পারে। তবে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরার জোট-সরকারে মতাদর্শগত সমরূপতা থাকার জন্য সরকার দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছে। জোট রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দলত্যাগের রাজনীতি। 'আয়া রাম' এবং 'গয়া রাম' এর রাজনীতি সংসদীয় গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। সুযোগ সন্ধানী দলগুলির সদস্যরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বারবার দলত্যাগ করেছে। এমনও হয়েছে যে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সদল বলে পদত্যাগ করে অন্য দলে যোগ দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে অরুণাচলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী গেগং আপাং তার ৪১ জন সহযোগীকে নিয়ে ২০০৩ সালে বি.জে.পি. তে যোগদান করেছেন।

তৃতীয়ত, জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নির্বাচনের প্রাক্কালে আসন বন্টন, মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাক্কালে দপ্তর বন্টন, সরকার পরিচালনার প্রাক্কালে সরকারী আনুকুল্য বন্টন প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির মধ্যে মতবিরোধের ঘটনা প্রায়শই প্রকাশ্যে এসে পড়ে। সহযোগী রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলিকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীকে বৃহদায়তনের মন্ত্রিসভা গঠন করতে হয়। মন্ত্রিসভায় ঠাঁই না পেলেই ছোট ছোট শরিকও বিক্ষোভমূলক রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। এটি হল তাদের ক্ষমতালাভের কৌশলগত পদ্ধতি। অনেক সময় জাত-পাত, আঞ্চলিকতা প্রভৃতির ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি অনুসরণ করে। এই ধরণের রাজনীতি হল জোট রাজনীতির মুখ্য দ্বন্দ্ব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জোটভুক্ত দলগুলিরনিজেদের মধ্যে সংঘাত এবং বিভিন্ন দলের নেতা বা নেত্রীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত। উত্তরপ্রদেশে কল্যাণ সিং ও মায়াবতীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত তাদের জোট সরকারের পতন ডেকে এনেছিল। জাতীয় রাজনীতিতে ভি. পি. সিং, দেবেগৌড়া ও গুজরালের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন নেতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাতও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

চতুর্থত, জোট-রাজনীতি দলীয় শৃঙ্খলা ও নীতিকে খর্ব করে। জোট সরকারগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন নীতি রূপায়নে সমঝোতা করতে হয়। কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি বা পদক্ষেপ নিতে তারা ব্যর্থ হয়, কারণ স্থিরীকৃত নীতি বা কর্মসূচী রূপায়ণ অপেক্ষা ক্ষমতায় টিকে থাকা তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[১] আন্তঃপার্টি ঐক্যমত্য ছাড়া জোট সরকারের পক্ষে সাফল্য লাভ করা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের জোট সরকারগুলির মধ্যে ঐকমত্যের অভাবজনিত কারণে ক্যাবিনেটের পক্ষে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পঞ্চমত, জোট রাজনীতির ফলে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ প্রশ্রয় পায়। জোট সরকার যেহেতু জনকল্যাণ অপেক্ষা সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকেই শ্রেয় বলে মনে করে, সেহেতু মন্ত্রী ও আমলাদের মধ্যে নানাধরণের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ ব্যাপক আকার ধারণ করে। মতাদর্শের অবসান এবং মূল্যবোধের রাজনীতির অবনমনের ফলে ভারতীয় গণতন্ত্রে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ আমলাদেরও গ্রস করে ফেলেছে। আমলাদের মধ্যে রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া কার্যকর হচ্ছে। তার ফলে আমলাদের নৈতিক মূল্যবোধ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রশাসেনের বন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বাসা বাঁধছে। নরসীমা রাও ও বাজপেয়ীর আমলে দুর্নীতিমূলক কেলেঙ্কারীর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি

---

১. S. K. Khann, Contemporary India Politics, P. 127.

দেশবাসীর বিক্ষোভ অনেক ক্ষেত্রেই চাপা থাকছে না। এইভাবে কেন্দ্রে ও রাজ্যে প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল জোট সরকার গঠিত হওয়ার ফলে বিচার বিভাগের পক্ষে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠার প্রবণতা সাম্প্রতিককালে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। জনস্বার্থমূলক ও সামাজিক কার্যসংক্রান্ত মামলার বিচারে সুপ্রীম কোর্টে ও হাইকোর্টগুলি শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের এক্তিয়ারের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হযেছে। ভারতের রাজনীতির বি-প্রতিষ্ঠানীকরণ (institutionalzation) ঘটেছে।

জোট রাজনীতির উপরি-উক্ত নেতিবাচক দিনগুলি থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় রাজনীতিতে জোট রাজনীতির ইতিবাচক প্রভাবকে অস্বীকার করা যাবে না। জোট রাজনীতি বোঝাপড়ার রাজনীতি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে এবং আমূল সংস্কারবাদকে নিয়ন্ত্রণ করেছে; ভারতে ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদ বা স্বৈরাচারিতার প্রক্রিয়াকে থামিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে।[২] দক্ষিণপন্থীদের হিন্দুত্ব ও উদারীকরণের দাবি এবং বামপন্থীদের শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের দাবি - উভয়কেই অবদমন ও অকিঞ্চিৎকর করে তোলা সম্ভব হয়েছে জোট কৌশলের মাধ্যমে । এর ফলে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক বহুদলীয় ব্যবস্থা সমন্বিত গণতন্ত্রে মধ্যপন্থা নীতিকে অবিসংবাদিত আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। মধুলিমায়ে বলেছন যে, পাঞ্জাবে অকালি দল ও বি জে পির জোটের মাধ্যমে হিন্দু ও শিখের মধ্যে দ্বন্দ্ব হ্রাস পেয়েছে।[৩] জোর্ট রাজনীতির বিকাশের ফলে রাজ্যগুলি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছে। রাজ্য ও অঞ্চলগুলিতে ক্রমবর্ধমান স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি যথাযথভাবে কার্যকর হয়।

৭.৭ সারসংক্ষেপ

ভারতের রাজনীতিতে জোট-ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, সাম্প্রতিক ভারতের প্রতিযোগিতামূলক বহুদলীয় ব্যবস্থায় বিশেষ কোনো একটি দলের পক্ষে এককভাবে সরকার গঠন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই অবস্থায় জোট সরকারকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় বিকল্প' হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ভারতের রাজনীতিতে ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর জোট রাজনীতি আধিপত্যশীল দলীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েছে। কংগ্রেসের একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব হয়েছে। ১৯৬৭ সালের পূর্বে যে জোট সরকার গড়ে উঠেছিল তা ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ১৯৬৭ সালের নির্বাচন এক বিভাজনকারী রেখারূপে দেখা দেয়। কংগ্রেসের অবক্ষয় সূচিত হয়। বিরোধী দলগুলির ক্ষমতায় আসার সুযোগ গড়ে ওঠে। প্রথমদিকে জোটরাজনীতি ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় কিছু সংকট সৃষ্টি করলেও পরবর্তীকালে জোট-রাজনীতি ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে।

সাম্প্রতিক ভারতে সব দলই উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এককভাবে কোনো দলই আর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য জোট গটনের প্রয়োজনীয়তা

২. Ibid. P. 128

৩. Ibid.

উপলব্ধি করেছে। বি জে পি চেষ্টা করছে এন ডি এ কে টিকিয়ে রাখার জন্য। সি পি এম একটি তৃতীয় জোট গঠনের চেষ্টা করছে। কিন্তু তৃতীয় ফ্রন্টকে সফল করে তোলা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই বি জে পি বিরোধী জোট গড়ে তোলার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গেও অনুক্ত জোট গড়ে তুলেছে সি পি এম। আঞ্চলিক দলগুলি জাতীয় স্তরে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করার জন্য জোট রাজনীতির কৌশল অবলম্বন করছে। বস্তুত, কেবলমাত্র রাজনৈতিক সুবিধাবাদ এবং ক্ষমতা লাভকে প্রশ্রয় না দিয়ে সুনির্দিষ্ট অভিন্নকর্মসূচীর ভিত্তিতে যদি জোট গড়ে ওঠে, তাহলে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রকে কৃতকার্য করতে জোট রাজনীতি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে।

একথা ঠিক যে, জোট রাজনীতি সরকারকে দুর্বল করেছে, সরকারের স্থায়িত্ব খর্ব করেছে। এর হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য অনেকে সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব কম হলেও সরকারের দায়িত্বশীলতা অনেক বেশি,। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসতি ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব বেশি, কিন্তু দায়িত্বশীলতা কম। স্বাধীনতা - উত্তর পর্বে ভারতের সংবধিান প্রণেতারা যখন সংবধিান রচনা করেছিলেন তখন আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহিরাক্রণের সম্ভাবনা ছিল। ঐ অবস্থাতেও তাঁরা ভারতের গণতন্ত্রকে সফল করে তোলার জন্য স্থায়িত্বকে প্রাধান্য দেননি, দায়িত্বশীলতাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংসদীয় ব্যবস্থার অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা যাবে না। তাই জোট সরকারকে শক্তিশালী ও স্থায়ী করে তোলার জন্য নির্বাচনী সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। সেজন্য প্রয়োজন গণ-সচেতনতা।

অনুশীলনী — ৩

★ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ★

১। ভারতে জোট-রাজনীতি গড়ে ওঠার কারণগুলি কী?
২। ভারতে জোট-রাজনীতির দু'টি নেতিবাচক দিক উল্লেখ কর।
৩। ভারতে জোট-রাজনীতির কোনো ইতিবাচক প্রভাব আছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।
৪। আঞ্চলিক দলগুলির উদ্ভব কীভাবে জোট গঠনে সহায়তা করেছে?
৫। ভারতে জোট রাজনীতির ভবিষ্যৎ কী ?

★ রচনাত্মক প্রশ্ন ★

১। ভারতে জোট-রাজনীতির কারণ ও ফলাফল পর্যালোচনা কর।
২। ভারতে জোট-রাজনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ কর।

৭.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

আধিপত্যশীল দলীয় ব্যবস্থা (Dominant Party System) ঃ- স্বাধীনতার পর ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেইসময় ভারতে তত্ত্বগতভাবে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও বাস্তবে কংগ্রেস দলের একক প্রাধান্য ও আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মরিস জোনস্, অ্যালান বল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঐ সময়ের (১৯৪৭-১৯৬৬) ভারতের দলীয় ব্যবস্থাকে আধিপত্যশীল দলীয় ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছেন।

দ্বিপ্রণালী বিশিষ্ট বহুদলীয় ব্যবস্থা (Bi-modal multi-party system) ঃ- সাম্প্রতিক কালের ভারতের দলীয় ব্যবস্থাকে অধ্যাপক রাখহরি চ্যাটার্জী দ্বি-প্রণালী বিশিষ্ট বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করেছেন। এখানে তত্ত্বগতভাবে বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকলেও জাতীয় স্তরে কার্যত কংগ্রেস ও বি জে পি-র নেতৃত্বে গঠিত জোটের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে থাকে।

কেন্দ্রাতিগ শক্তি (Centrifugal Force) ঃ- কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে এমন শক্তি। এই শক্তি কেন্দ্রকে দুর্বল করে, বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রাধান্য দেয়।

কেন্দ্রাভিগ শক্তি (Centripetal Force) ঃ- কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি। এই শক্তি কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে। এককেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক বাড়িয়ে তোলে।

কংগ্রেস ব্যবস্থা (Congress System) ঃ- রজনী কোঠারি স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে নেহেরুর আমলে জাতীয় কংগ্রেসের আধিপত্যকে 'কংগ্রেস ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ ঐ সময় জাতীয় কংগ্রেস ছিল অনেকগুলি দলের দল এবং 'ঐকমত্যের দল'।

এন ডি এ (NDA) ঃ- এর পুরো কথা হল 'ন্যাশন্যাল ডেমোক্রাটিক অ্যালায়েন্স' বা জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা। বর্তমানে বি জে পি-র নেতৃত্বে গঠিত এই জোট ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

ইউ . পি. এ. (UPA) ঃ- এর পুরো কথা হল 'ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স' বা সংযুক্ত প্রগতিশীল মৈত্রী। কংগ্রেস পরিচালিত এই জোট বর্তমানে সরকার গঠন করেছে।

৭.৯ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

★ সংক্ষিপ্ত উত্তর ★

১। অনুচ্ছেদ ৭.১ ও ৭.৫ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৭.২ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ৭.২ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ৭.৩ দেখুন।

★ রচনাত্মক প্রশ্ন ★

১। অনুচ্ছেদ ৭.১, ৭.২ ও ৭.৩ দেখুন।

অনুশীলনী - ২

★ সংক্ষিপ্ত উত্তর ★

১। অনুচ্ছেদ ৭.৪.২ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৭.৪ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ৭.৪.২ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ৭.৪.১ দেখুন।

৫। অনুচ্ছেদ ৭.৪.২ দেখুন।

৬। অনুচ্ছেদ ৭.৪.১ ও ৭.৪.২ দেখুন।

★ রচনাত্মক প্রশ্ন ★

১। অনুচ্ছেদ ৭.৪ ও ৭.৪.১ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৭.৪.২ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ৭.৪.১ ও ৭.৪.২ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ৭.৪.১ ও ৭.৪.২ দেখুন।

৫। অনুচ্ছেদ ৭.৪, ৭.৪.১ ও ৭.৪.২ দেখুন।

অনুশীলনী - ৩

★ সংক্ষিপ্ত উত্তর ★

১। অনুচ্ছেদ ৭.৫ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৭.৬ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ৭.৬ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ৭.৫ দেখুন।

৫। অনুচ্ছেদ ৭.৬ ও ৭.৭ দেখুন।

★ রচনাত্মক প্রশ্ন ★

১। অনুচ্ছেদ ৭.৫, ৭.৬ ও ৭.৭ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৭.৫ ও ৭.৬ দেখুন।

৭.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

★ Essay type ★

1. Discuss the casuses and consequences of politics becoming coalitional in India since 1967.

2. Examine the causes and consequences of coalition politics at the Union level in India since independence.
3. Analyse the growth and development of coalition politics in India since independence.

★ Short type ★

1. Mention two basic features of the coalition governments formed at the centre since 1996.
2. What is meant by the 'Congress System' of politics?
3. Whay is politics becoming coalitional in India in recent years ?
4. Bring out two major factors leading to the politics of coalitions at the centre of the Indian Union.
5. What is meant by 'Coalition'?
6. How will you classify coalitions in India?

৭.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. J. C. Johari, Vishal Publications, Delhi, 1976
2. K. P. Karuna Karma (ed) Coalition Governments in India: Problems and Prospects, 1975, Indian Institute of Advanced Study, Simla.
3. N. C. Sohani (ed), Coalition Politics in India, 1971, New Academic Publishing Company, Jullunder.
4. Sukadev Nanda, Coalition Politics in Orissa, 1979, Sterling Publishers Pvt. Ltd. New Delhi.
5. K. K. Ghai, India Government and Politics, 2002, Kalyani Publishers, New Delhi.
6. S.K. Khanna, Contemporary Indian Politics 1999, Discovery Publishing House, New Delhi.
7. Anjali Ghosh, Peaceful Transstion to Power, 1989, Firma KLM Pvt. Ltd. Kolkata.
8. Rakhahari Chatterje (ed) Politics India, 2001, South Asian Publishers, New Delhi.
9. Zoya Hasan (ed), Politics and the State in India, 2000, Sage Publications, New Delhi.
10. Sushil Ranjan roy, Coalition Politics and the Federalsing Process in India, With Special Reference to West Bengal's Relations with the Centre (1967-1970). 1984, M. Phil. Dissertation, B.U.

একক - ৮ ভারতে পরিবেশ বিষয়ক রাজনীতি : বিকল্প উন্নয়নের ধারণা

(Politics of Enviroment in India : The Concept of Alternative Devel opment)

গঠন —

৮.০ উদ্দেশ্য

৮.১ প্রস্তাবনা

৮.২ বাস্তব্যবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

৮.৩ পরিবেশ বনাম উন্নয়ন

৮.৪ ভারতে পরিবেশের সংকট

৮.৫ বিকল্প উন্নয়নের তত্ত্ব

- ৮.৫.১ কট্টর গান্ধীবাদী
- ৮.৫.২ পরিবেশবাদী মার্কসবাদী
- ৮.৫.৩ যথোপযুক্ত প্রযুক্তি
- ৮.৫.৪ বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণবাদী
- ৮.৫.৫ পরিবেশবাদী নৈরাজ্যবাদী
- ৮.৫.৬ পরিবেশবাদী নারীবাদী

৮.৬ ভারতে পরিবেশ আন্দোলন

- ৮.৬.১ ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

৮.৭ ভারতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ আন্দোলন

- ৮.৭.১ চিপকো আন্দোলন
- ৮.৭.২ নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন
- ৮.৭.৩ সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন

৮.৮ পরিবেশ আন্দোলনের প্রধান বিচার্য বিষয়সমূহ

৮.৯ ভারতে পরিবেশ সমস্যার সমাধানে গৃহীত ব্যবস্থাদি

৮.১০ সারসংক্ষেপ

৮.১১ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৮.১২ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৮.১৩ নমুনা প্রশ্নাবলী

৮.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৮.০ উদ্দেশ্য

মানুষের সমাজ আজ পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। পরিবেশের নানা উপাদান বিপর্যয়ের মুখে। স্বভাবতই তাতে বাস্তুরীতির ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে। পরিবেশের এই সমস্যা এমন এক ভয়াবহ আকার ধারণ করতে চলেছে যে, মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠেছে। তাই এটি শুধু আর পরিবেশ বিজ্ঞানীদের বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিভিন্ন বিষয়ের গবেষক ও নীতি-নির্ধারক, সমাজ সচেতন মানুষ, সংগঠন ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এই পরিবেশগত সমস্যা। তাই পরিবেশ সমস্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরও অন্যতম আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই এককের মধ্যে ভারতের পরিবেশ বিষয়ক রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যাবে :

১) ভারতে পরিবেশ সংকটের কারণ।

২) বিকল্প উন্নয়নের ধারণা।

৩) ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য।

৪) পরিবেশ সমস্যার সমাধানে ভারতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.১ প্রস্তাবনা

পরিবেশের সঙ্গে মানুষ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অনুকূল পরিবেশ মানুষের সার্বিক বিকাশের সহায়ক। অন্যদিকে প্রতিকূল পরিবেশ মানুষের জীবনযাপনকে বিপন্ন করে তোলে। পরিবেশ থেকেই মানুষ বেঁচে থাকবার এবং বৌদ্ধিক, নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির রসদ সংগ্রহ করে। মানুষ পরিবেশের ওপর যেমন নির্ভরশীল তেমনি পরিবেশকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। বিবর্তনের পথে মানুষ আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে, পরিবেশের ওপর সে অভূতপূর্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন উন্নয়ন ঘটেছে, অপরদিকে এর উপজাত হিসাবে প্রতিনিয়ত পরিবেশ ধ্বংসের বীজ রোপন করা হচ্ছে। মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে এক নতুন ধরনের ধারণা গড়ে তোলে বাস্তব্যবিদ্যা। এই বিষয় এক সংস্কারমূলক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে।

বাস্তব্যবিদ্যা মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে এক বিকল্প ধারণা উপস্থাপন করে। এই ধারণায় মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক সুসামঞ্জস্য সম্পর্কের কথা বলা হয়। কিন্তু ইউরোপীয় আধুনিকতা ও আলোকপ্রাপ্তির যুগে প্রগতির উপাদান হিসাবে বিজ্ঞানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই যুগের মানুষ শিক্ষা পেয়েছিল যে, প্রকৃতি হল ভোগ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্যের উপাদান। ধনতন্ত্র ও শিল্পায়নের যুগে মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্ক বিষয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি নানাধরনের পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হয়েছে। পরিবেশের অবক্ষয় ঘটেছে। অরণ্য হনন ঘটেছে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। যদিও উন্নয়ন ও প্রগতির নামে এই সব ঘটছে, কিন্তু বাস্তবে শিল্পভিত্তিক সমাজে ব্যবসা ও মুনাফার স্বার্থে পরিবেশের এই বিপর্যয় ঘটছে। এরই বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে বাস্তু-সংস্থানবাদ গড়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে বাস্তুসংস্থানবাদ ও রাজনীতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিকাশ

লাভ করেছে। পরিবেশগত সমস্যা রাজনীতিরও বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে উন্নয়নের নামে পরিবেশ ও জনজীবনে যে সংকট সৃষ্টির আশংকা দেখা দিয়েছে, তারই বিরুদ্ধে সহনশীল উন্নয়নের ধারণা হিসাবে বিকল্প উন্নয়নের ধারণা গড়ে উঠেছে। পরিবেশগত নৈতিকতা দাবি করে যে, প্রকৃতিকে যথোপযুক্ত সম্মান দিতে হবে; মানুষের মতো অন্যান্য প্রাণীরও অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। সহিষ্ণুতা, সংযম, অহিংসা প্রভৃতি মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে হবে। বাস্তুসংস্থানবাদ আধুনিকতার বিরোধিতা করে মানবজীবন সম্পর্কে উত্তর-বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, যেখানে ব্যক্তিকে সমগ্র তথা প্রকৃতির অংশ হিসেবে দেখা হয়। পরিবেশ সচেতনতা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ আন্দোলনের যৌক্তিকতা দেখায়। নারী, আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন প্রভৃতির মতো পরিবেশ আন্দোলনও নয়া সামাজিক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে।

৮.২ বাস্তব্যবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

জীববিদ্যার একটি উপক্ষেত্ররূপে ইকোলজি বা বাস্তব্যবিদ্যা গড়ে উঠেছে। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান প্রাণীবিজ্ঞানী আর্নষ্ট হেকেল (Ernst Hackel) প্রথম 'ইকোলজি' শব্দটি ব্যবহার করেন।[১] গ্রীক শব্দ 'ওইকোস' (Oikos) এবং 'লোগোস' (Logos) থেকে 'ইকোলজি' কথাটি এসেছে। 'ওইকোস' কথার অর্থ বসস্থান এবং 'লোগোস' এর অর্থ জ্ঞান। সুতরাং ইকোলজির অর্থ হল বাসস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান। বিভিন্ন বিজ্ঞানী ইকোলজি শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, জীব সম্প্রদায় সম্বন্ধে জ্ঞানই হল ইকোলজি। আবার অনেকে মনে করেন যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিবেশের সঙ্গে এদের মিথাস্ক্রিয়া হল ইকোলজি। বস্তুত বিজ্ঞানের যে শাখায় জীব এবং তাদের পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে জানা যায় তাকে ইকোলজি বা বাস্তববিদ্যা বলে।[২] পরিবেশ আবার মূলত দুধরনের উপাদান নিয়ে গঠিত - (১) জৈব উপাদান এবং (২) অজৈব উপাদান। জৈব উপাদান গড়ে ওঠে গাছপালা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, মানুষ প্রভৃতিকে নিয়ে। আর অজৈব উপাদান গড়ে ওঠে মাটি, জল, বাতাস, আলো, উষ্ণতা, আর্দ্রতা প্রভৃতিকে নিয়ে। প্রতিটি সত্তা তার পরিবেশের সঙ্গে জটিল সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। বাস্তব্যবিদ্যা এদের আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান করে। কোন বিশেষ প্রজাতির ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের পরিবেশ গ্রহণযোগ্য হবে — তা অনুসন্ধান করে বাস্তব্যবিদ্যা।

মানুষ পৃথিবীর নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকে। অন্য কোন গ্রহে সে টিকে থাকতে পারে না। মাটি, জল, উদ্ভিদ, প্রাণী প্রভৃতি সমাজের বস্তুতান্ত্রিক পরিকাঠামো গঠন করে। এই পরিকাঠামোর গ্রহণযোগ্যতা ও গুণগত মান মানবসমাজের সকল দিক — অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক কাঠামো ও সংস্কৃতি — প্রভাবিত করে থাকে। অপরদিকে মানুষের ক্রিয়াকলাপও প্রকৃতির গঠন পরিবর্তন করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন মানুষের জীবনধারার ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেমন, অতিমাত্রায় অরণ্য হনন জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। এর ফলে কৃষিকার্য বিঘ্নিত হয় এবং মানুষের জীবনযাপন বিপর্যস্ত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে

1 Satyabrata Chakraborty, Environment and Politics in India, in Rakhahari Chatterjee (ed), Politics India, P. 417

2 Britannica Ready Reference Encyclopedia, vol. 3, P. 213.

যে, পরিবেশের প্রকৃতি, এর অবক্ষয়ের কারণ ও ফলাফল নিয়ে অনুসন্ধান সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত পরিবেশের সঙ্গে মানুষের আচরণের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সামাজিক বাস্তব্যবিদ্যা সমাজবিজ্ঞানের শাখা হিসাবে গড়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছেও পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পরিবেশের অবক্ষয় প্রায়শই রাজনৈতিকভাবে অনুমোদিত এবং সংগঠিত হয়ে থাকে। আবার পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতেও রাজনৈতিক সমর্থন প্রয়োজন হয়। বস্তুত পরিবেশ সংকট আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পরিবেশনীতি এক অন্যতম সরকারী নীতিতে পরিণত হয়েছে। পরিবেশের অবক্ষয় প্রতিরোধকল্পে প্রতিটি প্রতিটি সরকারকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। সরকারী উদ্যোগ ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। অনেক রাজনৈতিক দল পরিবেশগত সমস্যাকে তাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছে। স্থানীয় স্তরে নির্বাচনী রাজনীতিতে পরিবেশ সমস্যা বিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী পরিবেশ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। পরিবেশ নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আবার সামাজিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। কিছু পরিবেশ সমস্যা, যেমন — বায়ুদূষণ, জলদূষণ প্রভৃতি সমগ্র জনসমাজকে প্রভাবিত করে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আবার সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, অরণ্য হনন কাঠব্যবসায়ীদের কাছে লাভজনক; কিন্তু এর দ্বারা অরণ্যবাসীদের মৌল প্রয়োজন মেটানোর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। পরিবেশের অবনমন প্রাকৃতিক সম্পদকে নিয়ে সামাজিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। ভারতের মতো কয়েকটি দেশে বিচারবিভাগের পরিবেশগত সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, পরিবেশ সমস্যা আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিরোধের উৎসে পরিণত হয়েছে। পরিবেশ সম্পর্কে উত্তর-দক্ষিণ বিতর্ক দেখা দিয়েছে। উন্নত দেশগুলি পরিবেশ অবনমনের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকে দায়ী করছে। অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলি উন্নত দেশগুলির উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে এর জন্য দায়ী করছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও পরিবেশগত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এইসব দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, পরিবেশের সঙ্গে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার এক মিথষ্ক্রিয়া ঘটেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় পরিবেশ সমস্যাও তাই এক অন্যতম বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৮.৩ পরিবেশ বনাম উন্নয়ন

পরিবেশবাদীরা 'আধুনিক' অর্থনৈতিক উন্নয়ন — ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক উভয়েরই তীব্র সমালোচনা করেন। আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকেই উন্নয়ন বলে অভিহিত করা হয়। যে দেশ যত বেশি উৎপাদন করে সেই দেশ তত উন্নত বলে পরিগণিত হয়। অর্থনীতিবিদ্‌রা মোট জাতীয় উৎপাদন (জি. এন. পি.) -এর ভিত্তিতে উন্নয়নের পরিমাণ করে থাকেন। পরিবেশবাদীরা মনে করেন, যে, এই বৃদ্ধিভিত্তিক উন্নয়নে সম্পদ ব্যবহারের নিয়ম-রীতি অনুসরণ করা হয় না। এর দ্বারা উন্নয়ন হয়ে পড়ে অসহনশীল এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংসসাধনকারী। উন্নয়নবাদীরা বলেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদকে সর্বাধিক ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিও এই মত পোষণ করে যে, দারিদ্র্যই হল দূষণের অন্যতম কারণ।

পরিবেশবাদকে পাশ্চাত্যের এলিটীয় ধারণা বলে মনে করা হয়। অনেকের মতে, অর্থনৈতিক বিকাশ নয়, জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ হল পরিবেশের অবনমনের উৎস।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শিল্পায়ন ও নগরায়নের যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সূচিত হয়েছে তার ফলে সারা বিশ্বে, বিশেষ করে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে নানা ধরনের পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তবে বিংশ শতাব্দীকে আধুনিকতা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যুগ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।[৩] এর ফলে মানুষ প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করার জন্য সচেষ্ট হয়। তৃতীয় বিশ্বও পাশ্চাত্যের আধুনিকতাকে অন্ধভাবে অনুতকরণ করার চেষ্টা করতে থাকে। গত চার দশক ধরে তাই আধুনিক উন্নয়নের পরিবেশগত সমালোচনা বিশেষ প্রাধান্য পায়। মুক্ত বাজার ভিত্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজের কোন নৈতিক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অতিমাত্রায় ভোগের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বৃদ্ধিমূলক অর্থনীতি পরিবেশে নানা ক্ষতিকর সামগ্রী উদ্‌গীরন করছে। বাজারনীতি প্রকৃতির নীতিকে লঙঘন করছে। এর ফলে জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। জীববৈচিত্র্যের ওপর আক্রমণ সামাজিক ও সংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকেও ক্ষুণ্ণ করছে। মুক্তবাজারনীতির ফলে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রকে সমাবস্থায় আনার চেষ্টা হচ্ছে।

আধুনিক উন্নয়নের ফলে যে পরিবেশগত অবনমন ঘটছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে তাতে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ তাদের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। জীবনধারনের জন্য তারা প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু উন্নয়নের নামে তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার পরিবর্তন ঘটানো হয়। পরিবেশবাদীরা মনে করেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আধুনিক অর্থনীতি মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। এর ফলে ধনী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৃত্রিম প্রয়োজন মেটাতে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হয়। আধুনিক প্রযুক্তির একটি উদাহরণ হল সবুজ বিপ্লব। এর ফলে একদিকে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বেড়েছে, অপরদিকে জমির উর্বরতা শক্তি ও মাটির নীচের জল নষ্ট করে পরিবেশের অবনমন ঘটিয়েছে। আধুনিক উন্নয়নের একটি অঙ্গ হল বৃহৎ প্রকল্প। এইসব বৃহৎ প্রকল্প দরিদ্র মানুষদের তাদের আবাস থেকে বিচ্যুত করে, পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করে জনসাধারণকে তাদের অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

বৃদ্ধিমূলক উন্নয়নের কুফল বিশ্লেষণ করে অনেকে বিকল্প উন্নয়নের ধারণা গড়ে তোলেন। পরিবেশবাদীর মনে করেন যে, যুক্তিসঙ্গত সহনশীল পদ্ধতিতে উন্নয়ন হওয়া প্রয়োজন।[৪] সহনশীল উন্নয়ন পৃথিবীর টিকে থাকাকে অগ্রাধিকার দেয়। সহনশীল উন্নয়ন বলতে সেই ধরনের উন্নয়ন বোঝায় যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর সামর্থ্যর সঙ্গে কোন আপোষ না করে বর্তমানের প্রয়োজন মেটায়। অর্থাৎ আমাদের উত্তরসূরিদের জন্য যে পৃথিবী আমরা রেখে যাচ্ছি তার মান যেন আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছি তার থেকে খারাপ না হয়। পরিবেশবাদীরা মনে করেন যে, সহনশীল উন্নয়ন কখনো মুনাফা বৃদ্ধিমূলক এবং অসমদর্শী অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। যে কোন অর্থনৈতিক কাজকে পরিবেশ এবং বাস্তুসংস্থান -এর

---

3 Satyabrata Chakraborty, Enviroment and Politics in India, in Rakhahari Chatterjee, Politics India, P. 421.

4 V. K. Prabhakar, World Environment, PP. 47-48.

মাপকাঠিতে পরিচালিত করতে হবে। ধনীদের ভোগের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে সাধারণ মানুষের মৌল প্রয়োজন মেটানোর ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। সহনশীল উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মূল্যবোধ ব্যবস্থাকে নতুন রূপ দিতে হবে। কোন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বৈচিত্র্য ও সাম্য যদি মৌল নীতি হিসাবে গৃহীত হয় তবে সেখানে এই সহনশীল উন্নয়ন সম্ভব হবে। অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক কাঠামো সহনশীল উন্নয়নের অঙ্গ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আগ্রাসনমূলক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের পরিবর্তে জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। পরিশেষে সহনশীল উন্নয়নে বলা হয় যে, ভোগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি জনগণকে অনুসরণ করতে হবে। তবে সহনশীল উন্নয়নের পূর্বশর্তগুলি এখনও সাধু ইচ্ছার প্রকাশ রূপেই রয়েছে।

৮.৪ ভারতে পরিবেশের সংকট

অনেক পরিবেশবাদী মনে করেন যে, প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতীয় সভ্যতায় বাস্তুসংস্থানগত প্রক্রিয়াকে সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা মান্য করা হত। অনেকের মতে, জাত ব্যবস্থা সম্পদ ব্যবহারের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে সমর্থন করেছিল। এর ফলে সম্পদের সহনশীল ব্যবহার হত। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, যেখানে সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে ইংরেজরা ভারতের বাস্তুসংস্থানগত ও সামাজিক কাঠামোর ওপর ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। শিল্পবিপ্লবের ফলে ঔপনিবেশিকতাবাদ সম্পদকে জীবিকানির্বাহের বদলে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকল। বাণিজ্যিকীকরণ, সাধারণ সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অবলুপ্তি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় ঘটিয়ে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করেছিল এবং দরিদ্রদের আরও প্রান্তিকীকরণ ঘটিয়েছিল।

ঔপনিবেশিকতা-উত্তর যুগেও দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশকেই জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। নেহরুর আমলে ভারত বৃহদায়তন শিল্পভিত্তিক বৃদ্ধির পাশ্চাত্য কৌশলকেই গ্রহণ করেছিল। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতও বৃদ্ধিমূলক উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করেছে। আধুনিক শিল্পের উপজাত সামগ্রী পরিবেশ নানা ক্ষতিকর রাসায়নিক যৌগ উদ্‌গীরণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, অ্যামোনিয়া, সালফার অক্সাইড, হাইড্রো কার্বন ইত্যাদি। এসবের পরিমাণ বৃদ্ধি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ জলকে দূষিত করছে। শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ মিশে মাটিকে দূষিত করছে। শিল্পাঞ্চলের বিকট আওয়াজও পরিবেশ দূষিত করছে।

আধুনিক শিল্পবিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ হল শক্তিসম্পদের উত্তরোত্তর ব্যবহার বৃদ্ধি। প্রচলিত শক্তির উৎস সীমিত। নির্বিচারে এর ব্যবহারে স্বভাবতই প্রাকৃতিক সঞ্চয়ে টান পড়েছে। ভারতে কয়লা ব্যাপকভাবে ব্যবহারের ফলে কয়লাখনি স্বভাবতই নিঃশেষিত হচ্ছে। জলবায়ু ও কৃষির ওপর এর প্রভাব পড়ছে। কৃষি এলাকাভুক্ত সাধারণ মানুষকে খাদ্যশস্য আমদানীর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। প্রচলিত শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পরিবেশের ওপর পড়েছে। এর ফলে নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদন মহাকাশের ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

ভারতের কৃষিতে আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষি-সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন না করে, সবুজবিপ্লবের প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে। এর দ্বারা মুষ্টিমেয় ধনী চাষীরাই উপকৃত হয়েছে। এর ফলে উৎপাদন বাড়লেও কীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির ব্যবহারে মাটির দূষণের মাত্রা বাড়ছে। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী নানারকম সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বড় বড় সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। মাটির নীচের জল তোলারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সবের ফলে পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দরিদ্র জনসাধারণ আবাসচ্যুত হয়েছে। তেহ্‌রি বাঁধ, নর্মদা বাঁধকে কেন্দ্র করে তাই পরিবেশ আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

অরণ্য পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার একটি প্রধান উপাদান। ১৯৫২ সালে যে জাতীয় বননীতি গৃহীত হয়েছিল, তার প্রধান উদ্দেশ্য হল দেশের ভূমি ক্ষেত্রের তিন ভাগের একভাগ জাতীয় বনভূমি হিসাবে সংরক্ষিত করা। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্য ছাড়া ভারতের কোথাও এই নির্দিষ্ট নেই। ১৯৮০-র দশকে ভারতের বনভূমি দেশের মোট ভূমির ১৩.৯ শতাংশে পরিণত হয়েছিল।[৫] জনসংখ্যাবৃদ্ধি, কৃষিজমির বিস্তার, নগরায়ন, শিল্পায়ন, বিশ্বায়ন অরণ্য থেকে যথেচ্ছভাবে উপকরণ সংগ্রহ করে মানুষের নিজের কাজে ব্যবহার করা প্রভৃতির ফলে প্রাকৃতিক বনভূমিকে নির্বিচারে কাটা হচ্ছে। এর ফলে ভূমিক্ষয় দেখা দিয়েছে। পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তবে সাম্প্রতিককালে অরণ্য সংরক্ষণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারত জীব-বৈচিত্র্যের এক উল্লেখযোগ্য দেশ। জীব-বৈচিত্র্যের প্রধান উপাদান হচ্ছে উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকূল। জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কেবল নৈতিক দিক থেকে বাধ্যতামূলক নয়। সমস্ত জীবজগৎ এক অদৃশ্য বাস্তুতন্ত্রের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। মানুষের নির্বিচার ক্রিয়াকলাপের ফলে আজকাল বহু প্রজাতি বিপন্নের মুখে। এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। তাই সাম্প্রতিককাকে এক প্রজাতির বিলুপ্তি প্রজাতির অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তুলেছে।

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো ভারতেও নগরায়ন ও যানবাহন ব্যবস্থার বিকাশ ক্ষতিকর গ্যাসের উৎপাদন ও বিস্তৃতির জন্য দায়ী। এইসব গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রভাবে তাপমাত্রা স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করতে চাইছে। 'গ্রীন হাউস গ্যাস'-এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। শহরগুলিতে শব্দের মাত্রা সহনশীলতার অনেক ওপরে অবস্থান করছে। এছাড়া ভারতের জনসংখ্যাবৃদ্ধি পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা মানেই দারিদ্রের প্রসার। আর এই দরিদ্র মানুষে বেঁচে থাকার তাগিদে পরিবেশের আরও অবনমন ঘটায়।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পরিবেশের ওপর যে প্রতিকূল প্রভাব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, ভারতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতে পরিকাঠামোগত সংস্কার নীতির প্রবর্তর লক্ষ্য করা যায়। ভারত সরকার দীর্ঘস্থায়ী ও সহনশীল উন্নয়নের পদ্ধতি

5 Satyabrata Chakraborty, P. 430.

গ্রহণ না করে 'নয়া অর্থনৈতিক নীতি' গ্রহণ করেছে। এর উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক বৃদ্ধি জোরদার করা এবং বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ভারতকে একীভূত করা। ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, মুক্ত বাজার নীতি গড়ে তোলা প্রভৃতি হল এই নীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিশ্বায়নের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বের বহুজাতিক সংস্থার দাপট বেড়েছে এবং কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছে। শিল্প মালিকরা কারখানার পরিবেশকে স্বাস্থ্যসম্মত করার বিষয়টিকে অবহেলা করছেন। মানুষের ভোগের প্রক্রিয়ায় উচ্ছৃঙ্খলতা এসেছে। প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং পরিবেশের অবক্ষয় ঘটছে। পরিবেশ দূষণ ক্রমশ সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বস্তুত, ভারতের বৃদ্ধিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া একদিকে যেমন অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছে, অপরদিকে পরিবেশের অবনমন ঘটিয়েছে।

অনুশালনী - ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :-

১. পরিবেশের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক কী?
২. বিকল্প উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?
৩. সহনশীল বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন কী?
৪. ভারতে পরিবেশের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব কী?

রচনাত্মক প্রশ্ন :-

১. ভারতে পরিবেশ সংকটের কারণ বিশ্লেষণ কর।

৮.৫ বিকল্প উন্নয়নের তত্ত্ব

সাম্প্রতিককালে পরিবেশ সংকটের ফলে ভারতের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। সরকারি ও বেসরকারি উভয় স্তরেই পরিবেশ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের লুণ্ঠনমূলক শোষণের বিরুদ্ধে বাস্তুসংস্থানমূলক আন্দোলন ক্রমবর্ধমান। বাজার অর্থনীতির চাপে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার তাগিদে প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠনমূলক শোষণ এবং দরিদ্র ও দুর্বলদের অস্তিত্ব সংকট বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। পরিবেশবাদীরা তাই চেষ্টা করেন প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ভোগ-ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করতে, পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করতেএবং পরিবেশের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে। তাঁরা বিকল্প উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতাদর্শ উপস্থাপিত করেন। রামচন্দ্র গুহ মতাদর্শের ভিত্তিতে চার ধরনের পরিবেশবাদী আন্দোলনকারীর কথা বলেছেন।[৬] এঁরা হলেন, (১) কট্টর গান্ধীবাদী,(২) পরিবেশবাদী মার্কসবাদী, (৩) যথোপযুক্ত প্রযুক্তিবাদী এবং (৪) বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণবাদী। এগুলির সঙ্গে আরো দু'টি ধারা যুক্ত করা যেতে পারে, যথা, (১) নৈরাজ্যবাদী এবং (২) নারীবাদী।

6 Ram Chandra Guha, Idedogical in Indian Environmentalism, in EPW, Dec. 3, 1988.

৮.৫.১ কট্টর গান্ধীবাদী

কট্টর গান্ধীবাদীরা আধুনিক শিল্পসভ্যতার ঘোর বিরোধী। তাঁদের মতে, প্রাচ্য সভ্যতা মূলত অবস্তুবাদী। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতে শিল্পায়নের সূত্রপাত ও বিকাশ ঘটে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকেই তাঁরা যাবতীয় জাতীয় সমস্যার মূল কারণ বলে মনে করেন। তাই তাঁরা প্রাক্-ঔপনিবেশিক ও প্রাক্-পুঁজিবাদী গ্রামসমাজে ফিরে যেতে চান। তাঁরা রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখেন। গান্ধীবাদীরা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত জীবনধারাকে সমর্থন করেন। তাঁরা ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে অনুসরণ করচে চান। আধুনিক সভ্যতার বিরোধী ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারী জীবনদর্শনই হল তাঁদের কাছে বিকল্প উন্নয়নের মডেল।

.৫.২ পরিবেশবাদী মার্কসবাদী

পরিবেশবাদী মার্কসবাদীগণ মার্কসবাদের ভিত্তিতে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে চান। এঁদের দার্শনিক ভিত্তি হল মার্কসবাদ। তাঁরা চান অর্থনৈতিক বিচারে ন্যায়সঙ্গত সমাজের সৃষ্টি। জাতীয় সম্পদের অসম বন্টনকেই তাঁরা সমাজের মূল সমস্যা বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, পুঁজিবাদ ও ভোগবাদ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করেছে। গান্ধীবাদীদের ন্যায় ঐতিহ্য বা পরম্পরা নিয়ে তাঁরা বিশেষ মাথা ঘামাতে চান না। বরং পরিবেশ রক্ষার জন্য এঁরা আক্রমনাত্মক আন্দোলনের পক্ষপাতী। এঁরা জনবিজ্ঞানমঞ্চ ও আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখেন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে প্রচার করেন। তাঁরা সমাজতন্ত্র ও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, নতুন সমাজ গড়ার কাজে আধুনিক বিজ্ঞান অপরিহার্য। সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব।

৮.৫.৩ যথোপযুক্ত প্রযুক্তি গোষ্ঠী

যথোপযুক্ত প্রযুক্তিগোষ্ঠী সরাসরি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিরোধী নন। বরং তাঁরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী বিকল্প সহনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার পক্ষপাতী। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবধর্মী ও প্রায়োগিক। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁরা সাবেকি ও আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তাঁরা ছোট ও বড় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের মধ্যে সমন্বয়ে সাধনের প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী। কেন্দ্রাভিমুখী এবং পরিবেশগত অবনমনকারী প্রযুক্তির পরিবর্তে আঞ্চলিক ও সামাজিক-প্রযুক্তিগত বিকল্প উন্নয়ন প্রয়াসে আস্থাশীল তাঁরা। আন্দোলনের পরিবর্তে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণকারী প্রযুক্তির ভিত্তিতে তাঁরা গঠনমূলক কাজের ওপর গুরুত্ব দেন।

৮.৫.৪ বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণবাদী

বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণবাদীরা বিকল্প উন্নয়নের মডেল হিসাবে প্রাকৃতিক সম্পদের বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা দেশের ভূমি ও জল সম্পদের অপচয় ও অবনতির বিরোধিতা করেন। অরণ্য-প্রেমীর গোষ্ঠী অরণ্য এবং উদ্ভিদ ও জীবের নানা প্রজাতির অবলুপ্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা জীবজন্তু, বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী। এইসব এলাকাকে

সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করে মানুষের আনাগোনা সম্পূর্ণ বন্ধ করার কথা বলেন তাঁরা। পরিবেশ সমস্যা মোকাবিলার জন্য এঁরা সরকারি উদ্যোগ ও নির্দেশের ওপর নির্ভরশীল। এঁদের অনুগামীদের সংখ্যা কম হলেও সরকারি নীতি নির্ধারণে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এঁরা পরিবেশ-অবনমনের সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণকে উপেক্ষা করে দক্ষতা ও পরিচালনার ওপর জোর দেন। এঁদের এলিট পরিবেশবাদী বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

৮.৫.৫ পরিবেশবাদী নৈরাজ্যবাদী

পরিবেশবাদী নৈরাজ্যবাদীরা সনাতন নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে বলেন যে, সরকারি নিয়ন্ত্রণ অপ্রয়োজনীয়; ছোট সমাজই আদর্শ। সংগঠন নয়, স্বতঃস্ফূর্ততাই হল গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশবাদী নৈরাজ্যবাদীদের মতে, প্রকৃতির মধ্যেই স্বতঃস্ফূর্ততা ও ভারসাম্যের শক্তি বিদ্যমান। তাই এদের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা উচিত নয়। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার যে কোন ধরনের প্রচেষ্টা মানবজীবনে ধ্বংস ডেকে আনবে।

৮.৫.৬ পরিবেশবাদী নারীবাদী

পরিবেশবাদী নারীবাদীরা সঙ্গে পরিবেশবাদের সমন্বয় সাধনের পক্ষপাতী। এঁদের মূল বক্তব্য হল এই যে, প্রকৃতি ও নারী প্রকৃতপক্ষে সমার্থক। কারণ পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ যেমন নারীদের অবহেলা করে, তেমনি প্রকৃতিকেও অবহেলা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই পুরুষ নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ও নিয়ন্ত্রণ খাটাবার চেষ্টা করে। এইভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রকৃতি ও নারী উভয়েই নিয়ন্ত্রণ ও অধীনতার শিকার হয়। নারীর মধ্যে সমন্বয়, শান্তি ও স্বতঃস্ফূর্তা স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে। এগুলি প্রকৃতিরও অপরিহার্য উপাদান। সুতরাং নারী ও প্রকৃতি উভয়ের কাছেই পিতৃতন্ত্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। উভয়েরই টিকে থাকার জন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ধ্বংস সাধনই হল বিকল্প মডেল।

উপরিউক্ত বিকল্প উন্নয়নের তত্ত্বগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেকটি তত্ত্বই দেশের বর্তমান উন্নয়ন মডেলের বিরোধী। কিন্তু পরিবর্ত মডেল সম্পর্কে তাদের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য রয়েছে।

অনুশীলনী - ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :-

১. বিকল্প উন্নয়ন সম্পর্কে কট্টর গান্ধীবাদীবাদের বক্তব্য কী?

২. পরিবেশবাদী মার্কসবাদীদের মূল বক্তব্য কী?

৩. পরিবেশবাদী নারীবাদ বলতে কী বোঝায়?

রচনাত্মক প্রশ্ন :-

১. পরিবেশবাদী আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব পর্যালোচনা কর।

৮.৬ ভারতে পরিবেশ আন্দোলন

সাম্প্রতিকালে নারী আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন প্রভৃতির মতো পরিবেশ আন্দোলনও নয়া সামাজিক আন্দোলনের এক অপরিহার্য সঙ্গে পরিণত হয়েছে। নয়া সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নাগরিকসমাজ থেকে সম্ভূত বিষয়াদির প্রতি প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করা হয়। এর মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র বা অর্থনীতি নয়; মূল লক্ষ্য হল নাগরিক সমাজের সামাজিক এলাকাসমূহ। পরিবেশের অধিকার আন্দোলন তৃতীয় প্রজন্মের মানবাধিকার আন্দোলনের ফসল।[৭] জীবিকার্জন এবং বনজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের ওপর অধিকারের প্রশ্নে মানুষের আন্দোলন পরিবেশ আন্দোলন হিসাবে পরিগণিত হয়।[৮] সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, পরিবেশ আন্দোলন হল এক সংগঠিত ও সচেতন সামাজিক ক্রিয়াকলাপ। এর মূল লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ভোগ-ব্যবহার সুনিশ্চিত করা, পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক। এর লক্ষ্য হল প্রকৃতি, জৈব-বৈচিত্র্য, বন এবং জলসম্পদ রক্ষা করা, ভূমিক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও জল এবং বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা।

পরিবেশের উত্তরোত্তর অবনমনকে রোধ করার জন্য বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্রই এক উল্লেখযোগ্য সক্রিয়তা লক্ষ করা যাচ্ছে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে ভারতে পরিবেশ উৎসাহী সংগঠনের সংখ্যা বেশি বলে পরিগণিত হয়েছে। বেশির ভাগ সংগঠনই বেসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী ধরনের। সংগঠনগুলির কাজের ধরন অনুযায়ী এগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় — শিক্ষামূলক, উন্নয়নমূলক এবং প্রতিরোধমূলক। ভারতে বেশ কিছু পরিবেশ উৎসাহী গনসংগঠন রয়েছে যাদের কাজ হল শিল্প ও কৃষির মাধ্যমে যে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে সে সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা এবং বিকল্প প্রযুক্তির অস্তিত্ব ও প্রয়োগ এবং অংশগ্রহণ মূলক উন্নয়নে জনগণের উদ্যোগ নথিবদ্ধ করা। এরা আলোচনাচক্র ও কর্মশালার মাধ্যমে মানুষকে পরিবেশ সচেতন করে তোলে। এইরকম একটি সংস্থা হল 'সেন্টার ফর সায়েন্স এণ্ড এনভিরনমেন্ট' (সি.এস.ই.)। এছাড়াও রয়েছে 'লোকায়ন' এবং ইনট্যাক (INTACH) নামক সংস্থা, যেগুলি পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

কিছু সংগঠন আধুনিক উন্নয়নের বাস্তুসংস্থানগত সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে বিকল্প প্রযুক্তি, উন্নয়ন এবং জীবনধারা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায়। এই প্রসঙ্গে কিছু উন্নয়নকামী পেশাদার মানুষের সংগঠন হিসাবে আমেদাবাদের 'উত্থান' এর ভূমিকা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৯] এই সংগঠনটি আমেদাবাদ জেলার ধোলেরা নামক অঞ্চলটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। এখানে জল ও মাটি দূষণ রোধ করে কীভাবে জমিকে চাষযোগ্য করে তোলা যায় সেই প্রকল্প নেয় এই সংগঠনটি। এই সব সংগঠন বিশ্বাস করে যে, স্থায়ী বা সহনশীল উন্নয়ন শুধু কাম্য নয়, বাস্তবও। এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি অনুস্তরে পরিবেশ সচেতন সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক কাজের ওপর গুরুত্ব দিয়ে জনগণকে পরিবেশ সচেতন করে তোলে।

বিকল্প উন্নয়নমূলক কাজের উদ্যোগকে সরকার বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয় না। অনেক সময় সরকার

---

7 মোহিত রায়, পরিবেশের অধিকার : অধিকারের পরিবেশ, শুভেন্দু দাশগুপ্ত (সম্পাদনা), প্রসঙ্গ মানবাধিকার, পৃষ্ঠা ১০৮-১০৯।

8 Ghanashyan Shah, Social Movements in India, Sage, New Delhi, 1990.

9 Satyabrata Chakraborty, P. 433.

বিরোধিতাও করে। এছাড়া স্থানীয় মাতব্বর, রাজনৈতিক নেতা এবং আমলারা এর বিরোধিতা করে। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলি প্রত্যক্ষ প্রতিরোধের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে পরিবেশ আন্দোলন গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসাবে চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, তেহরি আন্দোলন, চিল্কা আন্দোলন ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

৮.৬.১ ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আন্দোলনগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যেতে পারে :

(১) বেশির ভাগ পরিবেশ আন্দোলনই সাধারণ আন্দোলন, অর্থাৎ সমাজের সব স্তরের মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠে। কারণ পরিবেশের অবক্ষয়ের কুফল সকল স্তরের মানুষকেই ভোগ করতে হয়। জল বা বায়ু যখন দূষিত হয় তখন তা থেকে কেউই রেহাই পায় না। এইজন্যই পরিবেশ আন্দোলন এত অল্প সময়ের মধ্যে সারা বিশ্বে এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

(২) ভারতের বেশ কিছু পরিবেশ আন্দোলন ছিল বিশেষ স্তরের মানুষের স্বার্থ সম্বন্ধীয় আন্দোলন। বিশেষ স্তরের সপক্ষে এই আন্দোলন অনেক সময় সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করে। সমাজে যেহেতু অসম বিকাশ বিদ্যমান তাই ধনা ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সব মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরও সমানভাবে নির্ভরশীল নয়। বেশিরভাগ মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। পরিবেশ আন্দোলনও তাই শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন হতে বাধ্য। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন বা চিপকো আন্দোলন এই ধরনেক দৃষ্টান্ত। নর্মতা বাঁচাও আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল নর্মদা নদীর ওপর প্রস্তাবিত বড়ো বাঁধ নির্মাণের কাজ বন্ধ করা যাতে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট না হয় এবং হাজার হাজার স্থানীয় গরীব মানুষ বাস্তুচ্যুত, হয়ে না পড়ে। অপরদিকে ঐ অঞ্চলের ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ এই আন্দোলনের বিরোধী। তাদের মতে প্রস্তাবিত বাঁধটি নির্মিত হলে সেচের সুবিধা হবে এবং বিদ্যুতের ঘাটতি মিটে যাবে।

(৩) পাশ্চাত্য দেশের পরিবেশ আন্দোলনগুলির সঙ্গে ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য দেশের পরিবেশ আন্দোলনগুলি সৌন্দর্যবিজ্ঞান বিষয়ক এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়। এদের প্রধান দাবিগুলি হল — সবুজায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, দূষণমুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি। কিন্তু ভারতের পরিবেশ আন্দোলনগুলি মূলত গ্রামের গরীব ও প্রান্তিক মানুষদের সামাজিক অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

(৪) পাশ্চাত্য দেশের পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের আর একটি পার্থক্য হল, পশ্চিমী দেশগুলির বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে পরিবেশ সমস্যা অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু ভারতের পরিবেশ আন্দোলনগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অরাজনৈতিক সংগঠন দ্বারা পরিচালিত

হয়। রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না। কারণ তারা উন্নয়ন নীতিকেই বেশি প্রাধান্য দেয়, পরিবেশবাদকে উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখে।

(৫) ভারতে যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় সাধারণভাবে সেগুলি আকারে ছোট এবং আঞ্চলিক। এই সংগঠনগুলির কাঠামো কম আমলাতান্ত্রিক হয়, সহজেই এর গঠনগত কাঠামো পরিবর্তন করা যায় এবং জনগণের সঙ্গে এদের অনেক বেশি যোগাযোগ থাকে। কিন্তু এদের একদিকে যেমন অর্থের অভাব আছে, অন্যদিকে এদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরও অভাব আছে। সাধারণত একজন বা দু'জন ব্যক্তিকে ঘিরে এই ধরনের সংগঠন গড়ে ওঠে এবং স্বাভাবিকভাবেই খুব একটা স্থায়ী হয় না। তাছাড়া পরিবেশ বিষয়ক বড় কোন বিষয়েও এই আঞ্চলিক সংগঠনগুলির বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।

(৬) পরিবেশবাদের একটি জটিল বৈশিষ্ট্য হল যে, মধ্যবিত্তশ্রেণী পরিবেশবাদীদের সঙ্গে অনেক সময়ই দরিদ্র মানুষের সংঘাত হয়। যেমন, দূষণ সম্প্রসারনকারী কোন কারখানা বন্ধ হলে শ্রমিকরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও তারাই দূষণের প্রধান শিকার হয়, কিন্তু কাজ হারিয়ে তাদের জীবিকার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

(৭) ভারতের কয়েকটি পরিবেশ আন্দোলন অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিফলিত হয়। চিপকো আন্দোলনে দলিত ও উপজাতি মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। চিপকো আন্দোলনের অন্যতম মহিলা অংশগ্রহণকারী গৌরা দেবী বলেন যে, এই আন্দোলন মহিলাদের যুক্ত করার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু মহিলারা নিজে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এগিয়ে আসে। তাঁরা মানুষকে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাদের অস্তিত্ব অরণ্যের সঙ্গে যুক্ত। এইসব আন্দোলনে লক্ষ্য করা যায় যে, জনগণের জানাবার অধিকার আছে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার যে-সব বিষয় তাদের প্রভাবিত করতে পারে সেগুলি নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করার অধিকার আছে। তারা প্রতিবাদ করার অধিকার ঘোষণা করে।

৮.৭ ভারতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ আন্দোলন

৮.৭.১ চিপকো আন্দোলন

'চিপকো' কথার অর্থ 'জড়িয়ে ধরা'। অরণ্য সম্পদকে রক্ষা করার জন্য গ্রামবাসীরা গাছকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে তাই চিপকো আন্দোলন বলে অভিহিত করা হয়। হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীরা এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ঔপনিবেশিক আমলে বাণিজ্যিক স্বার্থে এই বনাঞ্চলকে শোষণ করা হত। স্বাধীনতার পরেও এই প্রক্রিয়া বন্ধ থাকেনি। রাজ্য সরকারের বনবিভাগ গাছ কাটার জন্য

ঠিকাদারদের নিযুক্ত করে। বনবিভাগের তরফ থেকে ঐ অঞ্চলের স্থানীয় মানুষদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যে, তাঁরা যেন কোনোভাবে অরণ্যসম্পদ নষ্ট না করেন। অথচ একই সঙ্গে ঠিকাদারদের বনের গাছ কাটতে ঢালাও অনুমতি দেওয়া হয়। এর ফলে একদিকে এই অঞ্চলের গ্রামবাসীদের জীবিকার্জনের অধিকার হরণ করা হয়। অপরদিকে ঐ অঞ্চলের বাস্তুসংস্থানের অবক্ষয় ঘটে। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে চিপকো আন্দোলন গড়ে ওঠে। গোপেশ্বর, তেহরি, চামোলি, নরেন্দ্রনগর প্রভৃতি অঞ্চলে এই আন্দোলন প্রাধান্য বিস্তার করে। ১৯৭০-র দশকে চিপকো আন্দোলন চরম রূপ নাভ করে। মহিলাসহ এই অঞ্চলের সমস্ত গরীব মানুষ এই আন্দোলনের সামিল হন।

চিপকো আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ নেয় 'দাসহলি গ্রাম স্বরাজ্য মন্ডল' নামে একটি সংগঠন। এটি উত্তরাখন্ডের অন্তর্গত গোপেশ্বর গ্রামের কিছু সমাজসেবীকে নিয়ে গঠিত হয়। এই সংগঠনের সদস্যরা প্রথমে গ্রামের মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উদ্যোগ নেন এবং ক্রমশ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৭৩ সালে বনবিভাগ ও ঠিকাদাররা গোপেশ্বর গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে কেদারনাথের কাছাকাছি বনাঞ্চলের গাছ কাটার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা গাছকে জড়িয়ে ধরেন এবং রাতের পর রাত জেগে পাহাড়া দিতে থাকেন। আগুনের মতো এই আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহিলারাই এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সরলা বেন, মীরা বেন, গৌরা দেবী, সুন্দরলাল বহুগুনা; চণ্ডীপ্রসাদ ভাট প্রমুখ। বৃক্ষ সংরক্ষণ ছাড়া এই আন্দোলনের দাবির মধ্যে ছিল বনভূমির মূল প্রজাতি বৈচিত্র্য বজায় রাখা, জ্বালানি ও পশুখাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে মহিলাদের অধিকার অব্যাহত রাখা।

১৯৭৮ সালে পুলিশ আন্দোলন-দমনের নামে আদিবাসী মহিলাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়, স্থানীয় গরীব মানুষদের নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে, আন্দোলনের দুই নেতা সুন্দরলাল ও চণ্ডীপ্রসীদকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু এর ফলে আন্দোলন আরও তীব্র হয়। সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলন কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। কেন্দ্রীয় সরকার আগামী পনের বছর উত্তরপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হিমালয়ের অরণ্যভূমিতে গাছ কাটা নিষিদ্ধ করে।

চিপকো আন্দোলন সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তৃণমূল ভিত্তিক বাস্তব্য-উন্নয়ন আন্দোলন। সারা পৃথিবী জুড়ে এই আন্দোলন স্বীকৃতি মেলে। এর ফলে ভারতে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষ পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়। এই আন্দোলনে মুনাফা অর্জন ও বেঁচে থাকার তাগিদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে। গ্রামের মহিলারা আন্দোলনের সামনের সারিতে চলে আসে। চিপকো আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটেনি। ভারতে কৃষক আন্দোলনের এক পর্যায় হিসাবে গড়ে ওঠে। আন্দোলনকারীরা পরবর্তী পর্যায়ে বনসৃজন ও পরিবেশ সংরক্ষণের দিকে মনোনিবেশ করে। চিপকো আন্দোলন উত্তরাখণ্ডের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও রাজনৈতিক অসন্তোষের প্রকাশ হিসাবেও দেখা দেয়। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, আন্দোলনকারীদের মধ্যে ঐক্যমত থাকলেও তাদের মধ্যে ভারতীয় পরিবেশবাদের আদর্শগত বহুত্ববাদ প্রতিফলিত হয়। যেমন, সুন্দরলাল বহুগুনা গান্ধীজী বিনোবা ভাবের অনুগামী ছিলেন; কিন্তু চণ্ডীপ্রসাদ ভাট গান্ধীজীর মতবাদ ও পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।[১০]

৮.৭.২ নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

নর্মদা নদী মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে গুজরাট রাজ্যের কাম্বে উপসাগরে গিয়ে মিলিত হয়েছে। নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হয় ১৯৪৬ সালে। ১৯৬১ সালে এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ অর্থাৎ সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন নেহেরু। এই প্রকল্পের ব্যয় ধার্য হয়েছে ২৫০০০ কোটি টাকারও বেশি। তিন হাজারেরও অধিক বড় ছোট বাঁধ নির্মাণ করা হবে। এই সব বাঁধ থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে এবং সেচের জন্য জল সরবরাহ করা হবে। প্রকল্পের সুফলের সিংহভাগ ভোগ করবে গুজরাট। কিন্তু সাংঘাতিক উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দেবে মধ্যপ্রদেশে। কারণ যে ২৪৩টি গ্রাম জলমগ্ন হবে তার মধ্যে ১৯৩টিই মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। উদ্বাস্তু পরিবার সমূহের ৬০ শতাংশই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত।

১৯৮৮ সাল থেকে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয়। বাবা আমতে, মেধা পাটকর, গিরিশ প্যাটেল এবং আরও অনেকের নেতৃত্বে গণবিক্ষোভ, ধর্না, র‍্যালি এবং গণসমাবেশের মাধ্যমে প্রতিবাদ সংগঠিত করা হয়। বস্তুত তখন থেকে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকারীদের মতে, সর্দার সরোবন প্রকল্প বিশ্বের সর্ববৃহৎ পরিকল্পিত পরিবেশ ধ্বংসের প্রকল্প। ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম এই আন্দোলনের সপক্ষে ব্যাপক সমাবেশের মাধ্যমে এর শক্তি প্রদর্শন করা হয়। দেশ ও বিদেশ থেকেও অনেক বেসরকারি সংগঠন এই ধ্বংসাত্মক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিরোধিতা করে। তাঁদের মতে, এই প্রকল্পের সেচব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পরমাণু মানুষকে স্থানচ্যুত করছে, অঞ্চলকে প্লাবিত করছে, শোষণ ও নিপীড়নকে সাহায্য করছে এবং সর্বোপরি প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিশেষ আঞ্চলিক ঐতিহ্য ধ্বংস করছে। বিশ্বব্যাঙ্ক এই প্রকল্পের জন্য ৪৫ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করেছিল। কিন্তু আন্দোলনের তীব্র চাপে ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক এই প্রকল্পে ঋণ মঞ্জুরের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়। সমস্ত পৃথিবীর লোক উপলব্ধি করে যে, এই ঘটনায় জনগণের জয় হল। কিন্তু ভারত সরকার নর্মদা প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখে। এর প্রতিবাদে আন্দোলনও ক্রমশ তীব্রতর হতে থাকে। পরিস্থিতির চাপে ১৯৯৭ সালে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, এই প্রকল্পের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে এবং বাঁধনির্মাণের প্রতিটি প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করা হবে। প্রতিবাদী আন্দোলন অব্যাহতই আছে।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন কেবল পরিবেশগত আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি রাজনৈতিক সংগ্রামেও পরিণত হয়েছে। সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে উপজাতি ও কৃষক সম্প্রদায়গুলি। তাই তারা এর বিরোধিতায় নেমেছে। কিন্তু এই প্রকল্প থেকে যারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে তারা হল ধনী চাষী, গৃহনির্মাণ ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণী। তারা তাই পাল্টা আন্দোলন সংগঠিত করেছে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায় একদিকে প্রকৃতির সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের সম্পর্ক, অপরদিকে সরকারি প্রযত্নে সমাজের প্রাধান্যকারী এলিট শ্রেণীর উন্নয়নের সঙ্গে উপজাতি সম্প্রদায়ের সংঘাত।

৮.৭.৩ : সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন

সাইলেন্ট ভ্যালি বা 'নিস্তব্ধ উপত্যকা' হল কেরলের উত্তরাঞ্চলে পালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটি গভীর অরণ্য সংকুল উপত্যকা। এই অঞ্চলটি জনাকীর্ণ নয়, অরণ্যে ঢাকা বলে এই এলাকার নামকরণ হয়

নিস্তব্ধ উপত্যকা। ৯০ বর্গকিমি ব্যাপী এই এলাকায় ছড়িয়ে আছে কম করে ১১০০ প্রজাতির গাছপালা, যাদের মধ্যে ৯৯৬টি প্রতাজিই সপুষ্পক। এদের মধ্যে অনেক প্রজাতি রয়েছে, যেগুলি পৃথিবীর অনেক স্থান থেকে অবলুপ্ত হয়েছে। এই অরণ্যভূমির প্রাণীসম্পদও বিপুল। এই প্রাণীকুলের মধ্যে রয়েছে অতি বিরল ও লুপ্তপ্রায় কয়েকটি প্রজাতি। এই আদিম অরণ্যাঞ্চলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে কুন্তীপূজা। এই নদীটি ৮৫৭ মিটার উচ্চতা থেকে হঠাৎ নীচে এসে পড়ায় এটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের আদর্শ নদী বলে বিবেচিত হয়।

ইংরেজ আমলেই এই নদীর ওপর বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। স্বাধীন ভারতে ১৯৭০-র দশকের মাঝামাঝি কেরল রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে প্রয়াসী হয়। প্রথমদিকে কারও কোন আপত্তি থাকেনি। কিন্তু পরে কয়েকজন পরিবেশবিদ বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন। ১৯৭৬ সালে বিষয়টির প্রতি 'কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ' এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই বেসরকারি পরিষদটি হল কেরলের বৃহত্তম জনবিজ্ঞান সংগঠন। প্রকল্পটি বাতিল করার দাবিতে এই পরিবেশবাদী সংগঠনটি আন্দোলনে নামে। তাদের যুক্তি হল যে, কেরলের তৎকালীন বিদ্যুতের চাহিদার মাত্র ৭ শতাংশ এই প্রকল্প থেকে পাওয়া যাবে। অথচ প্রকল্পটি রূপায়িত হলে পৃথিবীর কয়েকটি বিরল প্রজাতির প্রাণী, পাখি, ধানগাছ প্রভৃতির অবলুপ্তি ঘটবে।

একদিন যা ছিল কিছু স্থানীয় মানুষের দাবি, তা ক্রমে পরিণত হল জাতীয় পরিবেশবাদী আন্দোলনে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য পরিবেশ পরিকল্পনা এবং সমন্বয় সম্পর্কিত জাতীয় কমিশন একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে। আলোচ্য উপত্যকাটিতে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুসন্ধানী দল প্রকল্প রূপায়ণে আপত্তি করে। আরো বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রকল্পটি পরিত্যাগ করার জন্য কেরল সরকারকে অনুরোধ করে। বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ ড. সালিম আলি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে একটি খোলা চিঠিতে এই প্রকল্প বাতিল করার দাবি জানান। পরিবেশ সংরক্ষণ বনাম উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় বিতর্ক ও আন্দোলন সাত বছর চলার পর ড. এম. জি. কে. মেনন কমিটির সুপারিশে ১৯৮৩ সালে এই প্রকল্প বাতিল হয়। রক্ষা পায় বহু দুর্লভ উদ্ভিদ ও প্রাণী। সাইলেন্ট ভ্যালি পরিণত হয় জাতীয় উদ্যানে।

৮.৮ পরিবেশ আন্দোলনের প্রধান বিচার্য বিষয়সমূহ

১৯৭০ সাল থেকে ভারতে পরিবেশ আন্দোলনগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচার্য উপস্থাপিত করা যায়। প্রথমত, পরিবেশ আন্দোলনগুলির মাধ্যমে প্রকাশ পায় উন্নয়ন বনাম পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়। স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়। এই বিকাশের পরিকল্পনা সহনশীল বা স্থিতিশীল উন্নয়নের দিকে সঠিক নজর দেয়নি। উদাহরণ হিসাবে নর্মদা উন্নয়ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রকল্প ৩ লক্ষ ৫০ হাজার হেক্টর জমি প্লাবিত করবে, মধ্যপ্রদেশের হাজার হাজার উপজাতির লোক স্থানচ্যুত হবে এবং কোটি কোটি টাকার প্রাকৃতিক অরণ্য এর মাধ্যমে ধ্বংস হবে। মানুষ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসকারী এই ব্যাপক পরিকল্পনা বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক অনুদানের অনুমোদন পেয়েছে। এই উন্নয়ন প্রকল্প পরিবেশকে বিপন্ন করে, বন ও জৈব বৈচিত্র্য ধ্বংস করে। এছাড়া এর মাধ্যমে ব্যাপক ভূমিক্ষয় হচ্ছে এবং পরিবেশ ও ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। প্রকল্পের চারপাশে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী আদিবাসীদের মনে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ভারতের পরিবেশ আন্দোলন রাষ্ট্র বনাম জনগণের বিষয়টি মানুষের নজরে আনে। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রকৃতি অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্র হল এমন এক আইনসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান যা হল উন্নয়নের বাহন। সকল মানুষের ভালোর জন্য এই রাষ্ট্র কাজ করে। অথচ দেখা যায় যে, সমাজের অনেকেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভাবাবেগকে এই রাষ্ট্র আদৌ মর্যাদা দেয় না। অধিকাংশের বস্তুতান্ত্রিক উন্নয়নের নামে সংখ্যালঘুর এবং সমাজের পরম্পরাকে বিসর্জন দেবার দাবি জানায় রাষ্ট্র। তাই মধ্যপ্রদেশের বৃহত্তর লোকের স্বার্থে জলবিদ্যুৎ তৈরি এবং সেচের সুবিধা গুজরাট অবধি বিস্তৃত করবার জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশের উপজাতি সম্প্রদায়কে ভাসিয়ে এবং বাঁধের জলের স্রোতে বাস্তুচ্যুত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাই দেখা যায় যে, যখনই বাঁধ গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করা হয়, তখনই কিছু রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থগোষ্ঠী পরিকল্পনা দ্রুত রূপায়নের জন্য সমানভাবে তৎপর হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনও এই তৎপরতাকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে।

তৃতীয়ত, ভারতের পরিবেশ বিষয়ক রাজনীতির অন্যতম বিচার্য বিষয় হল আন্তর্জাতিক বনাম স্থানীয় সমস্যা। একদিকে আন্তর্জাতিক অনুদান প্রদানকারী সংস্থাগুলির চাপ এবং অন্যদিকে স্থানীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও ভাবাবেগের প্রবল চাপের মাধ্যমে পরিবেশ আন্দোলনগুলি উত্তেজনা ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিবেশ ধ্বংসসাধনকারী বৃহৎ প্রকল্পগুলির বেশির ভাগই আন্তর্জাতিক ভাণ্ডার থেকে অনুদান পেয়ে থাকে। যেমন, সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্প বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সমর্থন পাচ্ছিল, যদিও ব্যাঙ্কেরই নিজস্ব পর্যবেক্ষক কমিটি মাঝে মাঝেই এই প্রকল্প রূপায়নের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছিল। আন্তর্জাতিক অনুদান প্রদানকারী সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক বৃদ্ধিমূলক উন্নয়ন প্রকল্পগুলির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে এই সমস্যাগুলি উপেক্ষা করে। তারা দেশে ও বিদেশে সক্রিয় উন্নয়নকারী গোষ্ঠীর চাপে প্রভাবিত হয়। তাই বলা যেতে পারে যে, ভারতের পরিবেশবাদ এক নতুন ধরনের দ্বন্দ্বের ওপর আলোকপাত করে। একদিকে রয়েছে বিশ্ব অনুদানকারী সংস্থা, যারা উন্নয়নের নামে পুঁজি বিনিয়োগ করে এবং পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবকে উপেক্ষা করে। অপরদিকে রয়েছে স্থানীয় মানুষ যারা আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, নিজেদের বাস্তু, জীবিকা নির্বাহের তাগিদে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলির বিরোধিতা করে। বস্তুত সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এবং আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যিক্রিয়ার শর্তাদির প্রবল চাপে বিশ্বসংস্থা ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব এক অন্যতম বিচার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

অনুশালনী - ৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :-

১. পরিবেশ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়?

২. চিপকো আন্দোলন সম্পর্কে টীকা লেখ।

৩. নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন কী?

৪. ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের প্রধান বিচার্য বিষয়গুলি কী?

রচনাত্মক প্রশ্ন :-

১. ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও বিচার্য বিষয়গুলি পর্যালোচনা কর।

৮.৯ ভারতে পরিবেশ সমস্যার সমাধানে গৃহীত ব্যবস্থাদি

পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়টি বর্তমানে একটি বিশ্বব্যাপী বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিশ্বের বহু দেশ সবুজ রক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু করেছে। শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে যে পরিবেশ সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে তাতে জর্জরিত হয়ে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশ উন্নয়নের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। কলকারখানার শ্রমিকরা প্রথম আন্দোলন শুরু করে যাতে পরবর্তীকালে জনগণও অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলনের নাম হয় সবুজ আন্দোলন এবং আন্দোলনকারীদের সংগঠনের নাম হয় গ্রীন পার্টি। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সবুজ শান্তি আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনের মূল কথা হল — সবুজই পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও জাপানের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় এই গ্রীন পার্টি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও সংস্থার নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে। এদের অনুসৃত রাজনীতিকে বলা হয় 'গ্রীন পলিটিক্স' বা সবুজ রাজনীতি। সবুজ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার পিছনে যে বোধগুলি কাজ করে তা হল পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ, জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ এবং ভবিষ্যৎ বংশধরের প্রতি দায়বদ্ধতা।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও পরিবেশ সুরক্ষিত রাখার জন্য জনমত গড়ে উঠেছে। ভারতে সংরক্ষণের ঐতিহ্য প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চলে আসছে।[১১] ভারতীয় শিল্পকলা, সংস্কৃতি এবং সকল ধর্মের মধ্যে সংরক্ষণের সুর বিদ্যমান। ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে মানবপরিবেশ সম্মেলন নামে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরো শহরে বসুন্ধরা সম্মেলন নামে যে বিশ্ব সম্মেলন বসে তাতে ভারতের পরিবেশ মন্ত্রী শ্রী কমল নাথের অংশগ্রহণ এবং ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গের বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে ভারতের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট মানব পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সম্পর্কে ভারতের নেতৃবৃন্দও সচেতন হয়ে উঠেছেন।

স্টকহোমের বিশ্বসম্মেলনে যোগদানের পর থেকেই ভারতে সংবিধান সংশোধন ও আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চলে। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধান দুটি পৃথক ধারা সংযোজন করে পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়নের ব্যাপারে রাষ্ট্র তথা জনগণের কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়। সংবিধানের ৪৮(ক) ধারাতে বলা হয় যে, বন ও বন্যপ্রাণী-সহ পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়নের ব্যাপারে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। সংবিধানের ৫১-ক(ছ) অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে যে, বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণী সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন এবং জীবন্ত প্রাণী সমূহের প্রতি মমত্ব পোষণ হল ভারতীয়

11 V.K. Prabhakar(ed), World Environment, P. 46.

নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। এছাড়া বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টি রাজ্যতালিকা থেকে যুগ্ম তালিকায় নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই এ ব্যাপারে প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

ভারতে পরিবেশ নিয়ে দু'একটা আইন যে ছিল না তা নয়। যেমন স্মোক ন্যুইসেন্স অ্যাক্ট ইত্যাদি। কিন্তু পরিবেশ দূষণ নিয়ে বিস্তৃত আইনকানুন ছিল না। ১৯৭৪ সালে জল (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণীত হয়। একেই ভারত সরকারের প্রথম পরিবেশ আইন বলা যেতে পারে।[১২] এই আইনবলে দেশে প্রথম কেন্দ্রীয় জলদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিটি রাজ্যে এই পর্ষদ গড়তে বলা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যেই এই পর্ষদ গঠিত হয়। পরে এই পর্ষদের নাম হয় কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। রাজ্যগুলিতেও পর্ষদের নাম অনুরূপভাবে পরিবর্তন করা হয়। এই পর্ষদগুলির দায়িত্ব ক্রমশ জল দূষণ ছাড়িয়ে পরিবেশের সব কিছুতেই প্রসারিত হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য হল জল দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং বর্তমান জলভাণ্ডার সুরক্ষিত রাখা। দূষণজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে সেই ব্যক্তিকে ৩ মাসের জেল বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা দুটো শাস্তি একই সাথে দেওয়া যেতে পারে। পরবর্তীকালে এই আইন সংশোধন করে বলা হয় যে, কোন শিল্প বা সংস্থা জল ব্যবহার করলে সেস্ বা কর দিতে হবে।

১৯৮১ সালে প্রনয়ন করা হয় বায়ু (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন। এই আইনটির উদ্দেশ্য হল বায়ু দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ। এই আইনটি মোটামুটি জল দূষণ সংক্রান্ত আইনের অনুরূপ। জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলিকেই এই আইন কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইডের কীটনাশক তৈরির কারখানার দুর্ঘটনায় তিন হাজারের মতো সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে বিপজ্জনক শিল্পের নিরাপত্তাজনিত দায়িত্ব ও নাগরিকের অধিকারের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতে ১৯৮৬ সালে প্রণীত হল পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন, যাকে পরিবেশ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক আইন বলা যায়। এই আইনটির উদ্দেশ্য হল পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নতিসাধন। এই আইনে পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম তৈরির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছে। এই আইনে পরিবেশ দূষণের ঘটনা ঘটলে একজন নাগরিককে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে অভিযোগ জানানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে যাতে পর্ষদ সে সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়। অন্যথায় নাগরিকের অধিকার আছে বিষয়টি উচ্চ আদালতে নিয়ে যাওয়ার।

পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইনে সরকারকে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়, যেমন, পরিবেশের মান নির্ধারণ করা, পরিবেশ দূষণ জনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এই আইনের অধীনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম প্রণীত হয়। বিপজ্জনক রাসায়নিক প্রস্তুত, মজুত ও আমদানী নিয়ম, ১৯৮৯ অনুযায়ী ৪৩৪টি বিপজ্জনক রাসায়নিকের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এগুলিকে নিরাপদে ব্যবহারের জন্য কিছু নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কোন নতুন প্রকল্প চালু করতে গেলে পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তি, ১৯৯৪ অনুযায়ী স্থানীয় পরিবেশ মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জনদায়িত্ব বীমা আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী শিল্প দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ আবেদন করলেই নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবেন।

---

12 মোহিত রায়, পরিবেশের অধিকার : অধিকারের পরিবেশ, শুভেন্দু দাশগুপ্ত (সম্পাদনা), প্রসঙ্গ মানবাধিকার, পৃষ্ঠা ১১০।

উপরিক্ত আইনগুলি ছাড়াও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে আরও কিছু আইন প্রণীত হয়েছে। যেমন, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন অনুযায়ী বন্যপ্রাণী ও পক্ষী সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে বলা হয়েছে যে, বিপজ্জনক পদার্থ নিয়ে কাজকর্ম করার সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

পরিবেশ বিষয়ক আইনগুলিকে কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলি বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তুলেছে। এন.ডি. তিওয়ারি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার ১৯৮০ সালে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভাগ স্থাপন করে। পরে এই বিভাগকে অরণ্য মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত করে বিভাগটিকে এক পূর্ণ মন্ত্রকের স্তরে উন্নীত করা হয়। রাজ্য সরকারগুলিও পৃথক পরিবেশ মন্ত্রকে সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং রাজ্যগুলির দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিবেশ অবনমনের বিরুদ্ধে মানুষ যেমন সোচ্চার হয়ে উঠেছে, সুপ্রীম কোর্টও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। জনস্বার্থবাহী মামলায় ইতিবাচক প্রয়োগ ঘটিয়ে বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। এর ফলে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা গড়ে উঠেছে। যে-সব ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার প্রয়োগ ঘটেছে, তাদের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি অন্যতম। পরিবেশ সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রীম কোর্ট কোন কোন হাইকোর্টকে 'গ্রীন বেঞ্চ' গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে কলকাতা হাইকোর্টে 'গ্রীন বেঞ্চ' গঠিত হয়েছে। এইভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ পরিবেশগত অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালতের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন। তবে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা অনেক ক্ষেত্রে সমস্যারও সৃষ্টি করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিভাগ অনেক সময় উন্নয়নের দাবিকে অস্বীকার করে নানা প্রকল্পের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে। এই সক্রিয়তা অনেকসময় বিচারবিভাগ ও শাসনবিভাগকে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

৮.১০ সারসংক্ষেপ

পরিবেশের অধিকার আন্দোলন সাম্প্রতিককালের নয়া সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। সুস্থ পরিপূর্ণ জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষায় যে সমস্ত সামাজিক আন্দোলনকে ক্রমশ সমাজ ও রাষ্ট্র স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে পরিবেশ আন্দোলন অন্যতম স্থান দখল করে নিয়েছে। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে উন্নয়নের নামে পরিবেশ ও জনজীবনে যে সংকট সৃষ্টির আশংকা দেখা দিয়েছে তারই বিরুদ্ধে পরিবেশ আন্দোলনগুলি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে বিকল্প উন্নয়নের ধারণা। ভারতের ক্ষেত্রে পরিবেশ বিষয়ক রাজনীতি হল দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের আস্তিত্ব ও জীবনরক্ষার জন্য সংগ্রামের রাজনীতি। যেমন হিমালয় সংলগ্ন বনসম্পদ সংরক্ষণই হল চিপকো আন্দোলনের উদ্দেশ্য। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণের দাবি তোলে। কারণ এইসব সম্পদ রক্ষিত হলে তবেই স্থানীয় মানুষ টিকে থাকতে পারবে। সহনশীল বা স্থিতিশীল উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে যখন এইসব স্থানীয় মানুষের অস্তিত্ব সুরক্ষিত হবে। বস্তুত পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে দরিদ্র জনসাধারণ, দলিত সম্প্রদায়, নীচু জাত ও মহিলাদের সম্পর্ক অত্যন্ত

ঘনিষ্ট। কারণ পরিবেশ দূষণের ফলে এরাই সবচেয়েবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সুতরাং ভারতের পরিবেশবাদের বৈষয়িক ভিত্তি হল সমাজের জাত, শ্রেণী ও নারী-পুরুষের বৈষম্য সংক্রান্ত সমস্যা। তাই এইসব সমস্যার সমাধান না করতে পারলে পরিবেশ সমস্যারও সঠিক সমাধান সম্ভব নয়।

একদিকে পরিবেশ সংরক্ষণের দাবি, অপরদিকে স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক দাবি — এই দুটির মধ্যে সংঘাত পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়টিকে জটিলতর করে তুলেছে। যেমন পরিবেশবাদীরা কেরালায় বর্ষনারণ্যের সংরক্ষণে কুন্তী নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন। অথচ কেরালা বিধানসভা দু'বার সর্বসম্মতিক্রমে এই বাঁধের পক্ষে মত দেয়। বস্তুত পরিবেশ বাঁচাতে উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না। প্রগতির যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রযুক্তির ধারাকে অস্বীকার করা যায় না। তাই প্রয়োজন সহনশীল ও স্থিতিশীল উন্নয়ন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টায় কোন বাধা সৃষ্টি না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর দিকে নজর দিতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের গুণমান ও কার্যকারিতা বজায় রেখে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে যে, অধিকারের প্রসারণ মানবসমাজকে যেন পুরনো দারিদ্র্য, ব্যাধি, সংকীর্ণতায় না ফেরৎ পাঠায়। সমাজের সভ্যতার অগ্রগতি ও উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে পরিবেশের অধিকারে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি — এইসবের গুরুত্ব স্বীকার করেই পরিবেশের অধিকার আন্দোলনকে প্রসারিত করতে হবে।[১৩] এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কেবল পরিবেশ আইন প্রণয়ন করে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন পরিবেশ ও দূষণ সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানসিকতা পরিবর্তন।

অনুশীলনী - ৩

✶ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ✶

১. সবুজ শান্তি আন্দোলন কী?

২. সবুজ রাজনীতি বলতে কী বোঝায়?

৩. পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়নের ব্যাপারে ভারতে সংবিধানে কী সংযোজন করা হয়েছে?

৪. জল (দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের ওপর টীকা লেখ।

৫. পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন কী?

✶ রচনাত্মক প্রশ্ন ✶

১. ভারতের পরিবেশ সমস্যার সমাধানে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা কর।

২. ভারতে পরিবেশ সমস্যার সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা কর।

13 মোহিত রায়, পৃষ্ঠা ১১৬।

৮.১১ প্রধান শব্দগুচ্ছ

পরিবেশ (Environment) :

পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি প্রাকৃতিক ও জৈবিক উপাদান সমূহের সমষ্টি যেগুলি জীবের অস্তিত্বরক্ষা, বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও জননে সাহায্য করে। অর্থাৎ উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরকার হয় তাকে পরিবেশ বলে। পরিবেশ তৈরি হতে দরকার লাগে, জল, বাতাস, মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ।

বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুরীতি (Ecosystem) :

কোন নির্দিষ্ট ভৌত পরিবেশ ও সেখানকার জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্ক থাকে। কোন নির্দিষ্ট ভৌত পরিবেশ ও সেখানকার জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককেই বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুরীতি বলে।

স্থিতিশীল বা সহনশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) :

যে উন্নয়ন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদের ভাণ্ডারকে অটুট রেখে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটায় তাই হল স্থিতিশীল বা সহনশীল উন্নয়ন। এই উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রাকৃতিক সম্পদের গুণমান ও কার্যকারিতা বজায় রেখেও সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করে।

পরিবেশবাদী নারীবাদ (Ecofeminism) :

এটি একটি সমসাময়িক মতবাদ। পরিবেশবাদী নারীবাদ হল মূলতঃ নারীর অধিকার ও পুরুষের সাথে সমান অধিকার স্থাপনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার মতবাদ।

সবুজ শান্তি আন্দোলন (Green Peace Movement) :

১৯৭১ সালে নেদারল্যাণ্ডের আমস্টারডমে পরিবেশ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গঠন করা হয়। এই সংস্থাটি গ্রীন পীস ইন্টারন্যাশনাল বা সংক্ষেপে গ্রীন পীস নামে খ্যাত। রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গ্রীন পীসকে তাদের অন্যতম উপদেষ্টা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে পরিবেশ আন্দোলনকে জোরদার করে তুলেছে। গ্রীন পীসের লক্ষ্য হল — জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা, পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা, পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলা এবং পরিবেশের সুরক্ষার স্বার্থে দীর্ঘমেয়াদী শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

গ্রীন বেঞ্চ (Green Bench) :

সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টে পরিবেশ সম্পর্কিত মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য একটি নতুন বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। এর নাম গ্রীন বেঞ্চ। পরিবেশ আইনগুলিকে ঠিকমত প্রয়োগ করে পরিবেশ রক্ষা করার ব্যাপারে গ্রীন বেঞ্চের গুরুত্ব অপরিসীম।

৮.১২ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

✶ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৮.২ দেখুন।

২. অনুচ্ছেদ ৮.৩ এর শেষাংশ দেখুন।

৩. অনুচ্ছেদ ৮.৩ এর শেষাংশ এবং অনুচ্ছেদ ৯.১১ দেখুন।

৪. অনুচ্ছেদ ৮.৪ এর সেষাংশ দেখুন।

✶ রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৮.৪ দেখুন।

অনুশীলনী - ২

✶ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৮.৫ ও ৮.৫.১ দেখুন।

২. অনুচ্ছেদ ৮.৫.২ দেখুন।

৩. অনুচ্ছেদ ৮.৫.৫ দেখুন।

✶ রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৮.৫, ৮.৫.১, ৮.৫.২, ৮.৫.৩, ৮.৫.৪, ৮.৫.৫ ও ৮.৫.৬ দেখুন।

অনুশীলনী - ৩

✶ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৮.৬ দেখুন।

২. অনুচ্ছেদ ৮.৭.১ দেখুন।

৩. অনুচ্ছেদ ৮.৭.২ দেখুন।

৪. অনুচ্ছেদ ৮.৮ দেখুন।

✶ রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৮.৬.১ ও ৮.৮ দেখুন।

অনুশীলনী - ৪

✶ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৮.৯ এর প্রথমাংশ ও ৮.১১ দেখুন।

২. অনুচ্ছেদ ৮.৯ এর প্রথমাংশ দেখুন

৩. অনুচ্ছেদ ৮.৯ থেকে উত্তর করুন।

৪. অনুচ্ছেদ ৮.৯ দেখুন।

৫. অনুচ্ছেদ ৮.৯ দেখুন

✶ রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৮.৯ ও ৮.১০ দেখুন।

২. অনুচ্ছেদ ৮.১০ দেখুন।

৮.১৩ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay type :-

1. Comment on the major features and central issue of politics of environmentalism in India.
2. What are the major features of politics of environment in India. What are the central issues thrown up by environmental movements? Answer with illustrations.
3. Identify the major features of environmental movements in India with suitable illustrations.

Short type :-

1. Underline two major features of the Chipko movement.
2. Analyse two important features of environmental movements in contemporary India.
3. What are the legal-institutional provisions for protection of environment in India.
4. Identity some basic issues raised by the protagonists of environmental movements in Indla.

৮.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

1. Rakhahari Chatterjee(ed.), Politic India : The State-Society Interface, 2001, South Asian Publishers, New Delhi.
2. V. K. Prabhakar(ed.) World Environment, 2001, Anmol Publication, New Delhi.
3. শুভেন্দু দাশগুপ্ত (সম্পাদনা), প্রসঙ্গ মানবাধিকার, ২০০০, পিপল্‌স্ বুক সোসাইটি, কলকাতা।
4. Britannica : ready Reference Encyclopedia, vol. 3, 2005, Encyclopaedia Britannica, New Delhi.
5. Ghanashyam Shah, Social Movements in India, 1990 Sage, New Delhi.
6. Ramchandra Guha, Ideological Trends in Indian Environmentalism, in EPW Dec. 3, 1988.

একক - ৯ মানবাধিকার : ভারতে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও আন্দোলন
(Human Rights : Protection of and Movements for Human Rights in India)

গঠন —

৯.০ উদ্দেশ্য

৯.১ প্রস্তাবনা

৯.২ মানবাধিকার কী?

- ৯.২.১ মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য
- ৯.২.২ মানবাধিকারের শ্রেণীবিভাগ
- ৯.২.৩ মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য

৯.৩ মানবাধিকারের তত্ত্বসমূহ

- ৯.৩.১ স্বাভাবিক আইন তত্ত্ব
- ৯.৩.২ সদর্থক মতবাদ
- ৯.৩.৩ মার্কসীয় তত্ত্ব
- ৯.৩.৪ ন্যায় ভিত্তিক তত্ত্ব
- ৯.৩.৫ মর্যাদা ভিত্তিক মতবাদ

৯.৪ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও মানবাধিকার আইন

- ৯.৪.১ মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণাপত্র
- ৯.৪.২ মানবাধিকার ও তৃতীয় বিশ্ব

৯.৫ ভারতে মানবাধিকার সংরক্ষণ

- ৯.৫.১ ভারতের সংবিধান ও মানবাধিকার সংরক্ষণ
- ৯.৫.২ ভারতে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন
- ৯.৫.৩ মানবাধিকার রক্ষা আইন, ১৯৯৩
- ৯.৫.৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- ৯.৫.৫ পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন

৯.৬ ভারতে মানবাধিকার আন্দোলন

৯.৭ সারসংক্ষেপ

৯.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৯.৯ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৯.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৯.০ উদ্দেশ্য

বিংশ শতাব্দীর শেষের দশক থেকে মানবাধিকারে প্রশ্নটি দেশে বিদেশে মানুষকে বিপুলভাবে আলোড়িত করেছে। ভারতেও মানবাধিকার আন্দোলন ক্রমশই ব্যাপকতা লাভ করছে। সাম্প্রতিককালে মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা উপলব্ধি করেছে যে, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি মানুষেরই প্রয়োজন মানবাধিকার সংরক্ষণ। এই অধিকার ব্যতীত তারা তাদের সহজাত গুণের বিকাশ ঘটাতে পারবে না। মানবাধিকার লঙঘন তাই বৃদ্ধি করেছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ। এই প্রেক্ষিতে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও তার উৎসাহ দান হয়ে পড়েছে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য। ভারতে আজ যেমন সরকার মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য নানারকম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিয়েছে, তেমনই মানবাধিকার রক্ষার অনুকুলে জনমতও জাগ্রত হয়ে উঠেছে। এই এককটিতে মানবাধিকারের প্রকৃতি এবং ভারতে কীভাবে এর লঙঘনের বিরুদ্ধে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যাবে :

১) মানবাধিকার কী?

২) মানবাধিকারের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট।

৩) মানবাধিকারের আন্তর্জাতিকীকরণও আন্তর্জাতিক আইনের মানবিকীকরণ।

৪) ভারতে মানবাধিকার আন্দোলন ও সংরক্ষণ।

৯.১ প্রস্তাবনা

'মানবাধিকার' শব্দটির সাথে আমরা কম বেশী সবাই পরিচিত। ''সমস্ত মানুষই জন্মসূত্রে স্বাধীন এবং তাদের মর্যাদা ও অধিকার সমান'' [১] — এই নৈতিক অধিকার মনুষ্যত্বের দাবিতেই সমস্ত মানুষের মধ্যে বর্তমান। একে কেড়ে নেওয়া যায় না। এর জন্যই সারা পৃথিবীর মানুষ আজ অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সামিল হয়েছে। আজ যাকে 'মানবাধিকার' বলা হয়, তা এসব অধিকারেরই স্পষ্ট, লিপিবদ্ধ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রূপ।[১]

সমস্ত মানুষের মর্যাদা ও সাম্যের যে মূল্যবোধ আধুনিক অর্থে মানবাধিকারের মর্মবস্তু হিসেবে কাজ করছে, তা মানবসমাজের বিকাশের বিভিন্ন পর্বে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত। মানব সভ্যতার ইতিহাসকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণী সমাজে তাদের অগ্রাবস্থানের সুবিধাগুলি খুঁজেছে, তবু সমগ্র মানবসভ্যতা কিন্তু

1 বিশ্ব মানবাধিকার সনদ, ধারা -১, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, প্রসঙ্গ মানবাধিকার এর মধ্যে, পৃষ্ঠা ১৬০।

মানবাধিকারের পক্ষেই ছিল এবং এই মানবাধিকার রক্ষার জন্যেই সংগ্রাম করেছে। প্রাচীন সভ্যতা মানবজাতির কল্যাণ ও উন্নতিসাধনের লক্ষ্যেই কাজ করেছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাও মানবজাতির উন্নতি সাধনের জন্যই বেশি সচেষ্ট ছিল। ঋক বেদে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের সকল মানুষই আত্মমর্যাদায় সমান অধিকারের অধিকারী এবং তারা একে অন্যের ভাই। মানুষের এই আত্মমর্যাদা রক্ষার তাগিদেই সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামের ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। মানবাধিকার লঙঘন করার পরিণতিতে যেসব বর্বরোচিত কার্যকলাপ সম্পাদিত হয়েছে তা মানবসমাজের বিবেককে সজোরে ধাক্কা দিয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আকাঙক্ষা হিসাবে এমন এক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়েছে, যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশ ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ভয় ও অভাবের হাত থেকে মুক্তির স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে।

যদিও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের সময় থেকে সারা বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছিল, কিন্তু আধুনিক মানবাধিকার রক্ষার ইতিহাস ও সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা সারা পৃথিবীর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেবার এবং এ প্রসঙ্গে একটি সর্বসম্মত বিশ্বজনীন কার্যকরী কর্মসূচী গড়ে তোলার জন্য। এরই ফলে ১৯৪৫ সালে বিশ্বে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, যার সনদে মানবাধিকার ও মানবমর্যাদা রক্ষার দৃঢ় সংকল্পকে বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। সনদের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য হল মানবাধিকার এবং জাতি-লিঙ্গ-ভাষা ও ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মানের বৃদ্ধি ও বিস্তারের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা।[২] এই প্রক্রিয়ার পরিণতিতে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা স্বীকৃতি রক্ষার তাগিদে ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত হয়েছিল মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights)

এই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র সারা বিশ্বের মানুষের সামনে সূচনা করেছে এক নতুন দিগন্তের,, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ-বাদের শৃঙ্খল ভঙ্গ করে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সারা পৃথিবীতে শতাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করেছিল। মানবাধিকার বাস্তবায়নের পথে এটি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই ঘোষণাটি এক প্রধান স্তম্ভ হিসাবে কাজ করেছে। আজকের পৃথিবীতে মানবাধিকার রক্ষা সমগ্র মানবজাতির কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। মানবাধিকার রক্ষার সাফল্যের ওপরই নির্ভর করছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতার স্বরূপ। ভারতের জনগণও ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করেছে। ঔপনিবেশিক শাসক কর্তৃক তাদের জীবন ও স্বাধীনতা লঙঘনের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়েছিল। তাই স্বাধীনতার পর ভারতেও মানবাধিকার সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

2 *Article I* of U.N. Charter, Quoted in C.J. Nirmal, Human Rights in India, P. 190.

৯.২ মানবাধিকার কী?

আজকাল প্রায়শই সমাজবিদ ও রাজনীতিবিদরা 'মানবাধিকার' কথাটা ব্যবহার করেন। তাঁরা সাধারণত সেইসব স্বাভাবিক অধিকারের উল্লেখ করেন যেগুলি ব্যতীত মানবজীবন সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানবাধিকার হল সেই সকল অধিকার যা আমাদের সকলের মধ্যে নিহিত আছে এবং যেগুলি ছাড়া আমরা সমাজে 'মানুষ' হিসাবে বাঁচতে পারি না। সুতরাং 'মানুষ' হিসাবে স্বাভাবিক যোগ্যতায় প্রাপ্য স্বাভাবিক বা জন্মগত অধিকারগুলিকে 'মানবাধিকার' বলে।[২(i)] এই অধিকারগুলি প্রতিটি মানুষ জন্মলগ্ন থেকেই অর্জন করে। এই অধিকারগুলিকে জোর করে কেউ কেড়ে নিতে পারে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে, মানবাধিকার হল এমন সব অধিকার যা প্রতিটি মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে, তার মর্যাদা ও যোগ্যতা রক্ষা ও বৃদ্ধিতে ও অন্যান্য পূরণের জন্য সর্বত্রভাবে সাহায্য করে।

এই অধিকারগুলি কখনই রাষ্ট্র কর্তৃক লঙঘন করা উচিত নয়। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এগুলি সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। আবার অন্যদিকে এটা আশা করা হয় যে, সরকারই এই অধিকারগুলি রক্ষা করবে এবং প্রসারিত করবে। সমস্ত মানুষই ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সব স্বাধীনতা, সুযোগসুবিধা এবং বৈষয়িক প্রয়োজনীয়তা পাবার অধিকার — এটাই হল মানবাধিকারের প্রকৃতি। তবে অবশ্যই আশা করা হয় যে, মানুষ তার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে এবং আগামী প্রজন্মের স্বার্থের কথা মনে রেখে তার বৈষয়িক উন্নতির সীমারেখা নিয়ন্ত্রণ করবে।

অধিকার যেহেতু সমাজ নিরপেক্ষ নয়, তাই সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে। মানবাধিকার বলতে ঠিক কোন্ অধিকারগুলিকে বোঝায়, তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। অনেকে অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে মানবাধিকার হিসাবে গুরুত্ব দেবার কথা বলেন। আবার ধনতান্ত্রিক দেশগুলি অর্থনৈতিক অধিকার অপেক্ষা পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে অধিক গুরুত্ব দেবার কথা বলে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে ১০ই ডিসেম্বর জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় 'মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয়। এই মানবাধিকারগুলি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে ১৬ই ডিসেম্বর সাধারণ সভা কর্তৃক দু'টি চুক্তিপত্র এবং একটি ঐচ্ছিক সংযোজন গৃহীত হয়। এগুলি হল (১) পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র; (২) পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের ঐচ্ছিক সংযোজন এবং (৩) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি পত্র। সুতরাং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, মানবাধিকার হল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-নির্ধন নারী-পুরুষ প্রভৃতি নির্বিশেষে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পৌর,রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ। এদের মধ্যে একদিকে রয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার; অপরদিকে রয়েছে কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে এই মানবাধিকারের পরিধি ক্রমবর্ধমান। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা,

2(i) Britannica Ready Reference Encyclopdia, Vol. 5, PP. 82-83.

দূষণমুক্ত পরিবেশ, স্বাস্থ্যের অধিকার — সবই এই মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। মানবাধিকার আজ শুধু ব্যক্তিগত অধিকার নয়, সমষ্টিগত ও জাতিগত।

১৯৯৩ সালের আগে ভারতে মানবাধিকারের কোন আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নি। ১৯৯৩ সালে ভারতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন এবং মানবাধিকার আদালত প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানবাধিকার সুরক্ষা আইন পাশ করে ভারতীয় সংসদ। এই আইনের ২(১) ধারায় সর্বপ্রথম মানবাধিকারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই ধারা অনুযায়ী মানবাধিকার বলতে বোঝায় সেই সব অধিকার, যেগুলি ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদার সঙ্গে জড়িত এবং ভারতীয় সংবিধান দ্বারা অথবা আন্তর্জাতিক সনদ বা ঘোষণাপত্র দ্বারা স্বীকৃত এবং ভারতের আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।[৩]

৯.২.১ মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য

মানবাধিকারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। **এক,** মানবাধিকার সর্বজনীন, কারণ পৃথিবীর সকল মানুষ ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ নির্বিশেষে এই অধিকারগুলি ভোগ করার অধিকারী। আমরা জানি জন্মসূত্রে সকল মানুষই সমান ও স্বাধীন। সকল মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সমান তাই মানবাধিকার সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। **দুই,** মানবাধিকার অবিভাজ্য। এটি একটি সামগ্রিক বিষয়। কোন একটি মানবাধিকারকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে অন্যগুলোকে উপেক্ষা করা যায় না। একদিকে যেমন নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি একে অন্যের পরিপূরক, তেমনি অন্যদিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলির মধ্যেও এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রতি পর্যায়ের অধিকার মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে সাহায্য করে ও মানুষের মর্যাদাকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। **তিন,** মানবাধিকারগুলি অলঙঘনীয় ও পবিত্র। এই নৈতিক অধিকার মনুষ্যত্বের দাবিতেই সকল মানুষের মধ্যে বর্তমান। অন্য কেহ শক্তি প্রয়োগ করে কোন ব্যক্তির মানবাধিকার কেড়ে নিতে পারে না। কারণ মানবাধিকারগুলি প্রত্যেক মানুষের জন্মগত ও সহজাত অধিকার। **চার,** মানবাধিকার ব্যক্তিগত এই অর্থে যে, এই অধিকারগুলি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যেই অন্তর্নিহিত। মানবাধিকার সমাজের দ্বারা উদ্ভূত হয়নি। **পাঁচ,** মানবাধিকারের ধারণা আজ আর শুধু ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে একগুচ্ছ সমষ্টিগত মানবাধিকার। বিকাশের অধিকার, দূষণমুক্ত পরিবেশের অধিকার, দেশ বা জাতির স্বাধীনতা — এসবই হল সমষ্টিগত মানবাধিকারের উদাহরণ। সাম্প্রতিককালে এই সমষ্টিগত মানবাধিকারের সার্থক রূপায়নের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। **পরিশেষে** বলা যেতে পারে যে, মানবাধিকার বিষয়টি কোন বিমূর্তি ধারণা নয়; কোন দেশের সুনির্দিষ্ট সামাজিক বিকাশের স্তরের ওপর মূলত নির্ভরশীল। এই ধারণা সমাজ-নিরপেক্ষ, বিমূর্ত ও শাশ্বত নয়, বরং ক্রমবিকাশমান; সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।[৪] এইভাবে দেখা যায় যে, মানুষের বিভিন্ন

3 The Protection of Human Rights Act, 1993, in C.J. Nirmal, Human Rights in India, P. 290.

4 দীপংকর চক্রবর্তী, মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও রাজনীতি এবং তৃতীয় বিশ্ব, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, প্রসঙ্গ মানবাধিকার এর মধ্যে, পৃষ্ঠা ২৫-২৮।

অবস্থার প্রতিফলনকারী মানবমূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে মানবাধিকার গড়ে উঠেছে। জীবন, স্বাধীনতা, সমতা ও মর্যাদা সম্পর্কিত অধিকারসমূহই মানবাধিকার।

৯.২.২ মানবাধিকারের শ্রেণীবিভাগ

ঐতিহাসিক দিক থেকে এবং গঠন প্রকৃতির দিক থেকে মানবাধিকারগুলিকে তিনটি 'প্রজন্মের' অধিকারে ভাগ করা হয়ে থাকে।[৪(1)] নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি হল প্রথম প্রজন্মের অধিকার। এগুলি আলোকপ্রাপ্তির যুগ এবং ইংল্যাণ্ডের, আমেরিকার ও ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত। এগুলির মধ্যে রয়েছে জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, মতপ্রকাশ ও পূজা অর্চনার স্বাধীনতা প্রভৃতি। প্রথম স্তরের অধিকারের মধ্যে মূলত স্বাধীনতা কেন্দ্রিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের কী করা উচিত নয় তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার হল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রের প্রসারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সঙ্গে এই অধিকারগুলি সম্পর্কযুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে অধিকার, শিক্ষার অধিকার প্রভৃতি। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কী করা উচিত সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ ২১ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে প্রথম প্রজন্মের অধিকার হিসাবে জীবনের অধিকার সুনিশ্চিত করেন। কিন্তু ক্রমশ দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকারের সঙ্গে সংগতি রেখে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকারকেও জীবনের অধিকারের সঙ্গে সংযোজিত করার কথা বলা হয়। পরবর্তীকালে শিক্ষার অধিকারকেও ২১ অনুচ্ছেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মানুষের কষ্টার্জিত অধিকার সম্বন্ধে তাদের চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুর স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে ভেদরেখা ক্রমশ ঘুচতে থাকে। তৃতীয় প্রজন্মের মানবাধিকার হল সমষ্টিগত অধিকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে এই অধিকারগুলি সংযুক্ত। এই মানবাধিকার নতুন কিছু বিষয় যেমন পরিবেশ, উন্নয়ন, সংস্কৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির ওপর আলোকপাত করেছে। এখানে ব্যক্তির পরিবর্তে দল বা সম্প্রদায়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এইসব বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকারের মধ্যে আমরা কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানতে পারি না। এদের মধ্যে পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের কথা ১৯৯৩ সালে ভিয়েনা ঘোষণার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করা হয়েছে।

৯.২.৩ মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য

মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সাধারণভাবে মৌলিক অধিকার বলতে আমরা বুঝি সেইসব অধিকার, যা প্রত্যেকটি মানুষের সমাজে বেঁচে থাকার জন্য একান্ত অপরিহার্য। রাষ্ট্র এইসব অধিকার সুরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাধারণভাবে রাষ্ট্র এইসব অধিকারের ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। তাই

4 (i) Britannica Ready Reference Encyclopedia, Vo. 5, P. 83.

এই অধিকারের ওপর রাষ্ট্র বা সরকার কোন হস্তক্ষেপ করলে যে-কোন ব্যক্তি তার প্রতিবিধানের জন্য উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে। এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয় কারণ এগুলি মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে মৌলিক বা অপরিহার্য। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, এগুলি দেশের মৌলিক আইন অর্থাৎ সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। তাই আইন বিভাগ কর্তৃক কোন আইন বা শাসন বিভাগের কোন কাজ এগুলির বিরোধী হলে আদালত সেগুলি বাতিল করে দিতে পারে। এইভাবে আদালত মৌলিক অধিকারের পবিত্রতা রক্ষা করে।

এই আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, সব মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার। কারণ মানবাধিকার বলতেও আমরা বুঝি সেইসব অধিকারকে, যা ব্যতিরেকে একজন মানুষ সমাজ 'মানুষ' হিসাবে বাঁচতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানুষের সব অধিকারগুলি সমানভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। কোন দেশের লিখিত সংবিধান হচ্ছে সেই দেশের মৌলিক আইন। এই লিখিত সংবিধানে যেসব মানবাধিকারকে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং এর লঙঘনের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, কেবলমাত্র সেইসব মানবাধিকারকে আমরা মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করতে পারি। ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি হল মানবাধিকার। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সব মানবাধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায় না; অন্যদিকে সব মৌলিক অধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার। অর্থাৎ যেসব মানবাধিকার লিখিত সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত সেইসব অধিকারকে আমরা মৌলিক অধিকার বলতে পারি।

৯.৩ মানবাধিকারের তত্ত্বসমূহ

মানবাধিকার নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকগণ বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছেন। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের মাধ্যমে মানবাধিকার ধারণাটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। অতীতে মানবজাতির অধিকারসমূহ মানবাধিকার হিসাবে পরিচিত ছিল। তাকে ব্যাখ্যা করতে কতকগুলি তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছিল। এগুলি হল — স্বাভাবিক আইন তত্ত্ব, সদর্থকবাদ, মার্কসীয় তত্ত্ব, ন্যায়ভিত্তিক মতবাদ, মর্যাদাভিত্তিক মতবাদ প্রভৃতি। এই তত্ত্বগুলির মধ্যে অজস্র বিরোধিতা থাকলেও প্রত্যেকটি মতবাদ মানবাধিকার ও রাষ্ট্রে মধ্যে সম্পর্ক পর্যালোচনা করেছে।

৯.৩.১ স্বাভাবিক আইন তত্ত্ব

আধুনিক অর্থে মানবাধিকারের বীজ প্রাচীন গ্রীসের স্টোয়িক দর্শনের মধ্যে নিহিত ছিল। এই দর্শন স্বাভাবিক আইন তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। স্টোয়িকরা বিশ্বাস করতেন যে, সৃষ্টির মূলে একটি বিশ্বজনীন শক্তির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জ্য রক্ষা করে মানুষকে চলতে হবে। ৪২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে লিখিত সোফোক্লিস (Sophocles) এর নাটক 'আন্তিগোনে' (Antigone) তে উচ্চতর আইন, স্বাভাবিক আইন ও মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে রোমান আইনবিদদের দ্বারা এই তত্ত্বের উন্নতি, পরিমার্জন ও পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁরা স্বাভাবিক আইন এবং জাতীয় আইনের নীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কতকগুলি বিশ্বজনীন মানবাধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। রোমানদের মতে, স্বাভাবিক আইন ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর নীতিগুলি সমাজ সচেতন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত। এগুলি প্রকৃতির নিয়ম এর অনুসারী, অপরিবর্তনীয় ও চিরকালীন।

স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব উপরে বর্ণিত স্বাভাবিক আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বকে আধুনিক যুগের মানবাধিকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব বলে অভিহিত করা যায়। আধুনিক অর্থে স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হলেন জন লক। লকের মতে, মানুষ এমন এক প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে ছিল যেখানে তারা এক স্বাধীনতার বাতাবরনের মধ্যে বিরাজ করত। মানুষ হিসাবে ব্যক্তি প্রকৃতির রাজ্যে কতকগুলি সুস্পষ্ট অধিকার ভোগ করত। এইসব অধিকারের মধ্যে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। লক্ জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারকে স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। রাষ্ট্রের কর্তব্য হল জনগণের স্বাভাবিক অধিকারকে সম্মান জানানো এবং সেগুলিকে যথাযথভাবে সুরক্ষিত করা। এই স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্ব মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছে।

৯.৩.২ সদর্থক মতবাদ (Positivism)

সদর্থক মতবাদীগণ অধিকার সম্পর্কে এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। এই তত্ত্ব অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বিকাশ লাভ করে। এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা যদি আইন প্রণীত হয় তাহলে জনগণ তা মানতে বাধ্য। এই আইনকে সদর্থকবাদী আইন বলা হয়। সদর্থকবাদীদের মতে, মানবাধিকারের উৎস একটি ব্যবস্থার প্রচলনের মধ্যে নিহিত থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে অমান্য করার শাস্তিবিধান বা পালন করার পুরস্কার। এই মতবাদীগণ ''কী হয়'' এবং ''কী হওয়া উচিত'' — এই দুটির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, স্বাভাবিক আইন তত্ত্ব অযৌক্তিকভাবে 'কী হওয়া উচিত' এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে 'বাস্তব' আর 'উচিত' মধ্যে পার্থক্যটা গুলিয়ে ফেলেন। সদর্থকবাদের একজন অন্যতম প্রবক্তা জেরেমী বেন্থাম স্বাভাবিক আইনের ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষের অধিকার প্রকৃতি থেকে আসেনি। এগুলি আইনের দ্বারা সৃষ্ট। এর মূল্য নির্ভর করে তার উপযোগিতার ওপর। বেন্থাম স্বাভাবিক অধিকারের জায়গায় উপযোগিতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। জন অস্টিনের মতে, নাগরিক যে স্বাধীনতা ভোগ করে তা আসলে প্রদান করে সার্বভৌম এবং উপযোগিতার ধারণাই রাষ্ট্রকে নাগরিক স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

৯.৩.৩ মার্কসীয় তত্ত্ব

মার্কসবাদীগণ ব্যক্তির অধিকারকে সামগ্রিকভাবে সমাজের অধিকার থেকে পৃথক ভাবতে রাজী নন। তাঁদের মতে, কেবলমাত্র, সমাজ বা গোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধনের দ্বারাই ব্যক্তির উন্নততর স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে কোন ব্যক্তির প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরা ব্যক্তির অধিকারের ধারণাকে একটি বুর্জোয়া ভ্রান্তি বলে মনে করেন। মার্কসের মতে, ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রচারিত মানবাধিকারগুলি হল অহং ভাবপূর্ণ ব্যক্তির অধিকার। এরূপ মানুষ সমাজের অন্যান্য মানুষের থেকে

সম্পূর্ণ পৃথক। বস্তুতঃ মার্কসীয় তত্ত্বে মানবাধিকারের ধারণা হল বুর্জোয়া ধারণা। কারণ এরূপ অধিকারের কেন্দ্রবিন্দু হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার। মার্কসের মতে, মানুষ যখন ক্ষুদ্র বুর্জোয়া ব্যক্তি-অস্তিত্বকে অতিক্রম করে যায়, ব্যক্তির তখন অধিকারের প্রয়োজন হয় না। কারণ এইসব অধিকার বুর্জোয়া অর্থনীতিকে তার সহযোগী অসাম্য, শোষণ, আত্মকেন্দ্রিকতা নিয়ে বেড়ে চলতে সাহায্য করে। মার্কসের মতে, মানুষ কেবল তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে, যখন সব ধরনের নিপীড়নমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিলোপ ঘটবে।

৯.৩.৪ ন্যায় ভিত্তিক তত্ত্ব

ন্যায়ভিত্তিক তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা হলেন জন রলস্ (John Rawls)। তাঁর মতে, ন্যায় হল সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রথমগুণ। তিনি মনে করেন যে, কোন নৈতিক তত্ত্বের উদ্দেশ্য হল আগে সঠিক নৈতিক আচরণ নিরূপণ করা এবং তার ভিত্তিতে নৈতিক মঙ্গল নির্ধারণ করা। তাঁর মত অনুসারে ন্যায় বলতে ন্যায্যতাকে বোঝায়। মানবাধিকারকে বুঝতে গেলে এই ন্যায়কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে। ন্যায়ের মূল উদ্দেশ্যই হল মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা। ন্যায়ের মূল নীতিগুলি মূল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য প্রদানের পন্থা বলে দেয়। রলস্ মানুষের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের অধিকারকে সারগর্ভ নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, ব্যক্তি-মানুষের এই অধিকার অবশ্যই থাকা উচিত, যার ফলে সে কী চায় বা না চায় তা ঠিক করার এবং প্রয়োজনে তার পছন্দ পরিবর্তন করার ক্ষমতা তার নিজের হাতে থাকে। রলস্ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিরূপে সমাজে ন্যায্য বন্টন ব্যবস্থা আনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

৯.৩.৫ মর্যাদা ভিত্তিক মতবাদ

ল্যাসওয়েল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ছিলেন মর্যাদা ভিত্তিক মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা। এই মতবাদের দ্বারা সামাজিক কার্য ও নীতি নির্ধারণে মানুষের মর্যাদাকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়। এর প্রবক্তাগণ মানুষের মর্যাদা রক্ষাকে ভিত্তি করে মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেন। তাঁদের মতে, মানবাধিকারের দাবির প্রধান উদ্দেশ্য হল সকল মূল্যবোধগুলির মধ্যে বিস্তৃতভাবে অংশগ্রহণ। এই মতাদর্শের প্রবক্তাগণ এমন এক বিশ্বসমাজ গঠনের কথা বলেন, যার মধ্যে মূল্যবোধের গণতান্ত্রিক সুষম বন্টন ও সম্পদের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়। এই সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হবে মানুষের মর্যাদার সুরক্ষা।

মানবাধিকার সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন তত্ত্ব পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, কোন একটি বিশেষ তত্ত্ব বর্তমানে মানবাধিকারের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করতে পারবে না। তবে বলা যেতে পারে যে, স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্ব মানবাধিকার সম্পর্কে বর্তমানে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে বেশী সম্পর্কযুক্ত ও সময়োপযোগী। এর সঙ্গে ন্যায়, মর্যাদা, সাম্য ও সম্মান সংক্রান্ত মতবাদগুলি মিলিত হয়ে মানবাধিকার ধারণার বিকাশে সাহায্য করেছে। বিংশ শতাব্দীতে সদর্থকবাদের ক্ষীয়মানতা লক্ষ্য করা যায় এবং তার জায়গায় স্বাভাবিক আইন তত্ত্বের

পুনর্জাগরণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ন্যায়ভিত্তিক মতবাদ ও মর্যাদাভিত্তিক মতবাদ — উভয়েই স্বাভাবিক আইন তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। তবে স্ট্যামলার প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিত স্বাভাবিক আইন মতবাদের অনেক পরিবর্তন সাধন করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। কিন্তু এই মতবাদের প্রধান নীতিগুলি অপরিবর্তিত থাকছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, আন্তর্জাতিক আইনের আদর্শমুখীনতা সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক মানবসমাজকে প্রভাবিত করেছে এবং বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে মানবাধিকারের ক্রম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রক্রিয়াকে।

অনুশীলনী - ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :-

১. মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়?

২. মানবাধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের সম্পর্ক কী?

৩. মানবাধিকারের শ্রেণীবিভাগ কীভাবে করবে?

৪. মানবাধিকার সম্পর্কে স্বাভাবিক আইন তত্ত্বের মূল বক্তব্য কী?

রচনাত্মক প্রশ্ন :-

১. মানবাধিকারের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা কর।

৯.৪ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও মানবাধিকার আইন

বর্তমান বিশ্বে প্রায় সকল রাষ্ট্রই মানবাধিকারকে সাধারণভাবে স্বীকার করতে প্রস্তুত। বিংশ শতাব্দীতে মানবিকতার প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন মতাদর্শের উদ্ভব ঘটে। মনুষ্য জগতে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম অবদান হল মানবাধিকারের ধারণা। বর্তমানে মানবাধিকার যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়েছে। মানবাধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয় জার্মানীতে নাৎসীবাদের আবির্ভাবের পরবর্তী সময় থেকে। মানবাধিকারের নগ্ন লঙ্ঘন নাৎসী শাসনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তথাকথিত জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অজুহাত দিয়ে নাৎসী শাসকরা ইহুদীদের অধিকার হরণ এবং তাদের ওপর নিপীড়ন ও তাদের ধ্বংস সাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। এর ফলে বিশ্বব্যাপী নাৎসী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যুদ্ধের ফল সঞ্জাত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, বিশেষত নৃশংস ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের দুঃসহ স্মৃতি সমগ্র বিশ্বের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আন্তর্জাতিক স্তরে এক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করার জন্যে। ইতিহাসে ঐ অন্ধকার দিনগুলি আর যাতে ফিরে আসতে না পারে, তার জন্য বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রনায়করা ঐকান্তিকভাবে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেন। ১৯৪৪ সালে মিত্রশক্তির চার রাষ্ট্র ডাম্বার্টন ওক্‌সে মিলিত হয় এবং এক বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে এক খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে বলা হয় যে,

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামে এক আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠন করা হবে, যার প্রধান কর্মসূচী হবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য মানবিক সমস্যার সমাধান খোঁজা এবং মানবাধিকার ও মানুষের মৌলিক স্বাধীনতাগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এর ফল স্বরূপ ১৯৪৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের মধ্যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আইনী গঠনতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সংগঠনের মূল ভিত্তি হিসাবে মানবাধিকার ও মানব মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাকে অন্তর্ভুক্ত করা। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগ্রামে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করল। আক্ষরিক অর্থে আধুনিক মানবাধিকারের ধারণা এবং আইন গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, মানুষের মৌলিক অধিকার, সম্পদ ও মূল্যবোধ রক্ষা এবং সকল জাতির নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রতি আস্থা পুনঃস্থাপন করা হবে।[৫] সনদের ১(৩) অনুচ্ছেদে সংযোজিত হয়েছে — জাতি, ধর্ম, ভাষা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মানবাধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হবে। ১৩(২) এবং ৬৮ অনুচ্ছেদে মানবাধিকার কার্যকর করার জন্য সাধারণ সভার দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে।[৫(i)] সনদের ৫৫ ও ৫৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রসমূহ বর্ণ, ভাষা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং সেগুলি সংরক্ষণের জন্য সচেষ্টা থাকবে।[৬] সনদে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের হাতে। বলা হয়েছে যে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনবোধে পরিষদ কোন কমিটি ও কমিশন গঠন করতে পারে (সনদের ৬৮ নং অনুচ্ছেদ)।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন গতি হয় এবং ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে এই কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ শুরু করে। শ্রীমতী ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট ছিলেন এই কমিশনের প্রথম সভানেত্রী। ভৌগোলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিনিধিদের নিয়ে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা ৭০র কাছাকাছি। মানবাধিকার সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের। মানবাধিকার কমিশন এই দায়িত্ব পালনের প্রধান মাধ্যম। এই দায়িত্ব অনুযায়ী কমিশন মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণাপত্রের খসড়া রচনা করেছিল, যা ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। এছাড়া শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র, উপনিবেশ ও তাদের জনসাধারণকে স্বাধীনতা দানের ঘোষণাপত্র, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র, নারী বৈষম্য রদ সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র, শান্তির ঘোষণাপত্র প্রভৃতির খসড়া প্রণয়নে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। এছাড়া সাধারণ সভার নির্দেশক্রমে মানবাধিকার কমিশন পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার

---

5 Quoted in M. Sundara Raj, Awakening of Human Rights in C. J. Nirmal, Human Rights in India, P. 14.

5(i) Quoted in K. S. Krishnasamy, Organizational Basis of Human Rights, in C. J. Nirmal, Human Rights in India, P. 190.

6 Ibid. P. 190.

সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরি করে।এইসব দায়িত্ব পালনের জন্য কমিশন নানা ধরনের কর্মগোষ্ঠী এবং বিশেষ প্রতিবেদকদের নিয়োগ করে থাকে। এছাড়া বেশ কিছু উপ-সংস্থাও কমিশনের অধীনে কাজ করে থাকে। এদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার লঙঘন সংক্রান্ত বহু সরেজমিন তদন্তভিত্তিক প্রতিবেদন জমা পড়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত বর্ষপঞ্জির নিয়মিত প্রকাশনা এবং মানবাধিকার সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরির ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নেয় মানবাধিকার কমিশন।

৯.৪.১ মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণাপত্র

মানবাধিকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার পরিণতিতে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও রক্ষার তাগিদে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর গৃহীত হয়েছিল মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণাপত্র। এই ঘোষণাপত্রে মোট ৩০টি ধারা আছে।[৭] ১নং ধারায় মানুষের স্বাভাবিক অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ২-১১ নং ধারায় পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার লিপিবদ্ধ হয়েছে। এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; দাসত্ব ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি; আইনের চোখে সমানাধিকার; চিন্তা, বিবেক, ধর্ম ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা; শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকার ইত্যাদি। ২২-২৭ নং ধারায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; যেমন — কর্মের অধিকার, সমান কাজের জন্য সমান বেতন, শিক্ষার অধিকার, জীবনযাত্রার উপযুক্তমানের অধিকার প্রভৃতি। ২৮নং ধারায় বলা হয়েছে যে, [৭] ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতা পুরোপুরিভাবে ভোগ করার উপযোগী একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা লাভের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। ২৯ নং ধারায় সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির কিছু কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে ৩০নং ধারায় বলা হয়েছে যে, এই ঘোষণাপত্রের অন্তর্ভুক্ত কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গের কোন কাজকেই সমর্থন করা যাবে না।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকারগুলির বাস্তবায়নের ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক রচিত দুটি চুক্তিপত্র ১৯৫৪ সালে সাধারণ সভার নিকট পেশ করা হয় এবং ১৯৬৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সেগুলি গৃহীত হয়। চুক্তি দুটি হল — (১) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তিপত্র, (২) পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত চুক্তিপত্র। এছাড়াও পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত একটি ঐচ্ছিক প্রোটোকলও গৃহীত হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের মধ্যে রয়েছে প্রস্তাবনা ও ৩১টি ধারা এবং পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে একটি প্রস্তাবনা ছাড়াও ৫৩টি ধারা রয়েছে।[৮] পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের ঐচ্ছিক প্রোটোকলের মধ্যে ১৪টি ধারা আছে। এখানে বিভিন্ন তথ্য ও অভিযোগ সংক্রান্ত অধিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৮(i)]

7 শুভেন্দু দাশগুপ্ত, প্রসঙ্গ মানবাধিকার, পৃ,ঠা ১৫৯-১৬৩।

8 শুভেন্দু দাশগুপ্ত, প্রসঙ্গ মানবাধিকার, পৃষ্ঠা ১৬৪-১৮০।

8(i) M. S. Raj, Awakening of Human Rights in C. J. Nirmal, P. 16.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে প্রণীত চুক্তিপত্রগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতি অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের তুলনায় পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিপত্রটি অনেক বেশি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। তাছাড়া এই অধিকার বিষয়ে রাষ্ট্রের ওপর যে দায়বদ্ধতা অর্পণ করা হয়েছে তার উপস্থাপনাও বেশ জোরালো। সদ্য স্বাধীন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলিকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলি তার বিরোধিতা করেছিল। পরে পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে ঐগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হলেও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলিকে কৃত্রিমভাবে আলাদা করে দিয়ে দুটি স্বতন্ত্র চুক্তিপত্র প্রণীত হয়েছিল। পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিপত্রটি ১৯৭৬ সালে কার্যকর হয় এবং ঐসব মানবাধিকার কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব একটি কমিটির হাতে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিপত্রটি অদ্যাবধি কার্যকর হয়নি।

ছয়ের দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তাদের বিকাশের অধিকারকেও মানবাধিকারের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে পাশ্চাত্যের দেশগুলি তারও বিরোধিতা করেছিল। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ১৯৮৬-তে বিকাশের অধিকারকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা মানবাধিকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। একে আরও জোরদার করা হয় ১৯৯৩ সালে ভিয়েনা সম্মেলনে। যাই হোক, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা যে যথেষ্ট ইতিবাচক তা অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণার মধ্যে তা প্রতিফলিত। শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, নারীদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত ঘোষণা প্রভৃতি হল এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বিশ্বের সর্বত্র যাতে মানবাধিকার রক্ষিত হয় তার জন্য সাধারণ সভা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার বিষয়ক হাই-কমিশনার নামে একটি পদ সৃষ্টি করেছে। ১৯৮৬তে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তেহরান ঘোষণার বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জন না করলে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার পুরোপুরি বাস্তবায়িত করা যায় না। বস্তুত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা কেবল যুদ্ধরোধের মাধ্যমে সম্ভব নয়। বরং তা মানুষের মৌলিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের ওপর নির্ভরশীল। তাই মানবাধিকার সংরক্ষণে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৯.৪.২ মানবাধিকার ও তৃতীয় বিশ্ব

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের ছড়ি ঘোরানোর মঞ্চে পরিণত হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মতামত প্রকাশের কোন অধিকারই কার্যত নেই। পৃথিবীতে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের প্রায় নব্বই শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করছে উত্তর গোলার্ধের চারটি সংবাদ সংস্থা। তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের সাংস্কৃতিক অধিকারের ওপরও ধনতন্ত্রের আগ্রাসন প্রসারিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকারকে হাতিয়ার করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ওপর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। একে বলা যেতে পারে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে 'মানবাধিকারের রাজনীতি'।[৯] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্যত নিজেকে সারা

9 দীপঙ্কর চক্রবর্তী, মানবাধিকারের সংজ্ঞা, রাজনীতি এবং তৃতীয় বিশ্ব শুভেন্দু দাশগুপ্ত, প্রসঙ্গ মানবাধিকার এর মধ্যে, পৃষ্ঠা ৩৪।

বিশ্বের মানবাধিকার রক্ষার স্ব-ঘোষিত অভিভাবক হিসাবে ঘোষণা করেছে। যেসব দেশ তার তাঁবেদারী করে না সেইসব দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকার মানবাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ তোলে, যেমন, চীন, কিউবা বা ইরাকের কথা বলা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙিঘত হলেও মার্কিন সরকার নীরবতা অবলম্বন করে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম, চিলি, কুয়েত ও রাশিয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মানবাধিকার সংক্রান্ত যে বিভিন্ন চুক্তিপত্র ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাতে মার্কিন সরকার স্বাক্ষর করেনি।

উপনিবেশোত্তর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বহুল সমস্যায় জর্জরিত। তার ওপর বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া তাদের কাছে গোদের ওপর বিষফোঁড়া হিসাবে দেখা দিয়েছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধেরপরবর্তীকালে বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও তার ছত্রছায়ায় বিশ্বব্যাঙ্ক, আই.এম.এফ., বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রভৃতির কাজকর্ম হল বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ারই চিহ্নস্বরূপ। বিশ্বায়ন বহুজাতিক সংস্থাগুলি ও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সামনে ঠেলে দিয়েছে। নয়া-উদারনীতিবাদীদের যুক্তি হল, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বহুজাতিক সংস্থার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করবে। এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করে মানবাধিকারের প্রসার ঘটাবে। কিন্তু কার্যত বিশ্বায়নের ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সার্বভৌমকতা বিপন্ন হচ্ছে এবং তারা মানবাধিকার সংরক্ষণে অসহায় হয়ে পড়ছে। বিশ্বায়নের ফলে যে বিনিয়োগ হচ্ছে, তাতে আসলে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারনের ক্ষমতা বিনিয়োগকারীর হাতে থেকে যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে হাতে নয়। এতে যৌথভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ও মানবাধিকার দুইই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বস্তুত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বহুজাতির সংস্থাগুলির একটি লাভজনক বাজারে পরিণত হয়েছে। ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পাশ্চাত্যের কর্তৃত্বাধীন ও স্বার্থবাহী যে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে ও হচ্ছে, তার স্বার্থরক্ষা করাটাই কার্যত মানবাধিকার রক্ষার মূল কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছে। তবে আশার কথা এই যে, এইসব দেশে সাধারণ মানুষ তাদের মানবাধিকার সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়ে উঠেছে। মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

অনুশীলনী - ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর -ভিত্তিক প্রশ্ন :-

১. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে মানবাধিকার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

২. মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণাপত্র কী?

৩. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের ওপর টীকা লেখ।

রচনাত্মক প্রশ্ন :-

১. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তৃতীয় বিশ্বের মানবাধিকার রক্ষায় কতখানি সফল হয়েছে তা পর্যালোচনা কর।

৯.৫ ভারতে মানবাধিকার সংরক্ষণ

প্রাচীন ভারতে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় মানবাধিকারের ধারণার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদে শরীর, বাসস্থান ও জীবন বিষয়ক পৌর অধিকারের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে মানবাধিকার ও মানবিক আইনের ধারণা মূলত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।[১০] যুদ্ধ চলাকীলন অবস্থায় এবং যুদ্ধের পরে কোন্ মানবিক আইন গৃহীত হবে সে সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণবিধি প্রচলিত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের আচরণ-বিধির মাধ্যমে মানবাধিকার নির্ধারণ করা হত। মহাভারত (১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) মনুস্মৃতি (২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে যুদ্ধের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভারতে ধর্ম ছিল সর্বোচ্চ আইন, সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন শাসক এবং তা ছিল প্রজাসাধারণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সেইজন্য রাজশক্তি বা শাসকশ্রেণী ঐ আইন মেনে চলতে বাধ্য ছিল। এর ফলে রাজশক্তি কর্তৃক জনগণের স্বাভাবিক অধিকার লঙঘন করা অসম্ভব ছিল। সুতরাং প্রাচীন ভারতেও স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা ছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে ভারতে নির্বাচিত রাজতন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল।

ভারতে মানবাধিকার নিয়ে চিন্তাভাবনা বিশেষভাবে শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে, যখন শিক্ষার দাবি বিশেষ করে নারী শিক্ষার, নারীদের বিরুদ্ধে অমানবিক প্রথা রোধ করার জন্য দাবি, জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে দাবি ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন প্রমাণ করে যে, স্বাধীনতা হল মানুষের অন্যতম মানবাধিকার। জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারাটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ধারা। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পেশ করার জন্য কংগ্রেস একটি অধিকারের ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করে। তাতে বাক্-স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, আইনানুগ বিচার পাওয়ার স্বাধীনতা, জাতিগত বৈষম্য থেকে মুক্তি প্রভৃতিকে মৌলিক অধিকারের দাবি হিসাবে তুলে ধরা হয়। মোতিলাল নেহেরু কমিটি ১৯২৮ সালে ভারতীয়দের যেসব অধিকার দেওয়া হত না এরকম কিছু মৌলিক অধিকারের দাবি প্রস্তুত করে। ১৯৩১ সালে করাচি সম্মেলনে কংগ্রেস মৌলিক অধিকারের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ১৯৩৬ সালে জওহরলাল নেহেরু ভারতে প্রথম পৌর স্বাধীনতা সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ঐ বছরই সারা ভারত পৌর স্বাধীনতা সংঘ গঠিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি হন। ১৯৪০ সাল নাগাদ ভারতের বিভিন্ন দল, সম্প্রদায়, এমনকি সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীরও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণের দাবি তোলা হয়। সাংস্কৃতিক অধিকারের সংরক্ষণের দাবির মধ্য দিয়ে ভারত পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে এগিয়ে থাকল। প্রাক-স্বাধীন ভারতে মানবাধিকারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এদের সংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ মানবাধিকারগুলিকে সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় ও প্রস্তাবনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন।

৯.৫.১ ভারতের সংবিধান ও মানবাধিকার সংরক্ষণ

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানে সন্নিহিত নাগরিক-অধিকারগুলিকে সর্বজনীনতা দান করেছে। ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণও এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় ও প্রস্তাবনার

মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার লিপিবদ্ধ করে বিশ্বের কাছে ভারতের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। সংবিধান রচনাকালে গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ ব্রিটিশ শাসনকালে মানবাধিকারের কণ্ঠরোধ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, বর্ণ ও জাতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা সৃষ্টি করে বিভেদের মন্ত্রে দীক্ষিত করার ব্রিটিশ অপপ্রয়াস সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন। অচ্ছ্যুত শ্রেণীবর্গের অপরিসীম দুর্দশাও তাঁদের প্রভাবিত করেছিল। এই প্রেক্ষিতে সংবিধানপ্রণেতাগণ সংবিধানের মধ্যে মানবাধিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন। সংবিধানের প্রস্তাবনায় দেখানো হয়েছে যে, ভারতের সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য হল একটি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, যেখানে প্রত্যেক ভারতবাসী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার ভোগ করতে পারে। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতীয় নাগরিকের ব্যক্তিগত অধিকারগুলি সুরক্ষা করার প্রয়াসে সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারগুলি সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই অধিকারগুলি হল — সাম্যের অধিকার স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার এবং শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার। এই অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।

ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অংশে রাষ্ট্রশাসনপ্রণালীর নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংকলিত হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত দর্শনকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এই অংশে কতকগুলি নীতির উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি রাষ্ট্র বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট থাকবে। এগুলি হল সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আদর্শ-সংক্রান্ত নীতিসমূহ। এই নীতিগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে নাগরিকের কতকগুলি অধিকার নিহিত আছে, যদিও মৌলিক অধিকারের ন্যায় এই নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এই নীতিগুলি রূপায়নের মাধ্যমে কল্যাণ রাষ্ট্রকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে। অনুচ্ছেদ ৫১ক(৫)-এ বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হবে ধর্ম, ভাষা, প্রাদেশিকতা অথবা শ্রেণীগত বৈষম্যকে উত্তরণ করে সকলের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করা।[১১] এই উপঅনুচ্ছেদের মধ্যে মানবাধিকারের মূল তত্ত্ব এবং ভারতের সংবিধানের দর্শন নিহিত আছে। এর দ্বারা মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেবলমাত্র বিধি প্রণয়ন করে সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষণ করা যায় না, এর জন্য প্রয়োজন মানসিক পরিবর্তন। এই উদ্দেশ্যেই ৫১ অনুচ্ছেদটি সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে।

ভারতের সংবিধানের ৩২৬নং ধারায় সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে। সংবিধানের ষোড়শ অংশের বিভিন্ন ধারায় সংরক্ষণমূলক বৈষম্য নীতির মাধ্যমে সংখ্যালঘু এবং তফশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য বিশেষাধিকার প্রদান করা হয়েছে। সমাজের এইসব দুর্বল অংশের কল্যাণ সাধনের জন্য সংবিধানে লিপিবদ্ধ বিধিব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সময় নানাধরনের কমিশন নিয়োগ করেছে। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল — সংখ্যালঘুদের

11 Article 51A(C) of the constitution of India.

জন্য জাতীয় কমিশন, তফশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য জাতীয় কমিশন, মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশন ইত্যাদি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১৯৪৮ সালের বিশ্ব ঘোষণাপত্র এবং পরবর্তী কালের মানবিক অধিকার সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে ভারত বরাবরই মানবাধিকার রক্ষায় সজাগ ও যত্নশীল। তাই ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার সুরক্ষা আইন প্রণীত হয়। এই আইন অনুসারে ঐ বছরই গঠিত হয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়।

ভারতের সংবিধানে তত্ত্বগতভাবে মানবাধিকার বিভিন্ন ধারায় স্থান পেয়েছে ও সংরক্ষিত হয়েছে। অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতের হস্তক্ষেপ এবং সাম্প্রতিক বিচারবিভাগের সক্রিয়তা নাগরিকের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক জীবনে নিরাপত্তাহীনতা ভারতবাসীর অধিকার ভোগের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে ভেঙে দিয়েছে। ধর্ম ও জাতপাতকে হাতিয়ার করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিত্রার্থ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। এর ফলে মানবাধিকার কার্যত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপও মানবাধিকারের নতুন সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। সংবিধানে তফশিলী জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য যেসব বিশেষ অধিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কারণ অস্পৃশ্যতা নামক সামাজিক ব্যাধি এখনও দূর করা সম্ভব হয়নি। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা এবং ভাষাকেন্দ্রিক সংঘর্ষ সংখ্যালঘুদের অধিকার ধ্বংস করছে। ভারতে নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে নানাপ্রকার বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও নানাভাবে তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে ও হচ্ছে।

৯.৫.২ ভারতে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন

ভারতের সংবিধানে মানবাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতের আইনসভাও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপযুক্ত বিধি প্রণয়ন করে মানুষের জন্মগত মৌল অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। এই বিধিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — (১) ভারতীয় দণ্ডসংহিতা, ১৮৬০, (২) দন্তপ্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩, (৩) পৌর অধিকার সংরক্ষণ বিধি, ১৯৫৫ (১৯৭৬ এর সংশোধনী), (৪) তফশিলী জাতি ও উপজাতি (বর্বরতা নিরোধ) বিধি, ১৯৮৯।

মানুষের জীবন, স্বাধীনতা, সমতা ও সম্ভ্রম সংক্রান্ত অধিকার হল গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার। ভারতীয় দণ্ড সংহিতা মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান ইত্যাদিতে অন্যায় হস্তক্ষেপকে অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছে এবং সেই অপরাধ সংগঠনকারীর শাস্তির বিধান দিয়েছে। ভারতের সংবিধানে জীবনের অধিকার ও স্বাধীনতা অধিকার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১২] ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় এই মৌলিক অধিকার ভঙ্গ কারীর কার্যাবলীকে অপরাধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হল শান্তিরক্ষা এবং জনগণের প্রাণ, ধন সম্পত্তি, সুখ, শান্তি বিঘ্নকারী মানুষকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করে সমাজে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

12 অনুচ্ছেদ - ২১।

ভারতীয় দণ্ডসংহিতা অপরাধগুলির সংজ্ঞা ও শাস্তির পরিমাণ নির্দেশ করেছে। অপরদিকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতা সঠিক প্রক্রিয়া বা প্রণালী, যা অনুসরন করে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করবে এবং বিচারক বিচার কার্য নির্বাহ করবে, তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে নির্দোষ বলে বিশ্বাস করা হয়। সুতরাং কেবলমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের মৌলিক অধিকার খর্ব করা যায় না। প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বার করতে তদন্তের প্রয়োজন। কিন্তু তদন্ত চলাকালীন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি যেন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতায় যথাযথ বিধান দেওয়া হয়েছে।

অস্পৃশ্যতা একটি সামাজিক ব্যধি। এর আচরণ বা পালন মানবাধিকারের চরম অবমাননা। ভারতের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতা বর্জন করা হয়েছে এবং যে কোনও ধরনের অস্পৃশ্যতা প্রয়োগকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ৩৫ অনুচ্ছেদে এই অপরাধের জন্য শাস্তি নিরূপণের ক্ষমতা সংসদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এই ক্ষমতাবলে সংসদ ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) বিধি প্রণয়ন করে। ১৯৭৬ সালে ঐ বিধিকে সংশোধন করে নাম দেওয়া হয় পৌর অধিকার সংরক্ষণ বিধি (১৯৫৫)। ঐ বিধিতে পৌর অধিকারের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে যে, সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ফলে উদ্ভূত যে কোন অধিকারই হল পৌর অধিকার। এই পৌর অধিকার সংরক্ষণ বিধি অস্পৃশ্যতাজনিত অপরাধ বর্ণনা করেছে এবং ঐ অপরাধের জন্য দণ্ড নির্দিষ্ট করেছে।

তফশিলী জাতি ও উপজাতি (বর্বরতা নিরোধ) বিধি, ১৯৮৯-তে তফশিলী জাতি উপজাতির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে পরিগণিত করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি (৪৬নং অনুচ্ছেদ) অনুসরণ করে এই বিধির প্রবর্তন করা হয় যাতে ঐসব অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকরা সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্গের ও উচ্চবর্ণের নাগরিক দ্বারা নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত না হয়।

ভারতীয় নারীদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় পার্লমেন্ট বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করে। এইসব আইনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল নারীদের অশালীনভাবে উপস্থাপন (প্রতিরোধ) আইন (১৯৮৬), নারী ও বালিকাদের নীতিবিগর্হিত ক্রয় বিক্রয় দমন আইন (১৯৫৬), যৌতুক প্রতিরোধ আইন (১৯৭৮), ধর্ষণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ফৌজদারী বিধি সংশোধনী আইন (১৯৮৩), নারীদের জন্য জাতীয় কমিশন আইন (১৯৯০) প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়।

ভারতের সংবিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই অধিকারকে বাস্তবায়িত করার জন্য ১৯৪৮ সালে কলকারখানা সংক্রান্ত আইন, ১৯৫২ সালে 'খনি সংক্রান্ত আইন', ১৯৮৬ সালে 'শিশু-শ্রমিক (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন' প্রভৃতি পার্লামেন্ট প্রণয়ন করেছে।

৯.৫.৩ মানবাধিকার রক্ষা আইন, ১৯৯৩

ভারতের সংসদ ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার রক্ষা আইন প্রণয়ন করে। তবে এই আইন রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ৮ই জানুয়ারী ১৯৯৪। কিন্তু এই আইনের বিধানগুলি ১৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ তারিখ থেকে বলবৎ হয়েছে। এই আইনের বিধিসমূহের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ছাড়াও সমগ্র ভারতে প্রসারিত। মানবাধিকারগুলিকে অধিকার সুরক্ষা করার উদ্দেশ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ও মানবাধিকার আদালত প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই মানবাধিকার সুরক্ষা আইন পাশ করা হয়।[১৩]

১৯৯৩ সালের আগে ভারত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মানবিক অধিকারের কোন আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়নি। মানবাধিকার রক্ষা আইন, ১৯৯৩ র ২(১) ঘ ধারায় সর্বপ্রথম মানবাধিকারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই ধারা অনুযায়ী মানবাধিকার বলতে বোঝায় সেইসব অধিকার যেগুলি ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদার সঙ্গে জড়িত এবং ভারতীয় সংবিধান দ্বারা অথবা আন্তর্জাতিক সনদ বা ঘোষণাপত্র দ্বারা স্বীকৃত এবং আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। এই মানবাধিকার রক্ষা আইন বলেই জাতীয় এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠনের ব্যবস্থা এবং ঐসব কমিশনের কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত ও নির্দেশিত হয়। এছাড়া ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশন, ১৯৯২ সালে স্থাপিত সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশন এবং সংবিধানের ৩৩৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত তফশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য জাতীয় কমিশনের চেয়ারপার্সনদের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য হিসাবে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই আইনে।

৯.৫.৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে ভারত মানবাধিকার রক্ষায় যথেষ্ট সচেতন ছিল। তাই কেবল সংবিধানের মাধ্যমে নানা ধরনের মানবাধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করেই ভারত রাষ্ট্র ক্ষান্ত হয় নি। সর্বস্তরে ও ব্যাপক হারে মানবাধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার রক্ষা আইনের দ্বারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করার কথা বলা হয়।

মানবাধিকার রক্ষা আইনের ৩ নং ধারা অনুযায়ী ভারত সরকার একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করবে এরূপ উল্লেখ আছে। যাঁদের নিয়ে কমিশন গঠিত হয় তা নিম্নরূপ :

ক) সুপ্রীম কোর্টের একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কমিশনের চেয়ারপার্সন হবেন।

খ) সুপ্রীম কোর্টে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতি অন্যতম সদস্য হবেন

গ) যেকোন হাইকোর্টে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত একজন প্রধান বিচারপতি অন্যতম সদস্য হবেন।

ঘ) মানবাধিকার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অথবা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে দু'জন সদস্য নিযুক্ত হবেন।

13 The Protection of Human Rights Act, 1993 in C.J. Nirmal, Human Rights in India, P.289.

এছাড়াও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন, জাতীয় তফশিলী জাতি ও উপজাতি কমিশন এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনগণ পদাধিকার বলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য হন। এইভাবে সর্বমোট আটজন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত হয়। সদস্যরা ছাড়াও কমিশনে একজন সাধারণ কর্মসচিব থাকেন। ইনি কমিশনের প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক হিসাবে কাজ করেন। কমিশনের সদর দপ্তর দিল্লীতে অবস্থিত। কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং চারজন সদস্য রাষ্ট্রপতির সই সিলমোহর সম্বলিত আদেশপত্রের দ্বারা নিযুক্ত হন। তবে এই নিয়োগের আগে একটি কমিটির কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ নিতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য থাকেন। প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার অধ্যক্ষ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলের নেতা, রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা এবং রাজ্যসভার সহ-সভাপতিকে নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী হলেন এই কমিটির সভাপতি। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ভারতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা না করে সুপ্রীম কোর্টের কোন কর্মরত বিচারপতি বা কোন হাইকোর্টের কর্মরত বিচারপতিকে কমিশনের সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন পাঁচ বছর অথবা বয়স সত্তর বছর পূর্ণ না হওয়া — এই দুটি সময়ের মধ্যে যেটি কম হয় সেই সময়ের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁকে ঐ পদে পুনর্নিয়োগ করা যায় না। নিযুক্ত সদস্যদের কার্যকাল পাঁচ বছরের। তাঁদের আরও পাঁচ বছর ঐ পদে নিয়োগ করা যায়। তবে ইতিমধ্যে সত্তর বছর বয়স পূর্ণ হলে তাঁদের অবসর নিতে হয়। কমিশনের সভাপতি তথা সদস্যদের নিরপেক্ষতা ও অপরবশতা সুরক্ষিত রাখার জন্য মানবাধিকার রক্ষা বিলের ৫ ও ৮ নং ধারায় কয়েকটি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই ধারা দুটির বলে কোন সদস্যকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা কোন কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। তার জন্য বিহিত প্রক্রিয়া অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। এছাড়াও কোন সদস্যের প্রাপ্য কোন ভাতা এবং চাকরির শর্তসমূহ সেই সদস্যের পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তিত করা যাবে না। কার্যকালের মেয়াদ পরিসমাপ্তির পর কমিশনের চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনে কোন চাকরিতে নিযুক্ত হতে পারেন না।

মানবাধিকার রক্ষা আইন, ১৯৯৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ে ১২-১৬ নং ধারায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[১৪] ১২নং ধারায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান দশটি কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল :

ক) নিজ উদ্যোগে অথবা কোন অভিযোগকারীর পেশ করা আবেদনের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করা — (১) মানবাধিকার লঙঘন অথবা লঙঘনে সহায়তা এবং (২) লঙঘনের প্রতিরোধে সরকারী কর্মচারীর কর্তব্যে অবহেলা;

খ) কোন আদালতের বিচারধীন মানবাধিকার লঙঘনের অভিযোগের সঙ্গে জড়িত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমোদন নিয়ে মধ্যস্থতা করা;

গ) সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে জানিয়ে সেই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জেলখানা বা সমগোত্রীয় সংস্থার বাসিন্দাদের অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য সেখানে পরিদর্শন করা এবং সে সম্পর্কে সুপারিশ করা;

14 The Protection of Human Rights Act, 1993 in C.J. Nirmal, Human Rights in India, PP. 295-298.

ঘ) সংবিধান বা আইনে কার্যকরী মানবাধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচগুলি পর্যালোচনা করা এবং সেগুলির সুষ্ঠু রূপায়নের ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করা;

ঙ) সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সহ অন্যান্য যেসব বিষয়ের দ্বারা মানবাধিকার বিঘ্নিত হচ্ছে সেগুলি খতিয়ে দেখা এবং যথাযথ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা;

চ) মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলপত্র পরীক্ষা করে দেখা এবং সেগুলির কার্যকর রূপায়নের জন্য সুপারিশ করা;

ছ) মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণায় উদ্যোগী হওয়া ও তা সম্প্রসারিত করা;

জ) সমাজে বিভিন্ন স্তরে মানবাধিকার বিষয়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং বিভিন্ন প্রকাশনা, গণমাধ্যম, আলোচনাচক্র ইত্যাদির সাহায্যে এই অধিকারের রক্ষাকবচ বিষয়ে গণচেতনা বৃদ্ধি করা;

ঝ) যেসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই কাজে লিপ্ত আছে তাদের উৎসাহিত করা;

ঞ) মানবাধিকার রক্ষার স্বার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা।

মানবাধিকার রক্ষা আইনের ১৩ নং ধারায় কমিশনের অনুসন্ধান সম্পর্কিত ক্ষমতাসমূহ বর্ণিত আছে। অনুসন্ধানকালে কমিশন 'দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮' অনুযায়ী দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ভোগ করতে পারে। অবশ্য ফৌজদারি বিষয়ে কমিশনের সরাসরি কোন ক্ষমতা নেই। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করে। তবে কমিশন কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা না করে বিশেষ প্রতিবেদনও পেশ করতে পারে। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন বা বিশেষ প্রতিবেদনকে কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার রাজ্য বিধানসভায় উপস্থাপিত করে। আইনসভায় প্রতিবেদন পেশ করার সময় কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কী কী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে কিংবা কোন সুপারিশ কেন গ্রহণ করা হয়নি তার বিস্তারিত স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোন সমান্তরাল বিচারালয় নয়। তাই মানবাধিকার রক্ষা আইনের ১৩ নং ধারায় কমিশনকে দেওয়ানী আদালতের মর্যাদা দেওয়া হলেও অভিযোগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে কোন রায় দেওয়ার বা কোন দণ্ড দেওয়ার অধিকার কমিশনের নেই। কমিশনের শুধু পরামর্শমূলক ক্ষমতা রয়েছে, কোন বাধ্যতামূলক ক্ষমতা নেই। তাই শুরু থেকেই কমিশনের কার্যকারিতা ও ক্ষমতা নিয়ে অনেক অভিযোগ ও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এক সমালোচক বলেছেন যে, এটি হল এক নিষ্ফল দেবদূত যে তার সোনার পাখনা শূন্যে বাজায়। বর্তমান ভারতে ক্রমবর্ধমান মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে কমিশন রাজ্যগুলিকে বাধ্য করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা ও অর্থের অভাববোধ করছে। জন্মের শুরু থেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে কমিশন হল একটি প্রতিবন্ধী শিশু -এর সীমানা ও পরিধি ভারত সরকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে।

কিন্তু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আমাদের দেশে মানবাধিকার রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এখন প্রতি বছর প্রায় ৭০,০০০ অভিযোগ কমিশনের কাছে আসছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমিশন রাজ্যসরকারগুলিকে পরামর্শ দিয়েছে। পুলিশবাহিনীকে মানবাধিকার ব্যাপারে

প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য, নারী নির্যাতনের ঘটনার তদন্তে সহায়তা করার জন্য কমিশন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে। কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন স্তরে অসংখ্য আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের দারুণ সাম্প্রতিককালে মানবাধিকার লঙঘনের ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। নাগরিক সমাজের সঠিক সতর্কতার অভাবও এর অন্যতম কারণ। কেবল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একক প্রচেষ্টায় মানবাধিকার রক্ষা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন মানবাধিকার সম্পর্কে ব্যাপক গণ-সচেতনতা।

৯.৫.৫ পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন

মানবাধিকার রক্ষা আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে ২১-২৯ নং ধারায় রাজ্য মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে বলা হয়েছে।[১৫] ২১ ধারা অনুযায়ী কোন রাজ্য সরকার সেই রাজ্যের জন্য এটি মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে পারে। এই আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অসম প্রভৃতি রাজ্যে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালের ৩১ শে জানুয়ারী রাজ্য সরকারের গেজেট নোটিফিকেসন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয় নিম্নরূপভাবে :

ক) কোন হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন প্রবীন বিচারপতি হন চেয়ারপার্সন।

খ) কোন হাইকোর্টের কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হন একজন সদস্য।

গ) পশ্চিমবঙ্গের যেকোন জেলা বিচারকের আদালতের কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক হন একজন সদস্য।

ঘ) মানবাধিকার সম্পর্কে জ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে দু'জন সদস্য নিযুক্ত হন।

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কমিশনের সদস্যগণ রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের প্রথম সভাপতি হলেন চিত্ততোষ মুখার্জী।

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর অনুরূপ। তবে এই কমিশন রাজ্যের মধ্যে মানবাধিকার লঙঘনের ঘটনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে এবং রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করে। কমিশন প্রতি বছরই প্রতিবেদন তৈরি করে এবং প্রমাণিত মানবাধিকার লঙঘনের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে সুপারিশও করে। জাতীয় মানবাধিকারের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকারের ভূমিকা অনেকটা ইতিবাচক। কারণ কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশই রাজ্য সরকার মেনে নেয়।

15 The protection of Human Rights, 1993, C.J. Nirmal, Human Rights in India, PP. 300-304.

৯.৬ ভারতে মানবাধিকার আন্দোলন

ভারতে মানবাধিকার আন্দোলনকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। এক, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের আন্দোলন। দুই, স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের আন্দোলন।[১৬] স্বাধীনতা পরবর্তী যুগকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত মানবাধিকার আন্দোলন যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সাম্প্রতিককালে সেই দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

ভারতে মানবাধিকার আন্দোলনের সূচনাও ঘটেছিল ব্রিটিশ আমলে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়। বাংলার নবজাগরণ যখন থেকে শুরু হয়েছে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন শিক্ষার দাবি, বিশেষ করে নারীশিক্ষা এবং তাদের বিরুদ্ধে অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে এবং জতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে দাবি উঠেছিল, তখন থেকেই শুরু হয়েছিল মানবাধিকার আন্দোলন। জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারাটির সঙ্গে মিশেছিল মানবাধিকার আন্দোলনের ধারা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রমাণ করে যে, স্বাধীনতা হল মানুষের অন্যতম মানবাধিকার। জাতীয় আন্দোলনের সময়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মাঝে মাঝেই মানবাধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য কংগ্রেস একটি অধিকার সম্বলিত ঘোষণা প্রস্তুত করে। বাক স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, আইনানুগ বিচার পাওয়ার স্বাধীনতা, জাতিগত বৈষম্য থেকে মুক্তি প্রভৃতি ছিল অধিকার সম্বলিত ঘোষণার মূল দাবি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা সেই দাবি উপেক্ষা করেছিল। এরপর ১৯২৮ সালে মোতিলাল নেহেরু কমিটি ভারতীয়দের যেসব অধিকার দেওয়া হত না এরকম কিছু মৌলিক অধিকারের দাবি প্রস্তুত করে। ১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে 'নিখিল ভারত নিপীড়িত রাজনৈতিক কর্মী দিবস' পালন করা হয়। হিজলী কারাগারের বন্দীদের ওপর পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে ১৯৩১ সালে কলকাতার মনুমেন্টের নীচে অনুষ্ঠিত হয় এক ঐতিহাসিক জনসভা। এতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐ জনসভার মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি এবং নাগরিক স্বাধীনতার দাবিতে একটি 'নাগরিক কমিটি' গঠন করা হয়। তবে ঐ কমিটি সক্রিয়তার অভাবে ব্যর্থ হয়। ১৯৩১ সালে করাচি কংগ্রেসেরও মৌলিক অধিকারের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৬ সালে নরেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে অবিভক্ত বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বন্দীমুক্তি কমিটি। এর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মৃণাল কান্তি বসু। ঐ বছরই জওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে ভারতে প্রথম মানবাধিকার সংগঠনরূপে 'সারা ভারত পৌর স্বাধীনতা সংঘ' গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সংঘের প্রথম সভাপতি হন। ঐ সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন কে. বি. মেনন। জাতীয় নেতাদের একটি অংশ এই আন্দোলন যোগ দিয়েছিলেন। পুলিশি অত্যাচার, রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর নিপীড়ন, রাজনৈতিক ও গণসংগঠনগুলির ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা, বিনা বিচারে আটক প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করা এবং গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঐ সংঘ ঐকান্তিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ১৯৪০ এর দশকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণেরও দাবি তোলা হয়।

16 বীরেন রায়, মানবাধিকার আন্দোলন, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, প্রসঙ্গ মানবাধিকার এর মধ্যে, পৃষ্ঠা ৯৫।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে মানবাধিকারের জন্য যে আন্দোলন হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে মিশে যায়। রাউলাট বিল বিরোধী আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ, সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন ইত্যাদি ছিল একাধারে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও মানবাধিকার আন্দোলন। ১৯৩০ দশকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের অংশীদার ছিল না। কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করেছিল। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে যে সব আন্দোলন প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ঘটেছে তাতে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন ছিল।[১৭] ১৯৩৮ সালে ও পরবর্তীকালে মানবাধিকার আন্দোলনের বিষয় ছিল বন্দীমুক্তি। বন্দীমুক্তি নিয়ে তখন ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে মানবাধিকার আন্দোলনের যে ব্যাপকতা ছিল, স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে তা অনেক কমে আসে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান প্রণেতাগণ সংবিধানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মানবাধিকার লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে তেলেঙ্গানা ও কাকদ্বীপ অঞ্চলে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয়। এই আন্দোলন পরিচালনা করে কমিউনিস্ট পার্টি। দেশের স্বাধীন সরকারও এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিপীড়ন চালায়। ব্যাপকভাবে মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়। এরই প্রতিবাদে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়, যাতে বিখ্যাত আইনবিদ অতুল গুপ্ত ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কে.পি. চট্টোপাধ্যায় যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর কার্যত মৌলিক অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে সারা দেশেই আন্দোলন গড়ে ওঠে। কলকাতাতেও ব্যাপক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীও এগিয়ে আসেন।

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাধান্য বিস্তারকারী দলব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে বামপন্থী দলগুলির এযাবৎকালে যে সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তারা অনেকটা নিস্পৃহ হয়ে থাকে।[১৮] বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের নামে বহু ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হচ্ছে, তার ফলে ভারতীয় জনগণের মানবাধিকার বিপন্ন হয়ে পড়ছে বলে বিভিন্ন মানবাধিকার রক্ষা কমিটি ও ফোরামগুলি অভিযোগ তুলেছে। তবে একথাও ঠিক যে ভারতের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপও মানবাধিকারের পরিপন্থী। সাম্প্রতিককালে নারীবাদীরা নারীদের স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গণসংগঠন গড়ে তুলেছেন। ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তফশিলী জাতি ও উপজাতিগুলিও বর্তমানে তাদের অধিকার সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়ে উঠেছে। মানবাধিকার আন্দোলনকে সফল করে তুলতে গেলে সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে এবং তাদের এই আন্দোলনে টেনে আনতে হবে।

17 বীরেন রায়, মানবাধিকার আন্দোলন, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, প্রসঙ্গ মানবাধিকার এর মধ্যে, পৃষ্ঠা ৯৬।

18 শুভেন্দু দাশগুপ্ত পৃষ্ঠা ৯৮।

৯.৭ সারসংক্ষেপ

সকল মানুষই জন্মসূত্রে স্বাধীন এবং জীবন, সমতা ও মর্যাদার অধিকারের অধিকারী। মানুষ হয়ে জন্মেই মানুষ এইসব অধিকারের অধিকারী হয়ে যায়। এইসব অধিকার সর্বজনীন, অবিভাজ্য ও অহস্তান্তরযোগ্য। সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষ কোনরকম বৈষম্য ব্যতীত এইসব অধিকারের অধিকারী হয়ে যায়। এগুলিকেই আমরা মানবাধিকার বলে আখ্যা দিয়ে থাকি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি এবং যথেচ্ছ মানবাধিকার লঙঘনের ঘটনা এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিল যে, সমস্ত মানুষের স্বাভাবিক মর্যাদা এবং সমান ও অহস্তান্তরযোগ্য অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তির ওপরই কেবল এই পৃথিবীতে স্বাধীনতা ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের মধ্যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সর্বপ্রথম বাস্তবায়িত করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ১৯৪৭ সালে মানবাধিকার সংক্রান্ত কমিশন গঠন করে। কমিশন মানবাধিকার-সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণাপত্রের যে খসড়া রচনা করেছিলে, তা ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের বাস্তবায়নের ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৬৬ সালে সাধারণ সভায় দুটি চুক্তিপত্র গৃহীত হয় : (ক) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তিপত্র, (খ) পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত চুক্তিপত্র। এছাড়া পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত একটি ঐচ্ছিক প্রোটোকলও গৃহীত হয়। মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। মানবাধিকার কমিটির কার্যরতা সীমিত হলেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ্যে আলোচিত হলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জনমতের চাপে পড়ে।

ভারতের সংবিধানে প্রণেতাগণ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সংবিধানের বিভিন্ন অংশে মানবাধিকার লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া ভারতের কিছু আইনও মানবাধিকার সংরক্ষণে প্রয়াসী। মানবাধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতে মূলত যে আইনটি প্রণীত ও কার্যকর হয় তা হল ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার রক্ষা আইন। এই আইনের মাধ্যমেই জাতীয় ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠনের ব্যবস্থা এবং ঐসব কমিশনের কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত ও নির্দেশিত হয়। ১৯৯০ সালের আইন অনুযায়ী স্থাপিত হয় মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশন। ১৯৯২ সালের আইন বলে স্থাপিত হয় ভারতের সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশন। ভারতের সংবিধানের ৩৩৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তফশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশন গঠিত হয়।

ভারতের সংবিধান ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন আইন ও মানবাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতে নানাভাবে মানবাধিকার লাঞ্ছিত হয়েছে ও হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের দরুণ সাম্প্রতিককালে মানবাধিকার লঙঘনের ঘটনা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতাও ভারত সরকার কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। মানবাধিকারের পাহাড় প্রমাণ সমস্যার কথা মনে রেখেও বলা যায় যে, মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য এখনো অনেক দূর যেতে হবে। মানবাধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বে-সরকারী সংগঠন গড়ে উঠেছে। মানবাধিকার রক্ষা করার জন্য তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গত কয়েক বছরে মানবিক অধিকার

সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা যে যথেষ্ট বেড়েছে ইদানীংকালের অসংখ্য জনস্বার্থমূলক মামলাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাম্প্রতিককালে বিচারবিভাগের সক্রিয়তাও মানবাধিকার রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে। বস্তুত, মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা এবং এই অধিকার বাস্তবায়িত করার জন্য অবিরত সংগ্রাম।

অনুশীলনী - ৩

✶ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ✶

১. ভারতের সংবিধানে কীভাবে মানবাধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে?

২. ভারতে মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনগুলি কী?

৩. মানবাধিকার সুরক্ষা আইন, ১৯৯৩ এর বিষয়বস্তু কী?

৪. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন কীরূপ?

৫. পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

✶ রচনাত্মক প্রশ্ন ✶

১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন ও ভূমিকা পর্যালোচনা কর।

২. ভারতে মানবাধিকার আন্দোলনের প্রকৃতি পর্যালোচনা কর।

৯.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights) :

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন বিশ্বমানবাধিকার একটি দলিল প্রস্তুত করে এবং তা ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং পরিচিত হয় মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights) হিসাবে।

স্টোয়িকবাদ (Stoicism) :

অ্যারিস্টটলোত্তর যুগের এক অন্যতম দর্শন। ক্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের কিছু পূর্বে স্টোয়িক দর্শনের সূত্রপাত। বিখ্যাত পণ্ডিত জেনো ছিলেন স্টোয়িকবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিশ্বজনীন যুক্তির কথা বলেছেন। বিশ্বজনীন আইন বা স্বাভাবিক আইনকে লঙঘন করে আদর্শ জীবনযাপন করা অসম্ভব।

জন রলস্ (John Rawls) :

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একজন অন্যতম রাজনৈতিক দার্শনিক (১৯২১-২০০২)। জন রলস্ উদারনৈতিক তত্ত্ব ও ন্যায়ের ধারণা সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'এ থিয়োরী অব্ জাস্টিস' (A Theory of Justice)। তাঁর কাছে ন্যায় হল ন্যায্য পদ্ধতির মাধ্যমে ন্যায্য বন্টন।

বিশ্বায়ন্ (Globalization) :

বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে 'বিশ্বায়ন' একটি বহু ব্যবহৃত ধারণা। অধ্যাপক রবার্টসন 'বিশ্বায়ন' ধারণাটির প্রবর্তক। তাঁর মতে, একটি ধারণা হিসাবে বিশ্বায়ন একদিকে যেমন বিশ্বের সংকুচীকরণ বোঝায় অপরদিকে তেমনি বিশ্বের একত্মীকরণের ধারণাও সৃজন করে। অর্থাৎ বিশ্বায়ন, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্য, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার প্রতি আলোকপাত করে। তবে বিশ্বায়ন ধারণাটির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ' এক বিশ্ব' — এই ধারণার সৃজন।

অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) :

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি অন্যতম অঙ্গ। শুধুমাত্র যুদ্ধের অভাব নয়, কিংবা সংঘর্ষ পরিহার নয় — শান্তি তখনই সুনিশ্চিত হয় যখন জাতিতে জাতিতে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হয়ে ওঠে। সামরিক নিরাপত্তার অতিরিক্ত এই অবস্থার সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা বর্তেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে অঙ্গের ওপর তার নাম অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)।

বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা (Judicial Activism) :

১৯৮০র দশকের পর থেকে ভারতের শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগ সম্পূর্ণ একটি নতুন ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এই সময় থেকে ভারতের বিচার বিভাগ, বিশেষতঃ সুপ্রীম কোর্ট তার সাবেকি এক্তিয়ারের গণ্ডী ছাড়িয়ে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। বিচার বিভাগের এই নতুন ভূমিকাকে অনেকে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলে চিহ্নিত করেন।

৯.৯ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

✶ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৯.২ দেখুন।

২. অনুচ্ছেদ ৯.২.৩ দেখুন।

৩. অনুচ্ছেদ ৯.৩.১ দেখুন।

✶ রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৯.৩, ৮.৩.১, ৯.৩.২, ৯.৩.৩, ৯.৩.৪, ৯.৩.৫ দেখুন।

অনুশীলনী - ২

✶ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৯.৪ দেখুন।

২. অনুচ্ছেদ ৯.৪.১ দেখুন।

৩. অনুচ্ছেদ ৯.৪ দেখুন।

✶ রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৯.৪.২ দেখুন।

অনুশীলনী - ৩

✶ সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৮.৫.১ দেখুন।

২. অনুচ্ছেদ ৯.৫.২ দেখুন।

৩. অনুচ্ছেদ ৯.৫.৩ দেখুন।

৪. অনুচ্ছেদ ৯.৫.৪ দেখুন।

৫. অনুচ্ছেদ ৯.৫.৫ দেখুন।

✶ রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর ✶

১. অনুচ্ছেদ ৯.৫.৪ দেখুন।

২. অনুচ্ছেদ ৯.৬ দেখুন।

৯.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

1. Write a critical note on the composition and functions of the National Human Rights Commisiion in India.
2. Comment on the role of the National Human Rights Commission as a protector of human rights in India.
3. Comment on the major legal and institutional safeguards against violation of human rights in post-independence India and point out their weaknesses.
4. Write a critical note on Human Rights movements in post-independence India.

Short Type :

1. How is the National Human Rights commission constituted?
2. What are the major functions of the National Human Rights Commission?
3. How would you define Human Rights in the Indian context?
4. Write a short note on West Bengal Human rights Commission.

৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. Chiranjivi J. Nirmal(ed.), Human Rights in india : Historical, Social and Political Perspectives, Oxford University Press, New Delhi, 2001.
2. The Protection of Human Rights Act, 1993.
3. Britannica : Ready Reference Encyclopedia, vol. 5, New Delhi.
4. P.M. Bakshi, The Constitution of India, 2002, Universal Delhi.
5. শুভেন্দু দাশগুপ্ত (সম্পাদনা), প্রসঙ্গ মানবাধিকার, ২০০০, পিপল্‌স্ বুক সোসাইটি, কলকাতা।